

বাণীশ্রোত্র ।	৪৯
বাক্য ।	১
বিজ্ঞাপনী ।	৪৫৮
বিবিধ ।	৪৭৪
বিষকন্যা ও বিধবা রমণী ।	২৭২
ভারতবর্ষীয় ভাষা ।	১৭
ভারতে আৰ্য্যজাতি ।	৩২৮
ভারতের প্রজানীতি ।	৭০
ভারবি ।	২১১
ভালমানুষ ।	২৪১, ৪২৫
মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ ।	৫১৯
মহামায়ার চিত্রপট ।	৩৯৪
মৌক্তিক ।	১২৯
যবন ।	২৩৬
যমুনা তটে (পদ্য)	৯৭
রসিকতা ও রসের কথা ।	৫৬৩
লুক্সিসিরা (পদ্য)	৫৫৩
শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্তন ।	২৬৬
শিশুশিক্ষা ।	৫২৯
শূকর ।	৫৪৯
সংক্ষিপ্ত সমালোচন ।	৯৩, ১৯২, ২৮৬, ৩৮১
সমালোচন ।	৪৬৪, ৫৭১
সাগরবন্দ ।	১২
সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ ।	২
স্প্যানিস্ সভ্যতা ।	৫৪৮
সোমরস ও তাহার সেবন বিধি ।	৩২১
স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী উপদেশ ।	৫৫৭
সুভোগল ।	৫০১
সুভোগল ।	২৭৮

বান্ধব ।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন ।

৪র্থ খণ্ড ।

১২৮৫ ।

[১ম সংখ্যা ।

বান্ধব ।

আজি চারি বৎসর হইল বঙ্গীয় পাঠক-
বর্গের সহিত বান্ধবের পরিচয় ও প্রণয় ।
পাঠকবর্গ বান্ধবের প্রণয়কাজ্জী কি না,
তাহা আমরা ঠিক জানিতে না পারিলেও,
ইহা আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত আছি যে,
বান্ধব সর্বান্তঃকরণে পাঠকবর্গের প্রণয়-
কাজ্জী । সুতরাং ঐ প্রতিমধুর প্রণয় শ-
ব্দটি ব্যবহারে আমাদিগের ভয় কি লজ্জা
নাই ।

এই চারি বৎসরে বান্ধব কাহাকে কোন
বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ না হইয়া
থাকিলেও, অসংখ্য অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ
করিয়াছে । এই চারি বৎসরে আমরা শি-
খিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা ইদানীং অতি-
দ্রুত, অতিদীনহীনা দুর্বল হইলেও ই-

হার ভবিষ্যৎ নিতান্ত তিমিরাক্ত নহে ।
যে ভাষায় যমুনা-লহরী বৃত্ত করে, মোহন
লালের গর্জন, মোহনলালের বিন্যাস ত-
রঙ্গ বহির মত উদ্দীপিত হয়, রবীন্দ্রের
বিকট সিংহনাদের মধ্যেও অমৃতরস-নিসা-
ন্দিনী মধুময়ী কথা প্রতিধ্বনি প্রবেশপথ-
পায়,—যে ভাষায় প্রতাপের দেহভুল্লভ
পবিত্র চরিত অঙ্কিত হইতে পারে, এবং
ভাষার প্রাণরূপিনী উদ্দীপনা অখলীলায়
প্রবাহিত হয়, সে ভাষার ভরসা আছে ।
আমরা এই সঙ্গে ইহাও শিখিয়াছি যে,
বাঙ্গালা ভাষার যেমন ভরসা আছে, বা-
ঙ্গালিরও তেমন ভরসা আছে । যে দেশ-
প্রমোদ-নিদ্রা-মগ্ন ধনীর নিকট আদর নাই এই
পদস্থের নিকট সম্মান নাই,—দক্ষিণে ।

বামে কোন দিকেই অবলম্ব্য নাই, সম্মুখে ও পশ্চাৎ কোন দিকেই তিষ্ঠিবার স্থান নাই;—যে দেশে পাঠ্য বলিয়া নির্ধারিত না হইলে প্রবাল মুক্তার ন্যায় অমূল্য রত্নও বিকায় না, উপরিস্থের অনুরোধ কি ঈ-
দীত না হইলে ভারতের তীর্থরাজ্যরূপ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-পাঠে, ঐতিহাসিক কি বিজ্ঞান রহস্যের রম্যাবদানে, হেমচন্দ্রের অলোক-সাদারণ তেজোরশ্মির অনুধ্বানে কিংবা ভাস্কর্যময় কম্পতরুর ছায়াসেবনেও লোকের ওরুতি জন্মেনা;—যে দেশে কাঁচ আর কাঞ্চন সমান পদার্থ, ভ্রূর-গুঞ্জন আর ভেকধ্বনিতে সমান তৃপ্তি;—যে দেশে এক শ্রেণির লোক অর্থের দুর্ভবভরে উৎপীড়িত হইয়া পক্ষে পতিত, আর এক শ্রেণির লোক হা অন্ন বলিয়া অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত;—যে দেশে মুখের নাম রসিক, অজের নাম সর্বজ্ঞ ভট্টাচার্য, মাতৃভাষার মুখের নাম পাণ্ডিত্য, পর-মুখ-প্রেক্ষিতার নাম পৌকষ; যখন সেই দেশেও একটি নিরাশ্রয় এবং সর্বপ্রকারে

নিগৃহীতা ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, এবং সামান্য একটি মলিল-রেখার ন্যায় প্রথমতঃ প্রবাহিত হইয়া এইক্ষণ তরঙ্গমৎ-কুল মেঘনাদ-নদের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে গর্জন করিতেছে, তখন বুঝিয়াছি যে দুঃখিনী বঙ্গভূমির প্রতি অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির অরূপা নাই। আমরা আমাদের এই শিক্ষালব্ধ উৎসাহের উপর দৃঢ়নির্ভরে ক্রিয়াকালের বিশ্বাসের পর, পুনরপি প্রীতির ভিখারী হইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাদের অবসাদ-জন্য নিদ্রা যে মৃত্যুর প্রতিক্রিতি নহে, এবং বাক্যব যে প্রাণসত্ত্বে কখনও প্রতিশ্রুতি এবং পরিগৃহীত ব্রতদর্শনহইতে স্মৃতিত হইবে না, তাঁহারা এইটুকু বিশ্বাস করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আর যে সকল সুশিক্ষিত ও সুহৃদয় ব্যক্তি এত কাল বাক্যবকে হস্তাবলম্ব দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বের মত ইহার প্রতি সদয় রহিলেই আমরা অক্লান্তপদে চলিতে পারিব।

সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ।

প্রথম প্রস্তাব।

সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ,—

জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির

যে সময়ে যে ভাবে পরিপূর্ণ কি

ভূগোপরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই সময়ের

সাহিত্যও সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলসিত

রহে। মানুষের মন যখন শোকে আকুল,

ক্রোধে উদ্দীপ্ত, অথবা দুঃখে কি দুষ্টিভাষ

অবসন্ন রহে, তাহার মুখচ্ছবি তখন

সাজ্জন্দ এবং কণ্ঠধ্বনি বিরূত হয়,—এবং

যখন তাহার হৃদয় আনন্দভরে নৃত্য করে

চিত্ত নূতন স্বপ্নের সুধাময় স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহার চক্ষু তখন সেই আনন্দ ও সেই স্বপ্নে হাসিতে থাকে, তাহার কণ্ঠস্বর বসন্ত-মদ-মত্ত কোকিল-কণ্ঠের মাদুরীতে মিশিয়া যায়। মনুষ্যসম্বন্ধে প্রকৃতির এই নিয়ম অনুপ্রাণনীয়, এবং জাতীয় সাহিত্যও সর্বপ্রকারে এই নিয়মের অধীন। উহাতে কখনও ক্রোধের ভয়ঙ্কর গর্জন, কখনও অবকদ্ধ ক্রোধের ততোদিক ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত ভাব। কখনও প্রেমের উচ্ছ্বাস, কখনও শোক ও পরিতাপের হৃদয়বিদারী ককণা-নিঃস্রব, কখনও বীর-গর্ভ ও বাহুবল-দর্পের সিংহনাদ, কখনও স্বার্থপরতা ও বনিধৃতির সংকোচ ও সাবধানতা। কখনও বিলাসের আলস্য ও আবেশ, কখনও ভয়ের বিরূত ভক্তি এবং ভক্তির বীভৎস বিকার। ফলতঃ, সাহিত্যকে ইতিহাস না বলিয়া জাতীয় হৃদয়ের চিত্রপট বলাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, ইতিহাসে যাঁহা না থাকে, অথবা ইতিহাসে যাঁহা থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, ভাষার সাহিত্য মানবপ্রকৃতির সমস্তমূলক নিয়মানুসারে, সাহিত্যে তাহা আলিখিত হয়,—এবং সাহিত্য, পরিমার্জিত দর্পণের ন্যায়, জাতীয় পরিবর্তনের স্বক্ষাদপি স্বক্ষ বর্ণভেদও আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া প্রদর্শন করে। ইতিহাস প্রায়শঃই বাহিরের কথা লইয়া

যে সকল প্রশ্নের উত্তর করা নিতান্ত কঠিন, সাহিত্য তাহার সহুত্তর দেয়।

ভারতবাসী আৰ্য্যদিগের শৈশব সময়ের সাহিত্য বেদ। বেদে শিশুর মারলা, বেদে শিশুরিসিক্ত প্রভাতপদ্মের পবিত্র শোভা এবং পবিত্র মাদুর্য্য। বেদ ঐহাদিগের হৃদয়ের ভাষা ছিল, তাঁহারা মনু কি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, নমাজের অভ্যন্তরীণ ভেদ এবং পরিণামচিন্তা লইয়া বুদ্ধি বিলোড়ন করিতেন না,—কণাদ কি কপিলের ন্যায় তত্ত্বশাস্ত্রের বীজমূত্র লইয়া পদার্থতত্ত্বের অন্তস্তলে নিমজ্জিত রহিতেন না, এবং কালিদাস প্রমুখ কবিসম্প্রদায়ের ন্যায় কামিনীর বিভ্রম-বিলাস ও লাগণালীলা লইয়াও প্রমত্ত থাকিতেন না। তাঁহারা, প্রাতঃসূর্য্যের উদয়োন্মুখী প্রতিভা দেখিয়া, ঐহাকে কেহ জানে না, ঐহাকে কেহ জানিবে না, সেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির আনন্দময় অনুভবে, কাননস্থিত বিহঙ্গনিবহের মত, কলকল নাদে প্রকৃতির প্রভাতবন্দনা গান করিতেন;—জলভারপূর্ণ শ্যামল মেঘমালার নবীন-মৌন্দর্য্য-দর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেন;—বাসুর বেগ প্রশমনের জন্য স্তোত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন;—এবং তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে যেন শয্যা হয়, গাভী যেন দ্রব্ধবতী রহে, তকরাজি যেন ফলে ও ফুলে সুশোভিত হইয়া চক্ষু বিনোদন করে, এই জন্য তাঁহারা দেবতার আরাধনা করিতেন।

তখন রাজা কি রাজকীয় অত্যাচার ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে রাজনীতির অবিলম্বিত থাকিবে? নতুন গ্রন্থিত সমাজ-সংস্কারে সর্বপ্রকার অপূর্ণতা থাকিলেও, কোন রূপ অস্বাস্থ্য ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে সমাজতন্ত্রের ভয় এবং সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের বিকার থাকিবে? শ্রমবান্ধবের সহিত মনুষ্যের কৃত্রিম ভক্তি এবং কৃত্রিম আনন্দেরও কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তদানীন্তন সাহিত্যেও কিরূপে কৃত্রিম ভক্তি কিংবা কৃত্রিম আনন্দের কণ্টকিত স্থান পাইবে?

কিন্তু সত্য কথা এই যে, সাহিত্যে রীতিবাহিনীকে ধর্মের প্রাতিষ্ঠান এবং জগৎকে বলিয়া পূজা করিতেছে, এবং বাহ্যিক জগৎ-কলর-নিঃসৃত নির্মল নীতিশূদ্ধা আজি প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই নাজরীণ যোগী মহাত্মা গ্রীক, একটি শ্রমজীবী মহাত্মা শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিয়া, সম্মুখস্থিত শিশু-বর্গকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে,— “বাহাদিগের চিত্ত শিশুর মত সরল নহে, স্বর্ণরাজ্যে তাহাদিগের অধিকার নাই।” আমরাও বলি, বাহারা সেই বেদভাষী আর্গাশিশুর ন্যায়, আপ আপ কথার ঈর্ষ্য-রেক ডাকিতে পারে না, এবং প্রকৃতির রূপরাশিতে মোহিত হইয়া প্রকৃতির প্রাণ-দেবীর ক্রোড়ে শিশুর মত ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের জন্যও ধর্মরাজ্যে প্রবেশ-পথ নাই। ধর্মবিষয়ে

সেই পুরাতন বৈদিক সাহিত্য এবং এখনকার সমাজিত ধর্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যে কি প্রভেদ! এখনকার ধর্মবিষয়ক সাহিত্যেও একান্ত আত্মতত্ত্ব এবং অপারদ্বিগ্ন হইয়া অন্য এক প্রকারের আত্মতত্ত্ব। ইহার কোথাও স্বাধের লক্ষণ, প্রকৃতির সমীর-মঞ্চার এবং প্রকৃত আনন্দের সংস্পর্শ নাই। ইচ্ছাতে ধর্মের নাদনা, ক্রেশকের ঔষধ-সেবন; এবং ধর্মোপদেশ বার বার নাই কটুকন্যায়-ঔষধ-বিতরণ। ইহার প্রাণনার প্রসঙ্গ শ্রম, কিংবা বাদবিতণ্ডা; এবং ইহার সকল ব্রহ্ম অনুতাপ অথবা অভিসম্পাত, অন্তর্দাহ অথবা পাপের পতি হইল। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ‘ধর্মিক’ মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য এক সৃষ্টি-ছাড়া জীব। সে কাহারও স্বখে সুখী নহে, কাহারও দুখেও সে দুঃখী নহে। তাহার সহিত কাহারও কোন বিষয়ে মহাত্ম-ভূতি নাই। তাহার মুখমণ্ডলে চিরন্তনী অমাবস্যা; অবোধ বালক বালিকাও ভয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস পায় না। সে সকল বিষয়েই মতত মঙ্গুচিত। সে সঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না, এবং সঙ্কোচে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও ইচ্ছুক হয় না। তাহার হৃদয় এক অচিন্তনীয় ব্যাপির অধিকরণ। সেখানে আত্মোদার নাই, উৎসাহ নাই এবং হর্ষের তরল তরঙ্গ নাই। কবিতার কলকণ্ঠ সেখানে পরাজিত হয়, এবং সৌন্দর্যের পবিত্র প্রতিমাও পাপের প্রতিকৃতি বলিয়া সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়

বৈদিক সাহিত্য সর্ব্বাংশেই উহার বি-
পরীত। উহার সর্ব্বত্রই নবোদ্যত হৃদয়ের
আবেশ, অ কাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও উৎসব।
উহার ধ্যানধারণা গম্ভীর ও মধুর; প্রা-
র্থনা স্বভাবসুন্দর, সরল ও অমায়িক; উ-
পদেশ অভিসম্পাত-শূন্য এবং সাধনা
ঋষিপন্থীদের মত স্বাভাবিক ও স্বথপ্রদ।
ধর্ম্মশাস্ত্রে এইক্ষণ যে বিন প্রবর্তিত হইয়াছে,
বৈদিক সাহিত্যের কুত্রাপি তাহা পরিল-
ক্ষিত হয় না। তখন ধর্ম্মও লোকের গল-
গ্রাহ স্বরূপ ছিল না, এবং যাঁহারা পার্থক্য,
তাঁহারাও মৃষ্টিমান্ রোগ এবং জনসমা-
জের গলগ্রাহ ছিলেন না।

বেদের পর রামায়ণ আর মহাভার-
তের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমরা ক-
ণিকমাত্রের অর্থবিস্তৃতিতে প্রীতি আর বা-
লনীতিতে যে পার্থক্য দেখাইয়াছি, রামা-
য়ণ ও মহাভারতেও সেই পার্থক্য। রামা-
য়ণের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রেমো-
চ্ছ্বাস-পরিপ্লাবিত নূতন যৌবন, মহাভা-
রতের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার ক্ষতিলা-
ভগণনা-তৎপর প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য। রামায়ণে
হৃদয়ের আবেশ, হৃদয়ের আবেগ, এবং
রামায়ণের প্রধান-পুরুষ রাম। মহাভা-
রতে বুদ্ধির খর-দার, বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য এবং
মহাভারতের প্রধান-পুরুষ কূট-যুদ্ধ-প্রসিদ্ধ
বান্দেব, অথবা বান্দেবের করপ্তত পুত্র
রাজা যুধিষ্ঠির। আর প্রকৃতিরই বা কি
আশ্চর্য্য মহানুভূতি! রামায়ণের কবি,
বাল্মীকি; এবং মহাভারতের কবি, বাস।

ইতিহাসের দুইটি বিভিন্ন সময়ের ছবি রা-
মায়ণে ও মহাভারতে যেরূপ বিভেদস-
হকারে চিত্রিত হইয়াছে, শুদ্ধ তাহা তুলনা
করিলেই সাহিত্য এবং জাতীয় হৃদয়ের
সাময়িক অবস্থাঘটিত পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট
প্রতীক্ষমান হইতে পারে।

রামায়ণ এবং মহাভারত এই উভয়
কাব্যেই ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার রাজ্য ল-
ইয়া বিরোধ। রামায়ণের বিরোধ রাম
ও ভরতে, মহাভারতের বিরোধ কোরব
ও পাণ্ডবে। কিন্তু বিরোধের বিচিত্র
পার্থক্য একবার চিন্তা কর। রামায়ণের
দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা এই বলিয়া বিবাদ
করিতেছেন যে,—“এই রাজা, এই রাজ-
পদ, এই অতুল রাজসম্মান আমার নহে,
ইহা তোমার”। মহাভারতের ভ্রাতা
দ্বির গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছেন যে,—“যত
টুকু ভূমি স্থূতির স্মৃতিক্ষ অগ্রভাগে সংলগ্ন
রহিতে পারে, তাহাও বিনা যুদ্ধে প্রদান
করিব না”। রামচন্দ্র ভ্রাতাকে বিরোধে
পরাজব করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত সা-
ম্রাজ্য তুলিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং হৃদয়ের
আনন্দভরে ভার্ধ্যাসহ বনবাসী হইলেন।
মহাভারতের ভ্রাতা বিরোধে জয়লাভ ক-
রিয়া, ভ্রাতার উরুতে পদাঘাত, মস্তকে
পদাঘাত এবং অন্তরে ততোধিক ক্রোধকর
নিদাক্ষণ বাক্যের আঘাত করিলেন, এবং
ভ্রাতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রদা-
নাদি সংকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
সত্য বটে, বাস যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের পুত্র,

ধর্মের অবতার এবং সাক্ষাৎ ধর্ম-পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সত্য বটে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে নিয়ত বেদ পাঠ এবং বিপ্রসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া, এবং তাঁহাকে আশিধারব্রতে বিজয়ী দেখাইয়া সাধারণের মনে তাঁহার প্রতি এক অসাধারণ ভক্তি জন্মাইয়াছেন । ইহাও সত্য যে যুধিষ্ঠির অকারণ পরজ্রোহ, অকারণ পরপীড়ন, এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও দম্ভমাৎসর্গ প্রভৃতি বহুবিধ দোষহইতে নিম্নুক্ত রহিয়া জগতে ধার্মিক নাম পাইবার জন্য বহুল পরিমাণে যোগা হইয়াছেন । কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির এক প্রকৃতির ধার্মিক নহেন, এবং এই উভয় সময়ের ধর্মগত আদর্শও এক ছিল না । ইহাঁদিগের এক জনের ধর্ম্যে কুরূমের দৌরভ, বমন্তের কমণীয় কান্দি, সত্যের স্বচ্ছশোভা, এবং প্রথম বরষের প্রমত্ত প্রবাহ;—আর এক জনের ধর্ম্যে শীতের সঙ্কোচ, স্বার্থের দুশ্চিন্তা, কৌশল, কাপটা, কলির প্রারম্ভ-কালীন প্রদর্শন-প্রিয়তা, এবং বিবিধ কাঙ্ক্ষার্থের বিচিত্রঘটা । একজনের ধর্ম্যে শক্তি এবং স্বভাবের অপ্রতিহত বিকাশ,—আর একজনের ধর্ম্যে অকালবার্জ্যকোর অকৃতি এবং অনিচ্ছাকৃত গতি ।

ধন্য বাল্মীকি ! ধন্য ভারতবর্ষ ! আর আজি হতভাগা হইলেও ধন্য আমরা যে, যে দেশ রামচন্দ্রের পদত্রেণু স্পর্শ করিয়াছে, আমরা সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করি-

য়াছি, এবং যে গঙ্গা ও গোদাবরী আর্ঘ্যাবর্তের সেই সময়ের সেই আদর্শ-পুরুষ, সেই জাতীয় প্রতিনিধির পাদপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়াছে, আমরা আজি সেই পুরাতন গঙ্গা ও গোদাবরীর তরঙ্গমালা দর্শন করিয়া পুরাতন আর্ঘ্য জাতির কীর্ত্তি ও মহিমার তরঙ্গ ধ্যান করিতে পারিতেছি । প্রকৃত মহত্ত্বের ছায়া-পথে কিংবা স্রবণপথে অবস্থানও সামান্য দোভাগ্যের বিষয় নহে ।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে বাল্মীকির সমান, কিংবা কোন কোন বিষয়ে বাল্মীকি হইতেও শ্রেষ্ঠতর কবি জন্মগ্রহণ না করিয়াছেন, এমন নহে । গ্রীকদিগের হোমার, রোমানদিগের বার্জিল, ফরাশিদিগের কণেল এবং রুটিশদিগের মিল্টন, ইহারা সকলেই মানব জাতির গৌরব-স্থল এবং কবি-সমাজের গুণ বলিয়া পরিচিত । যদি কম্পনার বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্য লইয়া বিচার কর, তাহা হইলে রুদ্ধ বাল্মীকিকে সেক্সপীরের সহিত তুলনা-তুলে আনয়ন করা যায় কিনা, তাহাও সন্দেহের কথা । বাল্মীকির হৃদয়ের স্রোত নিরন্তর একখানে প্রবাহিত হইয়াছে ; সেক্সপীরের দিব্য-শক্তি স্বর্গও নরক, শৈল-শৃঙ্গ ও গভীর তমসাজ্জ্বল গিরিগুহা, কৈশর ও কেমিস, ক্লিওপেট্রা ও দেশদ্রিমনাপ্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ যুগ্মপং দর্শন এবং যুগ্মপং চিত্র করিয়া জগতের বিস্ময় জন্মাইয়াছে । কিন্তু যেরূপ ভারতের আর্ঘ্যজাতি ভিন্ন আর

কোন জাতির প্রকৃতিতেই রাম চরিত্র বি-
কশিত হয় নাই, সেইরূপ কি হোমার কি
বর্জিল, কি কর্ণেল, কি মিল্টন অথবা কি
শেক্সপীর, বাস্তবিক ভিন্ন কোন দেশের
কোন কবিই রাম চরিত্র স্রষ্টি করিতে স-
মর্থ হন নাই।

রামচন্দ্র প্রাচীন আৰ্য্যজাতির প্রাণ,—
দয়ার অমৃত প্রস্রবণ, অথচ পৌরুষদর্পের
সঙ্গীত প্রতিকৃতি। প্রণয়ে তিনি চণ্ডালকেও
আলিঙ্গন করিতে পারেন, প্রতিদ্বন্দ্বীতায়
লক্ষেশ্বরকেও তিনি ভূগ বলিয়া গণনা ক-
রেন না। স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনেও তাঁ-
হার যে স্থখ, তপোবনের পর্ণকুটীরেও তাঁ-
হার সেই শান্তি। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স-
র্বশাস্ত্রদর্শী তপস্বীরাও তাঁহার সহিত
আলাপ করিতে উৎসুক রহেন; এবং দা-
সিন্যাতনের অসভ্য, অারণ্য মনুষ্যরাও তাঁ-
হার কণার মাদুরীতে মুগ্ধ হইয়া আপনা
হইতে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে। তাঁ-
হার আঘাতে বজ্রের কঠিন দেহ বিদীর্ণ,
এবং ক্রোধে বহ্নি-শিখাও ভীত হয়; আ-
বার রাবণের মত ভাৰ্য্যাপহারী ও সর্ব-
নাশকারী শত্রুও যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহার
শরণ লয়, তিনি তখন করুণরসে দ্রবীভূত
হইয়া ধারায় অশ্রুপাত করেন। তাঁহার
চিত্ত কৈকেয়ীর প্রতিও ক্রুরভাব পোষণ
করিতে পারে না, অথচ কৌশল্যার ক্রন্দন
এবং ভরতের অনুনয় বাক্যও বিগলিত
কিংবা সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। যখন
রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য

বাহুপ্রসারণে উদ্যত, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ
পুঞ্জীকৃত পুষ্পরাশির ন্যায় তাঁহার সম্মুখে
সমাকীর্ণ, পৃথিবীর সমস্ত রাজমুকুট তাঁ-
হার পদতলে বিলুপ্তিত, তাঁহার প্রশান্ত
চিত্তে তখনও অধৈর্য্য কি উদ্বেলতা নাই,—
এবং যখন জটাজীৱ তাঁহার রাজভূষা, দু-
র্ভাগ্য তাঁহার ক্রীড়াসংচর এবং রক্ষ লতা
মাত্র তাঁহার পরিচারক, তখনও তাঁহার
দৃকপাত কি দুঃখ-বোধ নাই। অহো
কি মনুষ্য! কি অলৌকিক মাহাত্ম্য!
ভারতীয় কম্পনা সরসীর স্বর্ণকমল,—কি
সুন্দর,—কি কঠিন! সরোবরের স্বচ্ছ স-
লিলে প্রতিভাত প্রদীপ্ত ভাস্কর! কি উ-
জ্জ্বল! কি মনোহর।

ব্যাসও অসামান্য কবি, এবং স-
র্বাংশে আৰ্য্যনামের উপযুক্ত :—পা-
ণ্ডিত্যে অনুপম, মনস্বীতার অদ্বিতীয় এবং
স্রষ্টি-বৈচিত্র্যে ও স্রষ্টি-কৌশলে শেক্স-
পীরের সমান। তদীয় তীক্ষ্ণ হিমাজির
অভভেদী শৃঙ্গের ন্যায় ভারত-সাহিত্য-
রূপ মহাক্ষেত্রের এক প্রান্তে জভঙ্গিশূন্য
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যতকাল ইচ্ছা নি-
রীক্ষণ কর, সেই পাষণ্ডময়ী মূর্তিতে কখনও
প্রতিজ্ঞা পালনে ভগ্ন কিংবা পৌরুষ-ধৰ্ম্মে
অবহেলার লক্ষণ দেখিতে পাইবে না।
তাঁহার দ্রোণকর্ণাদি বীররসদ অদ্যাপি শ-
রীরবদ্ধ বীররসের ন্যায় সকলের মানস-
নেত্রের সম্মুখীন হইতেছেন। যতকাল
ইচ্ছা দেখিতে থাক, হৃদয় কখনও অবসন্ন
হইবে না। তাঁহার অভিমুখ্য অদ্যাপি রু-

পের ছটা বিকীরণ করিয়া, এবং রূপের সঙ্গে যৌত্রেতেজি বিভূষিত হইয়া, বিস্ময়-বিমুক্ত দ্রষ্টৃবর্গের সন্নিধানে বজ্রহস্ত চন্দ্র-মার ন্যায় মৃদু মধুর সলীলহাস্যে হতা ক-রিতেছেন,—যতকাল ইচ্ছা চাহিয়া থাক, চক্ষু কখনও ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না। কিন্তু কবিকুল চূড়ামণি শেফালীর ত্রিলো-কের উপাদেয় সামগ্রী একত্র সংগ্রহ ক-রিয়াও যে কারণে রাম স্মৃতি করিতে পা-রেন নাই, ব্যাসের বহু যত্নের ধন যুধিষ্ঠির-ও সেই কারণেই রামচন্দ্র নহেন।

যুধিষ্ঠির চিরবন্ধ। তাঁহার প্রকৃতিতে কখনও আবেগ কি আবর্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার গতি জলৌকার মত; তিনি পরস্থান না দেখিয়া কখনও পূর্বস্থান পা-রিত্যাগ করেন না। তিনি সমস্ত পাইলে বিরাটকেও শ্লেষ করিতে পারেন, কিন্তু অসময়ে দুঃশাসনকেও কিছু বলিতে চা-হেন না। তাঁহার সত্যপারায়ণতা বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে ‘হত ইতি গজ,’ অ-থচ আত্মদৈন্য-জ্ঞাপন এবং অনুতাপ-পরা-য়ণতায় তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধু। তাঁহার সা-হস ও বীর্য প্রায়ই বীর সান্নিধ্যে ও বিঘ্ন-বিপত্তির সম্মুখে অবসন্ন হইয়া পড়ে; অ-থচ সাহস ও বীরত্বের অভাব প্রদর্শন ক-রিয়া অন্যকে তিরস্কার করিতে তাঁহার চিত্ত কাতর হয় না, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি ক্ষুদ্রমাত্র শিশুকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিতেও তাঁহার মনে ম্লানি জন্মে না। অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারও ক্রোধ

আছে। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ মেঘের ন্যায় গর্জেনা, অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, এবং অশনির ন্যায় কাহারও মস্তকে সহসা আপতিত হয় না। উহা বিবের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রসৃত হয়, ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে রহে, এবং বাহার প্রতি ক্রোধ, ধীরে ধীরে তাহার সর্বনাশ করে। দু-র্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ছিল। কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির দুঃর্যোধনের অত্যাচারে বারণাবতের অভিমুখে পলায়ন করেন, সে ক্রোধ তখন পরিস্ফুট হয় নাই। যখন দুঃর্যোধনের ইঙ্গিতে কুরুসভায় দৌপদীর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হয়, সে ক্রোধ তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বহুলোক তখন অশ্রুপাত করিয়াছিল, বহুলোক তখন আ-ত্মনাদ করিয়াছিল, কেবল যুধিষ্ঠিরই প্রস-ন্নবৎ নিঃশব্দ ও নিশ্চল। কিন্তু বহুদি-নান্তে, বহু বর্ষান্তে, যুধিষ্ঠিরের পরিণাম-চিন্তাপরায়ণা, ধীরপদবিক্ষেপিনী, স্থিরা-নীতি যখন ফলোন্মুখী হইয়া আসিল, যখন কুরুকুলের সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট এবং ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত সহায় একে একে সময় শ-যায় শয়ান হইল, সংক্ষেপতঃ শত্রুবল য-খন সমূলে উৎপাটিত এবং ভাবী বিপদের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গেল, তিনি তখন কূপ-জল-মগ্ন দুঃর্যোধনের প্রতি ক্রোধ করিলেন এবং ক্রোধান্ধীপু বাক্যে তাঁহার মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ের চিরপৌ-ষিত বৈর-বহ্নিতে আহুতি দিলেন। আর প্রেম? যুধিষ্ঠিরের মত রাজনীতিনিপুণ,

রাজ্য-চিন্তা-নিমজ্জিত, রাজ-পদ-লোলুপ, পিপীলিক ব্যক্তিও কি কখনও প্রেমের স্বর্গীয় স্বপ্নের ভিখারী হয়, এবং প্রেম কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে?

প্রভুহাসনা এবং প্রেম নিতাবিরোধি। প্রেমের অঙ্কুরে পরার্থলালসা, পল্লবোদ্যমে পরাদীনতা এবং পুষ্পিত মৌরতে পরকৌন উপাসনা। প্রভুহাসনার অঙ্কুরে ও পল্লবে, ফুলে ও ফলে সর্বত্রই পরাভিভবচকো, পরমর্দন, পরনিগ্রহ। প্রেমিক অন্য উপর রুদ্ধ হইলেও অন্তরে প্রমত্তনৃবা, পার্শ্বতে। মন বলিয়ান্ হইলেও প্রীতির বননোচ্ছ্বাসে বাতুলিত বসন্তী। এবং মধ্যাক্ষ মার্জিতও বনায় তেজঃপুষ্প হইলেও প্রাণের অভ্যন্তরে জ্যোৎস্নার নায় শীতল ও আনন্দভরে ঢল ঢল। প্রভুপ্রিয় কঠোর, নির্ঘম, স্বার্থমাত্র-পরিহার, এবং যৌবনেও জরাজীর্ণ। ব্যাসের মহাভারতে এবং ব্যাসের সমসাময়িক ভারতে প্রভুহাসনার সর্বশিখ প্রতিমূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে, রাজনীতির অন্তস্থল পর্যাপ্ত আলোড়িত দেখিবে, শত্রুসংহার এবং কার্যোদ্ধারের জন্য যে সকল উপদেশ দিতে বর্তমান কালের বিষমার্ক প্রভূত রাজপুরুষেরাও ভীত অথবা কুণ্ঠিত হন, ব্যাসাসনের সন্নিহিত হইলে তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়জনক উপদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত ও কণ্টকিত হইবে;—তথায় কোন সময়ে কণিকের সহিত আলাপ করিবে, কোন সময়ে ভারত-বিগ্রহের বি-

জয়মন্ত্র মহামতি বাসুদেবের কুইলীলা দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় রহিবে; কখনও কণ শকুনির মন্ত্রণা শুনিয়া হৃৎকম্পে চমকিয়া উঠিবে, এবং কখনও বা মগধরণীর অবৈধ যুদ্ধ অথবা পাণ্ডবশিবিরে অশ্বপামার নৈশ আক্রমণ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকিবে। কিন্তু আদি হইতে অন্ত সমগ্র মহাভারতে কোথাও প্রেমের ক্ষুদ্রমশোভা দেখিতে পাইবে না। প্রভু ও পদবৈভব-লব্ধ ভারতবর্ষ তখন প্রীতিকে নীরস নির্মল্য পুষ্প জানে উপেক্ষা করিয়াছিল, ভারতের তদানীন্তন সাহিত্যেও সুতরাং ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

প্রেমের বিকাশ রামায়ণে অন্যরূপ।

যদি কেহ সংসারের দুঃখ-দাহে দগ্ধ হইয়া এবং মনুষ্য চরিত্রে অহংকৃত বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নির্ঘম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়া শান্তির জন্য লালসিত হন, তিনি রাজ্য-কির কল্পকাননে প্রবেশ ককন। যদি কেহ পৃথিবীর কুটিল ব্যবহারে ক্ষিপ্ত এবং প্রিয় পরিজনের ছলনা ও বঞ্চনায় অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিরাশ হন, তিনি লোক-পানী রামায়ণী গচ্ছায় অবগাহন ককন। ফলতঃ, বাৎসল্য, ভক্তি এবং দাম্পত্যপ্রীতি প্রভূত প্রেমের যত প্রকারের মূর্ত্তি অঙ্গ পর্যাপ্ত মনুষ্য-কম্পনার প্রতিভাত হইয়াছে, রামায়ণে তাহা স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে লিখিত রহিয়াছে, এবং জগতের সমস্ত সাহিত্য মধ্যে একমাত্র রামায়ণেই তাহা পূর্ণতা পাইয়াছে।

রামায়ণে অপত্য বাৎসল্য দশরথের, অলৌকিক ও অপূৰ্ণ । রাজা দশরথ বহু-বিবাহ প্রভৃতি বহুদোষে লিপ্ত এবং জৈগ-তার জন্ম নিন্দনীয় হইয়াও পুত্রের প্রতি ভক্তি এবং পুত্র-বাৎসল্যের জন্য মনুষ্য-রূপে চিরস্মরণীয় ও ভক্তিভাজন হইয়াছেন । যেমন স্বর্গ-বিরহে সংসার অন্ধ-কারে রহে, তিনিও রাম-বিরহে সেইরূপ অন্ধকারে রহিতেন । রামকে তিনি শুধু ভাল বাসিতেন না, রামচন্দ্রেই তিনি প্রকৃত জীবিত থাকিতেন । যখন রাম বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলায় গেলেন, তিনি সেই ক্ষণিক বিরহে জীবন্ত রহিলেন ; এবং যখন রাম কৈকেয়ীর সত্য-পাশে বদ্ধ হইয়া বনবাসী হইলেন, তখন তিনি, যেন কোন অলঙ্কিত নিরমের শাসনে, জীব-লীলা সংবরণ করিলেন । এই চিত্র দর্শনীয় । যে জগতে শোকের পরই মুখ-স্পৃহা, এবং মুখস্পৃহার সন্দেশেই বি-শ্রুতি ও বিষয়-তৃষ্ণা,—যে জগতে এক-চক্ষু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, আর এক চক্ষু ভোগ্য বস্তু প্রতি প্রদর্শিত হয়, এক হস্ত কপালে আঘাত করে, আর এক হস্ত লাভালাভের অন্ধপাতে ব্যাপ্ত হয়, অধিক আর কি, যে জগতে জনক-জননী-রূপে অপত্যনিগ্রহ এবং অপত্যের প্রতি বন্ধনারও সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত নিরন্তর-মুখে পড়ে, সেই জগতে দশরথের এই কবি-জনস্পৃহণীয় আলেখ্য খানি নয়ন ভরিয়া পান করিলেও ক্ষয়ের তৃষ্ণা নিরন্তর হয়না ।

রামায়ণে যাঁহার নাম ভারত, মহাভা-রতে তাঁহার নাম দ্রুপদাধন ; এবং রামা-য়ণে যাঁহার নাম লক্ষ্মণ, মহাভারতে তাঁ-হার নাম অর্জুন । ভারত আর দ্রুপদাধনের ভ্রাতৃ-প্রেম-গত পার্থক্য সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে । যে নিতান্ত অন্ধ সেও ইহা বু-ঝিতে পারিবে যে, ভারত সর্বপ্রথমে রাম-সদৃশ না হইলেও প্রায় দ্বিতীয় এক রাম ; এবং রামচন্দ্রের মত ভারতীয় সাহিত্যের আর এক বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ ;—শৈথ্য ও সাহসে অপ্রমেয়, অথচ শ্রীতিতে নবনীত-সম, তাগে অকণ্ঠিত । এই মহাপুরুষ পি-তৃসত্যপ্রমাণে সাগরাস্ররা ভারত ভূমির সাম্রাজ্য পদ পাঠিয়াও ভ্রাতৃস্নেহের নিকট তাহা তৃপ্ত হইতে হীনজ্ঞান করিয়াছেন, এবং যৌবনে যে'গী সাজিয়া, মাথায় জটা বা-ন্ধিয়া, ভ্রাতার আশ্রয়ে বনে বনে ভিক্ষা-রীর মত বেড়াইয়াছেন । মহাভারতে ইহার সদৃশ্য কোথায় ? যেখানে ভারত ভ্রাতৃকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াও অতৃপ্ত, মহাভা-রতে প্রতিরোধী বীর ভ্রাতার সর্বস্ব আত্ম-সাৎ করিয়াও সেখানে অপরিতৃপ্ত । কিন্তু ভারতের ভ্রাতৃত্বাব যদি পূজনীয়, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্বাব যেমন পূজনীয়, তেমনই শ্রীতি-জনক । আমরাদিগের বিবেচনার মনুষ্য-লোকে ইহার তুলনাস্থল নাই । এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা পৃথিবীর এই চারি প্রদেশে শুদ্ধ ভারত কেন্দ্রে এবং আশ্রিতের সময়েই ইহা সংসারে প্রদর্শিত ও সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে । অন্য কোথাও

ইহার ছায়াপাত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি যে, এইরূপ অ-লোক-সামান্য ভাতৃভাবের মর্য্যাদা পাঠ এবং মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবে, এমন আমরা প্রত্যাশা করি না।

প্রীতির প্রাণ আত্মোৎসর্গ। লক্ষ্মণ সেই আত্মোৎসর্গের সজীব প্রতিনিধি। লক্ষ্মণ স্ত্রী জানিতেন না, পুত্র জাতিতে ন, বিষয় বৈভব, মান আপমান, এবং সংসারের সুখ দুঃখ কিছুই জানিতেন না। তিনি জানিতেন একমাত্র ভাতা :—ভাতাই তাঁহার জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র ছিলেন। যখন সত্যের অনুপ্রোদে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভাতার বিচ্ছেদ হইল, তাঁহারা উভয়েই তখন সরস্বতী জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুই দেহে একপ্রাণ; সেই প্রাণ-রজ্জ্বর যখন আঁশি ছেদন হইল, দুইটি দেহই তখন ছিন্নমূল পানপের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িল। বীরত্বে লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? বুদ্ধির প্রখরতা, প্রকৃতির মহত্ত্ব এবং চরিত্র-গৌরবে লক্ষ্মণ কাহার নিকট ছীনপ্রভ? কিন্তু ভাতৃ-প্রেম তাঁহার সমস্ত আত্মাকে এমন গ্রাস করিয়া রাখিয়া ছিল যে, তাঁহার আর পৃথগস্তিত্ব ছিল না। তিনি পৃথগস্তিত্ব ভাল বাসিতেন না। তিনি ভক্তিতে আনত এবং প্রীতিতে ওগদত হইয়া একবারে ভাতৃজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং শৈশব হইতে বার্কাকা পর্য্যন্ত যতকাল জী-

বিত ছিলেন, ততকাল ঐ এক ভাবের অটল রহিয়াছিলেন।

মহাভারতে এই ভাতৃভাবের অনুকরণ চেষ্টা আছে, কিন্তু অসুকৃতি নাই। কালের পরিবর্তে তখন লোকের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইয়াছিল, এবং তখন সকলেই আপনাব মান, আপনাব গৌরব, আপনাব প্রভুত্ব ও পদমর্যাদা অকত রাখিয়া ভালবাসিত এবং ভাতৃপ্রেমেও বহুল পরিমাণে রাজনীতির প্রয়োগ করিত। ইহার সহস্র প্রমাণের মধ্যে প্রধান এক প্রমাণ গাণ্ডীরের নিন্দার যুগ্মিতির নিগ্রহ। কণ্ঠভরতীত যুগ্মিতির বর্ণকে যুদ্ধে অজিত জানিয়া, যেই গাণ্ডী-বের নিন্দা করিলেন, গাণ্ডীবধারী অর্জুন অমনি অশেষ প্রকারে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। যুগ্মিতির যে তাঁহাকে শিশুকাল হইতে সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন, ইহা তখন তাঁহার মনে রহিল না। তখন শুধু আত্মগৌরবই তাঁহার মনে রহিল, এবং স্বার্থ-বুদ্ধিই তাঁহার চিত্তকে পরিপ্লুত করিল। পুরাতন সমস্ত কথা জদর হইতে প্রফালিত হইয়া গেল। বাস নিখিয়া গিয়া-ছেন যে, অর্জুন ক্ষণকাল পরেই ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্তও সর্বথা সেই স্বার্থ-চিন্তার কুটিল কালের উপযুক্ত। ভাতুলজন পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?—না, আত্মপ্রশংসা

সায়নবাদ।

প্রথম প্রস্তাব।

সায়নবাদ কি? বোধহয় তাহা অনেকেই অজ্ঞাত আছে; এজন্য বলিয়া দিতেছি, “সায়নবাদ” জ্যোতিষের একটি অঙ্গ। প্রাচীন জ্যোতিষের মধ্যে গ্রহরাজ হৃষ্যের দ্বিবিধ সঞ্চারের কথা লিখিত আছে। সায়ন ও নিরয়ন। এই প্রস্তাবে আমরা পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় নবীন জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তের প্রভেদ দেখাইব বলিয়া প্রস্তাবটির মস্তকে “সায়নবাদ” মুকুট প্রদান করিলাম।

জ্যোতিষশাস্ত্র অতি গহন; তাহা সজ্জন্দ-বিচরণ অনেকের ভাগ্যো ঘটে না। নূতন জ্যোতিষের প্রচারাবধি পুরাতন জ্যোতিষের প্রতি নব্য সম্প্রদায় হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, বুদ্ধেরা অতি অজ্ঞ ছিল। কিন্তু প্রভেদের কারণ কি? ভ্রমক্রমেও একবার চিন্তা করেন না; চিন্তা করা আবশ্যকও মনে করেন না। পরন্তু দেশীয় জ্যোতিষের পুনরুজ্জীবিত নিমিত্ত যে চিন্তাকরা আবশ্যক, তাহা সকলেরই স্বীকার করা কর্তব্য। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষের পূর্বাধিত্য ও মূলতত্ত্ব—মধ্যবস্থা ও তাহার মূলতত্ত্ব,—বর্তমান অবস্থা

ও ইহার মূলতত্ত্ব;—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি আর কিছুকাল এই সকল বিষয়ের চিন্তা না করেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই এদেশের মহা অনিষ্ট ঘটিবে। তাঁহারা ভ্রম-বিলসিত গণনার কুহকে পড়িয়া গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুকালের বিপর্যয় করিয়া ফেলিবেন, আর বলিবেন “হায়! কলিকাতার কি প্রভাব! শীতের সময় শীত নাই, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম নাই, বর্ষার সময় বর্ষা নাই। অকালে বর্ষা, অকালে গ্রীষ্ম! হবেইত! না হওয়াই দোষ। হইলে শাস্ত্র সত্য হয়, ইত্যাদি—” অতএব পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে নূতন জ্যোতিষের যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এবং তাহার মূলানুসন্ধান করা অতীব কর্তব্য।

প্রভেদ আছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কোন্ কোন্ অংশে কি কি প্রকারের প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা হয়ত সকলে জ্ঞাত নহেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সর্বত্র একে একটি তালিকা প্রদান করিতেছি। এতদ্বারা জানিতে পারিবেন যে, প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত নবীন সিদ্ধান্তের কত প্রভেদ।

প্রাচীন সিদ্ধান্ত ।

তালিকা ।

নবীন সিদ্ধান্ত ।

- ১। পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডল তা-
হাকে বেষ্টিত করিতেছে ।
- ২। পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন ।
- ৩। চন্দ্র বিশ্ব ব্যাস ৪৮০ যোজন ।
- ৪। সূর্য্য বিশ্ব ব্যাস ৬৪০০ যোজন ।
- ৫। চন্দ্র, ভূ-কেন্দ্র হইতে ৫১৫৬৬ পরি-
মিত যোজনান্তরে আছেন ।
- ৬। সূর্য্য ভূ-কেন্দ্র হইতে ৬৮৯১৭৭ যো-
জনান্তরে আছেন ।

- ১। সূর্য্য স্থির ; পৃথিবী স্বকেন্দ্রক ভ্রমণ
দ্বারা তাহাকে পরিক্রমণ করিতেছে ।
- ২। পৃথিবীর ব্যাস ৮৭০ যোজন ।
- ৩। চন্দ্র বিশ্ব ব্যাস ২৩৮ যোজন ।
- ৪। সূর্য্য বিশ্ব ব্যাস ৯৭০০০ যোজন ।
- ৫। চন্দ্র ভূকেন্দ্র হইতে ২৬১৩৪ যোজ-
নান্তরে আছেন ।
- ৬। সূর্য্য ভূকেন্দ্র হইতে ১০৪৯২১৫৪
যোজনান্তরে আছেন ।

৭। মঙ্গলাদি গ্রহগণের বিষয়মান ।

গ্রহ	কলা	বিকলা
মঙ্গল	৪	৪৫
বুধ	৬	১৫
বৃহস্পতি	৭	২০
শুক্র	৯	০
শনি	৫	২০

গ্রহ	কলা	বিকলা
মঙ্গল	৬	১৯
বুধ	৬	৪৯
বৃহস্পতি	৩৬	৭৪
শুক্র	১৬	১
শনি	১৬	২

- ৮। ভূকেন্দ্র হইতে সূর্য্য যত দূরে, নক্ষত্র
সকল তাহার ৬০ গুণ দূরে ; এবং
তাহারা সূর্য্যতেজে প্রকাশ পায় ।
- ৯। সকল গ্রহেরই যোজনাত্মক গতি
তুল্য এবং তাহাদের কক্ষাকৃত
স্বরূপ ।
- ১০। এক নিরয়ন সৌর বৎসরে ৩৬৫
দিন, ১৫ ঘটিকা, ৩০ পল ।
- ১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন,
৭ হোরা ৪৩। ১৯'৩। ১২। সূর্য্যের
পরম ক্রান্তি ২৪ অংশ ।

- ৮। ভূকেন্দ্র হইতে অসীম অন্তরে, এবং
ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, উহারা
ভূকেন্দ্র হইতে সমান অন্তরে নহে
ও আপন তেজেই প্রকাশ হয় ।
- ৯। গ্রহদিগের যোজনাত্মক গতি বিষম
অর্থাৎ সকলের সমান নহে এবং
তাহাদের পথ বৃত্তাকার ।
- ১০। একনিরয়ন সৌরবর্ষে ৩৬৫। ১৫। ২২' পল
- ১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন, ৭
হোরা ১৩। ১১-৫৪। ১২। সূর্য্যের পরম
ক্রান্তি ২৭ অংশ, ২৭ কলা । •

ইত্যাদি ।

ইত্যাদি । *

* ইংরেজী মান বাঙ্গলায় হিসাব করিয়া দেওয়া হইল ।

নবীন সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন সিদ্ধান্তের এত প্রভেদ । নিদর্শনের জন্য অতঃপূর্ব সংখ্যক বিষয় প্রদর্শিত হইল । পরন্তু এইরূপ বিষয়ের ভারতম্ভা বা প্রভেদ আছে । প্রভেদ ঘটনার কারণ নানাবিধ । কতক অজ্ঞতা নিবন্ধন জন্ম, কতক বাক্য-পক কল্পনা, কতক বা গাণিতিক পরিভাষার বিপর্যাস ঘটনা এবং কতক কালপরিবর্তনের ধর্ম । হয়ত পূর্বকালে কথিত প্রকারেই ছিল, পরিবর্তিত বর্তমান কালে নব্য সিদ্ধান্তের অনুরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে ।

জ্যোতির্বিদ্যা কেবল বেধ-মূলক । বেধই জ্যোতির্বিদ্যার জীবন । যদি এখনও চেষ্টা করা যায়, কোন নিপুণ ব্যক্তি যদি এক্ষণ হইতে নানাবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে বেধ নির্ণয় করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষের সংস্কার সাধনে প্ররুত হইলেন, তাহা হইলেও অন্ততঃ অনেকাংশের বৈগুণ্য সমাধান হইতে পারে । “ বেধ-করণ ” ক্রিয়ার চর্চা বহুকাল যাবৎ ভারত হইতে উঠিয়া গিয়াছে । তাহাতেই এত ক্ষতি । কিন্তু সর্বপ্রথমে যখন এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার সঞ্চার হয়, তখন যে বেধক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তবে কিনা প্রথমকার বেধক্রিয়া কতকটা আনুমানিক, এজন্য সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম না হইতেও পারে ।

প্রাপ্ত প্রভেদ সমূহের মধ্যে কতকগুলি কেবল কাল-পরিবর্তনের মাহাত্ম্যেই

ঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে । বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতির্গ্রন্থে লিখিত আছে, “ ইন্দ্ৰং মাণ্ডব্য । সংক্ষেপাদ্রুতং শাস্ত্রং ময়োদিতব্ ।

বিজ্ঞস্তে রবিচন্দ্রাদৌর্ভবিষ্যতি যুগে যুগে ॥ ”

হে মাণ্ডব্য ! এবজুত জ্যোতির্বিদ্যাটি আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিলাম । পরন্তু চন্দ্রসূর্যাদির দ্বারা যুগে যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটনা হইয়া থাকে ।

অতএব কত কাল-কালান্ত অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার বেধ সংস্কার হয় নাই এরূপ হইলে গণনার ব্যতিক্রম না হইবে কেন ? সূর্যের পরমক্রান্তি, তাহার চক্রভোগ কাল, ইত্যাদি পদার্থত ঠিক না হইবারই কথা । মধ্যে মধ্যে যদি বেধক্রিয়ার দ্বারা নির্ণয় করিয়া পুরাতন গ্রন্থের সংশোধন ও নব নব গ্রন্থের রচনা করা হইত, তাহা হইলে কখনই এত ভারতম্ভা ঘটত না । ভারতবর্ষে যখন জ্যোতির্বিদ্যার সমুদ্র উন্নতি, তখন তাঁহার যে উপদেশটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পরভাবী গণক মহাশয়েরা যদি তাহা পালন করিতেন, তাহা হইলে কদাচ বিমুর্ষবিসর্গেরও ক্রটি হইত না । সেই উপদেশটি এই,—

“ যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্গাণ-
তৈকাকম্ ।
দৃশাতে যেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদি নি-
র্ণয়ম্ ॥ ”

(এটি স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ ।)

যে পক্ষে যে সময়ে যদ্বারা দৃষ্টি ও

গনিতের ঐক্য সাধিত হয়, সেই পক্ষে সেই সময় অনুসারে তিথি আদির নির্ণয় করিবেক।

পরভাবী আচার্যেরা যদি পূর্ব ঋষিদিগের এই উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গ্রন্থ নির্মাণ কালে তৎসাময়িক জ্যোতিঃপদার্থের বৈপক্রিয়া, অনুমান ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা একত্র বা ঐক্য করিয়া তত্তৎগ্রন্থ নির্মাণ করাই কর্তব্য ছিল। কিন্তু অনেকে তাহা করেন নাই, কেবল কতকগুলি ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যের দ্বারা গ্রন্থ গুলিকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

যে সময়টিতে দিব্যমান ও রাত্রিমান তুল্য হয়, তাহাকে বিষুবপাত বলে। সূর্য্যের বিষুব রেখা স্পর্শই এই দিব্যরাত্রের তুল্যতা ঘটনার কারণ। বিষুব-সঞ্চারণ অনুসারেই “মহাবিষুব সংক্রান্তি” ও “জলবিষুব সংক্রান্তি” নাম হইয়াছে। অতি পুরাতন কালের কোন এক সময়ে বসন্ত ঋতুর প্রথমার্দ্ধ সমাপ্তি কালে সূর্য্যের বিষুব সঞ্চারণ হইয়াছিল। দিব্যমান ও রাত্রিমান তুল্য হইয়াছিল। তদনুসারে তাহার “মহাবিষুব সংক্রান্তি” নাম হয়। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পূর্বে অর্থাৎ চৈত্রমাসের ১০ই তারিখে দিব্যরাত্রি সমাপ্ত হইতেছে, তথাপি আমরা সেই বৈশাখ মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তিই ধরিয়া আছি। যদিও লগ্নাদি নির্ণয় কালে তাহার শোধন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ অয়-

নাংশ করিয়া তাহার সম্যক সম্পাদন করা হয়, তথাপি তাহাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ রূপে বলি যাইতে পারে না। এতদপেক্ষাও শোধনের কোন বিশেষ নিয়ম করা উচিত।

অনেকে বলিতে পারেন, যে গ্রহগতি ও ক্রান্তি প্রভৃতি যেন লড়িয়া গিয়াছে, শোধন করিয়া লইলেই হইল; কিন্তু এমন কতক গুলি বিষয় আছে, যাহা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা বা ভ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলি যায় না। যথা—“পৃথিবী স্থির, সূর্য্যই তৎকেন্দ্রক পরিক্রম করেন, নক্ষত্র সকল স্বয়ং তেজস্বী নহে, সূর্য্যের তেজেই প্রকাশ পায়।” ইত্যাদি।

সত্য বটে, নবীন সিদ্ধান্তটি অনেক কাংশে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এই সত্য তৎকালীয় কাহারও হৃদয়ে উদ্ভিত হয় নাই, এরূপ নির্ধারণ করা যায় না। দ্বি সহস্রাব্দিক বর্ষ পূর্বে আর্থাভট্ট ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু আমাদের বিবেচনা হয়, তৎপূর্ববর্তী ঋষিদিগের মনেও এই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কারণ এসমস্ত কথা এরূপ গভীর ভাবে উল্লিখিত আছে যে, তাহা চলৎপৃথ্বীপক্ষে লইয়া গেলেও যাওয়া যায়। তবে যে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পৃথিবী স্থির বলিয়াছিলেন, তাহার অভিপ্রায় বোধহয় এই এবং ইহা সাধু অভিপ্রায় বলিয়াই বোধহয়। যথা,—

পৃথিবী সচলা, ইহা বাক্য না করিলেও ক্ষতি নাই। বরং পৃথিবীর চলবন্ধ বর্ণন করিতে ক্ষতি আছে। একটাকে ঘুরাইতে

হইবে, নচেৎ গণনা সিদ্ধি হয় না। স্বর্ষ্য কি পৃথিবী একের ঘূর্ণন সম্পন্ন করিলেই যখন সমস্ত গণনা সিদ্ধি হয়, তখন অনুমান-গম্য পৃথিবী ঘূর্ণন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্বর্ষ্য ঘূর্ণনের বর্ণনা করাই ভাল। ইহাতে গণনার কোন ইতি কর্তব্যতার ক্ষতি নাই, অথচ সাধারণ লোকের সহজ বোধ্য। ইত্যাদি।

ঋষিদিগের অভিপ্রায় যে এইরূপ ছিল, মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

“ইমাং মহীং নৈলবনোপপন্নাং

সমাগরগ্ৰামবিহারযুক্তাম্।

ত্বং শেব! *** চলিতঃ নগরং,

সংগৃহ্য তিষ্ঠস্ব যথাহচলা মাং।”

আদিপর্কের আত্মীক পর্বের এই শ্লোকটির ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে, ব্যাসের সময়ের ঋষিরা এবং তৎপূর্ববর্তী ঋষিগণ, পৃথিবীর চলবন্ধ বুঝিতে পারিয়াও লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। এই সময়েই পৃথিবীর “অচলা” নাম এবং পৃথিবী স্থির, স্বর্ষ্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণশীল, এই প্রকার মতের প্রাবল্য হয়। বহু কালের পর আবার আর্থাভট্ট বিলুপ্ত মতের পুনঃ প্রচার করেন।

অনেকে বলিতে পারেন, ব্রহ্মা যে শেষ নাগকে সচল পৃথিবী নিশ্চল করার জন্য আদেশ করেন, সে নিশ্চলতা অনবধ। পূর্বের বোধ হয় সর্বদাই ভূকম্প হইত, পৃথিবী তাহাতে অস্থির হইতেন। সেই চাঞ্চল্য নিবারণের জন্যই

ব্রহ্মা, শেষ নাগকে আদেশ করেন। অদ্যপি এদেশে-ঐরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবং এক্ষণ পর্যন্তও এদেশীয় অজ্ঞলোকেরা ভূকম্পের সময় বলিয়া থাকে যে, “বান্দুকী মাথা বদল করিতেছেন।” অতএব পৃথিবীর প্রকৃত চলবন্ধ-জ্ঞান ঋষিদিগের ছিল কিনা সন্দেহ।

যদিও এই আপত্তির প্রকৃত উত্তর করিতে না পারি, তথাপি ইহা নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, এ সময়ে ঋষিদিগের একেবারেই কিছু জ্ঞান ছিল না এমন নহে। অন্তঃ চলবন্ধ-জ্ঞানটি সংশয়ের আকারে ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। কেন না প্রদর্শিত শ্লোকের উত্তরে এবং অন্যান্য স্থলে দেখা গিয়াছে, “চলিত” শব্দের পূর্বে “নিয়ত” “সদা” প্রভৃতি এক একটি বিশেষণ আছে। কোথাও “আবর্তন” শব্দ আছে। সুতরাং “নিয়ত-চলন” এইরূপ শব্দ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘূর্ণনরূপ চলন লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা ঐ সকল কথা লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক এ সকল বিষয়ের বহু আন্দোলন নিম্প্রয়োজন। পৃথিবীই ঘূরুন, আর গ্রহেরাই ঘূরুন, একটি ঘুরিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কেন্টি সত্য তাহা না দেখিলেও হানি নাই। কিন্তু অন্যান্য গণনার অংশগুলি অসত্য হইলেই এদেশের ভয়ানক ক্ষতি।

“গ্রহলাঘব” নামে একখানা জ্যোতিষ্ম আছে, ইহা অন্তর্ধিক ৪০০ শত বৎসর পূর্বের গণেশ দৈবজ্ঞ কর্তৃক রচিত।

গাণেশ দৈবজ্ঞ যখন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন তিনি বেদাক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ দর্শনের একা রাখিয়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত পুস্তকখনি অদ্যাপি নির্দোষ আছে।

রাজা জয়সিংহ বারাণসীতে একটি বেদালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। দুঃখের

বিষয় তিনি পুরাতন জ্যোতির্গ্রন্থ গুলির সংস্কার করিবার অভিপ্রায় করিয়াই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। বারাণসীস্থ বেদালয় বা মন্দিরের বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জনের অভিলষ রহিল।

শ্রীকালীদাস বেদান্ত বাণীশ।

ভারতবর্ষীয় ভাষা।

বৈজ্ঞানিকগণ ভারতবর্ষের যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভারতে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতি অঙ্গ বা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়; তদ্বিষয়ের সম্যক আলোচনা আমাদের বিস্ময় ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে প্রায় বিংশতি কোটি মানব বাস করে। এই মানবসমূহ অসংখ্য বর্ণের স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি পরস্পর অর্নৈক্য। ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি মানব বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র ভাষায় কণ্ঠোপকথন করে। সেই ভাষা সমস্তের উৎপত্তি নির্ণয় করাই উপস্থিত প্রশ্নাবের উদ্দেশ্য।

ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আর্যেরা ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। আর্যদিগের আগমনের পূর্বে এদেশে নিত্যন্ত অসভ্যজাতি সমূহ বাস

করিত। আর্যেরা ভারতভূমে প্রবেশ করিয়া ইহার অসভ্য অধিবাসিদিগকে বিদূষিত করেন। তাহাদের উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া প্রাচীন অধিবাসিগণ অধিকাংশ দাক্ষিণাত্যে নামক জনহীন অরণ্য মধ্যে, অবশিষ্টেরা দুর্গম হিমালয় আশ্রয়ে প্রস্থান করে। এই অসভ্যজাতিদিগের ভাষা তাহাদের স্বভাবানুসৃত ছিল। আর্যেরা পবিত্র-সলিলা গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের অন্তর্ভূমে আবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভূবনবিখ্যাত সংস্কৃত ভাষা আর্যদিগের সহিত ভারতভূমে প্রবেশ করে। দেব-ভাষা সংস্কৃতমধ্যে বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা এতই প্রাচীন যে, ইহার প্রণেতা কে, তাহা অধুনা নির্ণয় করা অসাধ্য। ইহার প্রাচীনত্ব হেতুই হউক, বা ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, হিন্দুগণ বেদকে অপৌকষের ব-

লিয়া থাকেন। যথা ;—

জৈমিনী—১।১।৩২ সূত্রের অষ্টমাধিকরণ।

“পৌকষেয়ং নবা বেদ-

বাক্যং স্যাৎ পৌকষেয়তা।

কাঠকাদি সমাখ্যানাৎ

বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥

সামাখ্যাখ্যাপকত্বেন

বাক্যত্বস্ত পরাহতম্।

তৎ কৰ্ম্মনুপলব্ধেন

স্যাত্ততোহিপৌকষেয়তা ॥”

বেদের ভাষা প্রচলিত সংস্কৃতের সহিত সমান নহে। এই জন্য প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিলে বেদশাস্ত্রে প্রবেশ করা যায় না। সংস্কৃতের পরেই বা সমকালে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়*। সংস্কৃত যেরূপ সুসম্পন্ন, সৰ্ব্বাঙ্গ

* কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, প্রাকৃত ভাষাই আর্যদিগের অতি প্রাচীন ভাষা। আমরা এখনে তাঁহাদিগের যুক্তিনিচয় প্রকটন করিতেছি।

তাঁহারা বলেন সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন ভাষা, কদাচ কথোপকথনের উপযোগী নহে। ইহা কস্মিন্ কালে কথিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কথিত ভাষা স্বতন্ত্র ছিল। সেই ভাষার নাম প্রাকৃত। সেই প্রাকৃত ভাষাকে ‘সংস্কৃত’ অর্থাৎ বিশুদ্ধ করিয়া কাব্যদর্শনাদি লিখিবার নিমিত্ত যে ভাষা সৃষ্ট হয় তাহার নাম সংস্কৃত। তাঁহারা প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাভেদের প্রকৃতি প-

শুদ্র ও কঠিন ভাষা, তাহাতে সত্যত কথোপকথনে সংস্কৃত ব্যবহার করা সহজ নহে। বোধ হয় এই জন্তই কথোপকথন কার্য্য সুনির্বাহিত করিবার নিমিত্ত অল্প ভাষার প্রয়োজন হইয়া উঠে। প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়া সেই প্রয়োজন সংকুলান করে।

সংস্কৃত ভাষা হইতে যে প্রাকৃতের উৎপত্তি, এ সম্বন্ধে বিস্তর অকাটা প্রশ্ন আছে। বরকচি সংস্কৃত ভাষার অতি প্রা-

র্যালোচনা করিয়া তাহাদের প্রসূতি ও প্রসূতা সম্বন্ধ অনুমান করেন। আমরা পাঠকরন্দের গোচরার্থ কয়েকটি প্রাকৃত ও তাহার সংস্কৃত শব্দ নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাকৃত	সংস্কৃত
গদ	গত
হত	হন্ত
পাচ্চিম	পাশ্চিম
লোনম্	লবণম্
স্থান	স্থান
গাম	গ্রাম
হলদ্রা	হরিত্রা
মাদয়ম্	মাতরম্
অগ্নিম্	অগ্নিম্
বাক্সান	ব্রাহ্মণ
চয়ুমি	চতুর্থী
চয়ুদ্ধশী	চতুর্দশী
ছট্টী	ষষ্ঠী
ছণ	ক্ষণ
একথ	একস্থ

চীন বৈয়াকরণ। তিনি প্রাকৃতকে সংস্কৃত-সম্ভূতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। স্থান-ভেদে ও ব্যবহার-ভেদে প্রাকৃতের বিস্তর রূপান্তর হয়। “প্রাকৃত-প্রকাশে” প্রাকৃতের চারি ভাগ উক্ত হইয়াছে। যথা;—
(১) মহারাষ্ট্রীয়, (২) পৈশাচী, (৩) মাগধী, (৪) শৌরসেনী। এই ভাষানিচয় মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রধান প্রাকৃত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। প্রাকৃতের দ্বিতীয় রূপান্তর পৈশাচী ভাষা, শৌরসেনী ভাষা হইতে সমুদ্ভূত। বরঞ্চি প্রণীত

মস্তক	মস্তক
পরিদা	•প্রপিতা
অতি	অতি
	ইত্যাদি

এই তালিকাটুকু আমাদের বিবেচনা-নাগ প্রাকৃত সংস্কৃত-মূলক বলাই যুক্তি-যুক্ত। তাঁহারা আরও কহেন, ‘প্রকৃতিস্ত চাপরে জনাঃ’ এরূপ বিবেচনা না করিয়া “প্রকৃতি” অর্থাৎ স্বভাব “প্রাকৃত” অর্থাৎ চিরাগত বিবেচনা করিলে, প্রাকৃতের প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। ইত্যাদি রূপ কতকগুলি যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত প্রাকৃতকে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আমরা এ কথার কোন সামঞ্জস্য করিতে পারি না। আমাদের মতে এ সকল যুক্তি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পণ্ডিত মণ্ডলীকে ইহার মীমাংসা করিবার ভার দিতেছি।

“প্রাকৃত-প্রকাশ” গ্রন্থের মনোরমাখ্যাত টীকাকার লিখিয়াছেন যে,—

“পিশাচানাম্ ভাষা পৈশাচী। অস্যা পৈশাচ্যঃ প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।”

পিশাচদিগের ভাষা পৈশাচী। এই পৈশাচীর প্রকৃতি শৌরসেনী।

বরঞ্চির কথা প্রমাণে মাগধী ভাষাও পৈশাচীর ন্যায় শৌরসেনীর প্রকার-ভেদ এবং শৌরসেনী ভাষা সংস্কৃত হইতে সমুৎপন্ন। বরঞ্চি এই সকল প্রাকৃত মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়কে প্রধান প্রাকৃত এবং তাহাও সংস্কৃত-মূলক বলিয়াছেন। এতাবত প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাষ্ট্রীয় বা প্রধান প্রাকৃত ও শৌরসেনী এই ভাষাঙ্গয় সাক্ষাৎ সংস্কৃত-মূলক। মাগধী ভাষাকে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা শৌরসেনী-মূলক বলিয়া নির্দেশ করেন। ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লামেন বলেন, মাগধী ভাষা আলোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, ইহাও মহারাষ্ট্রীয় এবং শৌরসেনীর ন্যায় সংস্কৃত-মূলক। লামেন বলেন পৈশাচী ভাষাও সংস্কৃত সঞ্চারিত। তিনি সংস্কৃত বৈয়াকরণগণকে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর লামেনের যুক্তি সমর্থিত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃতের পতন সময়ে বা সমকালে উক্ত ভাষা চতুর্ফল জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের সকলই এক মূল-ভাষা সংস্কৃত হইতে সমুদ্ভূত, ইহা মনে করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। এই চারি ভাষা কথোপকথনের সুবিধা

সাধনার্থ সৃষ্ট হয়। ইহারা যে এককালে
বিলক্ষণ চলিত ভাষা হইয়াছিল, তাহাতে
সংশয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী ও শৌ-
রসেনী এই ভাষাৱয়ের নাম প্রমাণ করি-
তেছে যে, উক্তরা উক্ত নামদেয় প্রদেশ-
ত্রেয় প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধ-
র্মের আবিষ্কর্তা শাক্যসিংহের মাতৃভাষা
মাগধী। এ নিমিত্ত মাগধীভাষা বৌদ্ধধর্মের
উন্নতিসহ বিশেষ উন্নত হইয়া উঠে। মা-
গধী ভাষায় বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ বিরচিত
হয়। যখন বৌদ্ধ ধর্ম ভারতময় প্রচলিত
হইয়াছিল, মাগধী ভাষাও তৎকালে বহু-
বিস্তৃত হইয়াছিল। সিংহলে গিয়া মাগধী
ভাষা পালি নাম গ্রহণ করে। শৌরসেনী
ভাষাও মাগধীর ত্রায় জৈনদিগের ধর্ম-
ভাষা।

“ প্রাকৃত কণ্ঠ্যতক ” গ্রন্থে বর্ণিত হ-
ইয়াছে যে, উক্ত চারি ভাষা এবং অর্দ্ধমা-
গধী ও দাক্ষিণাত্য ভাষা, এই ছয় ভা-
ষার সাধারণ নাম ভাষা। এই ভাষা সম-
স্তের অপর শ্রেণীর নাম বি-ভাষা। যথা,—

সকারী বা চণ্ডালিকা
সাবরী
আত্মীয়া
হাবিড়ী
উৎকলী।

এই কয় ভাষাও নাটকাদিতে প্রযুক্ত
হইয়াছে। এ নিমিত্ত ইহাদিককে অপভ্রংশ
নাম দেওয়া হয় নাই। বিভাষার পুরাতন
শ্রেণীর নাম অপভ্রংশ। বঙ্গালা, গুজ-

রাটী প্রভৃতি যে সকল চলিত ভাষা নাট-
কাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাদের নাম
অপভ্রংশ।

পণ্ডিতবর বীম্‌স সাহেব নিম্নলিখিত
চলিত ভাষাগুলির মূল উল্লিখিতবৎ স্থির
করিয়াছেন। যথা,—

- ১। হিন্দি
- ২। বঙ্গালা
- ৩। পঞ্জাবী
- ৪। সিন্ধি
- ৫। মহারাষ্ট্রী
- ৬। গুজরাটী
- ৭। নেপালী
- ৮। উড়িয়া
- ৯। আসামী।
- ১০। কাশ্মীরী

এই একাদশ ভাষার সকল গুলিই
অধুন। ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে চলিত
আছে। উক্ত ভাষা সমস্তের ব্যবহারভেদে
ও স্থানভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তর
হইয়াছে। প্রভু-তত্ত্বানুসন্ধায়ী বীম্‌স সা-
হেব গুরুতর পরিশ্রম সহকারে তৎসমস্ত
নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি হিন্দি ভাষার
নিম্নলিখিত কয় শ্রেণী স্থির করিয়াছেন।
যথা ;—

মৈথিলী—(পূর্ণিমা ও ত্রিহুতের ভাষা)
মগধ—(দক্ষিণ বিহারের ভাষা)
ভোজপুরি—(সাহাবাদ, সারণ, চা-
ম্পারন, গোরক্ষপুর, প্রাচ্য অযোধ্যা এবং
বারাণসীর ভাষা)

কোশলী—(অযোধ্যা এবং রোহিল
খণ্ডের ভাষা)

ব্রজভাষা—(উত্তর দোয়াব, আগ্রা
এবং দিল্লীর ভাষা)

কনোজী—(দক্ষিণ দোয়াবের ভাষা)

রাজপুত ভাষা—(রাজপুতানার ভাষা)

বুন্দেলখণ্ড-ভাষা—(চম্বল হইতে
শোন নদী পর্যন্ত প্রদেশের ভাষা)

বীম্-সাহেব বাঙ্গালা ভাষার কো-
নও প্রকারভেদ লেখেন নাই। তিনি
উড়িয়া ও আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা
করিয়া দেখিলে ঐ দুই ভাষাকে বাঙ্গা-
লার রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায়
না। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি আছে
তাহা বিবৃত করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রস্তাব
লিখিতে হয়।

পঞ্জাবীর অনেক প্রাশাখা। পঞ্জা-
বের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষায় অল্প বা
অধিক পরিমাণে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

সিন্ধীয় ভাষার নিম্ন-লিখিত প্রভেদ
আছে।

সিরাই—(উত্তর সিন্ধের ভাষা)।

বিচোলি—(দক্ষিণ সিন্ধের ভাষা)।

লারি—(নিম্ন সিন্ধের ভাষা)

উছ—(মুলতানের ভাষা)

কচ্ছি—(কচ্ছের ভাষা)

মহারাজ্যীয় ভাষার নিম্নলিখিত চারি
প্রকার বিভিন্নতা আছে।

কনকানি—(রত্নগিরি এবং সমুদ্র স-

মিহিত স্থানের ভাষা)

দাক্ষিণা—

গোমন্তকী বা কুদালি—(সাবন্ত বা-
ড়ীর নিকটের ভাষা)

খান্দেশী—

গুজরাটের তিন স্বতন্ত্র প্রদেশে ত্রিবিধ
ভাষা কথিত হয়। ঐ তিন ভাষাই মূল গু-
জরাটীর প্রাশাখা মাত্র। যে তিন স্থানে
ভাষার স্বতন্ত্রতা আছে, তাহাদের নাম ;—

সুরত এবং বরোচ

অমেদাবাদ

কাটিওয়ার

বিশুদ্ধ নেপালীকে পার্কত বা পা-
হাড়ী বলে। তাহার যে কয় শাখা আছে,
মূলের সহিত তাহাদের প্রভেদ সামান্য।
নিম্ন-লিখিত স্থান সমূহের ভাষায় সামান্য
বিভিন্নতা আছে।

পাপ্পা

কমায়ুন

গাড়ওয়াল

থাক

মহাত্মা বীম্ পূর্ব-লিখিত ভাষা-
গুলিকে সংস্কৃত-মূলক বলিয়া স্বীকার ক-
রিয়াছেন। ভারতবর্ষ প্রচলিত অপর যে
সমস্ত ভাষা আছে, তৎসমুদয়কে তিনি
জৈন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্য-মূলক বলিয়া
স্থির করিয়াছেন। বীম্ নাহেব যে যে
রূপান্তরে উক্ত জৈন্দ-মূলক ভাষা সমস্ত
ভারতবর্ষে চলিত আছে বলিয়াছেন,
তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। ভোটিয়া বা ভোটাঙ্গা (ভোট-
রাজ্য)

২। লেপ্‌চা (সিকিম রাজ্য)

৩। লিম্বু } (সোন, কোশী

৪। কিরতি } ও অরুণ নদী-
মধ্যস্থ স্থানে)

৫। মুর্খি (পূর্ব নেপাল)

৬। গরজ (ঐ)

৭। নেওয়ার (মধ্য নেপাল)

৮। মগর (ঐ)

৯। ব্রাহ্ম (ঐ)

১০। চিপ্‌ক } (অযোধ্যা ।

১১। কুম্ভু } বায়ু—পূর্ব

১২। বায়ু } নেপালেও চলিত)

১৩। সনওয়ার (পশ্চিম নেপাল)

১৪। সর্প (ঐ)

১৫। কনওয়ারি বা মিলচান

১৬। তিব্বারকদ } (কুম্ভাণ্ড-

১৭। হুন্দেশী } নের উত্তরে)

১৮। দারাহি বা দোহি

১৯। নেওয়ার

২০। পাহাড়ী

২১। কাশওয়ার } (মধ্য নেপাল)

২২। পাক

২৩। তক্ষ

২৪। দীমল (নেপাল ও ভোটের
কিয়দংশ)

২৫। মেচী (ঐ)

২৬। বেরো (কাছাড়)

২৭। গারো (গারোপাহাড়)

২৮। অক

২৯। আবর

৩০। মিসমি } (আসাম সান্নিধ্যে)

৩১। মিরি

৩২। দফলা }

৩৩। খসিয়া (আসামের দক্ষিণ)

৩৪। মিকির (ঐ)

৩৫। নাগা

ক। রেঙ্গমা

খ। অজামি

গ। লোটা

} ঐ (নাগার
প্রশাখা)

৩৬। সিঙ্গফো (ঐ)

৩৭। কুকি (চট্টগ্রামের উত্তর)

৩৮। মনিপুরি ভাষা ।

৩৯। কোরেঙ্গ ভাষা

৪০। কারেণ ভাষা

৪১। সাঁওতাল

৪২। কোল (চয়বাসা)

৪৩। ভূমিজা (পুন্ডলিয়া)

৪৪। মণ্ডালি (ছোট নাগপুর)

৪৫। কোলেহান

৪৬। খন্দ (মন্তলপুর)

৪৭। গন্দ

৪৮। উরায়ন (সরগুজা)

৪৯। তেলুগু

৫০। তামিল

৫১। কণাটক

৫২। মলয়ালম্

৫৩। তুলুচু

৫৪। কুণ

৫৫। তুহ

৫৬। বুদগড়

৫৭। ইকলার

৫৮। কোহতর

৫৯। সিংহলীয়

বীম্‌ সাহেব-প্রদত্ত জেম্মমূলক ভা-

বাসমুহের তালিকা উল্লিখিত হইল।
 “শব্দভাষা চন্দ্রিকা” প্রণেতা লক্ষ্মীধর,
 পৈশাচী ভাষার যে সমস্ত স্থান নির্দেশ
 করিয়াছেন, তাহা মহাত্মা বীম্ কৰ্ত্তক
 নিক্রপিত জৈন্মমূলক ভাষা সমুহের স্থানের
 সহিত প্রায় মিলিতেছে। লক্ষ্মীধর যে
 সকল স্থানের কথা বলিয়াছেন, অধুনা
 সে সকল স্থানের নাম ও সীমা পরিবর্তিত
 হইয়াছে। আমরা নিম্নে লক্ষ্মীধরোক্ত পৈ-
 শাচী ভাষার স্থান সকলের নাম উল্লেখ
 করিতেছি।

পাণ্ডা
 কেকয়
 বাহ্লীক
 মহা
 নেপাল
 কুণ্ডল
 সুরদেশ
 ভোট
 গাঙ্গার
 হৈব
 কনোজান।

পাঠকগণ প্রাচীন ভূগোল অনুসন্ধান
 করিয়া দেখিবেন যে, লক্ষ্মীধর কথিত
 পৈশাচী ভাষার এই প্রাচীন স্থান সমূহ ও
 বীম্ সাহেব কর্ত্তক নির্ণীত জৈন্ম-মূলক
 ভাষা সমস্তের স্থান অধিকাংশই এক।
 সুরতরাং এই দুই তালিকা পর্যালোচনা ক-
 রিয়া উপলব্ধ হইতেছে যে, বীম্ সাহেব
 যে সকল ভাষাকে জৈন্ম-মূলক বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাহা
 পৈশাচী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু
 তাই বলিয়া আমরা পৈশাচিক ভাষাকে
 জৈন্মমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে পা-
 রিতেছি না। কারণ সংস্কৃত বৈয়াকর-
 ণেরা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৈ-
 শাচী ভাষা সংস্কৃতমূলক। তাঁহারা পৈ-
 শাচীকে প্রাকৃতের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া উ-
 ল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত যে সংস্কৃত-
 মূলক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।
 যথা;—হেমচন্দ্র—

“প্রাকৃতঃ সংস্কৃতাত্, তত্র ভবন্ম ততঃ
 আগতম্ বা প্রাকৃতম্।”

“প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, প্রাকৃত সং-
 স্কৃত হইতে উৎপন্ন বা আগত।”

এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ সংকলনের
 প্রয়োজন নাই।

ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লাসেন সাহেব বলি-
 য়াছেন যে, পৈশাচী সংস্কৃত হইতে সা-
 ক্ষাৎ সমুদ্ভূত। কিন্তু আমরা যতদূর দেখি-
 তেছি তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বীম্
 সাহেবের জৈন্মমূলক ভাষা ও সংস্কৃতমূ-
 লক পৈশাচী ভাষা এক; সুরতরাং বলা
 যাইতে পারে যে, বীম্ মহোদয় পৈশাচী
 ভাষাকেই জৈন্মমূলক বলিয়াছেন; কিন্তু
 সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোড়ন করিয়া ইহা
 নিঃশংসয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৈশাচী
 সংস্কৃত-মূলক। তবে বীম্ সাহেব এ
 কথা কেন বলিতেছেন? স্থির চিত্তে বি-
 বেচনা করিলে ইহার কারণ অনুমান করা

যাইতে পারে। পৈশাচী ভাষা যখন প্রথমে সংস্কৃত হইতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহার প্রকৃতি অবিকল সংস্কৃতের স্থায় ছিল, তখন শুনিতে তাহা যে সংস্কৃতমূলক একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইত। কিন্তু কালচক্রে সকলেরই পরিবর্তন হয়। কালচক্রে পৈশাচী-ভাষাও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যে যে স্থানে পৈশাচী ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার অধিকাংশ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই যে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় জৈনমূলক ভাষা প্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, ভারতের সীমান্তবর্তী প্রদেশস্থ ব্যক্তিগণ উক্ত বৈদেশিক ব্যক্তিগণের সহিত বহুবিধ সংস্পর্শ বদ্ধ হয়। ক্রমে ঐ জৈনমূলক ভাষা পৈশাচী ভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইতে থাকে। এবং কালক্রমে পৈশাচীভাষা এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, এক্ষণে তাহাকে দেখিলে সংস্কৃতমূলক বলিয়া বোধনা হইয়া জৈনমূলক বলিয়াই অনুমান হয়। দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগের সহিত যখন বঙ্গদেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন মুসলমানীয় ভাষা এত অধিক পরিমাণে বঙ্গভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষাকে প্রায় এক স্বতন্ত্র ভাষার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইরূপে সংস্কৃতমূলক পৈশাচীর সহিত, জৈনমূলক অপর ভাষা মিশ্রিয়া যে তাহাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিবে তাহাতে বিচির কি!

এ সম্বন্ধে আরও এক কারণ অনুমিত হইতে পারে। সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে পৈশাচিকগণ, হিন্দুগণের নিকট হইতে কদাপি সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের আনুগত্যও জন্মে নাই। তাহাদের শাস্ত্রভ্রষ্ট আচার ব্যবহার হিন্দুচক্ষে নিতান্ত দুর্গণ্য হইলেও ভারতের সীমা বহির্ভূত প্রদেশস্থ স্বেচ্ছগণ কর্তৃক প্রতিপোষিত হইয়াছিল। এমন কি, পৈশাচদিগের কোন কোন ব্যবহার, তাহাদিগের নিকট বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই সকল কারণ বশতঃ তাহাদের সহিত পৈশাচদিগের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঈদৃশ স্থলে একের ভাষা অপরের সহিত বিশিষ্টরূপে বিমিশ্রিত হওয়া নিতান্তই সম্ভবপর।

এতাবতী স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, দেবভাষা সংস্কৃতই ভারতবর্ষের যাবতীয় মৃত বা জীবিত ভাষার মূল-প্রস্রবণ। ভাষা ও ধর্মের ঐক্য মানবসমাজের একতা সংস্থাপনের সর্বপ্রধান কারণ। অধুনা ভারতবর্ষীয় নানাবিধ ভাষা ও আর্ষ্য হিন্দুধর্মের বহুবিধ প্রকার ভেদ নিবন্ধন আমরা ভারতবাসিগণের এতাদৃশ মানসিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। অধিক কি, ভাষাগত অতি সামান্য প্রভেদ বশতঃ পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গবাসিগণের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথাটি বড় ভাল নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দাক্ষণ লজ্জা ও ঘৃণার কথা। বঙ্গদেশ মধ্যে ভাষার ত প্র-

ভেদ নাই বলিলেই হয়, একটুকু দৈর্ঘ্য ও উদারতা সহকারে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, যখন ভারতের সমস্ত ভাষাই এক সাধারণ মূল হইতে সমুৎপন্ন, তখন ভারতবর্ষীয় কোন জাতিই অপার জাতি হইতে ভাষার বিভিন্নতা হেতু জাতাস্বরূপে পরিচিত হইতে পারেন না। প্রত্যুত কি আগবওয়াল (সেতুয়াবাদী) কি মহাজীর (বারী) একই স্বতন্ত্র জাতি নহেন। যদি আমরা তাহা মনে করি, তাহা হইলে আমাদের লক্ষ্যচিত্ততারই পরিচয় প্রদান

করা হয়। আর তা দৃশ সংস্কারের প্রাবল্য হেতুই অন্য অপার সমস্ত জাতির সহিত আমাদের এত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভবিষ্যতে উহা আরও বিস্তৃত হইয়া আমাদের যাবতীয় আশা ভরসা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে এবং কালে ভারতের এমন বিষম ব্যাধি উপস্থিত হইবে যে, কোন স্মৃতিকিংসকই তখন উহার প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া জীবনদানে সমর্থ হইবেন না।

শ্রীদাঃ—

জীবন প্রভাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবন উষ।

“দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ।

এ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে
উদয় অকণ উষার সহ ॥”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গজনির অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ও সেই শতাব্দী শেষ না হইতেই আর্ঘাবর্তের অধিকাংশ মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা কএক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেন,

বিজ্ঞাচল ও নর্থদান্সরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্ভম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহিত নর্থদান নদী পার হইলেন ও খন্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজা সজ্জির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসৈন্য পরাস্ত হইল এবং হিন্দু রাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে, তাঁহার সৈন্য-

পতি মালীক কাফুর তিন বার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন ও নর্থদা তীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন । তথাপি আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদায় প্রদেশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত হইল ।

চতুর্দশ খ্রীঃ শতাব্দীতে যখন টোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার পুত্র য়ুনাস পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া সমুদায় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন (১৩২০ খ্রীঃ), পরে মহম্মদ টোগলক নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান । দেবগড়ের নাম পরিবর্তিত করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন এবং সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে তথায় যাইবার আদেশ দিলেন । পীড়া ও নানা স্থানে বিদ্রোহ নিবন্ধন যখন এই প্রয়াস নিষ্ফল হইল, তখনও সম্রাট দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না । সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিকট্কাচরণ করিতে লাগিল । তৈলঙ্গ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দুনিবাসী বিজয়নগরে নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৩৫) ; এবং জফীর খাঁ নামক একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহায়তায় দিল্লীর সেনাপতি উম্মাদউলমুলককে

তুমুল সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমানরাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৪৭) । কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল এবং প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও চেষ্টা করেন নাই ।

কিন্তু এই বিপদ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপৎশূন্য ছিল না । হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়া ছিলেন । সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয়জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল । কথিত আছে দৌলতাবাদের প্রথম রাজা জফীর খাঁ পূর্বে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মণ বালকের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেন । পরে যখন জফীর খাঁ রাজা হইলেন, তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে জফীরের বংশ বাহ্মিনী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলিয়া খ্যাত । কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল, এবং একটির স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদ নগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠিল । ১৫২৬ খ্রীঃ অঙ্গে বাহ্মিনী বংশ ও দৌলতাবাদ

রাজ্য লোপপ্রাপ্ত হইল, এবং মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে টেলিকোট বা রক্ষিত গণ্ডীর যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইল ও বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহমদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কর্ণাট ও ড্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহমদনগর রাজ্যে অধিকাংশ দিল্লী সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহমদনগর রাজ্য অধিকৃত করেন, সুরাত আখ্যায়িকা বিরতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের জানা আবশ্যিক। মুসলমান রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের পরে আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য্য অ-

নেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, এবং সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্য্যকারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্র-দেশ পার্শ্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পার্শ্বভূভাগ অসংখ্য দুর্গ নির্মিত ছিল। মুসলমান স্থলতানগণ সেই সকল পার্শ্বত-দুর্গ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে নান্দ রাখিতে সঙ্কচিত হইতেন না; কিন্তু দারগা কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কখন বা চতুষ্পাশ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান স্থলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু মনসবদার ছিলেন। তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চাশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহী সেনাপতি, স্থলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ সময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, এবং সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটি জায়গীর ভোগ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও দ্রুত যুদ্ধে অদ্বিতীয়, এবং নিজ নিজ স্থলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; সময় সময় তাঁহারা আপনামধ্যেও

ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত হইতেন। বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্রাও খোরে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন এবং সুলতানের আদেশানুযায়ী ও বাণানদীর দ্বাবর্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্রাওকে অসম্মত করিয়া করিয়া জায়গীরস্বরূপ দান করেন ও চন্দ্রাওয়ের সমুত্তম সন্তান পুরুষ পর্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বতন্ত্রে শাসন করেন। এইরূপ রাওনারক নিয়ালকর বংশ পুরুষানুক্রমে কুলতন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে ঘাটিগী বংশ মলওয়ারী প্রদেশে, মনয় বংশ মুন্সীর প্রদেশে, ঘরপুরীয় বংশ কাপাসী ও মুদোল দেশে, ভুফে বংশ ঝটি প্রদেশে ও শবন্ত বংশ ওয়ারি প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য সাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে বা আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জাতি বিরোধের নাম আর বিরোধ নাই; পার্শ্বত-সম্মল কল্পণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্বদানে ও সর্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত, ও পার্শ্বতকন্ডের ও উর্করা উপত্যকায়, সর্বদাই মহাবুদ্ধ সংঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ; পরিচালনা দ্বারা আমাদের শরীরের যেরূপ সুবন্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্বদা কার্য ও উপদ্রব ও বিপর্যয়

দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উদ্বার প্রথম রক্তিম-চ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল। আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভন্সলে নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুকীরের যাদবরাওয়ের ত্রায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়েব প্রাচীন হিন্দুরাজ বংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ উদ্ভূত। বোড়গ খ্রীঃ শতাব্দীতে লক্ষজী যাদবরাও আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অখারোহীর সেনাপতি ছিলেন ও প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ভন্সলেবংশ যাদবরাওয়ের নাম উন্নত না হইলেও একটি প্রধান ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এইমাত্র বল আবশ্যক যে, যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভন্সলে বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস ও লোকের অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বোধ হয় পাঠক ইহাতে বিরক্ত হইবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

• রঘুনাথজী হাবিশদার।

—১২৮৫—

ক'ঞ্জন জিনিয়া তার আচ্ছন্ন বরণ।

প্রবণ তাহার দিয়া পঙ্কজ নরন ॥

প্রবণে কণ্ডলযুগ্ম দিশু 'দননর।

অভিনয় করিতে অবিরল কলনর ॥

দুইদিকে দুই তুল্য বায়ে ধরে ধনু।

আ'জানু-স্থিত ভূ-অ'নন্দির ধনু ॥

ক'শীরাম দাস।

কঙ্কণপাদদেশ বর্ষ কালে প্রকৃতি অপ-
রূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে; ১৬৬৩ খ্রিঃ
আজ বসন্তকালই এক দিন সারাসময়ে
সেই ঘোর ঘটা ও ভীষণ মৌসুমি যেন
দশ গুণ রুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্য ত-
খনও অস্ত যায় নাই অথচ সমস্ত আকাশ
দির্ঘ বলহী অতি-রুদ্ধ মেঘবাশিতে আচ্ছন্ন
ও চারিদিকে পর্কতশ্রেণী ও অস্ত অস্ত
দুর্ভেজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প-
র্কতে, উপত্যকা, অণোমণ্ডো, প্রান্তরে,
আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন
জগৎ অচিরে প্রচণ্ড ব্যত্যাসানিব জ-
নিয়া ভয়ে শুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ
পর্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথ-
গুলি সর্বত্র দেখা যাউতেছে। দূরস্থ বি-
শাল পাদপাবত পর্বতগুলি কেবল গা-
ঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ স্বরূপ দেখা যাউতেছে। আর
বহু নীচে উপত্যকা একেবারে অন্ধকারে
আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্বত-প্রবাহী জ-

লপপাতগুলি কোথা ও বোপাড়াচ্ছন্ন নান
দেখা যাউতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন
হইয়া কেবল শব্দমাত্র আপন পরিচা-
দিতেছে।

সুই পর্বতপাশে উপর দিয়া একান্ত
অশ্রাব্য বী বোগ অশ্রুত-ন ক'বন য-
উতেছিলেন। অশ্রুর সমস্ত শরীর ফণ-
পূর্ণ ও ঘর্ষাক, ও অশ্রাব্যের বেশ ধূল্য
ও বর্ধমান, দেখিতে হইত যেমন তিনি অ-
নেক দূর হইতে আসিতেছেন তাঁহার
হস্ত বর্ষ, কে'ষে অসি : বাহ্যে বলা
ও বায় বাজতে ঢাল, শরীরে বজ্র-
বর্ষাক'দন। পরিচ্ছদ ও বৈষ্ণব মহাবাই-
দেখিল। অশ্রুর হীরা : দন আশ্রয়
বর্ষ হইল, সচ'চর মতা জীবনের অ-
পেক্ষা তাঁহার অবনত হইল ও বর্ণ পৌ-
কন্তু পরিণামে বা বৌদ্ধে ভাপে এই বর্ষ-
সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের বজ্র-বর্ষ ক'ঞ্জন
রুদ্ধ হইয়াছে ও শরীরে বর্ষ ও দুর্ভেজ
হইয়াছে। যুবকের ললাট উন্নত, চক্ৰ-
জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল ও বর্ষাবজ্র
ও অশ্রয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্রুরে অশ্রু
বিশ্রাম দবার জন্য লক্ষ্যদয় ভূমিতে অ-
বতীর্ণ হইলেন, ল'। বর্ষের নেকপ
করিলেন, বর্ষ বৃক্ষাখর হেলাইয়া রাখি-
লেন, ও হস্তবর্ষ ললাটের বর্ষ মোচন
করিয়া ও নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুলি উন্নত প্র-
শস্ত ললাট হইতে পশ্চাদিকে সরাইয়া
ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরে ভূমল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনন্ত পর্বত ও পাদপশ্বেণী হইতে গভীর শব্দ উৎপিত হইতেছে, আর দুই একটি স্তমিত মেঘগর্জন শুনা যাইতেছে। যুবকের শূক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু রুদ্ধজলও পতিত হইল। এ যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত। যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না; তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনে নাই, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্ষা হস্তে লইয়া লক্ষদিয়া অশ্বপুষ্ঠে উঠিলেন। তাঁহার অসি অশ্বপুষ্ঠে ঝন ঝন করিয়া উঠিল; আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় তীরবেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্বত-প্রদেশের নুপু প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অপ্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্রাঘতা চমকিত হইল, ও মেঘের গর্জনে সেই অনন্ত পর্বত-প্রদেশ যেন শত বার শব্দিত হইল। অচিরে কোটীলক্ষস-বল বিক্ষিপ্ত করিয়া ভীষণ গর্জনে পবন প্রবাহিত হইল, ও যেন সেই অনন্ত পর্বতকেও সমূলে আলোড়িত ক-

রিতে লাগিল। এক কালে শত পর্বতের অসংখ্য পাদপশ্বেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উৎপিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্রাঘালোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল; এবং মধ্যে মধ্যে দূরপ্রতিঘাতী বজ্র শব্দে জগৎ কম্পিত ও শুদ্ধ হইতে লাগিল। তরায় মূলধারায় রুদ্ধ পড়িয়া পর্বত অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল এবং জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে ক্ষীতকায় ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিকল্প না হইয়া বেগে চলিতে লাগিলেন; সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে গর্জিত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবেন; সময়ে সময়ে অন্ধকারে লক্ষ দিয়া জলপ্রপাত পার হইবার সময়ে উভয়েই সেই কঠিন প্রস্তরের উপর পতিত হইলেন, এবং এক স্থানে বায়ুপীড়িত রক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু কৃধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা হুঃসাধ্য, নতরাং যুবক মুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিন চারি দণ্ড মূলধারায় রুদ্ধ হওয়াতে আকাশ পরিষ্কার

হইতে লাগিল, ও অচিরেই রুষ্টি থামিয়া গেল, এবং অন্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত রুক্ম সমুহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল। যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিন্ধু কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপমৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে শোভা অনির্ব্বচনীয়! পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, যত দূর দেখা যায় দুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত শিখরগুলি ক্রমাগত দেখা যাইতেছে ও সেই পর্ব্বতশ্রেণীর পাশ্বে, মস্তকে, চারিদিকে, নবস্নাত নিবিড় হরিদ্রা অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্যালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত শত গুণ স্ফীতকার হইয়া বর্দ্ধিত গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। প্রতি পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানারূপ বর্ণধারণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে; আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ুঘারা মেঘ তাড়িত হইয়া রুক্মরূপে গলিত হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গপ্রবেশ করিলেন; ঘরের ভিতর যাইলেন ও প-

শ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন সূর্য্য অস্ত হইতেছে। অমনি ঝন্ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার বন্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

“অধিক সকালে পহুছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।”

যুবক সহাস্যে উত্তর করিলেন “সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রাসাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।”

দ্বাররক্ষক। “কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

“তবে চলিলাম” বলিয়া যুবক রাজপুত্রের দিকে প্রস্থান করিলেন।

অনুমতি পাইয়া যুবক কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন এবং সম্যক্ অভিবাদন করিয়া ও নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া, কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা; তিনি লিপিগুলি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে

পারেন ও কান্না বিষয়ে শিবজীকে কিছু
আদেশ, লিপি পাঠ সমস্ত অগতঃ হই-
লেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ ক-
রিয়া কল্পদার আশেষে পত্রবাহকের
দিকে চাই দাখলেন। অষ্ট দশ বর্ষ
যুগের বাক্যকট্ট মর ও দার মখ-
মত, ও আশ্রয়বিলাসী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবড়
কৃষ্ণ কেশ, অষ্ট বদন্ত মস্তক অগ্নি ও প্র-
শান্ত মন এই দশম কল্পদার একবার চ-
কিত হইলেন, লিপির দাক দাখলেন
অবশ্যে বাক্যকট্ট যুগের দাক মরুভেদি
তক্ষণ নন্দ উঠিলেন। আশেষে ব-
লিলেন “ হাবিলদার ! তোমার নাম রঘু-
নাথকী ? তুমি কাকিতে ব্রাহ্মণ ? ”

রঘুনাথকী বিমীতভাবে শির নমাইয়া
প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কল্পদার। “ তুমি আরও ও ব-
য়সে বালকমাত্র । ” (ঈষৎ ক্রোধে রঘু-
নাথকী বনন ঈষৎ উজ্জ্বল হইল ; দেখিয়া
কল্পদার ধীরে ধীরে চলিলেন । “ কিন্তু
কিছু কহি কথাকালে পরাণুপাত । ”

রঘুনাথকী ঈষৎ ক্রোধকম্পিতস্বরে
অষ্ট মস্তভায়ে বলিলেন “ যত ও চেষ্টা
মাত্র মনুষ্যসম্মান, বোধ হয় তাহাতে প্রভু
আমার ক্রটি দেখেন নাই ; সিদ্ধি ভবানের
ইচ্ছা নীচ । ”

কল্পদার। “ তুমি সিংহগড় হইতে
তোষণে দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে ? ”

স্বিলস্বরে যুগল উত্তর করিলেন “ প্রভুর
নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম । ”

কল্পদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া
ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “ কিজাসা
অন্যবশক, তোমার আকর্তৃতই কার্য-
সামান্য তোমার যেকোন যত্ন তুমি পার-
চয় দিতেছ । ” রঘুনাথকীর সমস্ত বস্ত্র ও
শরীর এখনও সিক্ত ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত
দেখা যাইতেছিল ।

পরে কল্পদার সিংহগড়ের ও পুনর
সমস্ত অস্ত্র এবং মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও
রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন
করিয়া কিজাসা করিতে লাগিলেন । রঘু-
নাথকী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন ।

কল্পদার বলিলেন “ তবে কল্যাণে
আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি
প্রস্তুত থাকিবে ; আর শিবজীকে আমার
নাম করিয়া জানাইও যে তিনি যে তরুণ
হাবিলদারকে এই বিষম কার্যে নিযুক্ত
করিয়াছেন, সে হাবিলদার কার্যের অ-
নুযুক্ত নহে । ” এই প্রশংসা বাক্যে রঘু-
নাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করিলেন ।

রঘুনাথকী বিদায় পাঠিয়া চলিয়া গৈ-
লেন। রঘুনাথকে একপা পরীক্ষা করার
উদ্দেশ্যে এই যে, কল্পদার শিবজীকে অ-
তিশয় গুট রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি
গুট মন্ত্রণা পাঠ করার মানস করিতেছি-
লেন। সে গুলি সমস্ত লিপিবদ্ধা বাক্য
করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে
পারে। রঘুনাথকীকে সে গুলি বাচনিক
বলা যাইতে পারে কিনা, অর্থবশে বা

কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্তী হইয়া গৃঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন, পরীক্ষা শেষ হইল। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈর্ষা হ্রাস্য করিয়া বলিলেন, “শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযুবালা।

“—সজনি! ভাল করি পেখন না তেল।

মেঘমালা সঙ্গে, তড়িতলতা জু,

হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

আধ আঁচল খসি, আধ বদনে হাসি,

আধই নয়ন তরঙ্গ।

আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,

তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥

একে তনু গোরা, কনয় কটোরা,

অতনু কাঁচল উপাম।

হরি হরি কহ মন, জু বুঝি ঐছন,

ফাস পসারল কাম ॥

দশন মুকুতা পাতি, অধর মিলায়ত,

মুহু মুহু কহ তাহি ভাষা।

বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে হুঃখ রহ,

হেরি হেরি না পুরাল আশা ॥

বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীবেদীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অস্পাদিন পরই শিবজী ভবানীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অস্বর দেশীর অতি উচ্চ কুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্যে লিপ্ত হইতেন না। দেবীকে পূজা দেওয়া ও পুরোহিতের নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে পাঠাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কক্ষকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন, মন্দিরের নিকটে আসিলে, মন্দিরপার্শ্বস্থ ছাদে সহসা তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা তাঁহার শরীর কটকিত হইল! দেখিলেন সেই ছাদে একজন অনুপম লাবণ্যময়ী চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকা একাকী আসীনা রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডুল স্থাপন করিয়া অন্তাচলের রক্তিম শোভা অনিমেঘে দৃষ্টি করিতেছেন। কন্যার রেশম-বিনিম্বিত সুমার্জিত অতিক্রম কেশপাশ গণ্ডুলে, হস্তোপরি, ও পৃষ্ঠদেশে লব্ধিত রহিয়াছে এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরনিম্বিত চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ আরুত করিয়াছে। জয়গল যেন তুলিদ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের

শোভা সাধন করিতেছে। ঐষ্ঠদ্বয় স্বক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, উন্নতপ্রায় হইয়া রঘুনাথ সেই ঐষ্ঠদ্বয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাহু সুরগোল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, ও শ্রবণের বলয় ও কঙ্কণদ্বারা সুশোভিত। কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাক্ষণ বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বলতর করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদ্রুত বক্ষস্থলের উপর একটি কণ্ঠমালা দোহলামান রহিয়াছে। রঘুনাথ ! রঘুনাথ ! সাবধান ! তুমি রাজকার্য্যে আসিয়াছ, তুমি দরিত্র, একজন সৈন্যমাত্র ও দিকে চাহিও না, ওপরে যাইও না। রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি মূগ্ধের ন্যায় অনিমেষ লোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঙ্কিত অনুপম ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় ক্ষীত হইতেছিল, পূর্বে যে ভাব কখনও জানেন নাই, অদা সহসা সেই নব ভাবের উন্মেষে হৃদয় মুগ্ধ হইতেছিল; আহত হইতেছিল; সময়ে সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল। যৌবনপ্রারম্ভের প্রথম প্রেমের উদ্দম বেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় !

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রস্তুতবৎ অচল হইয়া সেই শুল্কর প্রতিমূর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সায়ন্তন আকাশের শোভা ক্রমে লীন হইয়া গেল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সেই প্রতিমূর্তির

উপর পড়িতে লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান !

সন্ধ্যার সময় কন্যা গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন,—দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় অজি সুরগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জার কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক সেইরূপ বক্ষের উপর বামহস্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ শ্রবণের উন্নত ললাটে ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আরক্ত করিয়াছে, কে'বে খজা, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ-বর্ধা, ও অনিমেষ লোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মূর্ত্তের জন্য রমণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে দুই এক বিন্দু স্বেদ মোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দীর্ঘে দীর্ঘে চিন্তিতভাবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আশ্রয় পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অশ্বর-দেশীর উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দন দেব। তিনি অশ্ব-

রের রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহের একজন সভাসদ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনু-রোধে, জয়সিংহের অনুমতানুসারে শিব-জীর সর্বপ্রথম বিজিত তোরণদ্বর্গে আগ-মন করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কেহই ছিল না, সুতরাং সতীক এই দ্বর্গে আসিয়া বহু যত্নে ভবানীর উপাসনা করিতেন ও একটি অপত্য মানসে অনেক যাগযজ্ঞও করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে এই দ্বর্গে অ-সিবার দুই তিন বৎসর পরই তাঁহার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করেন; কিন্তু কন্যা প্র-সব করিয়াই তিনি কালক্রমে পতিতহন।

জনার্দন কন্যার নাম সরযুবালা রা-খিলেন ও একমাত্র অপত্যকে অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কাল-ক্রমে সরযুবালা নিকপম রূপবতী হইলেন, ও যৌবন-প্রারম্ভে তাঁহার অপূর্ণ লাবণ্য ও নব নব সৌন্দর্য্যবিকাশ দেখিয়া দ্বর্গের সকলেই বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলি-তেন যে, ভবানী উপাসকের পূজায় পরি-তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কন্যাকে এইরূপ দেব-তুল্য সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে বিভূষিত করিয়া-ছেন। জনার্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্দাস-নের দুঃখও বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কতকক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দন দেব মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও একগুণ বলিষ্ঠ, চক্ষুদ্বয় শান্তিরস-পূর্ণ এবং স্বেচ্ছাশ্রু বি-

শাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়াছে। জনা-র্দনের বর্ণ গোঁর, ক্ষুদ্র হইতে যজ্ঞোপবীত লব্ধিত রহিয়াছে! পূজকের পবিত্র শান্তি-পূর্ণ মন, ও বালকের তায় সরল হৃদয় জনার্দনের মুখে দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করি-লেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সমভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্ৰোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিথ্যাদাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘু-নাথ বতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলি-লেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কএকটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন—

“প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত যে তুমুল রণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে আপনি তাহার জয়ের জন্য ভবানীর নিকট পূজা করিবেন। দেবীর প্রসাদ ভিন্ন মনুষ্য-চেষ্টা রণা।”

জনার্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভী-রস্বরে উত্তর করিলেন “সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকা-লই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরী স্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও সে বি-ষয়ে ক্রটি করিব না।”

রঘুনাথ। “প্রভুর দেবীপদে আর একটি আবেদন আছে। তিনি যৌরতর যুদ্ধে প্ররক্ত হইবেন, তাহার ফলাফল ক-থঞ্চিৎ পূর্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।”

জনার্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় আপনার অকম্পিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

“রজনীযোগে দেবী-পদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্যা প্রাতে উত্তর জা-
নিতে পারিবে।”

রঘুনাথ ধনুবাদ করিয়া বিদায় হই-
বার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে
জনার্দন বলিলেন ।

“তোমাকে পূর্বে এই ভূর্গে দেখি
নাই, অদ্য কি প্রথমে এ স্থলে আসিয়াছ?”

রঘু । “অদ্যই আসিয়াছি।”

জন। “ভূর্গে কাহারও সহিত পরি-
চয় আছে? থাকিবার স্থল আছে?”

রঘু । “পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক
স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্যা প্র-
তেই চলিয়া যাইব।”

জন। “কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সঙ্-
করিবে?”

রঘু । “প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ
হইবে না, আমাদের সর্বদাই একপে রাত্রি
অতিবাহিত করিতে হয়।”

যুবকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও সরল
উদার স্বভাব দর্শনে জনার্দনের অন্তঃকরণে
বাৎসল্যের উদ্বেগ হইল, বলিলেন—

“বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য,
কিন্তু অদ্য ক্লেশ সহনের কোন আবশ্যকতা
নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর,
সরযু তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া
দিবে। পরে রাত্রে বিশ্রাম করিয়া কল্যা দে-
বীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়া যাইবে।”

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্পীত
হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে
আঘাত করিল। এটি যাওনা না আনন্দের
উদ্বেগ? সরযু! সরযু! সে কি সেই
সায়ংকালীন আকাশপটে অঙ্কিত মনো-
হর চিত্র? রজনীর আগমনে আকাশপট
হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘু-
নাথের হৃদয়-পট হইতে সে আনন্দময়ী মুক্তি
কখন—কখন—কখনই লীন হইবে না।

কাল ।

১

“নদী আর কাল-গতি একই সংগন,”

একই রূপেতে দোহে করয়ে পয়াণ।

তটিনীর গতি প্রায়, অমূল্য সময় হায়

চালিছে অদৃশ্য ভাবে অনন্তে শরীর;

চলিতেছে চল চল, কে তারে ফিরাবে বল?—

ফিরিবেনা—ফিরাবারে পারে কোন বীর?
যেন তটিনীর গতি!—এত অজ্ঞানতা অতি!—

জলেতে ভাসিয়া গেলে অতুল-রতন;

যতন করিলে পারে পুনঃ তারে পাই করে—

আবর্তে ঘুরিয়া উঠে আপনি কখন।

কালের তরঙ্গে হায়, যদি কছু ভেসে যায়,

পুনঃ কি কখন তার পাই করতলে ?
 প্রফুল্ল কমল দলে ভাসায়ে দিলাম জলে
 ঘুরিতে ঘুরিতে পদ্ম হাসি হাসি চলে,—
 তখনি নামিয়া নীরে সাতারিয়া নলিনীরে
 ফিরায়ে আনিতে পারি প্রয়াস করিলে;—
 ফিরে কি ভাসিয়াগেলে কালের সলিলে ?

২

কত রত্ন অগণন—অমূল্য উজ্জ্বল
 কাল-স্রোতে গেছে ভেসে অর্ণবে অতল—
 অবনীর অলঙ্কার ! ফিরবে না তারা আর !
 এ নহে তটিনী-গতি !—বারেক তা হলে
 জীবন করিয়া পণ করিতাম দরশন
 সাহসে বাঁধিয়া বুক নামি সেই জলে,
 ফিরাইতে গতি তার প্রতিজ্ঞার বলে !

৩

এক দিনে কত হয় এক দিনে কত লয়—
 সপ্ত দিনে এই তিন ব্রহ্মাণ্ড স্বজন !
 পলকে প্রলয়-জলে কতু বিশ্ব যায় তলে
 পলকে প্রকাশে লক্ষ জগৎ নৃতন !
 তুচ্ছ নহে একপল ক্ষুদ্র এক বিন্দু জল
 দণ্ড দিন যুগ মাস মিশি পলে পল,
 বারি বিন্দু বিন্দু সনে মিশি হয় একক্ষণে
 জনমে ভীষণ সিদ্ধি অতন্ত অতল !
 ক্ষুদ্র দেখি তুচ্ছ ভাব যে হৃদয়ে জ্ঞানাভাব
 অনন্ত জগৎ এই অণুকণাময় !
 নব শিশু ক্ষুদ্রাকার, কালে ভীষ্য অবতার,
 পদ দস্তে কাঁপে ব্যোম গিরি সমুদয়।
 বিচিত্র কালের গতি জ্ঞানিগণ কয়।

৪

উন্নতি কি অবনতি,—সাধনের ফল ;

সভ্যতা ভব্যতা কিবা কালেতে সকল।
 কালে শিশু ভীমকায় কালে ভীম শিশু প্রায়
 কালেতে মশক ঐরাবত-অবতার,
 কালে হয় কালে লয় কালেতে জলের রয়
 উজ্জ্বলগামী !—অবিস্বাস ? বিচিত্রব্যাপার !
 নুরমা নগরী হয় কালেতে অশ্বশান প্রায়
 ফেঞ্চপাল হা বিধাতঃ ! ফুকরে গভীর !
 ভীষণ অটবীচয় কালে রাজধানী হয়
 রাজধানী অরণ্যানী ! দরিদ্র ফকির
 পৃথিবীর অধিপতি !—প্রবল প্রতাপ অতি,—
 জুজুটি ভজিতে কাঁপে মেদিনী গগণ !
 কালে ইন্দ্র বনবাসী ইন্দ্রাণী দম্ভদাসী !—
 অন্নভাবে অন্নপূর্ণা কাতর জীবন !
 কালে ভীম মকহুল পুষ্পোদ্যান ! ঝল মল
 করে কিবা প্রতিপল সাজি চাক সাজে !
 সরস সরসী তায়, শতদলে শোভা পায়,
 মাধবী বকুল চাঁপা হেমলতা রাজে।
 চারিদিকে ফুটে ফুল বিশ্ববাসী প্রেমাকুল
 মেহুর মলয় বয় ছুটে পরিমল,
 কোকিল পঞ্চম গায় অলি মধুলোভে ধায়
 আনন্দ-উৎসব-মত্ত ধরিত্রী সকল।
 কালেতে প্রমোদ বন মকহুল বিভীষণ
 ধ্বংস করে বালুময় প্রকাণ্ড প্রাস্তর !
 দীপ্ত প্রভাকর করে প্রচণ্ড মুরতি ধরে
 মায়াবিনী মরীচিকা !—শিহরে অন্তর !
 প্রবল প্রতাপে তায়, মত্তানিল ছুটে যায়,
 উৎপাটিত সন্তাড়িত করি সমুদায় !
 মরি কিবা ভীম ভাব !—উজ্জ্বলগিহ্নাব
 পাবক-প্লাবনে করি প্লাবিত ধরায় !
 গভীর অর্ণবচয় কালে উচ্চ হিমালয়—

কালে হিমালয় বিশ্বগর্ভে নিমগন !
 প্রমত্ত পবন ধায় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তায়
 ভীম ভাবে ছুটে যায় ছাড়িয়া গর্জন ।
 কাঁপায়ে মেদিনীবোম, শনি শুক্রবুধা সোম,
 আছাড়ে আছাড়ে পড়ি নিমগ্ন পাহাড়ে;
 আবর্তে আবর্তে ঘুরি ভীমনাদ ছাড়ে !

৫

শতদল-দল-গত যেমন জীবন,
 এই বিশ্বে সমুদায় জানিবে তেমন।
 সমীরণ সদা বয় কখন সে স্থির নয়
 সদাগতি নাম তাই ; কুলু কুলু স্বরে,
 আপনার মনে হয় ! সতত তটিনী ধায়

মিশিছে চলিয়া নিত্য গভীর সাগরে ।
 অদৃশ্য কালের গতি ;--কিন্তু সে চঞ্চল অতি,
 জ্ঞানীরে ভূলাতে নারে অজ্ঞানে কুহরে,--
 মিশিছে চলিয়া নিত্য কালের প্রান্তরে
 উত্তাল তরঙ্গ রাশি, মত্ত ভাবে অট্ট হাসি,
 উঠিছে ছুটিছে রঙ্গে পবন-হিলোলে,
 অতল অনন্তব্যাপী অর্ণবের কোলে ;--
 সে তরঙ্গ-রঙ্গে হয় ! জীব জলবিশ্ব প্রায়,
 জীবলীলা লীলাচলে মিশাইয়া যায়,
 যে জন যথার্থজ্ঞানী, জ্ঞানে নহে অভিমানী
 জীবনের ব্রত সেই মাথে সাধনায় ।

(হরিমোহন)

আশ্রা ।

এমনও এক সময় হইয়া গিয়াছে, যখন এই আশ্রা-হার অদূরবর্তিনী যত্ন-রাজধানী মথুরা পুরীর প্রাঙ্গণস্থ কেলিকানন স্বরূপ শোভমানা ছিল। এমনও সময় আবার অতীত হইয়াছে যখন এস্থান বিশ্বব্যাপক মহাতেহন্দ্রী শাক্যোপাসকদিগের বিহার ভূমি মথুরার দ্বার-বস্ত্রস্থ বাহিনিবাস মধ্যে পরিগণিত ছিল। হয়ত কোন দিন তাই তক্ষু যুদ্ধ ও কনিষ্ক প্রভৃতি ঐশ্বর্যবান রাজচক্রবর্তীদিগের প্রতিদিন সেবনীয় মৃগয়াভূমিতে পরিবর্তিত হইয়াছিল। আবার এমনও দিন উপস্থিত হইয়াছিল যে, হয়ত সেই দিনে ইহার প্রান্তবর্তী মহাবল পরাক্রান্ত পরমার

পরিহার এবং চৌহান বংশীয় রক্তপুত-জাতীয় রাজপুতস্বেরা ইহাকে আপন আপন দিগ্বিজয় পথের বিশ্রামাবাস করিয়া ব্যবহারে আনিয়াছিলেন। আবার সর্বশেষে ইহার ভাগ্যে এমনও এক সময় আসিয়া যুটিয়াছিল, যখন এই আশ্রা সমস্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রভূমি হইয়া মোগল-কল-ভিলক সম্রাটের আকবরের রাজধানীরূপে পৃথিবীবক্ষে অতুল ঐশ্বর্যের আকরভাবে বিরাজ করিতেছিল।

ভারতের ঐতিহাসিক ভূমির মধ্যে মুসলমানদিগের পূর্ববর্তী কালে এ স্থানে কখন কোন্ সময়ে কি ভাবে যে কতকিছু হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বর্তমান স-

ময়ে কোনরূপেই অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারি না। কিন্তু এইটি এক প্রকার নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি যে, মোঘলদিগের সভ্যতা, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বল প্রথমে এখান হইতেই তরঙ্গের ন্যায় স্ফীত হইয়া কখন বা হিমালয়োৎসঙ্গে, কখন বা পূর্ব ঘাটপার্শ্বে, কখন বা পশ্চিমঘাটতে এবং কখন বা কন্যাকুমারীর অন্তরীপশৃঙ্গে বাইরা আঘাত করিতেছিল। এইখানেই কোন সময়ে আবুলফজল্, ফয়জী, বীরবল ও মানসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা স্বাভাবিক কল্প চন্দ্রচূড়ের ন্যায় আকবর পার্শ্বে থাকিয়া কখন বা ইহার দরবারে আম্ নামক গৃহে এবং কখন বা ইহার দরবারে খাস্ নামধেয় ভবনে করে করে সম্মিলন পূর্বক নৃত্য করিয়াছিল। ইহারই ভয়াবশেষের অভ্যন্তরীণ কোন এক গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া মস্তিষ্ক আবুলফজল্ তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ আইন আকবরির পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছিলেন; এবং ইহারই ইত্যন্তোবিস্তীর্ণ ভগ্নগৃহ মস্জিদাদির কঠিনমুহুর্তে অলঙ্কৃত করিবার জন্য কোন দিন সেই প্রসিদ্ধ যবনকবি ফয়জী, আপনার মূললিত কবিতাকুশলে মালা গ্রন্থন করিয়া আপন হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণ কাল-কুরঙ্গ, সেই সমস্ত ঘটনা ও কথাকে ভূতরাজ্যের স্বপ্নভূমিতে নির্ধারিত করিয়া, ইহাকে আপনার মুখাবলীতৃণ পত্রের ন্যায় কেবল কতকগুলি চূর্ণীকৃত

সমাধিপুঞ্জাবশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই ভাঙ্গা ঘোর ও সমাধি মস্জিদ। কোন স্থানে কোন প্রসিদ্ধ গৃহশ্রেণীর খান কত ভগ্ন ইষ্টক পড়িয়া আছে;—কোথাও বা একটি পাচীর অংশ তৃণ গুল্মে রাম্যসিত হইয়া কোন এক নিভৃত স্থানের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে কোন একটি গৃহের বিভগ্ন শরীর ও বিকলাভ্যন্তর, অস্থিমাত্রাবশিষ্ট নৃকপালের মুখাভ্যন্তরের ত্রাণ পথপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়া পান্থবর্গের দম্ভ ও অহঙ্কারের প্রতি জ্বকটি করিতেছে। কোথাও বা সেই সকল প্রসিদ্ধ লোকদিগের মধ্য কাহার কাহার দেহাবশিষ্ট রজোমুষ্টি, শকটবর্ষের মধ্যপথে পড়িয়া এবং চক্রবর্ষণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীর আশ্রয় ও কপালসমূহকে বিরঞ্জিত করিতেছে। কোথাও আবার কালবিদলিত, সর্বোৎপাদিত এবং শূন্যাবশিষ্ট অট্টালিকা-ভূমিতে স্বভাবজাত কর্তক সমাকুল বহল তরুর সমাশ্রয়ে, বিজনতা যেন বিনাশ দর্শনে অতি কক্ষণক্ষরে পারাবতকণ্ঠে রোদন করিতেছে। বস্তুতঃ যে দিকে চক্ষু এবং কর্ণ ফিরাইবে, সেই দিকেই বোধ হইবে, যেন বিরাটকাল, এক পার্শ্বে আপনার চিরসহচর স্বরূপ বন, বিজনতা, ও শূন্যতা প্রভৃতি প্রেতদলের সহিত বসিয়া অতি গভীরভাবে ভোজনব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে;—আর অপর পার্শ্বে অধিবাসী পাচকেরা গৃহ, অট্টালিকা ও ঘটনাদিরূপ

নূতন নূতন অন্নব্যঞ্জন শাক স্থপাদি রন্ধনের ধূম, অগ্নিঝালা, কোলাহল ও দণ্ড কটাহ প্রভৃতির খট খট শব্দে চক্ষুকণকে অন্ধও বধির করিয়া তুলিতেছে।

যদিও ইহার গত যৌবনস্ত্রীর সহিত তুলনা করিলে আশ্রা এইক্ষণ কিছুই নহে, তথাপি ইহার প্রাচীন মাহাত্ম্য এবং কালকরের অস্পৃষ্ট---ইহার অন্তর্গত কোন কোন পদার্থ দূর হইতে ভ্রমণকারীদিগকে এখনও আকর্ষণ করিয়া আনে। এখনও ইহা দর্শক বর্গের তীর্থ স্থান বলিয়া গণনীয়। অতএব যদি আমি এখানে মোগল বংশীয় দিগের মহাপীঠ এই আশ্রা নগরের কোন কোন রত্নান্ত লিপি বন্ধ করি, বোধ হয় তাহা পাঠক বর্গের নিতান্ত অপ্রিয়কর অথবা পঠন-ক্লান্তিকর হইবে না। তাঁহারা প্রাচীন আখ্যাবর্তের অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান অবস্থার বহুতর বিষয় সামান্য ভাবে সাংক্ষেপিক রূপে ইহা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। যেমন কোন একটি মনুষ্য শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরীয় নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও তৎসহ তদন্তর্গত ব্যাপারাদি অতি সামান্য ভাবে দর্শন করিলেও সামান্যরূপে সমুদয় মনুষ্য শরীরেরই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ কোন একটি দেশ কি প্রদেশের কোন একটি কেন্দ্রীভূত নগরকে সামান্যরূপে মনোনিবেশের সহিত দর্শন করিলে, কিংবা তাহার রত্নান্ত পাঠ করিলেও সামান্যতঃ সেই সমস্ত ভূখণ্ডের বহুতর বিষয়

পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আমি অতি দীর্ঘকাল এই নগরে বাস করিয়া আসিতেছি। এই সময়ের মধ্যে, যদিও কোন দিন দেখিবার জন্য অধিক যত্ন করি নাই, তথাপি বিনাযত্নেই এত বিষয় চক্ষে পতিত হইয়াছে যে, তাহা এখন যত্নের সহিত কুড়াইয়া একত্রিত করিতে পারিলে, বাঁহারা এ পর্য্যন্ত এ সকল স্থান দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে তদ্বারা একটি ছোট খাট কোতুবাহ উপহার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে তাহাই করিতে ওরূপ হইলাম। আমার আদেশীয় পাঠকেরা যদি ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্রিত হন, আমি তাহা হইলেই পরিশ্রমসার্থক মনে করিব।

প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্বে গুটিকত কথা। যদিও প্রকৃত বিষয়ের সহিত তাহার বিশেষ কোন সংশ্লিষ্ট নাই, তথাপি মনের দুঃখ প্রকাশ জন্য পাঠকবর্গকে গুটিকত কথা বলা আমার যেন আবশ্যিক বোধ হইতেছে। পাঠকবর্গ অল্প পরিমাণ অনুধাবনের সহিত ভাবিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের অন্তঃকরণ পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকতর জিজ্ঞাসু এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ আমাদের দ্বারা আমাদের পার্শ্ববর্তী ঘটনা কি ব্যাপারাদি পূর্বের তায় তত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হয় না। সকল বিষয়েরই একটু একটু তত্ত্ব জানিতে অনেকেরই ইচ্ছাকরে।

যদিও এই জ্ঞান-ক্ষুধা সম্যক্ রূপে সর্ব সাধারণের অন্তরে এক্ষণ পর্য্যন্তও অধিকার-স্থান পায় নাই, যদিও সাধারণো দাক্ষণ মন্দাগ্নির প্রকোপ এখন অত্যন্ত প্রবলই রহিয়াছে, তথাপি কোন কোন জ্ঞানী লোকের মধ্যে কোন কোন অংশে অতি সামান্য পরিমাণে একটুকু ক্ষুধার বেগ জন্মিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়; এটি মৃত আশালতাতে প্রাণ সঞ্চারের কিঞ্চিৎ পরিচয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহা যে ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত দৃষ্টান্তের উদ্বোধন হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ সকল হইয়াও মধ্যপথে কতকগুলি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, পূর্বে আশালতার অঙ্কুর যেন আর রুদ্ধি পাইতেছে না। একটু একটু হরিদ্বর্ণ মুখ বাহির করিয়া যেখানকার যাহা, তাহা সেই খানেই আবার বিবর্ণতা পাইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এরূপ হইয়া যাওয়ার কএকটি কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান এবং সর্ব প্রথম এই যে, যাহার ক্ষুধা জন্মিয়াছে তাহার অন্ন নাই, আর যাহার অন্ন আছে, তাহার ক্ষুধা কি কচি মাত্র নাই। অন্নবানেরা অন্নের শয্যা, অন্নের উপাধান, অন্নের পাত্রিকা এবং অবশেষে অন্নে পথ পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া তাহার উপরে প্রত্যহ পদচারণা করিবেন ও তাহাতে মৃত পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অগম্য করিয়া রাখিবেন; তথাপি

নিরন্নদিগের ক্ষুধানল নির্বাপণ জন্য প্রাণান্তেও একটি কপর্দক পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের অন্নরাশি বস্ত্র বাঁধিয়া বাঁধিয়া আপন হস্তে প্রতিদিন মল-কূপে নিক্ষেপ করিয়া পচাইবেন, তথাপি একটি পয়সা অন্নের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্ত ব্যয়িত হইতে দেখিতে পারিবেন না। তাঁহাদের ক্ষুধাও জন্মে না, অন্নের এরূপ দুর্গতিও ঘুচে না। যাহার অনেক উদ্বীপক ঔষধি খাওয়াইবার পরে কিঞ্চিৎ জন্মে তাহাও বিকৃত ক্ষুধা;—কাগ এবং বোতল ভাঙ্গা খাইবার ক্ষুধা;—মাটি খাইবার ক্ষুধা। একটিরও অন্ন বাঞ্ছনের প্রতি অভিকচি হয় না। ভারতের ভাগ্যে যদি অন্নবস্ত্রদিগের একবার প্রকৃত ক্ষুধা জন্মিত, তাহা হইলে অনেক নিরন্ন তত্ত্ব-ক্ষুধার্ত লোক তাঁহাদের ভোজ সমারোহে আপন আপন উদর পূর্তি করিয়া মহান্ আনন্দ লাভ করিতে পারিত; আর এরূপে মুছমান হইয়া যাইত না। দেশের মুখও অনেক উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন দেখাইত। যে সকল লোকের কথা এখানে উল্লিখিত হইল, ইহারা প্রায় সকলেই আপন আপন পিতৃ-পুরুষদিগের ছল বল বাহুপার্জিত অন্নে অন্নবস্ত্র; ইহাদিগের আপন বিক্রমোপার্জিত কিছুই নহে, ইহারা যক্ষ নাগের মূর্তি ধারণ করিয়া কেবল পিতামহের স্রবণ কলসকে বেটন করিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে পুরুষকারের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি পক্ষান্তরে ইহারা এই

অন্নদ্বারা দেশের নানারূপ জ্ঞান-বুদ্ধির
নিবারণের চেষ্টা পান, তাহা হইলে ই-
হাদিগের অনেক পুঙ্খকাহের কথা হইয়া
উঠে সম্ভব নাই। আত্ম পানসের সঙ্গে
ইহাদিগের অন্তিম চূর্ণ হইয়া যাইবার আর
সম্ভাবনা থাকে না।

নিরন্নদের মধ্যে অনেকে পাঠশালা
রূপ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া শিক্ষক বৈ-
দ্যের উপদেশ রূপ উদ্দীপক ঔষধ দ্বারা
কিছু দিন হইল জ্ঞান-ক্ষুধাকে অত্যন্ত উ-
ত্তেজিত করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে,
তাহাদের অনেকেই সেই চিকিৎসালয় ছা-
ড়িয়া যখন কিঞ্চিৎ অন্নবস্ত হইয়া উঠিলেন,
অমনি এককালে ক্ষুধা রহিত হইয়া শয্যা
পড়িলেন। ভাতের ক্ষুধা আর রহিল না।
নানাপ্রকার বিরক্ত ক্ষুধা জন্মিতে লাগিল।
বোতল ভাঙ্গা, কাগ, ছাই, মাটি ও গো-
বরের কচি জন্মিয়া উঠিল। এইরূপ অন্তরায়
উপস্থিত হওয়াতে কোন দলেই পুষ্টি বি-
স্মৃত হইতে পারিতেছে না। অন্নবস্তের
যে রূপ বিরক্ত পদার্থ সকলের আহারে এ-
কদিকে সঙ্কট হইয়া যাইতেছেন, সেইরূপ নি-
রন্নের ক্ষুধাসত্ত্বেও অপরদিকে মুহ্যমান হ-
ইয়া পড়িতেছেন। এরূপ কেন হইল? ক্ষুধা
থাকে ত অন্ন থাকেনা, অন্ন থাকে ত ক্ষুধা
থাকে না। একি অন্নেরই দোষ, না, লো-
কের প্রকৃতির দোষ? যদি অন্নের দোষ
হইত, তবে ভিন্নদেশে কেন ভিন্নরূপ দৃষ্ট
হয়? লার্ডরস্, লার্ডওরের প্রকৃতির ক্ষুধা
কেন অন্তরূপ? এই ভারতবর্ষের কাল-

চর্চিত বন্ধে এত স্থানে এত কীষ্টি চিহ্ন
রহিয়াছে এবং সেই সকল চিহ্নের সহিত
এত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোকের অবজ্ঞা
এবং উপেক্ষা বশতঃ এতদিকে এতভাবে
দৃষ্টিপথের অগোচরে ভূগর্ভে বিলীন হ-
ইয়া যাইতেছে যে, যদি তাহা এ দেশীয়
ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ সম্বি-
লিত হইয়া আপন পিতৃপুঙ্খদিগের প্রতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপে সেই সকলের
চিত্রপট ও তৎসহ তাঁহাদের ঐতিহাসিক
রক্তান্ত একত্রে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া
পুস্তকে নিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে সেই
পূর্ব পুঙ্খদিগের সমাধির উপরে একটি
অপূর্ব স্বর্ণ স্তম্ভ প্রস্তুত হয়। এবং এই
সকল চিহ্ন-চিত্র ও তাহার রক্তান্ত সর্বদা
অন্তঃকরণে দেশের অনুরাগকে উদ্দীপন
করে। সময়ে সেই উদ্দীপনা আবার প্রাণ-
বলেও পরিণত হয়। যাহারা এই স্তম্ভ
প্রস্তুত করেন, তাহারাও পৃথিবীতে সর-
স্বতীর অধিষ্ঠান কাল পর্যন্ত ভারত বাসী-
দিগের ভাবি হৃদয়ে জীবিত থাকিতে
পারেন। যে দেশে প্রাণ আছে, ধু-
জিয়া দেখ, সেই দেশেরই প্রতি গৃহে
এইরূপ স্মরণ-স্তম্ভ পুস্তকাকারে গ্রন্থাগারে
বিগ্রহরূপে অর্চিত হইতেছে। আর যে
দেশে ইহা পাদ-দলিত হইয়া স্মরণাগার
হইতে অবজ্ঞা ও অবহেলার সম্বার্কশী দ্বারা
অপসারিত হইয়াছে, সেই দেশই প্রেত-
লোকগত পিতৃ-দেবতাদিগের অবমাননা
রূপ পাপে ভাজিয়া পড়িয়া এবং পূর্ব

পুরুষদিগের বলবীৰ্য্য কীৰ্ত্তি সাহসাদির উদ্ধীপনারূপে তেজে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ ও অবশেষে ভস্মরূপে পরিণত হইয়াছে। কোন একটি সামান্য গ্রামের ইতিহাসও যদি প্রকৃত রূপে লিখিতে হয়, তাহাতেও অনেক পরিভ্রম, সহায়তা, সময়, অনুসন্ধান ও কখন কখন অর্থবিতরণ আবশ্যক করে। বিদেশীয়েরা এবং প্রকারের কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে আমাদের নিকট হইতে যত সাহায্য এবং সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন, আমরা স্বদেশীয়েরা আপনাদের নিকট হইতে তাহার চতুৰ্থাংশের একাংশও সহজে পাইতে পারি না। সুতরাং আমরা কাব্য লিখি, কল্পনার আশ্রয় লই, এবং রত্নাঙ্ক জগতের সম্মুখীন হইতে, অথবা ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবেশ করিতে যেরূপ সাহায্য, সম্মল ও উপকরণ সামগ্রীর আবশ্যকতা তাহা না পাইয়া, এবং পাইতে চাহিলে কমল-মধু-মুগ্ধ স্বদেশীয় ধনিসন্তানদিগের নিকট স্থগিত, উপেক্ষিত ও সৰ্ব্বপ্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া কাল-কুক্ষি-নিহিত পুরাতন তত্ত্বের অনুসন্धानে বিরত হই। পুরাতন তত্ত্বের অনুসরণ আমার পক্ষে আরও কষ্টকর। অবস্থার নিপীড়নে আমি যার পর নাই অসহায়। আর, পদমর্যাদা এবং প্রতিপত্তি-বিরহে এই আগ্রার অনেক স্থানই আমার অগম্য, অথবা দুর্য্যগম্য। আমি পাঠক-বর্গকে এই হেতু পূৰ্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি তাঁহাদিগকে যাহা

উপহার দিব, তাহা অযত্নলব্ধ এবং ইতিহাসের শৃঙ্খলা-শূন্য।

আগ্রা হিন্দুদের সময়ে কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন স্পষ্ট চিহ্নই ইহার শরীরের উপর এক্ষণ বিদ্যমান নাই। কনিংহাম্ প্রভৃতি স্থপতি কাকবিশারদ ব্যক্তিরা ইহার নামের ব্যুৎপত্তি হইতে এবং অন্যান্য লেখকদিগের মত হইতে ও অন্যবিধ কারণ সমস্ত হইতে ইহার নাম ও প্রাচীনত্বের বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান করেন। পাঠকবর্গের কোতূহল নিবারণ জন্য তাহার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হইল।

উড়সাহেবের রাজস্থানের পুরান্নতে আগ্রা কোন কালে অগরওয়ালবংশীয় সরদারদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের বংশাবশেষ এখনও নাকি দিল্লীর পশ্চিমে অগরোহা নামক স্থানে, বৃন্দেলখণ্ডে, রাজপুতনার কোন কোন অংশে এবং মালোয়াদেশের অগুগর নামক স্থানে বাস করিতেছে।

কুইণ্টস্‌কট্টারস্ তাঁহার পুরান্নতে “অগ্রামেশ” নামে যে এক প্রাচীন রাজার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ, আগ্রা, তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। কেহ বলেন যে, রজঃপুতবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে “অগ্রাজ” নামে কেহ ছিলেন। তিনি অগ্নি হইতে উদ্ভব হইয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্রাজ হইয়াছিল। আগ্রা এক সময় তাঁহারই রাজধানী ছিল।

কেহ আবার বলেন, পুরাণে অগ্নিমিত্র নামে যে এক রাজার উল্লেখ আছে, সেই অগ্নিমিত্র শব্দই কালে আকৃষ্ট ও অপভ্রাষিত হইয়া অগরাজ হইয়া গিয়াছে। অগরাজ এবং অগ্নিমিত্র এক ব্যক্তিরই অভিধান। সূতরাং এখানে অগ্নিমিত্র অর্থাৎ অগরাজের রাজধানী ছিল বলিয়াই, ইহার নাম আশ্রা হইয়াছে।

কেহ অনুমান করেন, কাল-প্রসিদ্ধ মথুরার অগ্রবর্তী নগর বলিয়াই ইহার আশ্রা নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অগর শব্দে লবণকুণ্ডকে বুঝায়। আশ্রার মৃত্তিকাতে অনেক স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়, এবং ইহার কুপাদির জলও লবণাক্ত। সূতরাং ইহাকে অগর অর্থাৎ লবণকুণ্ড মনে করিয়াই ইহার নাম আশ্রা রাখা হইয়াছে।

আবার ১৮৬৯ সনে এই আশ্রানগরের কোন একটা স্থান খনন করিতে করিতে প্রায় দ্বিসহস্রেরও অধিক রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার সমুদয় মুদ্রাতেই প্রাচীন পাশ্চাত্য সংস্কৃত অক্ষরে অতি স্পষ্টরূপে “ গুহিল জী ” নাম অঙ্কিত ছিল। কেহ কেহ ভাবেন যে, এই “গুহিল জী” হয় ত মেওয়ার দেশীয় বীলোট বংশের আদিপুরুষ জীগোহাদিত্য অথবা গুহিল হইবেন। ইনি ইহরেজী ৭৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু মুদ্রার কলেবরে যে জাতীয় অক্ষর অঙ্কিত ছিল, তাহা যেন এই কাল হইতেও অনেক প্রা-

চীন কালের অক্ষর বলিয়া অনুমিত হয়। সূতরাং ঐ মুদ্রা যে বীলোট বংশীয় জীগুহিলের মুদ্রা, এ বিষয়ে সংশয় থাকে। এদিকে কনিংহাম সাহেব গোয়ালিয়রের নিকটে নরওয়ার নামক স্থানে “ জীগুহিল পতি ” নামাঙ্কিত গোটাকত টাকা পান। ঐ টাকাতে যে প্রণালীর অক্ষর সকল অঙ্কিত ছিল, তাহার সহিত আশ্রাতে প্রাপ্ত মুদ্রা সকলের কলেবরস্থ অক্ষর সমুদয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ইতি মধ্যে আবার সেই প্রদেশের তোরমনের পুত্র পশুপতির নামাঙ্কিত আরও চারিটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এই চারিটি মুদ্রা পাওয়ার পরে, কনিংহাম সাহেব এই অনুমান করেন যে, পূর্বোক্ত গুহিলপতিও এই বংশেরই কেহ হইবেন। তোরমন খ্রীষ্টীয় অব্দের ২৬০ হইতে ২৮৫, এবং পশুপতি খ্রীষ্টীয় ২৮৫ হইতে ৩১০ অব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া প্রবাদ আছে। এইক্ষণ সর্বের কালাইল সাহেব এই ঘটনা দেখিয়া নরওয়ারের জীগুহিল পতি ও আশ্রার গুহিলজীকে এক মনে করেন। এবং এই আশ্রা যে কোন সময়ে সেই জীগুহিল পতির সিংহাসনভূমি ছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করেন।

এদিকে আবার আশ্রার দূর হইতে প্রায় ৩ মাইল উপরের দিকে যমুনার দক্ষিণ তটে একটি বাগান ও বাড়ীর কিঞ্চিৎ চিহ্ন পড়িয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা ইহাকে রাজা ভোজের বাগান

ও বাড়ী বলিয়া নির্দেশ করে। এই রাজা ভোজ কে, তাঁহার কি রক্তাশু, তাহা এই-ক্ষণ জানিবার কোন উপায় নাই। সর্কেষর কাল্‌ইল সাহেব বলেন যে, তিনি নাকি এখানকার কোন বিচক্ষণ লোককে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য দিভাসা করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ৬ বর্ষ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত, মালোয়াদেশীয় রাজা ভোজের বাগান ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। সাধারণেরা যদিও তাঁহাকে এত বিশেষ করিয়া এবিষয় বলিতে পারিয়া ছিল না বটে, কিন্তু ইহা যে রাজা ভোজের বাড়ী এবং মুসলমানদের আক্রমণকালের পূর্ব হইতেই এখানে আছে, তাহা তিনি সকলের নিকট হইতেই এক প্রকার সর্ববাদিসম্মত রূপে শুনিয়া ছিলেন। যদি এই জনশ্রুতি সত্য হয়, তাহা হইলে আগ্রাতে মুসলমানদের পূর্ববর্তী কালের এই একমাত্র হিন্দু চিহ্ন বর্তমান আছে, বলিতে পারা যায়।

অঞ্জনা-পুত্র যে প্রকার সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত চারিটি প্রস্তরাক্ত অক্ষর দ্বারা কাল-বিলুপ্ত সমগ্র মহানটক পুস্তক উদ্ধার করিয়াছিলেন, সাহেবদিগের অধ্যবসায় এবং যত্নরূপ আঞ্জনেয়ও সেই প্রকার বিশ্বাস্তি সাগরস্থ অনিশ্চিততা রূপ অনলম্পর্শ মিলিলে নিমজ্জিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে কখন বা মৃত্তিকা প্রোথিত যুগ্মশরীরাক্ত চতুরক্ষর দ্বারা এবং কখন বা ই-

তন্তুতোবিকিণ্ড কাল নিষ্পিষ্ট মন্ডন ইষ্টক খণ্ড দ্বারা উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প। ধন্য ইহঁদের যত্ন! ধন্য ইহঁদের পরিশ্রম! এবং ধন্য ইহঁদিগের অধ্যবসায়! আমরা শয়ন করিয়া থাকি, পরিহাসে আর গল্পে সময় অতিপাত করি এবং বৈঠকখানায় বসিয়া কখন বা হা, হা, হী, হী, রবে পৃথিবীকে তৃণবৎ উড়াইয়া দেই, তথাপি একবার চক্ষুকম্বলন করিয়া দেখ না যে, আমাদের দ্বারের দুই পার্শ্বে কি ছড়ান রহিয়াছে এবং এই সকল ছড়ান পদার্থ-চূর্ণ দ্বারাই বা কি বিষয় কতদূর আকৃতিতে আনা যাইতে পারে। আর ইহঁরা ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্ন-শোণিত-শুক্ল-জাত হইয়াও কেবল শুদ্ধ কৌতুহল নিরন্তর জন্য আমাদের পতিত গৃহের ভগ্ন ইট, পাটকল এবং মৃত শরীরের অস্থি পঞ্জর ঘাটিয়া আমাদের পরিচয় নিতে এবং আমাদের পরম্পরের সহিত পরম্পরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আমরা পাশাপাশি থাকিয়াও আপন যত্নে কেহ কাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছি না।

পাঠকবর্গের সমীপে উপরোল্লিখিত কতিপয় পংক্তিতে আগ্রা নামের উৎপত্তি এবং তাহার ব্যুৎপত্তি হইতে যে যে অনুমান তদুৎপত্তি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে ও ইহার বক্ষে হিন্দুদিগের যে যে চিহ্নরেখা, ইহার প্রাচীন পরিচয়ের জ্ঞান আজি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক

প্রকার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া, এ পর্য্যন্ত আর কিছু জানা হয় নাই। কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদিতে সংশ্লিষ্ট পাদন করিবার এত বিষয় আছে যে, তাহা অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করিলে অনেক নূতন কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে । আজি একটি সামান্য লোক, ইকীসম্ খনন করিয়া তাহার গভীর মৃৎকুক্ষি হইতে চূর্ণীকৃত ডায়না দেবীর মন্দিরের সম্পূর্ণ অবয়ব চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছে । ভারতে কি সেরূপ অর্থ নাই যে, ইহার বক্ষে কোন কোন বিলুপ্ত স্থানের বিলুপ্ত কীর্ত্তি সকল সেই রূপে চিত্রিত হইতে পারে ? আছে । অনেক তমসাক্ষ গর্ত্ত সকলের মধ্যে আজিও রজত কাঞ্চন স্তূপীকৃত হইয়া আছে । কিন্তু তাহার ধারে কাছে একটিও মনুষ্য নাই ।

হিন্দুদিগের পরে মুসলমানদিগের কাল । মুসলমানদিগের কীর্ত্তি ইহার বক্ষের প্রায় সর্বত্রই পুঞ্জ পুঞ্জ বিক্ষিপ্ত আছে । ইহাতে ইহাকে মুসলমানদিগের স্থাপিত নগর বলাই সম্ভব । লোকেরাও এক প্রকার তাহাই বলিয়া থাকে । সর্বপ্রথমে লোদীবংশীয়েরা এখানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন । সেকেন্দর বিন্ বহল লোদী খৃষ্টীয় ১৫১৫ সনে আগ্রাতে দেহত্যাগ করেন । ইহার সমাধি কোথায় দেওয়া হয়, তাহার কিছু নিশ্চিত নাই । ইনি এই সহরের অভ্যন্তরে বাদল গড় নামক কোন একটি প্রাচীন হিন্দুদুর্গকে সং-

স্কার করিয়া এখানে বাস করেন । এই বাদলগড় নামক হিন্দু দুর্গ কোন্ স্থানে ছিল, এখন মৃত্তিকার উপরিভাগ দেখিয়া তাহা জানিবার কোন সুযোগ নাই । সহরের মধ্যে “লোদী খাঁকা টিলা” নামক যে একটা উচ্চ স্থান আছে, কোন কোন লোকে তাহাকেই বাদলগড়ের ভূমি বলিয়া বলে । কেহ বা আকবর নির্মিত বর্ত্তমান দুর্গকে বাদলগড়ের প্রাচীন ভিত্তি-ভূমির উপরে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বলে । গোয়ালিয়র দুর্গের নিম্ন প্রাচীরকে সেখানে বাদলগড় বলিয়া থাকে । তাহা ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা কলাণমলের জাতি বাদল সিংহ দ্বারা রচিত হয় । কনিংহাম সাহেব সেই স্মৃতি আশ্রয় কাল-বিলুপ্ত বাদল গড়কেও তাহারই রচিত বলিয়া অনুমান করেন । উপরোক্ত “লোদী খাঁকা টিলা” বাতীত সহরের পশ্চিমে পাঁচ মাইল অন্তরে সেকেন্দরা নামক স্থানে সেকেন্দর লোদীর প্রাসাদ বাটীর অল্প কিছু ভগ্নাংশ পতিত আছে । ইহা বাতীত লোদী বংশীয়দের আর কোন চিহ্ন এখানে নাই । লোদী খাঁর টিলার বিষয়ে একটুকু সন্দেহ আছে । খাঁ খানন্ লোদী নামে বাবর এবং হুমায়ূনের একজন প্রসিদ্ধ সৈন্যধাক ছিলেন । এবং খাঁ জাহান লোদী নামে জাহাঙ্গিরেরও এক জন সেনাপতি ছিলেন । এক্ষণ লোদী খাঁয়ের টিলা যে কোন্ লোদীর আবাস বাটী ছিল, তাহা বলা সহজ ব্যাপার নয় । সেকেন্দর লো-

দৌর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদীও এখানে বাস করেন।

খৃষ্টিয় ১৫২৬ সনের মে মাসে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজয় করিয়া আগ্রা এবং দিল্লী করত্ব করেন। তাঁহার প্রাসাদবাটী ও উজানাদির ভগ্নাবশেষ অন্য অস্ত্র গৃহাদির ইফক চূর্ণ সংহতি সহ বর্তমান নগরের ঠিক বিপরীত দিকে যমুনার পূর্ব-তটে রেলওয়ে স্টেশন ও ইংমার্কটোলার সমাধি মসজিদ হইতে নুনিহাই নামক গ্রাম পর্যন্ত স্তূপে স্তূপে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। নুনিহাই গ্রামকে এখনও রেলের গাড়ীর উপর হইতে যেকালে দেখা যায়, যেন একখানি ছোট খাট নগর বলিয়া ভ্রম হয়। উহার মধ্যে এখনও অনেক সমৃদ্ধিশালী লোক বাস করে। বাবরের সময়ে যে, ঐ স্থানেই আগ্রাছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ১৩৭ হিজরী সনে বাবরের দেহ পতন হইলে পর, তাঁহার পুত্র হুমায়ুন প্রথমে এখানে আদিবাস করেন। যে সনে বাবরের মৃত্যু হয়, হুমায়ুন সেই সনেই একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। তাহার ভগ্নাংশ আজিও তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার পায় পায়ে কাচপুরা নামক গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের গায়ে হুমায়ুনের নাম ও যে সনে তাহা নির্মিত হইয়াছে সমুদয় লেখা আছে। গ্রাম্য লোকেরা তাহার উৎসর্গে কুর্চীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে এবং ক-

পোত শুক প্রভৃতি পক্ষী সকল তাহার চূর্ণীকৃত মস্তকের কোটরে থাকিয়া পার্শ্ববর্তি শস্য ক্ষেত্র অপহরণে জীবন যাপন করিতেছে। এই মসজিদেরই কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে যমুনাট পর্যন্ত ব্যাপ্ত ভূমি খণ্ডকে “মাহ-তাব খাঁকা বাগ” বলে। এখানে এক্ষণ কিছুই নাই। কেবল একদিকে একটি ভগ্ন বুরুজ কিঞ্চিৎ ইফক চূর্ণ লইয়া পতিত রহিয়াছে। এই স্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর ছোট প্রবাদ আছে। মাহতাব খাঁ কোন এক আমিরের পুত্র ছিলেন। তিনি তাজমহলের স্থায় আর একটি বাড়ী এখানে প্রস্তুত করিবেন বলিয়া উদ্যোগ করেন, এবং ভূমিকে প্রাচীর-বন্ধ করিয়া লন। সাজিহান তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন যে, যদি তুমি এখানে কোন গৃহ প্রস্তুত কর আর সেই গৃহ দেখিতে তাজমহল অপেক্ষা কোন অংশে কুৎসিত হয়, তাহা হইলে এতসুন্দর এই তাজ গৃহের কাছে, ওরূপ একটি কদাকার পদার্থ সর্বদা থাকিলে তাজের শোভার অনেক ব্যাঘাত হইবে। আর যদি তোমার গৃহ তাজগৃহ হইতে সৌন্দর্য্যে উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার তাজের শোভা সমস্ত প্রাসিত ও বিলুপ্ত হইবে। মাহতাব খাঁ ইহা শুনিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত হন। সাজিহান তৎপর এইস্থানে আপনার সমাধির জন্য তাজ মহালের অবিকল উপর একটি উদ্যান ও বাটী প্রস্তুত করিতে মনন করেন এবং তাহা যমুনার উপর দিয়া ম-

ধর প্রান্তরের সেতু দ্বারা, তাজ গৃহের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার দুর্বৃত্ত পুত্র অরজজীব দ্বারা তিনি অকালে কারাকন্ড হওয়াতে সে ইচ্ছা তাঁহার অন্তরেই লীন হইয়া যায়। এই মাহ-তাব্ খাঁর বাগ এবং পূর্বোক্ত হমায়ুনের মসজিদে পশ্চিমে যমুনা তট দিয়া বহুদূর ব্যাপিয়া বাবর ও হমায়ুনের প্রাসাদ বাটী ও উদ্যানাদি রচিত ছিল। এক্ষণ তাহার কিছুই নাই। কেবল এখানে সেখানে মৃত্তিকা-স্তূপ ও ইষ্টক খণ্ড সকল ছড়ান রহিয়াছে। বাবর কি হমায়ুন কাহারই সমাধি এখানে নাই।

মুসলমান বংশের কুবলয় স্বরূপ আকবর ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা এবং দিল্লী অধিকার করেন। অধিকারের পরক্ষণেই তিনি আগ্রাতে আসিয়া বাস করেন নাই। আগ্রা হইতে পশ্চিম দক্ষিণে প্রায় ২৪ মাইল ব্যবধানে ফকর সলিম-চিস্তির দিরাগা ফতেহ পুর সিকরীতে কিছু দূর বাস করেন। সেখানে সত্ৰাটের বাসোপযোগী প্রাসাদ বাটী, উদ্যান ও অন্যান্য বহুবিধ অট্টালিকা আজিও দর্শকদিগের নয়ন বিনোদনের জন্য প্রস্তুত আছে। এইস্থানে কিছুকাল বাস করিয়া সেখানে তাঁহার পুত্র সলিমের (জাহাঙ্গিরের) জন্ম হইলে

পর প্রায় ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রাতে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। প্রবাদ আছে যে, যখন তিনি আগ্রাতে আসেন তখন কিছুকালের জন্য আগ্রার বর্তমান দুর্গ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে ইদগাহ নামক রুহৎ সমজিদ হইতে সোয়া মাইল ব্যবধানে এবং বর্তমান মাজিষ্ট্রেট অফিস হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে মুলতানপুর ও খোয়াসপুর নামক গ্রাম দ্বয়ে শিবির সম্মিলিত করিয়া থাকেন, এবং দুর্গ তাঁহার অধিবাসের উপযুক্তরূপে সজ্জিত হইলে তাহাতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনা হইতেই পূর্বোক্ত গ্রাম দ্বয় মুলতানপুর ও খোয়াসপুর নাম প্রাপ্ত হয়। মুলতানপুর অর্থে মুলতান অর্থাৎ রাজার আপন নগরকে বুঝায় আর খোয়াসপুর অর্থে খোয়াস্ অর্থাৎ চাকরদিগের অধিষ্ঠিত স্থানকে বুঝায়। খৃঃ ১৫৭১ অব্দে আগ্রার বর্তমান দুর্গ নির্মিত হয়। এই সময় হইতেই আগ্রা আকবরবাদ রূপে অপূর্ণ এক নূতন নাম ধারণ করে। কিন্তু এই নামে বোধ হয় ইহাকে এক উত্তর পাশ্চাত্যলয় লোক ভিন্ন অপরে তত চিনিতে পারে না। আগ্রাই ইহার সর্বত্র প্রসিদ্ধ নাম।

ক্রমশঃ

(প্রবাসী ।)

বাণীস্তোত্র।

গীতি।

জয় বিদ্যা জগত জননি,
জীবমুক্তি-প্রদায়িনি,
কলুষনাশিনি রমে
জয়দে বরদে বাণি ও।

সুখ মোক্ষ তব পদে
ককণাময়ি হে শুভদে
ভকতবৎসলা বালা,
মুঢ়ে জ্ঞানদায়িনি ও ॥

২

বেদমাতা বিশ্বরমে,
কবীশ-মনীষ-প্রিয়তমে,
আগমে নিগমে ব্যক্ত,
মহিমা তোমারি ;

অনন্ত উৎসব রঙ্গে
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে
পূজিছে সদা চরণ কমলে
কম্পনা-কামিনী ও ॥

৩

মধুর মলয়ানিলে,
গায় ভ্রমর কোকিলে,
বসন্তে তোমার গুণ,
বসন্তবাসিনি ;

আহা কিবা সুখসঙ্গ,
নাহি তাল স্বর ভঙ্গ,
হাসিছে কুশুম, নাচিছে তারা,
খেলিছে তরঙ্গিনী ও ॥

৪

সুরাসুর মায়ের বশ,
অক্ষয় মায়ের বশঃ,
ভুবনপূজিত নাম,
পাপ-দুঃখ-হারি ;

অপরূপ দেখে চাহিয়ে,
বসেছে আনন্দে মায়েরে লইয়ে
সারস্বত সুর যত,
মধ্যে বীণাপাণি ও ॥

৫

কত যত্ন কত শ্রমে,
শুভ দিনে স্বর্ণভূমে,
পূজিত তোমারে রমে,
নগরে নগরে ;

অযোধ্যা অবন্তী পুরী,
মথুরার সে মাধুরী,
হারিয়ে কপালদোষে,
ভারত দুঃখিনী ও ॥

৬

বাংলায় গৌতম বাস,
ভবভূতি কালিদাস,
শঙ্কর, ভাস্কর শূণ্ড
ভারত-ঋশানে ;
দেহ বর হে বরদে
তোমার পদপ্রসাদে
ভারত পাইবে প্রাণ
মৃতসঞ্জীবনি ও ॥

৭

ছিলে যুগ যুগ ভরি,
ভারতে পবিত্র করি,
ভারতে প্রসন্ন সদা,
হ্যাদে গো ভারতি ;
এ গভীর অন্ধকারে,
কৃপা কটাক বিতরে,
পতিত ভারতে উদ্ধারহ,
পতিতপাবনি ও ॥

(পথিক)

জীবন প্রভাত ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কণ্ঠমালা ।

“ মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন । ”

ভারতচন্দ্র রায় ।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরস্ব-
বালা পিতার আদেশে অভিধির খান্দোর
আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন
গ্রহণ করিলেন, সরস্ব পশ্চাতে দণ্ডায়মান
রহিলেন । মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আ-
হুত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক
জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার
রীতি আছে ।

রঘুনাথ বসিলেন, কিন্তু ভোজন দূরে
থাক, চিত্ত সংযম করিতে পারিলেন না ।
খেতপ্রস্তর-বিবিক্তিত আধারে সরস্ব দৃষ্ট

সরস্ব আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধা-
রিণীর দিকে সোহাগচিত্তে চাহিলেন, যেন
তাঁহার জীবন, প্রাণ, মৃষ্টির সহিত মিলিত
হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল ।
চারি চক্ষু মিলন হইল, অমনি সরস্ব মুখ-
মণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লজ্জাবতী
চক্ষু মুদিত করিয়া, মুখ অবনত করিয়া,
ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন । রঘুনাথও
যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হ-
ইলেন ।

পুনরায় সরস্ব আর একটি পাত্র আ-
নিলেন, রঘুনাথ বর্কর নছেন, এবার তিনি
মুখ অবনত করিয়া রাখিলেন, কেবল সর-
স্বর স্নান প্রবর্ণ বলয়বিজড়িত হস্ত ও ক-
ঙ্কণবিজড়িত শৃঙ্গোল বাহুমাঞ্জ দেখিতে
পাইলেন ; অগত্যা হৃদয় স্ফীত হইল, এ-

কটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। সরযু তাহা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হস্ত জমৎ কাঁপিতে লাগিল, তিনি দীয়ে দীয়ে পাঁখে সরিয়া গেলেন।

ভোজন সাজ হইল। রঘুনাথের শয্যা-রচনা হইল, রঘুনাথ দীপ নিৰ্ব্বাণ করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার দীয়ে দীয়ে উদ্ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অপরিস্রব যোচ্চা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ মগ্ন হইয়াছে, দূর্গে লক্ষ্যমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দূর্গে ও চতুর্দিকস্থ পর্বতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই হৃদয়ের প্রথম ভীষণ উদ্বেগ, এ চিন্তা এ উদ্বেগ রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, চিরজীবনে কি শেষ হইবে? এত দিন রঘুনাথ বাৎসর্য্য ছিলেন, অজ্ঞ যেমন সহসা তাঁহার শাস্ত্র, নীল, জীবনাকাশের উপর দিয়া বিদ্যারূপিণী একটি প্রতিমূর্তি সরিয়া গেল, রঘুনাথের নয়ন, হৃদয় আলসিয়া গেল, তাঁহার মগ্ন চিন্তা, উদ্বেগ, ও

সহস্র বেগবতী মনোহরিত সহসা জাগরিত হইল। শত সহস্র বার সেই আনন্দময়ী মূর্তি মনে আসিতে লাগিল, সেই আলো-লিখিত জয়মূল, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জল চক্ষু, সেই পুষ্পনিদ্দি মধুময় ওষ্ঠ ইতি, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুরগোল বাহুগুল মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আর রঘুনাথ উন্মত্ত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইল, শরীর অবসন্ন হইল, কিন্তু হৃদয়ের তৃষা নিবারণ হইল না; পুনঃ পুনঃ নব নব সৌন্দর্য্য মানস-চক্ষুতে উদয় হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অগ্নিদিকে পতঙ্গবৎ সেই সৌন্দর্য্যদিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই আনন্দময়ী কহা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন? এই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, এই জবানিদ্দি ওষ্ঠ, এই চিত্তহারি অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ! কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্ত হাবিলদার মাত্র, জনার্দন অতি উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত্র, তাঁহার রূপবতী কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়! কিজন্য এরূপ আশায় হৃদয় রথা বাধিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ রথা তুমি কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীরের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন করিলেন। ললাটের শিরা স্ফীত হইতে লাগিল। ভাবিলেন “হায়! আমি অকিঞ্চিৎকর বন্ধুহীন সামান্য মৈনিক মাত্র। আমার বংশধর্যাদা বিলুপ্ত, আমার নাম

নাই, গৌরব নাই, আমি সরসুর অযোগ্য ! কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি এই কুসুমটিকে হৃদয়ে ধারণ করিবে, আমি ইহার স্মৃতিমাত্র যাবজ্জীবন বহন করিব ; দেশে, বিদেশে, যুদ্ধে, শত্রুশিবিরে, জীবনে, মরণে, বহন করিব । হা বিধাতঃ ! কেন আমি সরসুর অযোগ্য হইলাম,—বা অযোগ্য হইয়া কেন এ কুসুমটি দর্শন করিলাম ? ” তবে কি এ আশা ত্যাগ করিবেন ? সে যুক্তি হৃদয় হইতে তিরোহিত করিবেন ? সে যে জীবনের অংশ স্বরূপ হইয়াছে ; রঘুনাথ দেখিলেন স্বহস্তে হৃদয় উৎপাটন করা সম্ভব, সে যুক্তি অপনয়ন করা হুঃসাধ্য । রঘুনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিলেন ।

আবার চিন্তা করিলেন “ সেই স্বর্গীয় অঙ্গরাজ্য কি মুহূর্ত্ত জন্যও আমার জন্য চিন্তা করিয়াছেন ? ইহার জন্য আমার হৃদয় কিণ্ড ও উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের এক কণায়ও কি আমি স্থান পাইয়াছি ? ইহার জন্য আমার মন ও জীবন ব্যাকুল হইয়াছে, তাঁহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও কি এ অকিঞ্চিৎকর সৈনিকের জন্য ধাবমান হয় ? ইহাকে একবার দেখিবার জন্য আমি জীবন দিতে উদ্যত, তিনি কি মুহূর্ত্তের জন্যও আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি করিয়াছেন ? আমি না কিন্তু সরসু ! সরসু ! আমার হৃদয় জানিলে তুমি আমার উপর বোধ হয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও সদয় দৃষ্টি

প্রদান করিতে, অভাগা তাহার অধিক চাহেনা । ” আবার অন্ধকার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন ।

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনাথের এ বিষয় চিন্তা শেষ হইল না । হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া একাকী নিঃশব্দে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন । এই শান্ত রজনীতে তাঁহার হৃদয়ে কি প্রাণের ঝটিকা বহিতেছে !

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয় । রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া সগর্বে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন “ ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য হইব, যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য, কি জন্য আমার অসাধ্য হইবে ? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা কীণ ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্বল ? যুদ্ধে কি আমি অন্য অপেক্ষা ভীক ? * * “ দেখিব এই পণ রাখিতে পারি কি না । ” * * “ তাহার পর ? যদি কৃতকার্য হই তাহা হইলে সরসু । আমি তোমার অযোগ্য হইব না ; তখন সরসু ! তোমাকে গণ্ধাদলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তধর ধারণ করিয়া স্বর্গ-

মুখ তুচ্ছ করিব, তখন অহস্তে ঐ স্তম্ভর
কেশ পাশে মুক্তামালা জড়াইয়া দিব, আর
ঐ স্তম্ভর বিশ্ববিন্দি ওষ্ঠস্থল—” র-
ঘুনাথ ! রঘুনাথ ! উন্নত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে
শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের ভিতর
না যাইয়া সেই ছাদের যেখানে পূর্বদিন
সরযু বসিয়াছিলেন সেইস্থানে শয়ন ক-
রিতে আসিলেন। দেখিলেন—কি দে-
খিলেন ? দেখিলেন একটি কণ্ঠমালা প-
ড়িয়া রহিয়াছে ; দুইটি করিয়া মুক্তা, পরে
একটি করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা
চিনিলেন। সেই মালা পূর্বদিন সন্ধ্যা-
কালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ ক-
রিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতঃ বশত
ঐস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ আ-
কাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ভগবন্
একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্বলক্ষণ
দান করিলেন ?” শত সহস্রবার সেই মালা
চুসন করিয়া পরে পরিধেয় কুর্তীর নীচে
বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরে
সেই স্থানেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।
কিন্তু সে নিদ্রা অগ্নিপূর্ণ, অগ্নি সরযু-পূর্ণ।

পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ
হইল। জনার্দন দেবের নিকট ভবানীর
আজ্ঞা জানিলেন ; “স্নেহদিগের সহিত
যুদ্ধে জয়, অধর্মদিগের সহিত যুদ্ধে পরা-
জয়।” পরে কল্যাদারের নিকট কতক-
গুলি লিপি ও যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ লইয়া
রঘুনাথ যাত্রা করিলেন।

দুর্গ ভাণ্ডার পূর্বে একবার সরযুর
সহিত দেখা করিলেন ; সরযু যখন মন্দিরে
আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিও তথায়
যাইলেন। হৃদয়ের তুমুল উদ্বেগ কথঞ্চিৎ
দমন করিয়া দ্বিৎ কল্পিতস্বরে বলিলেন—

“ভদ্রে ! কল্য নিশিযোগে ছাদে এই
কণ্ঠমালাটি পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসি-
য়াছি ; অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জনা
করুন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফি-
রিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই কমলীয়া
উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশায়ত উন্নত ল-
লাট ও উজ্জ্বল ক্রম নয়নদ্বয়, সেই তরুণ
যোদ্ধার উন্নত অবয়ব ! সহসা রমণীর শ-
রীর কম্পিত হইল, গৌর মুখমণ্ডল পুন-
রায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ! সরযু উত্তর
দিতে অশক্তু !

সরযুকে নির্বাক দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে
ধীরে বলিলেন “যদি অনুমতি করেন তবে
এই স্তম্ভর মালাটি উছার অভ্যন্ত স্থানে
স্থাপন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি।”

সরযু সলজ্জনমনে একবার রঘুনাথের
দিকে চাহিলেন, উ। সে বিশাল আয়ত
নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় সহস্রধা
বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায়
আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

মৌনই সম্মতির লক্ষণ জানিয়া রঘু-
নাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া
দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করি-
লেন না।

কন্যার শরীর একেবারে রোমাঞ্চিত হইল, ও বায়ুত্যাগিত পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; ধন্যবাদ দিবেন কি তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠ হইতে বাহু-ক্ষুণ্ণি হইল না ।

রঘুনাথ সরযুর এই উদ্যম দেখিয়াই আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন । ক্রণেক পর ঈষৎ খেদযুক্ত স্বরে বলিলেন—“তবে অতিথিকে বিদায় দিন ।”

সরযু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন ; আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, “আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় কি এ দুর্গে আগমন হইবে ?”

উ ! পিপাসার্ত চাতকের পক্ষে প্রথম রক্ষিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে উবার প্রথম রক্তিমচ্ছটার ন্যায়, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল ! তিনি উত্তর করিলেন—

“রমণীরত্ন ! আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসায়, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না তা জানি না ; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, যতদিন এই হৃদয় শুষ্ক না হইবে, ততদিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন, আপনার দেবশিষ্যিত মুক্তি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না । আপনার পিতা এই পথে

আসিতেছেন, আমি বিদায় হইলাম, কখন কখন মিরাজের দরিত্র সৈনিককে স্মরণ করিবেন ।”

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটি ছল ছল করিতেছে ; তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না ।

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও অশ্বে আরুঢ় হইয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

রঘুনাথের অধীনের অস্থারোহিণ পূর্ব দিন রঘুনাথের অঙ্গ পরে আসিয়া ছিল, স্তবরাং প্রাচীরের বাহিরে তাহারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল । তাহার পুনরায় আপনাদিগের অসমসাহসী ও দুর্দম ত্রেজস্বী হাবিলদারকে পাইয়া হৃৎকান্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সরল বালককে আর পাইল না । তোরণ দুর্গাগমনের দিন হইতে রঘুনাথজীর বালোচিত চপলতা দূর হইল, মনুষ্যের চিন্তা ও প্রতিজ্ঞায় জীবন আচ্ছন্ন হইল ।

সেই দিবসেই রঘুনাথজী হাবিলদার সিংহগড় উপস্থিত হইয়া শিবজীকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

শায়েষ্টা খাঁ ।

“ কেন চিন্তাকুল আজিনবাবের মন ?”

নবীনচন্দ্র সেন ।

যদিও কএক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা ও রাজ্য ও দুর্গসংখ্যা দিন দিন

রুদ্ধ পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে পূর্বে দিল্লীর সম্রাট তাহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর শায়েস্তাখাঁ আমীর উল ওমরা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শাসনকর্তা নিয়োজিত হইলেন, ও শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা ও চাকন দুর্গ ও অন্য কএক স্থান অধিকার করেন, ও পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিরত সময়ে শিবজীকে একেবারে স্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্ত সিংহ ও এই বৎসরে (১৬৬৩ খ্রীঃ) বহু সৈন্য লইয়া শায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। শায়েস্তাখাঁ শিবজীর চতুরতা বিশেষরূপে জানিতেন সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাজার পুনাগারে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শিবজী নিকটবর্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাজার পুনাগারে সে সময়ে যুদ্ধব্যবসারে অধিক পরিণত হয় নাই, দিল্লীর

পুরাতন সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে; সুতরাং শিবজী চতুরতা ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষযোগে একদিন সাংকালে মোগলসেনাপতি শায়েস্তাখাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন, ও কিরূপে শিবজীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে; ও জানালার ভিতর দিয়া সাংকালের শীতলবায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, আমির উল ওমরা স্বয়ং ঈষদ্ভাষ্য করিয়া বলিলেন—

“তাহাকে পাইলে জয় করিতে কত কণ? ” আনুওরী নামে একজন চাটুকার বলিল “আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাজার সেনা যেন মহাবাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করিবে। ”

সেনাপতি তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কএক বৎসর অবধি মহারাজারদিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীক্রে ধীরে উত্তর করিলেন “আমি বোধ করি তাহাদের উক্ত দুইটি ক্ষমতাই আছে। ”

শায়ের্তা খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন?”

চাঁদখাঁ নিবেদন করিলেন “গত বৎসর কতিপয় পার্শ্ববর্তী মহারাজ্যীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা জঁহা-পনার স্মরণ আছে; একটি দুর্গ হস্তগত করিতে সহস্র মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও অরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া ঘাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে।

সভাসদ সকলে নিশ্চয় হইয়া রহিল, শায়ের্তা খাঁ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—

“চাঁদখাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন। পূর্ব্বের উহার একরূপ ভয় ছিল না।” চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিকটর রহিলেন।

আনওয়ারী সময় বুঝিয়া বলিল “জঁহা-পনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাজ্যীয়েরা ইন্দুর বিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না।”

শায়ের্তা খাঁ একটি বড় স্পন্দর রহস্য বিবেচনা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, স্মরণে সভাসদ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল।

চাঁদখাঁ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—“ইন্দুরে পুনর ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা।” শায়ের্তা খাঁ এ বিষয়ে উদ্বেগশূন্য ছিলেন না; কিন্তু ভয়চিহ্ন সম্বরণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—“এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখাস্থ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবেন না।”

সভাসদ সকলেই “কেরামৎ” “কে-রামৎ” করিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাজ্যীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি শায়ের্তা খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন “এই প্রদেশ দুর্গ পরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীখয়ের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কখনও সিদ্ধি হইবে কি না তাহার স্থিরতা নাই।” চাঁদখাঁ কার্য্যজ্ঞ ছিলেন এই ক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়াছেন সে কথা বিস্মৃত হইয়া সংপরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলেন। “জঁহা-পনা! দুর্গই মহারাজ্যীয়দিগের বল, উহার সন্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই, কেননা দেশ পার্শ্বতম, উহাদের সেনা

এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন দিক দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে; আমরা তাহার উদ্দেশ্য পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাজীরদিগের অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।”

শায়েস্তাখাঁ চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া অবধি আর দুর্গ জয় করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিলেন ‘কেন? মহারাজীরেরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাৎকাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী নাই, পশ্চাৎকাবন করিয়া সমস্ত মহারাজীসেনা হংস করিতে পারিবে না?’

চাঁদখাঁ পুনরায় নিবেদন করিলেন—‘যুদ্ধ হইলে অবশ্যই যোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাজীরসেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পূর্বতপ্রদেশে মহারাজীর অশ্বারোহীকে পশ্চাৎকাবন করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ অশ্বারোহী বর্ষাক্ত ও বহু-অঙ্গ-সমধিত; সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ, তাহাদের ভার দুর্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত; কিন্তু এই পূর্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাধি জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাজীর অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ যেন ছাগের ন্যায় তুলশ্বৈলক্ষ দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও পুরা-

খের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জঁহাপানা! আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন মহাশয় সেই স্থান অবরোধ করুন; এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীখরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাজীরদিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদের পশ্চাৎকাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া বাইয়া আহমদনগর ও আরঙ্গাবাদ ছাড়িবার করিয়া আসিল, কতম জমান তাহার পশ্চাৎকাবন করিয়া কি করিল?’

শায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন—‘কতম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া মাতাজীকে পলাইতে দিয়াছে; আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিকল্পে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীখরের সেনাগণের মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই?’

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া এক বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন; পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—‘পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই; সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেদূর হকুম হইবে, কামীল করিতে এ দাস পরাধীন হইবে না।’

চাঁদখাঁর উৎকর্ষ পরামর্শ অনুসারে

কার্য করেন, শারেন্তার্থীর এরূপ সাহস ছিল না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাজী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শারেন্তার্থী তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আসিবার আজ্ঞা দিলেন। সভার সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

কণেক পরই মহাদেওজী ন্যায়শাজী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাজীর বয়স একগু চত্বাঃিংশৎ বৎসর হয় নাই; অবয়ব মহারাজীরদিগের ন্যায় দৈবৎ ধর্ম ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীরবুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, অঙ্কে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর পুরু তুলার কুর্টিতে আবৃত, পুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উকীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। শারেন্তার্থী সামরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

শারেন্তার্থী জিজ্ঞাসা করিলেন ‘সিংহগড়ের সংবাদ কি?’

মহাদেওজী একটি সংকুত শ্লোক পড়িলেন—

‘সস্তি নমোদ্যদকেহু কৃষা পঞ্চবটীধনে।

সরসুবিচ্ছেদশোকং রাঘবন্ত কথং সবেৎ ॥’

পরে তাহার অর্থ করিলেন ‘দওকা-রণো ও পঞ্চবটী বনে শত শত নদী আছে কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরসু নদীর বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ একগু শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সম্ভাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?’

শারেন্তার্থী পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন— ‘হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, একগু তাঁহার যুদ্ধ করা বিকল, দিল্লীধরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং একগু আশা আছে।’

ব্রাহ্মণ দৈবদ্ব্যাস্য করিয়া পুনরায় সংকুত পাঠ করিলেন—

‘ন শক্তোহি আভিলাষং জাপরিতুষ্ঠাতকঃ।
জাভাতু তং বারিধরন্তোবরতি যাচকং ॥’

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ আপনার দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়া পূর্ণ করে। মহাজনের বাচককে দিবার এই রীতি। প্রভু শিবজী একগু পুনা ও চাকন হারাইয়া নান্নি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু তবাপুশ মহামোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অমুগ্রহ করিয়া বাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য।’

শারেন্তার্থী লানন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন ‘পণ্ডিতজী তো-
তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরি-

তুচ্ছ হইলাম বলিতে পারি না; তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি সুষম্বুর ও ভাবপরিপূর্ণ। বর্ধার্বই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন ?

মহাদেও। ‘খাঁ সাহেব! সম্মুখ-রুদ্ধে দিল্লীখরের সৈন্যের দোৰ্দ্ধণপ্রতাপে বিপর্যাস্ত ও বাতিবাস্ত হইয়া আমরা কেবল সন্ধি সন্ধি এই শব্দ করিতেছি।’

শায়েস্তাখাঁ এবার আত্মলাদ আর সন্মরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, ‘চাঁদ খাঁ! সম্মুখ রুদ্ধ ভাল না দুর্গ অবরোধ ভাল,কিসে দ্বারা শত্রু অধিক ভীত হইয়াছে?’ পরে আমন্দ কথঞ্চিৎ সন্মরণ করিয়া শায়েস্তাখাঁ বলিলেন,—

‘ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রাশোচনার সন্দেহ হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার নিদর্শন কৈ?’

ব্রাহ্মণ তখন গভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শন পত্র বাহির করিলেন। অনেককণ পর্যন্ত শায়েস্তাখাঁ সেইটি দেখিলেন। পরে বলিলেন—‘হাঁ আমি নিদর্শন পত্র দেখিয়া সন্দেহ হইরাছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে ককম।’

মহাদেওজী। ‘প্রভুর এইরূপ আজ্ঞায় বধন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর রুদ্ধ করা কৃপা।’

শায়েস্তাখাঁ। ‘ভাল।’

মহা। ‘মৃতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইরাছেন।’

শায়ে। ‘ভাল।’

মহা। ‘এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীখর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক,জানিলে সেই গুলি পালন করিতে যত্ববান হইবেন।’

শায়ে। ‘প্রথম, দিল্লীখরের অধীনতা স্বীকার করণ। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?’

মহা। ‘তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই; মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেই গুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।’

শায়ে। ‘ভাল। প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীখরের অধীনতা স্বীকার করণ। দ্বিতীয়, দিল্লীখরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীখরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কএকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।’

মহা। ‘সে কোন্ কোন্টি।’

শায়ে। ‘তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীখরের অধীনে জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট কি

অসম্মত তাহা যেন আমি দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি ।’

মহা । ‘যে রূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব । এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয়, ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে ?’

শায়ে । ‘কদাচ নহে । ধূর্ত কপটচাঙ্গী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না । এমত ধূর্ততা নাই যে তাহাদের অসাধ্য । যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার আমাদের অনিষ্ট করিও ।’

‘এবমন্ত’ বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন ; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু-কণা বহির্গত হইতেছিল ।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক দ্বার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন । একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘দূত মহাশয় কি দেখিতেছেন ?’ দূত উত্তর করিলেন ‘এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি ; এটিও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত হুর্গগুলিই তোমরা লইবে ; হা ! ভগবন !’ প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল ‘সে জন্য আর রূথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্যে যাও ।’ ‘সে

কথা সত্য’ বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ।

ব্রাহ্মণ শীত্ৰই বহুজনাকীর্ণ পুনা নগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন ।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

শুভকার্য্যের দিনস্থির ।

“নিশি বিপ্রহরে
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজজ্যোতিগণ ।”

নবীনচন্দ্র সেন ।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন ; যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন । দুই একটি দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নিৰ্কাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার বন্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে শ্রুণ্ড ।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময় কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে শ্রুণ্ড, জগৎ নিস্তব্ধ । ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন । দ্বির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,—কৈ সে পদশব্দ আর শুনা যায় না ।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? সে শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? উদ্বেগ পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; পরে নিঃশব্দে ভূলা-নির্ধিত কুষ্টির আল্পনের ভিতর হইতে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন; গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে শুষ্ট, নগর শব্দ-শূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারের ফিরিয়া গেলেন; তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় অনেক লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অজ্ঞাত গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন! নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস কষ্ট করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অটালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগতকে আবৃত করিয়াছে! অনেকক্ষণ পর একটি চীৎকারশব্দ শ্রুত হইল; ব্রাহ্মণের হৃদয়

কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাছারা দিতেছে। দূর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেও পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে সেই স্থানে আসিল; এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেইস্থানে আসিল; মহাদেও যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে চাহিল। উঃ মহাদেবের হৃদয় দুঃ দুঃ করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস কষ্ট করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের শ্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্তী একটি দ্বারে আঘাত করিলেন; শায়েস্তাখাঁর এক জন মহারাজীর সৈনিক বাহির হইয়া আসিল; দুই জনে অতি সজ্ঞাপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন ‘সমস্ত প্রস্তুত?’
সৈনিক। ‘প্রস্তুত।’

ব্রাহ্মণ। ‘অনুমতি পাইয়াছ ?’

সৈনিক। ‘পাইয়াছি।’

আবার অম্পর্ক পদশব্দ প্রচুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তমনস হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন; অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরে সৈনিককে বলিলেন ‘রক্তহস্তে আসিয়াছ ?’

সৈনিক বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিল ‘ভাল। সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে ?’

সৈনিক। ‘কল্য।’

ব্রাহ্মণ। ‘অনুমতি পাইয়াছ ?’

সৈনিক। ‘হাঁ’ একটি কাগজ দেখাইল।

ব্রাহ্মণ। ‘কত জন লোকের ?’

সৈনিক। ‘বাদ্যকর দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।’

ব্রাহ্মণ। ‘এই যথেষ্ট, কোন সময়ে ?’

সৈনিক। ‘রজনী এক প্রহর।’

ব্রাহ্মণ। ‘ভাল। এই দিক হইতে বরষাত্রা আরম্ভ হইবে।’

সৈনিক। ‘স্মরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ। ‘বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে।’

সৈনিক। ‘স্মরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ। ‘জ্যোতি কুটুন্স যত পারিবে জড় করিবে।’

সৈনিক। ‘স্মরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ তখন অম্পর্ক হাস্য করিয়া বলিলেন ‘আমরাও শুভকার্য্যে যোগ দিব, সে শুভকার্য্যের ঘট। সমস্ত ভারত-বর্ষে রাষ্ট্র হইবে।’

সহসা একটি সজোরে নিকিষ্ট তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল; সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুস্তির নীচে লোহ-বর্মে লাগিয়া তীর খণ্ড খণ্ড হইল।

তৎপরেই একটি বর্ষা। বর্ষার ভীষণ আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ষা ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন নিষ্কোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ যোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি খায়েরাখাঁ চাঁদখাঁকে ভীক বলিয়াছেন। যুদ্ধাবসার চাঁদখাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, সম্মুখযুদ্ধ বিনা তিনি কখনও পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাঁহাকে দেয় নাই।

মনে মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে স্থির করিলেন কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দান করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধা-

রণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক ধর্ম, তাঁহার অপূর্ব ও ক্রতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দুস্বাধীনতাসাধনে প্রতিক্ষা, এ সমস্ত চাঁদখাঁর নিকট অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ প্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাক্কা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পাত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুণ্ড অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সম্ভেদ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিম্নাশ্রমিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সম্ভেদের কথা শায়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন এই ভণ্ড দৃতকে ধরив। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহুর্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবভির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সৈনিকের সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দৃতকে বিনাশ করিয়া সৈনিক সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন ‘শায়েস্তা

খাঁ! যুদ্ধব্যবসায় রুখা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ডীকও নহি, দিল্লীশ্বরের বিকদ্ধাচারীও নহি; অদ্য যে বড়যন্ত্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা অবহেলা করিবে না।’ কিন্তু আশা যায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্ষা ব্যর্থ দেখিয়া লক্ষ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খজা হারা সজোরে আঘাত করিলেন। আশ্চর্য্য বর্ষে লাগিয়া সে খজা প্রতিহত হইল।

“কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে” বলিয়া মহাদেওজী আপন আন্তরিক গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন।

নিমেষমধ্যে বজ্রমুক্তি চাঁদখাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল,—চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাডলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অপরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন—

“শায়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কলা করিবে।”

শায়েস্তাখাঁ! অন্যায় তিরস্কারে অদ্য যে অমূল্য বীর রক্তটিকে হারাইলে, বিপদের সময় তাহাকে স্মরণ করিবে কিন্তু আর পাইবে না।

যোদ্ধার কর্তব্যাকার্য্যে যে সময়ে চাঁদ-
খাঁ জীবন দান করিলেন, সেনাপতি শা-
য়েস্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুরে নিদ্রা ঘাই-
তেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণ বিষয়ে
সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন ।

মহারাজ্ঞীয় সৈনিক এই সমস্ত ব্যাপারে
বিস্মিত হইয়া বলিল ‘প্রভু কি করিলেন ?
কল্যাণ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের স-
মুদায় সঙ্কল্প রূখা হইবে ।’

ব্রাহ্মণ । ‘কিছুমাত্র রূখা হইবে না ।
আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অ-
পমানিত হইয়াছেন, এখন কএক দিন
সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে
না । এই মৃতদেহ ঐ গভীর কুপে নি-
ক্ষেপ কর, আর অরণ রাখিও কল্যাণ র-
জনী এক প্রহরকালে’—

সৈনিক । “রজনী একপ্রহরকালে ।,,

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ ক-
রিলেন । তিন চারি স্থানে প্রহরগিণ তাঁ-
হাকে ধরিল, তিনি শায়েস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত
অনুমতি পত্র দেখাইলেন, ও নিরাপদে
পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

রাজা যশোবন্ত সিংহ ।

“কোন ধর্ম্মেতে, কহ দাসে, শুনি,
জন্মভেদ, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা ।”

মধুসূদন দত্ত ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা
যশোবন্ত সিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া
রহিয়াছেন ; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া
এই গভীর নিশীথেও কি চিন্তা করিতেছেন,
সম্মুখে কেবল একটি মাত্র দ্বীপ জ্বলি-
তেছে, শিবিরে অন্য লোক মাত্র নাই ।

সংবাদ আসিল মহারাজ্ঞীয় দূত সা-
ক্ষাত করিতে আসিয়াছেন । যশোবন্ত
তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁ-
হারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আ-
সিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আ-
হ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলি-
লেন । উভয়ে উপবেশন করিলেন ।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিমন্ত্রণ হইয়া রহি-
লেন, কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন ।
মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে স্র-
তীক্ষ দৃষ্টি করিতেছিলেন ।

পরে যশোবন্ত বলিলেন ‘আমি আ-
পনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি । তাহাতে
যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি,
তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে ?

মহা । ‘প্রভু আমাকে কোন প্র-
স্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে
পাঠাইয়াছেন ।’

যশো । ‘কেবল পুনা ও চাকান দুই আশা-
দের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এইজন্য খেদ ?’

মহা। ‘দুর্গনাশে তিনি কুক্ক ন-
হেম, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।’

যশো। ‘মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে
পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন।’

মহা। ‘বিপদে পড়িলে খেদ করা
তাঁর অভ্যাস নাই।’

যশো। ‘তবে কি জন্য খেদ ক-
রিতেছেন?’

মহা। ‘যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি
ক্ষত্রিয়কুলাবতংশ, যিনি সনাতন ধর্মের
রক্ষাকর্তা, তাঁহাকে অদ্য স্বেচ্ছের দাস
দেখিয়া প্রভু কুক্ক হইয়াছেন।’

যশোবস্তুর মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত
হইল; মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন
না, গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

‘উদয়পুরের প্রতাপরাণার বংশে
যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের
রাজকন্যা যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হই-
য়াছে, রাজস্থান যাঁহার পুখাতিতে পরি-
পূর্ণ রহিয়াছে, সিংহাসনে যাঁহার বাজ-
বিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত
হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে
সনাতন হিন্দুধর্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে,
দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে
যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাতেই, ব্রাহ্মণ-
মাতেই, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে,
অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হি-
ন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু
কুক্ক হইয়াছেন। রাজন! আমি সন্নিধ্য
দূতযাত্র, আমি কি বলিতেছি জ্ঞানি না,

অপরাধ হইলে মার্জনা করিবেন, কিন্তু এ
যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন?
এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উড্ডীন
হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য?
হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য?
ক্ষত্রোচিত যশোলাভের জন্য? আপনি
ক্ষত্রকুলবর্ষ! আপনি বিবেচনা করুন;
আমি জ্ঞানি না।’

যশোবস্ত অধোবদনে রহিলেন। মহা-
দেও আরও বলিতে লাগিলেন—

‘আপনি রাজপুত! মহারাজারায়ের
রাজপুত-পুত্র; পিতা পুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে
না। আপনার সহিত প্রভুর যুদ্ধ সম্ভবে
না; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিবেদন করিয়া-
ছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পা-
লন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ
ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপু-
তের যশোমীত আমাদের রমণীগণ এখনও
গাইয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ
দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়,
সে রাজপুতের সহিত যুদ্ধ! ক্ষত্রকুলতি-
লক! রাজপুত-শোণিতে আমাদের
খড়া রঞ্জিত হইবার পূর্বে যেন মহারাষ্ট্র
নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা
যেন বর্ষা ও খড়া ভাগ করিয়া পুনরায়
লাজল ধারণ করিতে শিখি!’

যশোবস্ত সিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া
ধীরে ধীরে বলিলেন ‘দূতপ্রধান! তো-
মার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দি-
ল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ

করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিব—’

‘এবং শত শত স্বর্ঘ্যকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ব্রহ্মস্রোতের সম্পূর্ণ জয় হইবে।’ ভয়ংকর বাজতাবে দূত এই কথা বলিলেন।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সঞ্চার করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন—

‘কেবল দিল্লীখয়ের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কি-রূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিজোহাচারী, চতুর শিবজী অদোর অঙ্গীকার অন্যায়সে কল্যাণ করে।’

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন ‘মহারাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাতাসান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিন্যস্ত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে; অমূল্যমান ককন, শিবজী সভ্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, হিন্দুদেবের পূজা

দিতে কবে পরাধীন? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনথ যখন সর্পকে ধারণ করে সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিভ্যাগ করিবামাত্র জর্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে, এটি বিজোহাচারণ নয়, এটি স্বভাবের রীতি। কুকুর যখন খরগোশকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগোশ প্রাণরক্ষার জন্ত কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়, এটি চাতুরী না স্বভাবের রীতি? দেখুন, যাবতীয় জীব জন্তুদিগকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিক্ষাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি সে উপায় শিক্ষান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা। যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ বল, মান, দেশ-গৌরব, জাত্যাভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম ও জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবনরক্ষার্থ পলায়ন-পট্ট যুগের নীজগতি কি বিজোহা? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া বাইতে

যত্ন করে, সেটি কি নিম্নমীর? কত্রির-
রাজ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুসলমান-
দিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা
শ্রুতিতে পাই, কিন্তু হিন্দু প্রবর! আপনি
হিন্দু জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা
করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন
না।' মহাদেওয়ের জ্বলন্ত নয়নদ্বয় জলে
আরুত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া বশোবন্ত
হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন 'দুঃ-
প্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি
নাই, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জনা
করিবেন। আমি কেবল এই মাত্র বলি-
তেছিলাম যে দেখুন রাজপুতগণও আধী-
নতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সা-
হস ও সম্মুখ রণ ভিন্ন অন্য উপায় জানেন
না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায়
অবলম্বন করিয়া সেইরূপ কললাভ করিতে
পারে না?'

মহা। 'মহারাজ! রাজপুতদিগের
পুরাতন আধীনতা আছে, বিপুল অর্থ
আছে, দুর্গম পর্বত বা মকবেষ্টিত দেশ
আছে, প্রবীণ রাজধানী আছে, সহস্র বৎ-
সরের অপূর্ণ রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়-
দিগের ইহার কোনটি আছে? তাহারা
দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের
এই প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিগের দেশ
আক্রমণ করিলে আপনাদের পুরাতন স্ত্রী-
ভাষাসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্জয় ভেজ
ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজ-

পুত্র সেনার সম্মুখে দিল্লীখরের সেনা স-
রিয়া যায়। আমাদের দেশ আক্রমণ ক-
রিলে আমরা কি করিব? পূর্বরীতি বা
রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, তাহারা
আছে তাহারা প্রত্যুত রণ দেখে নাই!
যখন দিল্লীখর কাবুল, পঞ্চাব, অযোধ্যা,
বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থান
ভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী
যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ রহৎ
অনিবার্য রণ-অর্থ ও রণ-গজ প্রেরণ ক-
রেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বাকদ,
গোলা, রৌপ্যযুগ্ম, স্বর্ণযুগ্ম, সহস্র সহস্র
শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দ-
রিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহা-
দিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সৈন্য নাই,
সেরূপ অর্থ গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ
নাই, চতুরতা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?
হরিভ-গতি ও পর্বত-যুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের
আর কি উপায় আছে? কত্রিররাজ!
জীবন-প্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আ-
চরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর কখন
মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহা-
দিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সং-
স্থান হইলে, দুই তিনশত বৎসরের রণ-
শিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অ-
সাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।'

এই সমস্ত কথা শুনিয়া বশোবন্ত চি-
ন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে লম্বাট
স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে
লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার

বাঁকাগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

‘আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসা-
ধনে সম্ভেদ করিতেছেন কেন? হিন্দুধ-
র্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন,
শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই।
মুসলমান শাসন ধ্বংস করণ, হিন্দুজাতির
গৌরব সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থা-
পন, সনাতন ধর্মের গৌরবরক্ষা, হিন্দুশা-
স্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান,
গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিব-
জীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি
তঁাহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলেন
তবে স্বহস্তে এই কার্য সাধন করুন।
আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন,
মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে
হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ ক-
রুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদঘাটিত হইবে,
প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি
শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণে বলবান, স-
হস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত, শিবজী
সমুদ্রতটতে আপনার একজন সেনাপতি
হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করি-
বেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।’

এই প্রস্তাবে উল্লাসিতাধী বশোবন্তের
নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেক-
কণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে
ধীরে বলিলেন ‘মাড়য়ার ও মহারাষ্ট্রে
অনেক দূর, এক রাজ্যের অধীন থাকিতে
পারে না।’

মহাদেও। ‘তবে আপনার উপযুক্ত
পুত্র থাকিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দিন, ন-
চেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শি-
বজী ক্ষত্রিয় রাজ্যের অধীনে কার্য করি-
বেন, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ
করিবেন না।’

যশোবন্ত আবার চিন্তা করিয়া ব-
লিলেন—‘এই বিপদকালে, আরংজী-
বের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাখিতে
পারিবে এমন আত্মীয় নাই।’

মহাদেও। ‘কোন ক্ষত্রিয় সেনাপ-
তিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা
রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হ-
ইবে; শিবজী মানস্ফুরিতে রাজ্যপরিভ্রমণ
করিয়া রানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।’

যশো। ‘সরূপ সেনাপতিও নাই।’

মহা। ‘তবে যিনি এই মহৎ কার্য
সাধন করিতে পারিবেন তাঁহাকে সাহায্য
করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার
আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও
স্বধর্মের গৌরব সাধন করিতে পারিবেন।
ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রযোদ্ধাকে সহায়তা ক-
রুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে
এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনাকে এজন্ত
প্রশংসাবাদ না করিবেন।’

যশোবন্ত ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলি-
লেন, ‘বিজয়র, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়,
কিন্তু দিল্লীস্থর আমাকে স্বেচ্ছ করিয়া এই
কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে
অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি উত্তোচিত?’

মহা । ‘ দিল্লীস্থ যে হিন্দুদিগের কাকের বলিয়া জিজ্ঞাসা কর স্থাপন করিয়াছেন সে কার্য কি ভ্রোচিৎ ? দেশে দেশে যে হিন্দুপূজক, হিন্দুমন্দির, হিন্দু-দেবালয়ের অবমাননা করিতেছেন সে কি ভ্রোচিৎ ? কাশীর পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজীদ নির্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভ্রোচিৎ ? ’

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন—
‘ দ্বিজবর ! দ্বিজবর ! আর বলিবেন না, যথেষ্ট বলিয়াছেন । অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র । রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্ঠা ও আমার চেষ্ঠা অভিন্ন । সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীস্থরের বিক্ষেপে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায় ? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি । ’

মহারাজীর দূত দ্বয়ঃ হাস্য করিয়া যশোবন্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাইয়া একটি কথা কহিলেন । শুনিয়া মাত্র যশোবন্ত একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণেক নির্বাক হইয়া রহিলেন, বিন্ময়োৎক্লস্ত লোচনে দু-তের দিকে দেখিতে লাগিলেন, পরে সানন্দে ও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । উভয়ে গোপনে, অতি যত্নস্বরে

অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর মহাদেও বলিলেন ‘ মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কলা কোন ছলে পুনা হইতে কএক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয় । ’

যশো । ‘ কেন ? কলা পুনা হস্তগত করিবার চেষ্ঠা করিবে ? ’

দূত । হাস্য করিয়া বলিল ‘ না, একটি বিবাহ কার্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্যে ব্যাঘাত হইতে পারে । ’

যশোবন্ত বুঝিয়া বলিলেন ‘ ভাল, দূরেই থাকিবে । ’ দূত বিদায় যাত্রা করিলেন । যশোবন্ত দৈবদ্রাস্য করিয়া বলিলেন—

‘ নারায়ণী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া থাকিবে ; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না ? ’

মহা । তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিল্লীর সেনাপতি শারেন্তা খাঁ বিন্মিত হইয়াছেন । ’

যশোবন্ত দ্বার পর্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন ‘ তবে যুদ্ধ বিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য করিবেন । ’

মহা । ‘ সেইরূপ কার্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব । ’

যশো । ‘ হাঁ বিন্মরণ হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য করিতে তোমার প্রভুকে

বলিও।' হাসিতে হাসিতে শিবিরাত্যস্তরে প্রবেশ করিলেন।

যশোবন্তের এক জন বিশ্বস্ত অমাত্য অপ্পক্ষণ পরে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার শিবির হইতে এই রাজ

এক জন অশ্বারোহী সিংহগড় প্রমুখে যাইলেন, উনি কে ?'

যশোবন্ত উত্তর করিলেন, 'উনি হিন্দুজাতির আশাশ্রয়, হিন্দুধর্মের প্রহরী।'

(প্রাপ্ত)

ভারতের প্রজানীতি ।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে উদীচা ভাষা সমূহে যে সকল সংবাদ পত্র, পুস্তক ও পত্রিকাদি মুদ্রিত হয় বা হইবে, তাহার মুশাসন জন্য সংপ্রতি রাজপুরুষগণ যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া ভারতের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ব্যবস্থার সম্ভাবিত কার্যকারিতা এখনও পরিচায়িত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রবর্তনাতেই আশঙ্কার তরঙ্গাতিবাত আরম্ভ হইয়াছে; ইহার প্রকৃতি ও পরিণাম বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই মনোযোগ বিধান অবশ্য কর্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত মনন করিয়াছি, এই উপলক্ষে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচন করিয়া, বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার সূত্রগত বিচার করিব।

রাজার গৌরব রাজার ভাষার পরিবাণ্ড রহিয়াছে; রাজার শরীর অলংকা এবং পবিত্র; সূত্রগত রাজভাষাও নিষ্পাপ, নিকলঙ্ক। মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা

তেও এই সূত্রের মৰ্যাদা রক্ষিত হইয়াছে; ইংরেজরাজ বলিয়া দিয়াছেন, যে ইংরেজীতে যে ব্যক্তি মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, তাহার অভিপ্রায়গত সাধুতার, তাহার নীতিগত মুশিক্ষার এবং তাহার ধর্মবুদ্ধিসম্মত বিজ্ঞতার অন্য পরিচয় নিশ্চয়োজন। সে যে কথা বলে, তাহাতে জ্ঞান্টি থাকিলেও সে ভাল মন্দ বিচার করিয়া বলিয়াছে, ইহা বুঝা যায়; বাহ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, সেও সে কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া লইতে জানে। সেই জন্য ইংরেজীতে ভ্রম মার্জ্জমীর, কারণ সংশোধনের সম্ভাবনা আছে।

এই নিয়মের ফলে, ১৫ মার্চের পরে দেশীয় ভাষার যে সকল পত্রাদি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রাজনীতি বা রাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আর সে পূর্বের মত বাক্যের পরিষ্কৃতি নাই। কিন্তু নিশীড়িত কোথের কল্লে, কোথের দীর্ঘনিশ্বাসে, শঙ্কার সঙ্কোচে, বিবৃতি অন্তর্দাহের প্র-

মাগ সর্বত্র দেদীপ্যমান। মুদ্রণ-স্বাধীনতার লোপ হইল বলিয়া যুক্তিতাকরে ভারতীয় লেখক বাহা প্রকাশ করিতেছেন না, ভারতবাসীর সভায়, ভারতবাসীর প্রমোদ-মন্দিরে, বাসে, পাদচাঁরে, আলোপে, প্রলোপে, হাস্যে পরিহাসে, সেই অসন্তোষ যেন মুক্তি ধরিয়া বিচরণ করিতেছে। কাগজের কথা এখন মুখে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কলে, এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সমস্তই ভারতবাসীর একতম সম্প্রদায় নিবন্ধ। সাম্প্রদায়িকদের সংখ্যা নিত্যন্ত অল্প নয়, তাহা আমরা জানি; পাশ্চাত্য শিক্ষার বঁহাদেব ছন্দ-রুতির ক্ষুধা হইয়াছে, বঁহাদেব চিত্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জম্বুভূমি ও মাতৃভাবার নামে বঁহাদেব অন্তঃকরণ উত্তারিত হয়, তাঁহাদের অনেকেই এ সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাও আমরা জানি। তথাপি সবিনয়ে, অগচ নিঃসঙ্কোচে আমরা বলিতেছি, যে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমরা বিশেষ বা সামান্য কোন প্রকার গৌরবের বিষয় বিবেচনা করি না। আমরা বাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব, তাহার জন্য স্পষ্টাকরে একথা ব্যক্ত করিয়া রাখা আবশ্যক।

বঁহারা এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, তাঁহারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি নিরন্তর ব্যখিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজা আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজ্যে বিদেশীর দেহ পুষ্ট হইতেছে,

ভারতবর্ষে বিজাতীয় রীতি নীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিক্ষেপে প্রবর্তিত হইতেছে,—এই বঁহাদের দৃষ্টি। জুল কথা, ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে,—তাহাতেই বঁহাদের অসন্তোষ। এ অসন্তোষের অন্তি কেহই অস্বীকার করে না; যে ব্যবস্থার উপলক্ষে আমরা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিরাছি, তাহার উপস্থাপন সময়ে মন্তব্য-বিশারদ ব্যবস্থাপকবর্গ এই অসন্তোষের উপরেই ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং এই অসন্তোষের বিস্তার অনিষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই অসন্তোষ ন্যায় ও যুক্তিমূলক কি না, এই স্বাধীনতাস্পৃহা অনুমোদনীয় কি না, প্রথমতঃ তাহারই বিচার করা আবশ্যক।

স্বাধীনতা ও ঈশ্বরচাঁরে অল্পই প্রভেদ। যনুষ্যের নিকট বাহার জবাবদিহি করিতে হয় না, এইরূপ দায়শূন্য নবাবও যদি নিজের অর্থের সার্থকতা করিতেছিনে করিয়া অতি সুখাদ্য সামগ্রী বা অনুপাদেয় পানীয়ে অমিত আসক্তি দ্বারা স্বীয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত করেন, তাঁহাকেও আমরা দোষ দিয়া থাকি; কারণ, তিনি ঈশ্বরচাঁর-পরায়ণ। অথচ এই দোষ দেওয়াতে, এই নিন্দা করাতে আমাদের যে অনধিকার চর্চা করা হয়, তাহা নহে। সমাজভুক্ত ব্যক্তি যাত্রাই সমাজের নিকট নীতিমূলক দ্বায়ে আবদ্ধ, সেই জন্যই আ-

মরা মবাবের নিন্দাবাদ করি ; তাঁহার বু-
তুক্ষা বা পিপাসার শান্তি করণ বিষয়ে
তাঁহার স্বাধীনতা থাকিলেও সেই স্বাধী-
নতার অপপ্রয়োগ বা অতি প্রয়োগে আ-
মরা আমাদের সেই নিন্দা করিবার ক্ষম-
তার পরিচালন করি ; সাধ্য থাকিলে সে-
রূপ স্থলে শাসন করিতেও ত্রুটি করিতাম
না, তাহাতে সন্দেহ নাই । আপনার শ-
রীর লইয়া আত্মতৃপ্তি সাধন বিষয়ে এত
বাধা ;—সাক্ষাৎ মদকে ইহাতে কাহারই
ক্ষতি হয় না ও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, ত-
থাপি সমাজনীতির এই আক্রোশ । এমত
অবস্থায় রাজনৈতিক সমাজের বন্ধন যে
ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর হইবে, তাহা বি-
চিত্র কি ?

রাজনৈতিক সমাজের মূলমন্ত্র,—অ-
ধীনতা । প্রত্যেক ব্যক্তি স্বৈচ্ছাচারের কি-
য়দংশ করিয়া রাজার হস্তে নাস্ত করিতেই
রাজনৈতিক সমাজের স্থিতি । কিন্তু সেই
অংশের পরিমাণ নির্দেশ করা অসম্ভব ।
ক্ষেত্র বুঝিয়া, সময় বুঝিয়া ইহা তাবৎ
কালের নিমিত্ত নিকপিত হইয়া থাকে ।
এই অধীনতাই আমাদের মঙ্গলের কারণ ;
এই রাজা প্রজা সম্বন্ধের উপরে সামা-
জিক উন্নতির নির্ভর । সভা সমাজের
প্রজাগণ শারীরিক ও বৈষয়িক মুখ স্বচ্ছ-
ন্দতা ভোগ করিয়া, কাব্য, সঙ্গীত এবং
চিত্রবিদ্যাতির আলোচনায় যে অন্তর্জগ-
তের উন্নতি ও স্বাস্থ্যসাধনের অবসর পা-
ইয়া থাকে, এই স্বাধীনতাই তাহার মূল্য

স্বরূপ । সুতরাং সমাজে যাহাকে স্বা-
ধীনতা বলি, তাহা স্বৈচ্ছাচার হইতে বি-
ভিন্ন ; বস্তুতঃ তাহা অধীনতারই এক প্র-
কার ফল । কেবল নিয়ম ও নিয়মকর্তা
কথঞ্চিৎ স্বাধীন ; তন্নিম্ন সকলেই সেই
নিয়মের এবং যাহার হস্তে সেই নিয়ম ব-
লবৎ করিবার ভার দেওয়া হয়, তাহার
অধীন । ইউরোপ ও ইউরোপের মস্তদী-
ক্ষিত আমেরিকা এই সকল তত্ত্বের আদর
ও গৌরব বুঝিয়াছে, শাসনের মুখ সে-
খানে জানে ; সেখানে প্রজায় যাহা কিছু
করে, সেই শাসনের উৎকর্ষ চেষ্টাতেই
তাহা করে , সুতরাং তত্ত্ব দেশে সভ্যতা,
বিদ্যা এবং ধনশালিতার বিস্তারক বুদ্ধি ।

ভারতবর্ষের অবস্থা অন্তরূপ । ভারত-
বর্ষ কোন কালে এক সাম্রাজ্য ছিল, ইতি-
হাসেরও তাহা মনে নাই । এখনকার ভা-
রতবর্ষ দেখিয়া যাহা মনে হয়, তাহাতে
মস্তক ঘুরিয়া যায় ।—একাদশ কোটি হি-
ন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ; তত্বপরি বুদ্ধ
দেব, দৈত্যদেব, রামজী, হুম্মানজী আ-
ছেন ; বিংশতি কোটি লোকের বিংশতি
প্রকার ভাষা, শতাধিক প্রকার পরিচ্ছদ ।
শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়, বিগত
সহস্র বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী, বোম্বাই
বাসীর সঙ্গে কোলাকুলি দূরে থাকুক,
বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করে নাই ; এখনও
যোজনান্তরে স্বাধীন রাজা, আর ইহাদের
মধ্যে কেহই আধুনিক নহেন, স্বর্ঘ্য বা চ-
ন্দ্রের সাক্ষাৎ বংশধর । এতদ্ভিন্ন আর্য্য,

অনার্য, স্বেচ্ছ, যবন, ধার্মহাট্টা, বর্গী—
কে নয়? আমাদের সমাজনীতির শি-
ক্ষক; যাহার বেড়াতে ইচ্ছা আশাদি-
গকে পশুত্ব লিখাইয়া গিয়াছে। ত-
থাপি স্বাধীনতাবাদীরা বলিবেন—তার-
তব্ব একবর্ষ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বহুকাল পূর্ব
হইতে ছিল না, এখনও নাই; অথচ এ
স্বাধীনতার বিনিময়ে ইউরোপ প্রভৃতির
তুলনায় আমরা কিছুই পাই নাই। ইহার
উত্তম কারণ আছে।—প্রথমতঃ, আমরা
স্বাধীনতাই হারাইয়াছি, কিন্তু কোন প্র-
ণালীর অনুরোধে কাহাকেও তাহা অর্পণ
করি নাই, দ্বিতীয়তঃ বা ভারতঃ আমরা
কখনই কোন চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হই নাই।
তৃতীয়তঃ, বহুদূর ধরিয়া আমাদের উপ-
কারের জন্য কেহ আমাদের রাজা হয়
নাই, স্বার্থসাধনের জন্য কেহ দল্লতাবে
আসিয়া দস্যুর মত চলিয়া গিয়াছে, কেহ
বা অভিলোভপরবশ হইয়া রহিয়া গি-
রাছে। আত্মাতিরিক্ত উদ্দেশ্যে কাহারই
ছিল না। আমরা কে, ভারতবর্ষ কি, ইহা
বুঝিয়া বলিয়াই এত গণ্ডগোল।

বীহারী একটি জয়ভূষিতক; বী-
হারী শুধু ভারত-নামমিত অরণ্যকলিগুটে
পান করিয়া অসীতার অমিত উত্তরখান-
বিশ্বত হইতে পারেন; অনেক বলিলেই,
হিমালয় হইতে কুমারিকা ও পর্বত হ-
ইতে চন্দ্রমাখ পবিত্র পরিবাণ এই বিশাল
ক্ষেত্র বীহাদের বশোদয়নের উপরে প্রতি-

কলিত হয়; বেদ বলিলেই একেশ্বরবাদ,
মিথীশ্বরবাদ, নিকরগমুক্তি, বহু মাথা-
লের পূজাও সত্য পীরের সিনী বীহাদের
অন্তরে অন্তর্ভুক্ত উদিত হয়; পুরাণের
নামে বীহারী ঈশ্বরের মন্ত্রণাকোশল হ-
ইতে বিপিন ক্রকের গগন-মার্গ-বিদারিণী
বক্তৃতা ও কুরুক্ষেত্র হইতে পাবনার প্র-
জাদের দাজার ধারাবাহিকতা দেখিতে
পান,—তাহারাও একথা স্বীকার করিতে
বীধা যে, আর্থোপনিবেশ এই ভারত-
ভূমি রাজহুয় ও অশমেধ সবেও চির দিন
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত, যে এই খণ্ড-
রাজ্যমালা বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ধর্মবি-
প্লবে বিপর্যাস্ত; তাহারাই স্বীকার করিতে
বাধ্য যে রাজনীতিসম্বন্ধে সমগ্র ভারত-
বর্ষ কমিন্ কালেও একতন্ত্রাধীন হয়
নাই, যে দরবেশ বা সেকেন্দরের আক্র-
মণে বিক্ষাচল বা রাজমহলের উপল-
মালা বিকলিত হয় নাই, দক্ষিণে বা পূর্বে
ভারত ভারিয়া কেহ অশ্রুপাত করে নাই।
এই অনার্য ভারতভূমি যবনের সংস্পর্শ-
দূষিত হইবার পরে একবার একটুকু একী-
ভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু যে
কারণেই হউক, তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে
নাই। ভারতের সমগ্র “ভবিষ্যতের উ-
দয়-কক্ষের নিহিত।”

ভারতের বেদ, ভারতের দর্শন, ভার-
তের কাব্য, ভারতের গণিত এক কালে,—
“জিজ্ঞাসিত সকলে, পূজিত সকলে,
কিম্বিক, মিরীম, যুনানী মণ্ডলে।”

একথা সত্য ; কবির এ সকল কথা বলিবার অধিকার আছে ; অতি দূরসম্পর্কেও কৃতিত্ব দেখাইয়া মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা যায়, আভিজাত্যগৌরব কোন প্রকারে উন্নীত করিতে পারিলে মনুষ্যকে উন্নীত করিতে পারা যায়। কিন্তু রাজনীতির কঠোর অঙ্কে উপস্থাপিত পরিবার যোগ্য কথা এ সকল নহে। ধর্ম বা বিদ্যার আলোচনার ভারতবর্ষের এক ব্যক্তি বা এক প্রদেশ চরমসীমা দেখাইয়া থাকিলে, আত্মাদের কথা, এবং সেই মূলে স্বজাতীয়তা স্থাপন করিতে পারিলে মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহাতে শাসনতন্ত্র-গত একজাতিত্ব সপ্রমাণ হয় না। এমিয়া খণ্ডে বীণাশ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, এবং স্বকীয় ধর্মনীতির প্রচার করেন, ইহাও আমাদের পরিতৃষ্টি-জনক সংবাদ, কিন্তু তাই বলিয়া জেকসালেম এবং পঞ্চনদের রাজনৈতিক উত্থানপতনের একীকরণ উপপন্ন হইবে না। সমগ্র পৃথিবী মনুষ্যের আবাসক্ষেত্র, অতএব এক এবং অভিন্ন ; যতদিন এই পরমবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে না পারিবে, ততদিন প্রাচীন ভারতের একতার কথা মনে করিয়া অন্য দীর্ঘ বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার অধিকার তোমার নাই। ভারতে রাজতন্ত্রবিষয়ে আর্ষা, পারসীক, গ্রীক, মোগল, পাঠান, ফরাশী, ইংরেজ সকলই তুল্য।

সাত শত বৎসর ভারত পরাধীন বলিয়া আজি আমরা দুঃখ করিতেছি ;

কিন্তু মুসলমানের যখন প্রথম অভ্যুদয়, তখন ভারতের প্রাণ কাঁদে নাই, ভারতের বণিক ও কৃষক কবোঞ্চ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই। তাহার পর, যখন ক্রমে ক্রমে ইংরেজের প্রতাপ-বলি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, তখনও ভারতবর্ষ তদবস্থ। অদ্য এই ইংরেজের রাজ্যে সাঁওতাল, গারো, কুকির ঘে অবস্থা, ইংরেজ যখন প্রথম রাজ্য-বিস্তার আরম্ভ করিল, তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণের রাজনৈতিক অবস্থায় যে বিশেষ প্রভেদ ছিল, এরূপ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, বিশ্বাস করা উচিতও নহে।

ইংরেজ বণিমুত্তি, ইংরেজ ধৃত, ইংরেজ প্রবঞ্চক, ইংরেজ—তাহাকে যাহা বলিবে, তাহাই। কিন্তু সে কথায় আমাদের ইচ্ছাপত্তি কি ? গজেনবী মায়ুদের বা ঘোরীর মত না আসিয়া ইংরেজ বণি-শ্রেণে এদেশে আসিয়াছিল, তাহাতে আমাদেরই লাভ ;—অন্যথা রক্তশ্রোত প্রবলতর বহিত মাত্র। তথাপি স্বরুতনামা স্বদেশ-বৎসলদের মনে রাখা উচিত যে, তাব গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপাঠে ইহাই বুঝা যায় যে ইংরেজ রাজ্যাভিলাষে প্রথমতঃ এদেশে আইসে নাই। সময়ের তাড়নায় অবস্থার তাড়নায় তাহাদিগকে রাজত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আর ইংরেজেরা এখন যাহার অধিকারী তাহার অধিকাংশই হলে বা বলে লব্ধ হয় নাই, ইহাও মনে রাখা আবশ্যিক।

কলতঃ যেরূপেই ইংরেজের রাজ্যলাভ
ঘটিয়া থাকুক, কি নিয়মে সে রাজ্য পরি-
চালিত হইতেছে; তাহা দেখা কর্তব্য।
নিয়মের পরীক্ষা, ফলে;—উদ্দেশ্যের প-
রিচয়, কার্যে। যাহার চক্ষু আছে, সেই
দেখিতে পারে যে ইংরেজের রাজ্যে অস-
ভ্যতার পরিবর্তে সভ্যতা, মূর্খতার পরি-
বর্তে জ্ঞান, দারিদ্র্যের পরিবর্তে ধনবিস্তার,
উপদ্রবের পরিবর্তে শান্তি, অন্ধকারের
পরিবর্তে আলোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।
এখন, নির্ভীকচিত্তে, নিঃসঙ্কোচে, টাঁকে
টাকা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায়, জুতা পায়ে,
চাষা গ্রামের জমিদারের বিকক্ষে সতি-
যোগ করিতে যায়; একশত ব্যক্তি এক
শত বার সুবিচার পাইয়াছে দেখিয়া বি-
চারকে ধর্মাবতার বলে, ধর্মাবতার মনে
করে। এখন, যে গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাধি-পত্র নাই, সে গ্রামকে আমরা
দিক্কার করি; বাঙ্গালা ভাষায় জর্জরীয়
পণ্ডিতের বিদ্যা পরীক্ষা করি; এখন, কস
তুরঙ্গে যুদ্ধ হইলে ইউরোপের কোন্ রা-
জ্যের কি পশু অনুশরণীয় আমরা তাহার
নির্ধারণ করি; সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্কে শস্য
সম্ভাবনার বিচার করি; এখন, গলায় ক-
স্কর্টার, পায়ে মোজা না থাকিলে আমা-
দের সন্দেহ হয়; ভ্রমলোক আমাদের বা-
চীতে আসিয়া আমাদেরকে অনারত্ব দে-
খিলে, আমরা উলঙ্ঘন মনে করিয়া লজ্জিত
হই; এখন, কাগজে লিখিয়া রাজরাজে-
খরকে অপদম্ব করি; বক্তৃতা করিয়া জ-

গৎ উদ্ঘাদিত করিয়া তুলি। অধিক কি,
কএক বৎসর মাত্র ইংলণ্ডের গুরু পদ-
প্রাপ্তে জ্ঞান চর্চা করিয়া, গুরুকে বিদ্যায়
পর্য্যভব করিতে পারি না বলিয়া, গাভ্রজা-
লায় জলে ডুবিয়া মরিতে যাই!—জি-
জ্ঞাসা করি, এই সমস্ত কাহার প্রসাদাৎ?
তোমার ভারতের ইতিহাসের কোন্ স্থলে
অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া এইরূপ আর একটি
চিত্র তুমি দেখাইতে পার?

তথাপি আমরা স্বাধীন হইব! আমা-
দের অপেক্ষাও মূর্খ ভারতবাসীকে এহেন
রাজ্যরও বিদ্রোহিতা করিতে উপদেশ
দিব! রাজদ্রোহিতা শিখাও তাহাতে তত
দুঃখ নাই, কিন্তু তুমি যে এখনও বালক,
এখনও শিক্ষানবীশ। এ গুরু মহাশয়
হয়ত মরিতে পারেন, বিহবা গ্রাম ছাড়িয়া
পলাইতে পারেন, কিন্তু কর্তা যে এখ-
নও জীবিত। আগে সংসারের ভার গ্র-
হণ কর, গৃহস্থ হও, তখন গুরু মহাশয়কে
পেন্সন দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে
ইচ্ছা থাকে দিবে; না দাও, তিনি চ-
লিয়া যাইবেন। এখন উত্তলা হইও না।

উপরে যাহা বলা গেল, একবার তা-
হার ফল স্থির করা যাউক। প্রথমতঃ, ভা-
রতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া
বোধ হয় না, স্মৃতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীন-
তার অর্থ নাই। ইংরেজ যে স্বত্ব অবলম্বন
করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভার-
তের একতা সম্পাদন সম্ভবপর; একতা
সংসাধিত হইলে মঙ্গলের আশা করা

যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণরূপে হইতেছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণে যেরূপ প্রসার, পূর্বে এমন ছিল না। চতুর্থতঃ, রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক : আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যিক এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার প্রধান উপকরণ গুরুভক্তি। গুরুর প্রতি ভক্তি না থাকিলে, তাঁহার উপদেশে প্রজ্ঞা না থাকিলে, তাঁহার কথায় আস্থা না থাকিলে, বিদ্যালভের কিংবা জ্ঞানোপার্জনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। রাজনীতিতে ইংরেজ সাক্ষাৎসংস্পর্কে আমাদের গুরু : অতএব তিনি যখন বলেন যে ভারতবর্ষের উপকারের নিমিত্তই তিনি প্রয়াসী, তখন সে কথার মর্মগ্রাহ করিতে না পারিলেও তোমার বিশ্বাস করা কর্তব্য। যে যত্রে ইংরেজ ভারতের রাজতন্ত্র পরিচালন করিতেছেন, তাহার আমূলপ্রান্ত ধারণা করিবার শক্তি ভারতবাসীর এখনও হয় নাই। তথাপি গুরুসম্বন্ধে কথ্য ইংরেজ করিতেছেন,— যে যত্রে যখন ভারতবাসীকে দীক্ষিত করেন, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার পরিণাম,

তাহার উপকারিতা এবং তাহার প্রয়োগার্থিতা বুঝাইবার যত্ন করিয়া থাকেন ; এবং বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসু হইতে পারিবে বলিয়া ইংরেজ ভারতবাসীকে বচন-স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। অসঙ্কোচে যাচাই ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, যেখানে তোমার সন্দেহ হয় ভঞ্জন করিতে বল, সন্দুর্ভচিত্রে ইংরেজ তাহা শুনিতেন, শুনিবেন। কিন্তু অভক্তি প্রদর্শন করিলে কেন তিনি বিরক্ত হইবেন না? ধৃষ্টতা দেখাইলে কেন তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? তুমি যে মনের ভাব বাক্য করিতে পাও, ইচ্ছা ইংরেজের দয়ার গুণে ; তুমি যে দয়ার পাত্র, তুমি যে অনুগৃহীত হইলে যথোচিত আচরণ করিতে জান, তাহা কেন দেখাইবে না? আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে ইংরেজরাজকে,—

“মহতী দেবতা হোমা নররূপেণ তিষ্ঠতি” মনে করিয়া এবং এই শাস্ত্র-বচন সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচরণ করাই আমাদের উচিত, আমাদের আবশ্যিক, আমাদের পরম ধর্ম।

অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্বগণ আমাদের কাম্য, তখন তাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্যমিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ-

ইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সর্বথা আমাদের যত্ন-
শীল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সকল লো-
কের বিদ্যাবুদ্ধি কখনই সমান হইতে পা-
রেনা; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল
বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন
দেশের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তিরূপ বি-
শেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করে।
সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষবর্গের সাধু
এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের
প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা
সেই দেশের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে
বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।

আমরা গুণবাদী নহি; সকল বস্তুর
মুন্দের অংশই বাছিয়া দেখি, তাহা নহে।
যাহারা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা স-
ম্বন্ধীয় উপরি ন্যস্ত কথা গুলিতে গুণবাদি-
তার লক্ষণ দেখিবেন, তাঁহাদিগকে এই
মাত্র বলিতে পারি যে, অপ্রিয় হইলেও
অনেক সময়ে সত্য কথা বলা আবশ্যিক,
এবং—

“ হিতং মনোহারিচ মুহূৰ্ত্তং বচঃ। ”
তথাপি আমরা স্বীকার করি যে, কম্পি-
তই ভটক বা বাস্তবই হউক যে সকল দুঃ-
খের কাহিনী ভারতবর্ষের সর্বত্র আজি
কালি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমু-
দয়ই ঈর্ষা, দাঙ্কিতা বা অসদভিসন্ধি-
জুড়িত নহে। কিন্তু অজ্ঞতার পরিচয় অ-
ধিকাংশ ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান, ইহাও সহ-
জেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের দুঃখের গীত যাহারা গা-

হিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্র-
দায়ের মনের ভাব এইরূপ যে তাঁহারা
ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ এবং ইংরেজাধিকৃত তা-
রতবর্ষের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক অধিকার
এবং স্বত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ সমতার অভাবে
পক্ষপাতিতার প্রমাণ দেখিতে পান, এবং
তাহা ন্যায়াবুমোদিত নহে বিবেচনা ক-
রিয়া অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকেন।
তাহার ফলে রাজভক্তির যে কিয়ৎপরি-
মাণে লাঘব হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।
কিন্তু আমরা ইহাদের খেদের কারণ বু-
ঝিতে পারি না। ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্ন-
বচিসম্পন্ন, ভিন্ন-সভ্যতা-প্রবর্তিত রাজ্য
ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা সং-
স্থাপন করেন, তাহার অধিকাংশই পরী-
ক্ষা দক্ষিণ; ইংরেজ স্বদেশে যাহার গুণ-
বত্তা দেখিয়াছেন, যাহার উপকার বুঝি-
তেছেন, স্বভাবতঃই এদেশে সেই নিয়মের
বা সেই কার্য্যের ফলবত্তা দেখিতে বাঞ্ছা
করেন; কিন্তু তাহার উপযোগিতার বি-
ষয়ে যে আদৌ তাঁহারা সন্দিহান হইবেন
ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। সেই জন্য প্রবর্তিত
ব্যবস্থা নিত্য পরীক্ষা করিয়া সময়ে সময়ে
তাহার সঙ্কুচন বা সম্প্রসারণ করিতে
বাধ্য হন। আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস,
ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের সমাজনীতিতে
লালিত এবং পালিত; ভারতবর্ষের আ-
ভ্যন্তরিক অবস্থা জানি না বলিলেও চলে।
ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সহিত আমাদের যে
সহানুভূতি, তাহাও সেই বিজাতীয় শিক্ষা-

প্রণোদিত । সুতরাং উভয় দেশের প্রকৃ-
তিগত বৈলক্ষণ্যের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি না
রাখিয়া সহসা রাজনৈতিক বৈষম্য বি-
রক্তি প্রকাশ করি ; ইংলণ্ডে যাহা ভাল,
এখানেও তাহাই ভাল, এই এক ভ্রান্ত সি-
দ্ধান্ত দ্বারা রাজকীয় কার্যকলাপের সমা-
লোচনা করি । গতিকেই অস্মাদের অ-
সন্তোষ । ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এ-
খানে তাহা প্রতিপন্ন হইল ; আমাদের
অজ্ঞতার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এই স্থলে
পাওয়া গেল । ইংলণ্ডের প্রজা ৭০ কথায়
জাতস্বত্ব বলিয়া আশ্রয় লয়, যাহার
সম্বন্ধে দেখিলে বা আশঙ্কা করিলে খজা-
হস্ত হইয়া উঠে, সেই কথাতে আমাদের
তরুণ উল্লেখ বা উক্তি নিতান্ত হাস্যজনক
এবং নিতান্ত উপেক্ষণীয়, ইহা অনেকেই
বুঝেন না । তবে এই সকল পরীক্ষোদ্ভিষ্ট
স্থলে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবার
আবশ্যকতা আছে ; শাস্তভাবে ভক্তি-
পূর্ণ বাক্যে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা
বল্য উচিত । ইংরেজ আমাদিগকে গ্রুপ
স্থলে বলিবার অধিকার দিয়াছেন ; সে
অধিকারে এখনও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই ;
কখনও হইবে বলিয়াও বোধ হয় না ।

অন্য এক সম্প্রদায়ের হুঃখকারী, নি-
য়ম এবং যাহার উপর সেই নিয়মের প্র-
য়োগ পরীক্ষার ভার আছে, সেই ব্যক্তির
প্রভেদ করেন না বা করিতে জানেন না ।
কর্ফু মার্জিষ্ট্রেট এবং কোজদারি আইন
ইহারা এক এবং অভিন্ন বিবেচনা করেন ।

যে লর্ড লিটন, কুলার ব্যাপারের মন্তব্য
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার
মুদ্রণ আইন উপলক্ষে তথ্যবিধ বক্তৃতা
করিতে পারেন, ইহাও তাঁহার বুদ্ধিতে
পারেন না । ফলতঃ এই সম্প্রদায়ের লো-
ককে বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই ; কেন-
ভেদে প্রয়োগ-ভেদ, এবং ফল-ভেদ হয়,
আপনা আপনি যে ইহা দেখিতে পার
না, সে অন্ধ ; তাহার পক্ষে আলোকেও
অন্ধকারে প্রভেদ নাই । তথাপি একটি
কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক ; অমৃত কথ-
চারী লইয়া এই সাম্রাজ্য চালাইতে হয় ;
সুতরাং কচিং কুত্র ব্যক্তিবিশেষের ভ্রম-
প্রমাণ হইবে, ইহা কেবল যে সম্ভব তাহা
নহে, প্রভূত গৌরবেরই বিষয় ; এবং এই
সকল ভ্রমপ্রমাদের শাসন বা সংশোধনে
আত্মসিক কঠোরতা প্রদর্শন না করিয়া
যে, অপেক্ষাকৃত সদাচার দেখান হইয়া
থাকে, ইহা উচ্চতর রাজপুরুষবর্গের বি-
জ্ঞতা এবং মহানুভাবতারই পরিচায়ক ।
রাজ্যরক্ষা শিশুর ক্রীড়া নহে । যে সকল
ব্যক্তি উল্লিখিত দোষ প্রদর্শন করেন, তাঁ-
হারা যদি অপ্রশস্ত্য ভাবিয়া দোষের
গুরুত্বানুসারিণী কথা বলেন, রাজপুরুষবর্গ
কখনই সে কথায় অবজ্ঞা করিবেন না ।

অতএব স্মৃতঃ দেখিতে গেলে স্বাধী-
নতাবাদীদের কথা যে প্রকার অসার
এবং অগ্রাহ্য, যাহারা ইংরেজায়িত, এবং
যাহারা স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত কার্যের প্র-
ভেদনির্ব্বাচনে অক্ষম, তাহাদের কথাও

সেইরূপ অর্থোক্তিক। কিন্তু ইহাদের অসন্তোষ এই অবধি ক্ষান্ত হইলেই ক্ষতি ছিল না। ফলতঃ তাহা না হইয়া ইহাতে প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা আছে।

ইউরোপে, মধ্যএসিয়াতে, এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় এইক্ষণে সত্য সত্যই রাজ-নীতি-সঙ্কট উপস্থিত। ভারতবাসী রাজনীতির কথায় এখনও নিতান্ত শিশু, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এখন কোন কথা কহিতে হইলে দ্বিগুণ সাবধানতার প্রয়োজন। তদ্বিপরীতে আমাদের অসত্য বা অসম্যক তত্ত্ববর্তী এবং অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আজি কালিকার বিষম সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া, আমরা যদি হঠকারিতার পরিচয় দেই, যদি ইংরেজরাজের অধাধিকতা, ভীকতা, দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, শোষণকতা, রাজপুরুষগণের পক্ষপাতিত্ব আত্যাচারপরতা; আর সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের পূর্বতন কম্পিত গৌরবকথার প্রলাপবচনে প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য, এবং বিপ্লবপ্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্তব্য। আজি কালি বখন চিরদিনাপেক্ষা অধিকতর রূপে শাস্তির প্রয়োজন, তখন অকুরেই উপদ্রবের বিমাশাধান, ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্মের অপলাপ হইবে, আদালের সর্ম্মনাশ হইবে।

তিন শ্রেণীর লেখককে লক্ষ্য করিয়া মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম, যাহারা স্পষ্টতঃ, বা পাকতঃ ইংরেজরাজকে অত্যাচারপরায়ণ, শোষণক, পক্ষপাতকলুষিত, ভীম ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া অপদম্ব এবং সম্মানচ্যুত করিতে যত্ন করে; দ্বিতীয়, যাহারা ইংরেজ ও ভারতবাসী হিন্দু ও খৃষ্টানকে পরস্পরের প্রতি জাতিবৈয়ের পন্থা প্রদর্শন করে, একজন বা দশজন দুরাচারের ব্যবহার দেখাইয়া সমগ্র জাতির নিন্দাবাদ করে, এবং ব্যক্তিবিশেষের কথা তুলিয়া শেষে কুলে কালি দিতে যায়; তৃতীয়, যাহারা অনুগ্রহ-লব্ধ এই মহাত্মা পাইয়া, তাহার অপপ্রয়োগ করিয়া স্বার্থসাধনের জন্ত ভয়প্রদর্শন বা উৎপীড়ন করে। এই নীচরুতি, লঘুচেতা, কাপুরুষ লেখকদিগের উল্লেখ করিলেই, ইহাদের জঘন্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহারা সমাজের কণ্টক, মনুষ্যনামের মানি মাত্র। ফলতঃ উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই যে দমন হওয়া আবশ্যিক, বোধ করি সমদর্শী ব্যক্তি মাত্রেয়ই নিকট তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি। ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অত্যাব নাই, বা বাতুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে ইহার সূত্র লইয়া বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণ্ডগোল করা অ-

নায়, একথা আমরা বার বার বলি । যাঁ-
হারা ভারতবর্ষের হিতকামনার ছিলে আ-
ত্মবিনাশ সাধন করিতে বসিয়াছেন, প্রজা-
হ্মের গলে ছুরিকা বসাইতে উদ্যত, তাঁ-
হারা শক্তি হউন, সাবধান হউন ;—
যাঁহাদের লেখনী গরলপ্রসবিনী, ভারত-
বর্ষের শিরায় শিরায় যাঁহারা বিষ ঢালি-
তেছেন, তাঁহারা শক্তি হউন, সাবধান
হউন ;—যাঁহারা রোজ-তপ্ত অথচ লম্বুতণ-

সদৃশ ভারতবাসীর চিত্তে অগ্নিসংযোগ
করিতে ব্যাঘ্র, ভারতবর্ষ ছার খার করিতে
উপস্থিত, তাঁহারা শক্তি হউন, সাবধান
হউন । অন্য কাহারও ক্ষার কারণ নাই,
ক্রোধের কারণ নাই, দুঃখের কারণ নাই,
এবং স্বকীয় কুসুমকোমল মুখশয্যার কু-
সুমকোমল ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া
রুখা ভাবনায় শুষ্ক হইবার কারণ নাই ।

(উকীল)

আত্মা ।

আত্মার বাহা কিছু মাছাত্মা, এই স-
ময় হইতেই তাহার সূত্রপাত হয় । এই
সময় হইতেই ইহার উদ্বেষিত যৌবন-গন্ধ
নানা রাজা হইতে ভ্রমরনিবহ স্বরূপ বি-
বিধ প্রকারের লোককে ঝাঁকে ঝাঁকে
অঙ্ক করিয়া আনিতে থাকে । কত আমির,
কত ওমরা, কত সাহেব, কত পাদবী, কত
ফকীর, কত সন্যাসী, কত পণ্ডিত এবং
কত ছদ্মবেশী এই সময় হইতেই ইহা
লক্ষ্মীপ্রদ পাংশু রাশিতে মল্লক অলঙ্কার
করিয়া ঘাটে, পথে, মাঠে, আলয়ে ও
গলিতে গলিতে ষটিকান্দ দোলক বস্ত্রের
নায় ইহার সর্বত্র বিদুলিত হইতে থাকে ।
এই সময় হইতেই ইহার ভূত-বিলীন আদি-
বাসীরা প্রতি রাজ্যে সুরগা, নকীর ও নাক
কারার মৃদুল মধুর অভিধাতে মিলিত হ-
ইয়া বিশাল দামামা ও করতালের সঘন-

গভীর গর্জনে প্রভাতে জাগরিত হইতে
থাকে । এই দিন হইতেই আত্মা কিরূপ-
কালের জন্য প্রাসাদ-মুকুট-শ্রেণী-
কলসে ঝলসিয়া সমস্ত পূর্ণ করিয়া
কেন্দ্রীভূত করে ; এবং এই সেই দিন,
যে দিন হইতে ইহা দূর দূরস্থ চক্রবর্তীদি-
গের নিকটে সুপরিচিত হইয়া মোগল-
শরীরে ভারতের প্রাণ-গর্ভে বিস্তার ক-
রিতে থাকে । এখন বাহা কবিশিগের ক-
ল্পনা স্বপ্নেও চিত্র করিতে পরাতন হয়,
কিছু দিন পূর্বে তাহাই সত্য ঘটনারূপে
ইহার বক্ষঃসরোবরে ভাসমান ছিল ।
ইহার রেণুপরিণত অট্টালিকামালার গ-
বাক্ষপংক্তি চতুর্দিকে প্রায় দিবা রাত্রি
মোগল মুন্সেফদিগের মুখপদ্মে চিত্রিত থা-
কিত । সেকালে কিছু দিগের জন্য সমস্ত
ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি এই ধামেই সমবেত

ভাবে সমাসীন ছিল। এই বিদ্যা এবং এই বুদ্ধির কণিকা মাত্র কর্ষণে কি সংস্পর্শনে লোকে তখন আজিকার মতই গর্ষিত হইত, অন্য বুদ্ধি কি বিদ্যা সহজ গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও লোকে তখন এ বিদ্যার নিকটে তাহাকে উৎকৃষ্ট দেখিত না। মাতৃভাবার যে আসন, তাহা প্রায়লোকেরই রসনাবেদিতে আজিকার ন্যায় সঙ্গীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানকার রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বেশ ও ভূষাদির তরঙ্গমালা ভারতের ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া এক সময় তলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল। এখানেও কোন সময় মোগলমস্তিষ্কের প্রতিভা হইতে নূতন ধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ধর্মসংহিতা রচিত হইয়াছিল, রিচার্টস্কে নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রচারিত হইয়াকতা, ভীকতনিষোপশিষাদি দ্বারা ধরাতল-ব্যপ্ত হইয়াছিল। “আল্লাহ আকবর” এই দ্ব্যর্থ বাচক ধ্বনি কোন সময় লোকের মুখগহ্বরে দৈনিক সম্ভাষাতে এখানেই প্রথমে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। দেবতা হইয়া লোকের ভক্তিমঞ্চে আসীন হইবার আশা এক সময়ে এখানকার সিংহাসন হইতেই লতাকারে উৎখিত হইয়া আকাশ বেষ্ঠন করিতে চাহিয়াছিল। আজিকার লোকেরা যেমন আজিকার স্থানবিশেষে আজিকার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছে, কোন সময়ে কোন সময়ের লোকেরাও সেইরূপ এই স্থানবিশেষের শিল্পাদি দেখিয়া নির্বাক

হইয়া শুদ্ধভাবে চাহিয়া রহিয়াছিল। আজি যেমন নগরবিশেষে সমস্তই সাহেবানা, কোন সময়ে এখানেও সমস্তই মোগলানা ছিল। এই দিনে যেমন লোকেরা, সমুদয় বাগান, ভিটি ও বসতির বাটী বিক্রয় করিয়া সমুদ্র সন্তরণান্তর দ্বীপবিশেষে যাইয়া যে ফল লাভ করে, সেই দিনেও লোকেরা সেইরূপ সর্বস্বান্ত পণ করিয়া একবার গঙ্গা ও যমুনা বাহিয়া এখানে আসিতে পারিলে সেই ফল লাভ করিত। পাঠকবর্গকে আর অনর্থক ভাষার ব্যাপকতা দ্বারা উত্তাক্ত না করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন সময় সমস্ত ভারতের সুখ দুঃখ বিতরণের ভাঁড়ার কিয়ৎকালের জন্ত এইখানেই সংস্থাপিত ছিল। কোন সময় ইহার এক খানি ইষ্টকথও এক দিবসে যে ব্যাপার দর্শন করিয়াছে, আজি তাহা এক ব্যক্তি এক মাস বসিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব আমি আমার অসহায় অবস্থায় ইহার প্রাচীন এবং নবীন অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমে পাঠকবর্গের নিকটে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

আত্মা হিমালয়ের প্রসারিত পাদপত্রের ক্রমনিম্ন ভূমির উপরে সংস্থাপিত এবং সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ৫৫০ ফুট উচ্চ। বাঙ্গলা দেশ সমুদ্রের বক্ষঃস্থল হইতে

যত খানি উচ্চ, তাহা ইহা হইতে বিরোধ করিলেই পাঠকবর্গ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গের নগরাদির সহিত তুলনা করিলে উচ্চতায় এস্থান একটি অনতিবহুৎ পর্যন্ত পৃষ্ঠ সদৃশ । সিকিম-শৈল-শ্রেণীর পাদদেশে শিম্র আসাম প্রভৃতি স্থান এখান হইতে ২৫০ ফুট নিম্ন, এবং সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান ৪০৫ ফুট ; হাতের পরিমাণে ২৭০ হাত নীচে । কলিকাতা, বাথরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান যে আরো কত নীচে, তাহা ইহা হইতেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে । সাধারণ্যে এই বিশ্বাস যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, হিমালয়ের পদতলস্থ একটি সামান্য সমতল উচ্চ ভূমি মাত্র । আমাদেরও পূর্বে এই বিশ্বাসই ছিল ; কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে, ইহার উত্তরপশ্চিমে যমুনা এবং শতদ্রুর মধ্যবর্তি ক্ষেত্র এখান হইতে আরও ৩৬৬ হাত উচ্চ । অতএব ইহা হইতে এই দেখা যায় যে, হিমালয় যেন সপরিবারে ভারতের মস্তকে দক্ষিণাঙ্গ হইয়া বসিয়া বঙ্গাভিমুখে পদধ্ব প্রসারিত করিয়া আছে, এবং তাহার পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে নুখ-রেখা সদৃশ বঙ্গভূমি সমুদ্রতটে অবস্থান করিতেছে ।

আগ্রা-বিভাগে ইটাওয়া, মইনপুরী, করকাবাদ, এটা এবং মথুরা এই কয়টি প্রদেশ আছে । ইটাওয়া আগ্রা হইতে লৌহবস্ত্রে ৭৩ মাইল ব্যবধানে কিঞ্চিৎ পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত । কলিকাতা হইতে

রেলপথে আগ্রা আসিবার কালে ইটাওয়া স্টেশনের মধ্যদিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে দাবিত হইতে হয় । ইটাওয়ার সহর, ইটাওয়ার রেল স্টেশন হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে থাকে । সহর হইতে আবার যমুনা, প্রায় মাইল দুই দক্ষিণ দিয়া পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে । এস্থান আগ্রা-বিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ । অনেক কক্সলাবশিষ্ট বাঙ্গালি বাবুরা দেশের জল বায়ুর উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া শরীর সংস্থারের জন্য অনেক সময় এস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেন । গ্রীষ্মকালে আগ্রা যত গরম হয়, এস্থান তত হয় না ; এবং ইহার বায়ুতে আগ্রা অপেক্ষা শিথলতা কিঞ্চিৎ অধিক আছে বলিয়াই ইহার সহবাস অনেকের মনোরম্য । ইহাতে শিথলতা থাকিবার বোধ হয় আর কোন কারণ নাই ; কেবল এই কারণ যে, ইহার উত্তর পার্শ্বেই মইনপুরী প্রদেশ । এই মইনপুরী প্রদেশের দেশের মধ্যদিয়া অনেকগুলি কল্যাণী নদী পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহার গাত্রে অগ্নিভাগ কতকগুলি ঝিল ও হ্রদে, স্থচিত আছে । মইনপুরী আগ্রা হইতে রাজবস্ত্রে প্রায় ৭০ । ৮০ মাইল পূর্বদিকে । ইটাওয়া হইতেও যাইবার পথ আছে, লৌহবস্ত্রে নাই । এস্থান আমাদের কাছে এক বিষয়ে একান্ত মনোহর । এখান হইতে আমরা কখন কখন ঝিলজাত মাগুর ও শিজীমৎস্য পাইয়া থাকি । যদিও তাহা আয়তনে এবং

স্বাদে জন্মভূমির মৎস্য হইতে অনেকাংশে নিরুচ্চ, তথাপি অবয়বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া উহার অভাবাংশ সকল আহার সময়ে কল্পনাসাহায্যে পূরণ করিয়া লই। দেশীয় মৎস্য অনেক দিন হইল দেখি না, এই বলিয়াই উহাতে আমাদের এত আদর। মইনপুরীর পূর্বোত্তর ফরকাবাদ। এই প্রদেশ গঙ্গা নদীর উভয় তটে বিস্তৃত। ফরকাবাদের সহর গঙ্গার তট হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আগ্রা হইতে রাজবন্দে প্রায় ১০০ মাইলেরও অধিক দূর ব্যবধানে। ইহার সহিত আমাদের এক রাজস্ব ব্যতীত আর কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। ফরকাবাদের পর এটা। এটা আগ্রা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্বোত্তর এবং রাজবন্দে প্রায় ৫০ মাইল হইতেও অধিক দূরে। এক রাজ্যীয় সম্পর্ক ভিন্ন এস্থানের সহিতও আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার পর মথুরা। মথুরার সহর আগ্রা হইতে পশ্চিমোত্তরে রাজবন্দে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার সহিত তীর্থ সম্বন্ধে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিছু দিন পূর্বে যাত্রীরা আগ্রা হইয়া উটের গাড়ীতে ইহাকে দর্শন করিয়া যাইত এবং পথে দম্যকর্তৃক সর্বস্বাপহৃত হইয়া অনেক সময় অশ্রু মুখে পদব্রজে মথুরা ও ব্রন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্ত হইত। আজি কালি লৌহবস্ত্র হওয়াতে লোকেরা সে উৎপাত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা পা-

ইয়াছে। ইংরেজদিগের শাসিত রাজ্যে এত দম্যভয় কিরূপে সম্ভবে, ইহা ভাবিয়া পাঠকবর্গ বোধহয় কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্যের কোন কারণ নাই। মথুরার রাজবন্দে ক্রিয়দংশ ভরতপুরের এলাকা মধ্যে পড়িয়াছে। দম্যারা সর্বদাই এই সন্ধিস্থানে থাকিয়া আপন আপন অভীষ্ট সাধন করে। যদি রাজার শাসন উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এদেশীয়দের নিতান্ত দুর্দৃষ্টবশতঃই তাহা না হওয়াতে যাত্রীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। আজি কালি যাত্রীদিগকে আর এ ভাবনা ভাবিতে হয় না। এখন যেমন আগ্রা না আসিয়া বরাবর কলিকাতা হইতে বাঙ্গালী শকটে হোটাস্ স্টেশন দিয়া স্বতন্ত্র লৌহবস্ত্র এককালে মথুরায় যাইয়া উপস্থিত হওয়া যায়, সেরূপ জাবার আগ্রা হইয়াও রাজপুতনার বাঙ্গালী শকটে স্বতন্ত্র শাখা লৌহবস্ত্র মথুরায় যাওয়া যায়। মথুরা কখন কখন কুটুম্ব হস্তে আমাদিগকে পেরা ও খুব চুড়ু মিস্টার যোগাইয়া থাকে। খুব চুড়ু চিনিতে পাক করা দুধের টাচি। আর মথুরার পেরা এইজন্য প্রসিদ্ধ যে, ইহা যুগান্তেও নষ্ট হয় না এবং ছুড়িয়া ফেলিলে দম্যর মস্তকও ভগ্ন করা যায়। প্রবাদ আছে যে, মথুরাবাসী ১৮টোবে ব্রাহ্মণেরা ইহার ৬।৭ সের অনায়াসে আহার করিয়া উঠে।

আগ্রা বিভাগের দক্ষিণ সীমা ধৌলপুর, গোয়ালিয়র এবং জালাউন। পূর্ব-সীমা কানপুর এবং অযোধ্যা বিভাগের অন্তর্ভুক্তি হরদোই প্রদেশ। উত্তর সীমা সাজিহানপুর, বদাওন, আলিগড় এবং পঞ্জাবের অধীনস্থ গুড়গাঁও। পশ্চিম সীমাতে রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর।

আগ্রা যমুনার পশ্চিমতটে অবস্থিত। যমুনা হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার উত্তরপশ্চিম দিয়া আসিয়া নগরের পাদদেশ দৌত করিয়া ব্যালগতিতে পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার গতি এক এক স্থানে এত বক্র হইয়া গিয়াছে যে, সেই বক্রের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে আসিতে কোথাও বা ২০ মাইল, কোথাও বা ১২ মাইল এবং কোথাও বা ৬ মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। প্রভাতে একস্থান হইতে নৌকা খুলিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগাইয়া দেখ যে, সেই স্থানেরই অপরদিকে মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এই কারণেই বোধ হয়, আমাদের দেশীর লোকদিগের নৌকাপথে আসিতে এত বিলম্ব হইত। যমুনা আমাদের একমাত্র জলাশয়। ইহারই আশ্রয়ে আমরা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমোত্তরীয় আগ্নেয়বাত্তে জীবন ধারণ করিয়া থাকি; তন্ম হইয়া বাই না। জম্বুভূমির সাগর-নিভা তটিনী সকলের জ্যেষ্ঠী আমরা ইহারই কৃপাকোপ-বিশিষ্ট মন্দ মন্দ বীচিলহরী দেখিয়া অনেক

সময় এককালে বিস্মৃত হইয়া বাই। ইহার তটবয় বিলক্ষণ উচ্চ এবং স্থানে স্থানে আগ্নেয়সীমান্বিত শ্যামল বালুাদি দ্বারা ভূষিত হওয়াতে দূর হইতে যেন মনোহর কেলিশৈলশ্রেণীর ন্যায় দেখায়। তটস্থিত ভূমি উভয় পার্শ্বেই ভিতরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দূর দূরস্থ উচ্চভূমি সকল হইতে আনীত বর্ষাকালীর জলপ্রবাহ সকলের দ্বারা এরূপ গভীর ভাবে বন্ধুর হইয়া গিয়াছে এবং নানাদিক হইতে আগত সেই স্কুল পয়ঃপথের পরস্পর সন্নিবিষ্ট দ্বারা এরূপ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার প্রতিক্রম মানচিত্রে দেখিলে, যেন তাহা যমুনার শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট তনুফল্লাজীর ন্যায় বোধ হয়। এক এক স্থানের পয়ঃপ্রণালী এত গভীর ও দীর্ঘ যে, তাহাতে দুই তিন সহস্র সৈন্য অনায়াসে লুকায়িত হইয়া থাকিতে পারে। নানাদিক হইতে নানা পয়ঃপথ আসিয়া নানাভাবে মিলিত হওয়াতে ইহাদের গতি এত বিভিন্নপথগামিনী হইয়াছে যে, কোন অপরিচিত ব্যক্তি ইহার মধ্যে নামিলে সহজে বাহির হইতে পারে না। অনেক সময় পথ না পাইয়া ঘূড়িতে থাকে। এদেশের প্রায় নদীর তটই এইরূপ রেভাইন জাল (Revin's) দ্বারা বন্ধুরীকৃত হইয়া আছে, বৃষ্টি হইবামাত্রই এই সকল পথ জাতীয় করিয়া তটভূমি সমস্ত আগ্রা ও নগরাদির জল বেগে আসিয়া-যমুনা গর্ভে পতিত হইয়া থাকে।

কণকালও ভূমির উপরে তিস্তিতে পারে না। রুক্ষির পরমুহূর্তেই ভূমি শুষ্ক হইয়া উঠে, এই গতিকেই দেশ বর্ষাকালেও অতিশয় শুষ্ক থাকে। সহরের মধ্য দিয়া অনেক গভীর গভীর পয়ঃপথ যাইয়া এরূপে যমুনাতে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে যখন ইহাদের মধ্যদিয়া জল চলিতে থাকে, তখন জলের এত বেগ হয় যে, প্রতিবৎসরেই শুনা যায়, দুই চারি জন যুবা ও বালক ইহার জলবেগে ক্রীড়া করিতে গিয়া যমুনাতে পতিত হইয়া মৃত হইয়াছে। যমুনার জল খাইতে অতিশয় মধুর। অনেক সংস্কারবশতঃ অগুণ করে দিয়া ইহার গর্ভের জল খায় না। ইহার তটস্থিত কূপোদকই প্রায় সাধারণো ব্যবহৃত। বর্ষাকালে ইহার বক্ষঃ অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তৃত হয়। জল অত্যন্ত আদিল হয়, এবং অতিশয় বেগবান্ হয়। কোন কোন বর্ষে উভয় তট প্লাবিত হইয়া ইহার তীরস্থিত পথ ও গৃহপ্রাঙ্গণ সকলে পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করে। শীতকালে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার প্রায় সমস্ত বক্ষেই শুষ্ক ও শুষ্কবর্ণ পুলিন সকল জাগিয়া উঠে। কোন কোন স্থানে হাঁটু জল হইতেও অনেক কম জল থাকে, কোন স্থানে মানুষ পর্য্যন্তও তল হয়। ইহাতে বিস্তর কষ্টপ আছে; স্থান করিবার সময় দুই হাতে চেলিয়া স্থান করিতে হয়। এত কষ্টপ যে প্রথমতঃ নামিতে অতিশয় ভয় বোধ হয়, কিন্তু

লোকের সঙ্গে ইহাদের এইরূপ আত্মভাব জন্মিয়াছে যে, ইহার কাহারও কিছু অনিষ্ট করে না। ইহার কোন কোন অংশে কুস্তীরও আছে। কিছু দিন হইল এখানে বিডল্ মিউজিয়ম্ নামে যে একটি মিউজিয়ম ছিল, তাহাতে আমি একটি রহৎ কুমীরের কঙ্কাল দেখিয়াছিলাম। সেটি নাকি লোকে এই যমুনার মধ্যেই মারিয়াছিল। তাহার উদরের মধ্যে মনুষ্যের শরীরের যে সকল অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহার শরীর-কঙ্কালের সঙ্গে এক পাখের আবদ্ধ ছিল। বর্ষাকালে ইহাতে শুশুকদিগকেও উল্লক্ষন করিতে দেখা যায়।

যমুনা ছাড়া আগ্রার প্রায় ৮।১০ মাইল দক্ষিণ দিয়া খাড়ি নদী নামে নালার আকৃতি অতিক্রমাদী অপর একটি নদী পশ্চিমে ভরতপুরের এলাকা হইতে আসিয়া পূর্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া সহরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে গিয়া এরাদত্ নগরের নামাতে বোর্ন অথবা উতুনচুন নামে আর একটি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

বোর্ন নদীও ভরতপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া আগ্রার আরও বহুদূর দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোইতা, পার্কতী ও পূর্বোক্ত খাড়ি প্রভৃতি অতিক্রিয়া পয়ঃপ্রণালীসমূহী নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সিকোহাবাদ নামক রেলওয়ে স্টেশনের বহুদূর দক্ষিণে যমুনাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধা চর্যগুণী অথবা চব্বলও আমাদের অপর এক জলৈশ্বর্য্য। যদিও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের বলিয়া বলিতে আমরা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হই, তথাপি ইহা আমাদের বিভাগের দক্ষিণ সীমার আংশিক পরিধা এবং ইহার মৎস্য-সম্পত্তি আমাদেরই বাবুরচিখানার বিভব। চব্বল ধৌলপুরের মধ্যদিয়া আসিয়া আগ্রার প্রায় ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইটাওয়ার ফেশনের বহুদূর পূর্বদক্ষিণে যমুনাতে মিলিত হইয়াছে। ইহা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে প্রায় যমুনার সদৃশ।

ইহা ছাড়া সহরের প্রায় ৪ মাইল পূর্ব দিকে অপর একটি আংশিক আর্দ্র পরঃপ্রণালী উত্তর দিক হইতে আসিয়া যমুনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। জল-সম্পত্তি নাই বলিয়া আফ্লাদে ইহাকেও আমরা নদী বলিয়া থাকি। এতদ্বিন্ন আমাদের বিভাগে মইনপুরী ও ইটাওয়ার মধ্যে শির্বা, সিঙ্গুর, পীরা, আহমি, উকন্দ, কুলুন্দী, কালী, ইমুন এবং পাণ্ডু প্রভৃতি নদীনাথধারিণী কতকগুলি সোতা নালা চারিদিক হইতে যাইয়া যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহারা অনেকে বর্ষার মেঘাপগমে ভানুমুখ দেখিয়া শুষ্কতাপ্রাপ্তে পাংশুবক হইয়া উঠে, তবু গ্রামাঙ্গুলের উপস্থিতিপুঙ্ক্তের ছাত্র-সংখ্যার ন্যায় ইহারা আমাদের বিভাগের মানচিত্রে নদী সংখ্যা পূরণ করিয়া থাকে,

এবং আমরাও ভীষণ লু-বাসুর দাহসময়ে ইহাদের শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসিচ্ছিন্ন দেখিয়া আশ্বস্ত হই। এখানেই যে আমাদের জলবিভব ক্ষান্ত হইল, পাঠকবর্গ কখন এরূপ মনে করিবেন না। ইহা ছাড়াও আমাদের বিভাগে ঝিল ও হ্রদ নাম-ধারী থানা, ডোবা ও গর্ত এদিকে ওদিকে ছড়ান আছে, এবং প্রকৃত ঝিল ও হ্রদও আছে। এই বিকল্প দৃষ্টবক্ষ মহামহা রাজস্থানের পাশ্বে থাকিয়া আমরা কিরূপে এত সোতা, নালা, থানা, ডোবা, হ্রদ এবং ঝিলের অধিপতি হইলাম? যে রাজস্থানের অন্তর্গত বিকানোর প্রদেশে প্রবাদ আছে যে, খৃষ্টীয় ১৮৬১ সনে টাকাতে চারি'সের জল বিক্রয় হইয়াছিল এবং যাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহ একবার আগ্রাতে আসিয়া যমুনার প্রবাহ দেখিয়া বিস্ময়াবিস্ট হইয়া বলিয়াছিল যে, “আরে! ইকেইসা, তমাম্ জল বহু চলা কোই ইসে বাঁধ নেহি রাখ্তা!” ঈদৃশ অঞ্চলের ধারে কাছে এত জলস্থলীর বিদ্যমানতা, কিরূপে সম্ভবে? পাঠকবর্গ এবিষয় আন্দোলন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিস্ট হইতে পারেন। আমরাও মানচিত্র দেখিয়া প্রথমে তাহাই হইয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন দ্বারাই সেটি আমাদের মন হইতে দূর হইয়াছে। আমাদের পদতলেই যমুনা এবং যমুনার আর এক পাশ্বেই খানিক দূর দিয়া গঙ্গা বহিতেছে। মইনপুরী, ইটাওয়া, ফরকাবাদ, এটা এবং

মথুরা প্রদেশের অধিকাংশ, সমুদয়ই এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রবৎ ভূমিতে অবস্থিত করিতেছে। এই ভূমিখণ্ডকে এখানে দোয়াব বলে। দোয়াব অর্থাৎ দুই জলের মধ্যবর্তী ভূমি। এই দুই ভারত-প্রসিদ্ধ নদীর মধ্যবর্তী হওয়াতেই এই স্থান সকল সর্বদা ইহাদের দ্বারা ধৌত হইয়া হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও আমি কখন এসকল স্থানে যাইয়া দেখি নাই, তথাপি মানচিত্রস্থ প্রতিকল্প দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ইহার এই নদীদ্বয়ের গতি পরিবর্তন দ্বারা বারে বারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাদেরই থিতান পদার্থ সকল দ্বারা পুনঃ পুনঃ রচিত হইয়াছে। ইহার এই উভয় নদীরই শুষ্ক গর্ত ভিন্ন আর কিছু নয়। অতএব এসকল স্থানে এত বিল, ঝিল এবং সোতা, নালা থাকিবার এই কারণ। কোন কোন বিষয়ে কিরূপ পরিমাণে বাঙ্গলা দেশের সদৃশ। শুনিয়াছি গ্রীষ্মকালে লু-বান্স ইহাদের শরীরোপরি কিঞ্চিৎ মন্দভাবে বহিয়া থাকে। বর্ষাতেও আত্মতার তত প্রকোপ হইতে পারে না। এই অঞ্চলের অনেক স্থানে নীল জন্মে। পাঠকবর্গ আমাদিগকে যেন সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধার মধ্যে গণনা করেন না। যদিও আমাদের অব্যবহিত পশ্চাৎদিক হইতে রাজস্থানের মক-সুদীক্লপ চুল্লী, শীতের ছয় মাস নির্বাপিত থাকিয়া, সমস্ত নিদাঘ আমাদিগকে উত্তপ্ত তন্দুর মুখে ফেলিয়া ভাজিতে থাকে, তবু

আমরা আমাদের বিভাগীয় প্রতিবেশিবর্গের জল-সম্পত্তির কথা শুনিয়া অতিপথে অনেক স্নিগ্ধ থাকি। এককালে কবাব হইয়া যাই না। আমাদের দৈনিক আহারের মৎস্যোপকরণ এই সকল নদী, নালা, বিল, ঝিল হইতেই যোগান হইয়া থাকে। রোহিত, কাতলা, কালীবাউস, বোয়াল, ছোট ছোট টাইন, ফলি, চিতল, মিরকা, পাঙ্কাস, গজার, সরপুটী, পুটী, খরশুল, চেলা, বাঁশপাতি, টেঙ্গরা, ক্ষুদ্র চিঙ্গরী, নারিকেলি, বাচা, রিচা, আইর, চাঁদা, পোয়া, ফেশুয়া, চাপিলা, ছোট ছোট শকুল, মাগুড়, শিঙ্গী, কঁকড়া এবং কখন কখন ইলিশ পর্য্যন্তও পাইয়া থাকি। ইলিশ, ফাল্গুন, চৈত্র এবং বৈশাখ এই তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন পাওয়া যায়। এখানে ইলিশ শব্দ শুদ্ধ ইলিশের আকৃতি এবং অবয়ব বাচ্য। স্বাদবোধক নয়। ইহাকে যখন পাই, তখনই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাই। ডিমেই ইহা প্রায় সর্বস্বাপন্নতা হইয়া থাকে। অন্য অন্য মৎস্যেরা আপনাদের ঋতু অনুসারে উপস্থিত হয়। রোহিত, কাতলা, মিরকা এবং বোয়াল প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের মৎস্য অপেক্ষা শীতের মৎস্য কিছু স্বাদু। তত আইশের গন্ধ থাকে না। ফিরিঙ্গী ভারীদের জন্য খরশুল মাছে হাত রাখিবার যো নাই। এদেশে বাসার ভূতা কাহার-জাতিরাই মৎস্য বিক্রয় করে এবং নৌকাবাহক মালা

জাতীয়েরাই মৎস্য ধরে। কখন কখন কাহারেরাও ধরে। এখানে মৎস্যের কোন বাজার নাই। কাহারেরা স্ত্রীপুরুষে মা খায় করিয়া করিয়া বাঙ্গালি, ফিরিজী এবং মুসলমান এই জাতির মধ্যে বিক্রয় করে। বোধ হয় এই তিন জাতি এই অঞ্চলে আসিবার পূর্বে এদেশে মৎস্যের ব্যবহার ছিল না; ব্রজধর্ম এবং জৈন ধর্মের শাসনই ইহার বোধ করি এক মাত্র কারণ। মরা খায় বলিয়া যদিও এদেশের কচ্ছপ খাইতে অতিশয় যুগা হয় এবং কখন কোন বাঙ্গালি কি ফিরিজী খায় না, কিন্তু তাহার ডিম মৎস্যবিক্রেতাদিগকে বলিয়া আনাইয়া খাইয়া থাকে। ইকিমিতে মাছ গরম বলিয়া গ্রীষ্মকালে এদেশের মুসলমানেরা কৈহ খায় না। এই গতিকে একটুকু শস্তা হয়। কিন্তু খাইতে বড় ভাল লাগে না। বিশেষতঃ বড় বড় মাছ। বড় মাছ মাত্রেরই পেট চিরায় থাকে সুরতায় তাহাদের আভ্যন্তরিক অনেক খাদ্যাংশ পাইবার যো থাকে না। অনেক সময় মনোমত এবং অভিকৃতি-গত দ্রব্য লাভের জন্য বাঙ্গালিয়া মৎস্য বিক্রেতাদিগকে পুরাতন বস্ত্রাদি দান করিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

আশ্রা ও যমুনা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় পাঠক বগর্কে পূর্বে কহিতে ভুলিয়াছি। কিঞ্চিৎ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যমুনা এবং গঙ্গার গর্ভ নিয়তই পরিবর্তনশীল। ইহাদের গর্ভ-পরিবর্তন দ্বারাই

পার্শ্ববর্তি স্থানাদির আকৃতি এবং প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। শুনা যায় যে, আশ্রা হইতে পূর্বদক্ষিণে প্রায় ১২।১৩ মাইল দূরে যমুনার একটি পরিত্যক্ত শুষ্ক গর্ভ আছে। ইহা প্রস্থে কোন কোন স্থানে ১½ মাইলের অধিক হইবে এবং দীর্ঘে কোন কোন স্থান ২০ মাইলের ও অধিক হইবে। বর্ষাকালে এখনও এই গর্ভ অংশতঃ প্লাবিত হয়। কার্লাইল সাহেব বলেন, এবং তাহা অনেক সম্ভব যে, যদি হিন্দুদিগের সময়ের প্রাচীন আশ্রা খুজিতে হয়, তাহা হইলে এই পুরাতন গর্ভের পার্শ্বস্থ গ্রামাতে খোঁজাই কর্তব্য। বাস্তবিক এইকণ্ডারতর্কই যত নগর বিদ্যমান আছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের কীর্তি-সমাধি দেখিতে হইলে, আধুনিক নগর সকলের পার্শ্ববর্তি স্থানাদি খনন করিয়া দেখিতে হয়।

কোন নবীন অভ্যাগত বঙ্গবাসী, যখন বাঙ্গালী শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘপর্ষাটনজনিত শরীর-পীড়ি হইতে কিঞ্চিৎ অবকাশ পান, এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং পথের এপাশে ওপাশে ছাটিয়া মুহূর্মুহঃ নগরের মুখচ্ছবির প্রতি দৃষ্টিনির্দেশ করেন, তখন সর্বপ্রথমেই তাঁহার মনে একটি ধূলিধূসরিত বিকল ভাবের উদয় হইয়া থাকে; এবং সুস্বিক্ষণ শাশল লতা-পত্রকণ্ডল্যাদির গাঢ় অবগুঠনে স্তম্ভ

অবগুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির সান্নিধ্য হইতে দূরে
নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন চতুর্দিকে কেবল হা-
হাকারের প্রতিকৃতি দেখেন। গৃহাদির
প্রতি নয়নপাত করিলে দেখেন, কেহ
আতপত্ত্বয়ে মস্তকে খড় বাঁধিয়া, কেহ সূ-
জীর্ণ পুরাতন পতনোন্মুখ গাত্রবেষ্টিনে দ-
রমা জড়াইয়া, কেহ শৈবালে লেপিত,
কেহ তৃণাকুরে রোমাণ্ডিত ভগ্ন কর্পরে ব-
সিয়া, কেহ পলিতকেশনিত মর্ষরঞ্-
জিত মস্তকে বিচূর্ণচূড় হইয়া, কেহ স্রবর্ণ-
কলস মস্তকে মর্ষরাস্বরে আপাদশির
আচ্ছাদিত করিয়া ও পদ্মাসনে যমুনাতটে
উপবিষ্ট হইয়া, কেহ সদাঃ চূর্ণদৌত-ক-
লেবরে বিবিধ রঙ্গমালার কণ্ঠ বিরঞ্জিয়া,
কেহ আবার তাহারই পাশ্বে গলিতত্বকে
ও জামু-জজ্বা-কপোল-বিভগ্নে বিকটাসা
হইয়া এবং কেহ নিক্ষিপ্ত শরীর ইষ্টকে ধরা
পৃষ্ঠে পতিত রহিয়া অতি গস্তীর ভাবে
মনুষ্যকণ্ঠের অবিরাম কল কল ও যা-
নাদির খট খট ও ঘর্ঘরের মধ্যে ভূত ভ-
বিষাৎ বর্তমান চিত্তাক্রপ যোগে যেন
নিষ্পন্দ নিমগ্ন রহিয়াছে। চারিদিক হইতে
ব্রজের রঞ্জেৱেণু উড়িয়া উড়িয়া সকলের
গাত্রে লাগিতেছে। ধূলিরই মঞ্চ, ধূলিরই
আসন, এবং ধূলিরই ধূনী। যে দিকে
দেখা যায়, কেবল ধূলাই ধূলা। বাস্তবিক
আজি কালি আশ্রার ধূলাই প্রথম প্রধান
প্রাকৃতিক সম্পত্তি। জানি না, আকবর কি
দেখিয়া ইহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন।
বর্ষার দুটি মাস নির্বিঘ্নে চলিয়া গেলে,

অবশিষ্ট দশ মাস আশ্রা কেবল ধূলি-
তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। এত ধূলা
হইবার বোধ হয় দুটি কারণ। প্রথমতঃ
ইহার মৃত্তিকাই স্বাভাবিক পাংশুল ও
আঁঠা শূন্য। দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ প্রকারের
যানাদি অনবরত অবিচ্ছান্তভাবে ইহার
পৃষ্ঠকে ঘর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার পৃ-
ষ্ঠোপরিস্থ অণুসংহতিতে যে কিঞ্চিৎ যো-
গাকর্ষণ আছে, তাহাও প্রতিনিয়ত ইংরে-
জিশকট এবং দেশীয় একা, বহেলী ও উষ্ট্র
সিক্রমের চক্রঘর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহার
শরীরস্থ প্রায় দ্বিহস্ত প্রমাণ মৃত্তিকা বর্ষে
বর্ষে আকাশপথে উড্ডীন হওতঃ দূর দূরস্থ
রাজ্যাদিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এখানকার
ক্ষেত্রাদির মৃত্তিকাও এইরূপ পাংশুল এবং
মকুবর্ণ অর্থাৎ ঈষৎ পীতভ। জলে সিঁফ
না করিলে ডেলা বাঁধে না। যে ক্ষেত্রের
মৃত্তিকার স্বাভাবিক ডেলা বাঁধা হয়, শু-
নিয়াছি তাহা অতিশয় উর্বর এবং তাহার
প্রতি বিষাতে কৃষককে বার্ষিক সাত আট
টাকা কর দিতে হয়। মধ্যম শ্রেণীর ভূ-
মিও কিঞ্চিৎ ডেলা বাঁধা হয় এবং তাহা-
তেও শস্যাদি উৎপন্ন হয়। বিষা প্রতি
ইহারও তিন চারি টাকা কর দিতে হয়।
অধম শ্রেণীর ভূমি অধিকাংশই ক্ষার ও ক-
ঙ্করময়। ইহাতে উষ্ট্রের খাদ্য নানা প্র-
কার কটকাকীর্ণ রক্ষ ভিন্ন আর কি-
ছুই জন্মে না। যখন আমরা কোন কোন
সময় ক্ষেত্রাদিতে ভ্রমণ করিতে যাই, তখন
আমরা দেখি যে, কোন কোন স্থান সুশ্রু-

তোক্ত ঔষ্ধি-লবণ দ্বারা শুক্লীকৃত হইয়া আছে। কোন কোন স্থানে সোরাও দৃষ্ট হয়। নগরের অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাতে এত সোরা যে, হুতন কোন গৃহ নির্মিত হইলে, কএক বৎসরের মধ্যেই ইহার আক্রমণে জর্জরিত হইয়া উঠে এবং প্রাচীরস্থ চূর্ণের আন্তর সকল খসিয়া খসিয়া পড়ে। ইষ্টক সকল চূর্ণ হইয়া ঝুর ঝুর করিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু প্রস্তর নির্মিত গৃহে এরূপ হইতে দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন বহুকাল হইতে মনুষ্য এবং পশুমূত্র সঞ্চিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। পূর্বের সহরেরই উত্তরপশ্চিম প্রান্তে মজ্জ নামক গ্রামের কাছে এক প্রকার লবণ জন্মিত, এখন তাহা সরকার হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যমুনার ধারে আকবরের সময়ের সোরাওয়ালী কুঠীনাংমে একটি রুহং বাটী আছে; এইক্ষণ তাহা মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষ্মী চাঁদ শেঠ কিনিয়া লইয়াছেন। শুনা যায় যে, আকবরের সময়ে এখানে সোরা প্রস্তুত হইত।

আগ্রার সহর সমুদয় একস্থানে একত্রীকৃত নয়। ইহা অংশে অংশে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং সহরের মধ্যে মধ্যে অনেক বিস্তৃত বিস্তৃত শূন্য স্থান সকল পড়িয়া আছে। এ সকল শূন্য স্থানের অনেক গুলা পূর্ব হইতেই শূন্যাবস্থায় আছে, এবং কতক গুলা প্রাচীন গৃহাদির বিলোপে ক্রমে শূন্য হইয়া উঠিয়াছে। কাশী এবং দিল্লীকে কোন অত্যাচ্ছ স্থানে বসিয়া যেরূপ মনো-

হর দেখায়, ইহার শরীরের অভ্যন্তরে অনেক শূন্য ভূমি থাকাতে ইহাকে সেরূপ সুন্দর দেখায় না। এরূপ হওয়াতে যদিও ইহা নয়নের আরাম দায়ক হয় নাই বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের অনেক আরামজনক হইয়াছে। স্থানে স্থানে বায়ু সুন্দররূপে খেলিতে পারে বলিয়া অনেক পরিষ্কৃত থাকে। ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত ইহার এক একটি অংশও নিত্যন্ত অবিস্তৃত নয়। ইহার সমুদয় অংশ এক স্থানে একত্রিত হইলে, ইহাকে বর্তমানাপেক্ষা অত্যন্ত বিস্তৃত দেখাইত। ইহার গাঁত্রোপরিস্থ ভূমি, আমাদের দেশের ভূমির ন্যায় তত সমতল নয়; সর্বত্রই প্রায় উচ্চ নীচ। যদিও এখানকার বর্ষা অতিশয় ক্ষীণ, তবু ইহার মৃত্তিকা অনেক ঋণ বলিয়া নানাদিক হইতে আগত বর্ষার জল-গতি দ্বারা ক্রমে ধৌত হইয়া হইয়া স্থানে স্থানে বড় বড় নালা সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কঙ্কর-প্রস্তরমিশ্রিত মৃত্তিকার বিস্তৃত স্তূপ সকল দাঁড়াইয়া আছে। লোকেরা তাহার উপরে গৃহ অট্টালিকাদি তুলিয়া বাস করিতেছে। এই জন্যই সহরের বক্ষঃ এই সকল নালায় গর্ত দ্বারা এক প্রকার এব্রো খেব্রো হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন নালা প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল হইতেও দীর্ঘ। পীপলমণ্ডি নামক সহরের একটি অংশ এইরূপ একটি নালায় এক অংশের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে ইহার মধ্যে স্থাপিত গৃহাদির কটি ঘেঁষিয়া জল

চলিতে থাকে। কলিকাতাতে সাহেবেরা এত অর্থ ব্যয় করিয়াও যাহাতে কৃতকার্য হইতেছেন না, এখানে প্রকৃতি আমাদিগকে আপন যত্নে বিনা ব্যয়ে তাহা করিয়া সর্বদা শুষ্ক বিছানায় শুষ্ট রাখিতেছে।

মৃত্তিকার হাত কএক নীচেই কঙ্কর প্রস্তরের স্তর। পূর্ব বাঙ্গালার মৃত্তিকাতে কোন খানেও ইহা নাই। থাকিবার বোধ হয় কারণও নাই। কিন্তু রাঢ় দেশের কোন কোন স্থানে আমি ইহা দেখিয়াছি। তাহারা ইহাকে ঘেটেই বলে এবং ইহা ভস্ম করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করে। এখানেও তাহাই করে। এখানে সাধারণতঃ সমস্ত চূর্ণার কণ্ব ইহাকে ভস্ম করিয়া হয়। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ-প্রস্তর। আকৃতি অত্যন্ত বন্ধুর। ইহাকে কুটিয়া ঝুঁড়া করিয়া এবং তদ্বারা কদম প্রস্তুত করিয়া কুম্ভকারেরা এক প্রকার সুন্দর অতি পাতল মুরাই প্রস্তুত করে। এই মুরাইতে সাধারণ মাটির মুরাই হইতে জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। এখানে ইহাকে ‘কঙ্কর কা মুরাই’ বলে। ভূমির অব্যবহিত নীচেই এই চূর্ণ প্রস্তরের স্তর থাকিতে এখানকার কূপোদক মাঝেই চূর্ণের অংশ থাকে। কোন খানে কম, কোন খানে বেশি। এই চূর্ণের অংশ এবং তৎসহ সোরা ও অন্য-বিধ ক্ষারজ লবণের অংশ মিশ্রিত থাকতে

এখানকার প্রায় সমুদয় কূপোদকই খাইতে বিষাদ। কেবল যমুনার পার্শ্ববর্তি কূপোদকেই এ দোষ নাই। থাকিলেও সহজে জিহ্বাতে অনুভব করা যায় না। এই চূর্ণ-প্রস্তরের স্তর ভেদ করিয়া আরও অনেক নীচে চলিয়া গেলে মিষ্ট জলের স্তর পাওয়া যায়। আমার পরিচিতের মধ্যে কোন একটি সমৃদ্ধিশালী ক্ষত্রিয় বাড়ীতে বসিয়া মিষ্ট জল খাইবার আশায় এখানকার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদিগের দ্বারা আপনার গৃহপ্রাঙ্গণে বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন মতেই মিষ্ট জল পাইতে পারিলেন না। উপরিস্থিত স্তর সকলের মদ্যাদিয়া বর্ষা এবং অন্যান্য প্রকারের জল সকল চোরাইয়া পড়িয়া কূপের নিম্নস্থ জলকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

উপরোক্ত কঙ্কর বাতীত, ইহার বক্ষে চিকুনী ও পোতানি নামে আরও দুই প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহা এখানকার সাধারণ লোকেরা গৃহ-প্রলেপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাহেবেরাও অনেক সময়ে পরিমিতব্যয়িতার অনুরোধে আপনার প্রাঙ্গণস্থ বহিঃ-প্রাচীরাদিতে ইহার প্রলেপ করাইয়া থাকেন। ইহার প্রলেপ দেখিতে চূর্ণের প্রলেপ হইতে বড় কম সুন্দর দেখায় না।

(ক্রমশঃ)

(প্রবাসী)

তরঙ্গিনী ।

গীতি-কবিতা ।

(রাগিণী লগ্নী, তাল জং)

বড়ই সাধের তুমি সজ্জন আমার রে,

তরঙ্গ-রঙ্গিনী !

যখন দেখিতে যাই

তখন দেখিতে পাই

নূতন-মুরতি তব নয়ন-রঙ্গিনী ।

প্রেমের প্রবাহ তুমি প্রাণ-বিনোদিনি ।

২

কত লীলা ও তনুতে, কতই ভঙ্গিমা রে,

বিভ্রম, ভামিনি !

চাঁদের আলোতে হেসে,

চাঁদের আলোতে ভেসে,

চলেছ চটুলে কোথা বল তাহা শুনি ।

হাসিছে তোমার মুখে মুখদা বামিনী ।

৩

কার না জুড়ায় প্রাণ হেরিলে ওরূপ রে,

রূপ-বিলাসিনি !

আকাশে একটি চাঁদ,

হৃদে তব কোটি চাঁদ,

জড়িত জ্যোৎস্নার তুমি রস-তরঙ্গিনী !

তুমিই কি বিরোগীর সস্তাপ-বারিনী ?

৪

যৌবন-জ্যোৎস্নারে তব খেলিছে লহরী রে,

ভুবন-মোহিনী,

লহরে লহরে মরি

উখলিছে কি মাধুরী

কি গরিমা, কিবা ছটা ভুজঙ্গ-গঞ্জিনী,

পুলিনে মলিন লাজে বন-মোহাগিনী ।

৫

মৃদল মৃদল বহে ধীর-সমীরণ রে,

অদীর-গামিনি !

অদীর সে পরশনে,

বুঝি না কি ভেবে মনে,

কি মায়ায় কি ছলনা খেল মায়াবিনি !

একি পুনঃ? তালে তালে নাচিছ তটিনি ?

*

৬

আবার আবার একি ভীষণ হিলোল রে,

তট-বিষাতিনি !

কেন এই গরজন

এ নিষ্ঠুর দরশন

নিরখি অশ্বরে ওই নীল-কাদম্বিনী,

পরকীয় ছায়াও কি ছোয় না মানিনী ?

৭

কল কল কল নাদে কি কথা কহিছ রে,

কল-নিবাদিনি !

অস্ত যায় রবি শশী

পোহায় দুঃখের নিশী

তব হায় না ফুরায় তোমার কাছিনী

কার প্রেমে বল ধনি, তুমি উন্মাদিনী ?

৮

মরমের দুখ আজি কহিব তোমার রে,

ভূপর-নন্দিনি !

তব তটে বসি' বসি',

অশ্রু জলে সদা ভাসি,

নিবার এ অশ্রু-বারি দুঃখীর-সঙ্গিনি !

দ্রবময়ি ! দ্রব-দয়া, করুণা-রূপিণি !

৯

বড়ই সাধের তুমি সজ্জন আমার রে,

তরঙ্গ-রঙ্গিনি !

'কোথা যাও ফিরে চাও'

সঙ্গে মোরে লয়ে যাও

তরল-তরঙ্গ-ময়ি ! অনন্ত-গামিনি !

ভাসাব তরঙ্গে তব জীবন-তরনী। (শ্রীবঃ)

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। 'মিত্রপাঠ; আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত।'—বঙ্গদেশের ইহা একটি কলঙ্ক যে, যাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি আছে, তাঁহারা বালকবালিকাদিগের জন্যে কাব্য লিখেন না। ইহার এক কারণ এই, এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা প্রায়শঃই স্বজনবৎসল ও অনুগত-পালক শিক্ষাসমাজের নিকট বিড়ম্বিত হন;—আর এক কারণ এই, তাঁহারা কাব্যের বিপণিতে যাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন, ঐদৃশ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা দূরে থাকুক,—সেই অনন্ত কোটি লেখকবর্গের সহিত তাঁহারা সময় বিশেষে মল্লযুদ্ধ করিতেও বাধ্য হন। হেলেনাকাব্যের রচয়িতা উল্লিখিত বিড়ম্বনা ও লজ্জা উভয়েরই প্রতি দৃষ্টিপাতশূন্য হইয়া এই কলঙ্ক মোচনে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহার মিত্রপাঠ, বালকশিক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যে শ্রেণির বালকেরা বোধোদয় পড়িয়া থাকে, তাহারা মিত্রপাঠ পড়িলে

ভাষা শিখিবে, অথচ জ্ঞান লাভ করিবে।

২। 'কুন্দমালা। নিসর্গ সুন্দরী-প্রণেতা ত্রিশারদা প্রসাদ স্মৃতিরত্ন বিরচিত।' এদেশীয় কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিণ্টন, বায়রন, স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মন্ত্ৰ-শিষ্য। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা কবিতা ইংরেজী কবিতার হুতন এক যুক্তির মত। বিলাতের বিবিদিগকে সাড়ী এবং বলয় চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণ পরাইয়া বোঁ সাজাইলে, অথবা এদেশের বধুদিগকে গা-উন পরাইয়া বিবি সাজাইলে যেমন দেখায়, ঐ সমস্ত কবিতাও আমাদের নিকট তেমনি প্রতীত হয়। দেখিতে স্বন্দর,—শোভায় অপূর্ণ; কিয়ৎপরিমাণে হুতন হুতন, অথচ স্থিরচক্ষে তাকাইলে পরিচিতপূর্ব্ব। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির গুরুস্থান স্বদেশ। তাঁহারা যাহা কিছু শিখিয়াছেন, তাহা কা-

লিদাস, ভারবি ও ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিশ্রদ্ধার নিকট । সুতরাং তাঁহাদিগের কবিতায় ঐ অপূর্বত্ব, ঐ নূতনত্ব নাই । কিন্তু অপূর্ব ও নূতন না হইলেও কুন্দমালার মত কবিতা অবহেলার বস্তু নহে । আমরা নিসর্গসুন্দরীর নির্মল কান্তি দেখিয়াই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কবি বলিয়াছি, তদীয় অশ্রুজলসিক্ত কুন্দমালার গাঁথনি দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশবিষয়ে আশাবিত্ত হইলাম ।

৩ । ‘কবিতামুকুর । ত্রিশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ।’ গ্রন্থকার তদীয় বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় দফায় লিখিয়াছেন ; “—আমাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবাবসরকারে চাকরি করিয়া মজুমদার খেতাব প্রাপ্ত হন, এবং তদবধি আমাদের বংশাবলী ঐ খেতাবে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন । কিন্তু আপাততঃ ঐ খেতাব মনোরম বোধ না হওয়ায় আমাদের চিত্রপ্রচলিত মুখোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করা গেল ।”

একথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই । কত লোক কত অসৎকর্ম করিয়া খেতাব লইতেছে, অথচ কেহ তাহাদের নিন্দা করিতেছে না । এমত স্থলে আমাদের গ্রন্থকার কেতাব লিখিয়া খেতাব লইবেন, অথবা পুরাতন খেতাব, পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে ইহ খলু নখর জগতে কোন পাষণ্ডচিত্ত দুর্নীত ব্যক্তির আপত্তি হইতে

পারে ? কিন্তু গ্রন্থকার তদীয় বিজ্ঞাপনের প্রথম দফায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের নানারূপ আপত্তি আছে । প্রথম দফায় প্রথম পংক্তি এই,— “কয়েকটি কবিতা বিরচিত করিয়া কবিতামুকুর প্রকাশিত হইল ।” বাক্সালা ভাষা বেওয়ারিশী মাল হইলেও ইহাতে এইরূপ ব্যাকরণ-বিকল্প ও রীতিবিকল্প বাক্য প্রণীত হওয়া অনুচিত । দ্বিতীয় আপত্তি ‘পরাপরাদেন পরস্য দণ্ডে ।’ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,— “কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের রীতি অবলম্বন পূর্বক অধিকাংশ কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে ।” এই কথায় আমাদের কেন, অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে । গ্রন্থকার কিরূপ কবিতাকে হেমচন্দ্রের অনুকৃতি বলেন, নিম্নে তাহার একটি প্রদর্শিত হইল ।

“আশীলক্ষ বর্ষ পঞ্চাদি জনম,
জনমি জগতে, ভূঞ্জিয়া অসম
যাতনা যতেক, জীবাত্মা চরম,
হয় দুর্গে ভবে মান-বা-কারে ।

কত বিড়ম্বনা কঠোর নিগ্রহ,
ভোগ-শেষ হয় টুটে যবে গ্রহ,
যার তবে পেয়ে দীর্ঘ-অনুগ্রহ,
আগ্রহে জীবাত্মা পবিত্রাধারে ।”

এই কবিতাটিতে হেমবাবুর অনুকরণের মধ্যে আমরা এই দেখিয়াছি,— ইহার একস্থানে লেখা আছে, ‘প্রয়োগ’,— আর একস্থানে লেখা আছে, ‘শাখা’ এবং তৃতীয় একস্থানে লেখা আছে

‘পূর্ণকোরস্’। অনুকরণ মন্দ নহে।

৪। ‘কবিতা প্রমুখমালা। ত্রিরজনী-কান্ত বন্দ্র প্রণীত।’ এখানিতে নানাবিধ নীতি কথা আছে। যথা,—

“হে মানব! যে প্রতিজ্ঞা কর একবার,
দেখ যেন নাহি হয় অন্যথা তাহার।
বাক্যে যা বলিবে তাহা অবশ্য করিবে,
নতুবা বিভূর কাছে অপরাধী হবে।
প্রত্যয় হবে না কাক তোমার বচনে;
অতএব কর যত প্রতিজ্ঞাসাপনে।”

৫। ‘ভারত উদ্ধার। অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) ত্রীরামদাস শর্মা-বিরচিত।’ আমরা করিতা মুকুর এবং কবিতা প্রমুখ-মালার সঙ্গে সঙ্গেই যে, ভারত উদ্ধারের নাম করিলাম মানাবর ত্রিযুক্ত রামদাস শর্মা ইহাতে অবশ্যই পুলকিত হইবেন, এবং বিনা যত্নে, বিনা পরিশ্রমে এবং অত্যা-মাত্র অর্থ ব্যয়ে কবি সমাজে স্থান পাই-লেন বলিয়া অবশ্যই তিনি আনন্দ ভরে অশ্রুপাত করিবেন। কিন্তু তথাপি আমা-দিগকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হই-তেছে যে, ভারত উদ্ধারের অপর নাম ‘চারি আনা’—কবিতা মুকুর এবং কবিতা প্রমুখ মালার অপর নাম ‘ছয় আনা।’ বঙ্গে অদ্যাপি গুণাগুণের তার-তম্যানুসারে কাব্যের মূল্য নির্ধারণ হয় কি না,—অদ্যাপি লোকে কাঁচ কাঞ্চনের পা-র্থক্য দেখিয়া আপনা হইতেই আপনার উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লয় কি না, ইহা হ-

ইতেই রস-ভাব-বিচার-সক্ষম বিচক্ষণ পা-ঠকবর্গ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

মূল্য-গত ভারতম্যের কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপে সমালোচনা করিতে হ-ইলে আমাদের বলা আবশ্যক যে, রামদাস শর্মার এই নূতন কাব্য বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন সৃষ্টি। ইহার প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক পংক্তিই রচয়িতার অসাধারণ মনোস্থিতি এবং অনন্যসাধারণ ব্যঙ্গবর্ণন-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। ফলতঃ এই কাব্যখানির আদ্যন্ত পাঠ ক-রিলে মনে সর্বত্রই এই প্রতীতি জন্মে যে, বাঙ্গালার বিদ্যাশ্রুত ভট্টাচার্য্য এবং নাম কাটা সিপাহিদিগকে যদি কেহ চিনিয়া থাকে, তবে চিনিয়াছেন রামদাস শর্মা, এবং বাঙ্গালার অন্তঃসারশূন্য অকর্মণ্য বাগ্মী ও লেখকবর্গকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিও আমাদের এই রামদাস শর্মা।

উৎসাহ উপকারজনক, উৎসাহের অনুকরণে রূথা আশ্ফালন যার পর নাই অপকারজনক। স্বদেশবাৎসল্য সর্ব-তোভাবে প্রশংসনীয়, কিন্তু স্বদেশবাৎ-সল্যের নাম লইয়া সময় ও শক্তির অপ-চয় করা, এবং নট ও নটীর মত রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে যাওয়া সর্বতোভাবে নিন্দ-নীয়। কৃষিকার্য্য পৃথিবীর উপকারি,—পার্থিব প্রয়োজনে অপরিহার্য্য, কিন্তু কৃষি-কার্য্যের অনুরোধে মার্জারের দ্বারা হল-

চালনা, মুষিকের দ্বারা ক্ষেত্রোৎকর্ষ-বিধানের চেষ্টা একান্ত উপহাসের বিষয় । সাধনায় স্বর্গ আছে, কিন্তু সিদ্ধির প্রথম সোপান শিক্ষা । ইত্যাদি গভীর তত্ত্বকে অতি-গভীর বিজ্ঞপচ্ছলে বর্ণনা করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যাবিশেষে গ্রন্থকারের মনোরথ সফল হইয়াছে । যে তাঁহার এই ত্রিচত্বারিংশৎ পৃষ্ঠাতক পুস্তক খানি লইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপবিষ্ট রহিয়াছে, সে ই প্রথমে হাসিয়াছে,—হাসিয়া অনাকে হাসাইয়াছে, এবং পরিশেষে প্রতপ্তহৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে ।

রামদাস শর্ম্মার অমিত্রাক্ষর পদ্য নিতান্ত প্রীতিপ্রদ । ভাষা লইয়া ক্রীড়া করিতে, ভাষার রস-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া পাঠকের চিত্তে তৃপ্তি জন্মাইতে তাঁহার অণু-মাত্রও আয়াস হয় না । তিনি নিরন্তর ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ এবং শ্লেষ পরিহাসে ব্যাপ্ত রহিয়াও দুই এক স্থলে তুলিয়া কিরূপে অন্যবিধ উচ্চ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নোক্ত পংক্তিচয়ে তাহা প্রকাশ পাইবে ।

“কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত-সম ?
ভাসাইয়া জবাফুল গজ্জার সলিলে—
একটি একটি করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সব গুলি এনেছি ধরিয়া ।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,

দেখিছি নয়নে ছায় ! পারি নি ফিরাতে !
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই
স্বপ্নের শৈশব তবে চাহি না কি আয় ?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায় ?
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোতসম ?”

আমাদিগের সুযোগ্য সহকারী আ-
র্যদর্শনসম্পাদক ভারত-উদ্ধারের সমা-
লোচনা করিতে গিয়া অভিনববস্তুর দর্শন-
জন্য আনন্দের উৎসাহে ইহার একাধিক
উদ্ধৃত করিয়াছেন । আমরা যদি অধিক-
তর আনন্দোৎসাহে ইহার অপারাদ্বি উদ্ধৃত
করি তাহা হইলে আর রামদাস শর্ম্মার
‘চারি আনা’ লাভ ঘটয়া উঠে না ।
অতঃ আমাদিগের বিবেচনায় প্রত্যেক
বাস্তালিরই ইহাকে চারি আনা দক্ষিণা
দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যালভ করা কর্তব্য ।
আমরা এই নিমিত্ত ভারত উদ্ধারের আর
কোন স্থল উদ্ধৃত না করিয়া কেবল গ্র-
ন্থকারকে আশীর্বাদ মাত্র দিয়াই বিদায়
করিতে বাধ্য হইলাম । আমরা আশী-
র্বাদ করি, ব্যাস যেমন ভারত-কাব্য লি-
খিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বরে অমর হইয়া-
ছেন, রামদাস শর্ম্মাও সেইরূপ এই ভারত
উদ্ধার কাব্য রচনার জন্ত বিশিষ্ট কৃষ্ণের
বরে কম্পতকর অক্ষয়-ফল লাভ ককন,—
এবং হেম-তুলিকা-চিত্রিত শরীর মত ভা-
র্যা ও জয়ন্তের মত পুত্র লাভ করিয়া ই-
শ্বের উজ্জ্বল কাণ্ডিতে সমুজ্জ্বল হউন ।

যমুনা তটে ।

যমুনার কাল জল নাচিতে নাচিতে
দেখিছু ছুটিছে দ্রুত হাসিতে হাসিতে,
করি রঙ্গ মনসাধে; প্রেমিকে ফেলিয়া ফাঁদে
ভাগিরথী-কোলে স্রোত সোহাগেতে

ঢালিতে !

উদিত নবীন রবি, ধরিয়া নবীন ছবি,
তরল রূপের ছটা ঝলমল করিছে !
কি মরি সে কম কান্দি ! হৃদয়ে জন্মায় ভাস্তি,
তরল তপন হতে রূপধারা ঝরিছে !
কাল জলে ভাসি ভাসি ছড়াইয়া রূপরাশি
হাসিমাখা মুখে মরি জনমন হরিছে !
কেমন রবির ছবি যমুনা খেলিছে !

২

মন্দ মন্দ গন্ধবহ ফুলরেণু উড়ায়,
হাসিতে মাখায় হাসি স্রাবধারা ছড়ায়,
ফুলদলে নাচাইয়া, লতা পাতা কাঁপাইয়া,
কুঞ্জবন হাসাইয়া মূহুরবে বহিল ।
কালিন্দীর কালজলে আমরা কি বুতুহলে
রবির কণকছটা ঝলমল করিল !—
তরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গতালে তালে নাচিল ।

৩

কালিন্দীর কালজলে কিবা শোভা হইল !
নব খনদলে যেন সৌদামিনী হাসিল !—
লতা পাতা তরুদল সব হল সচঞ্চল,
একে, বেকে, থেকে থেকে, ধীরে ধীরে
কাঁপিল !

হলে পর হিমালয়, সেও হেথা হ'ত নয় !
আমরি কালিন্দী কিবা গঙ্গাজলে মিশিল ?
বরদার বক্ষে কেরে মসি-রেখা আঁকিল ?

৪

ত্রিটিশের জয়ন্তন্ত সমুন্নত বদনে
ভীমহর্গ ছুটিতেছে চুস্বিবারে গগনে !
ভীষণ গভীর বেশ, উজ্জ্বল বোমকেশ,
নিমগ্ন গভীর তপে !—সেও আজ কাঁপিল !
দেখিয়া কেহ না দেখে—দেখিয়া কেহ না

শেখে !—

না দেখিয়া কেহ কিংবা মনে মনে শিখিল—
যমুনার কাল জল কত খেলা খেলিল ।

৫

দেখিতে দেখিতে ভানু অন্তগত হইল ।
হাসি হাসি মুখশলী শশধর উদিল !
আমরি কি রূপরাশি ! সকলি উঠিল হাসি !—
রসবতী বসুমতী খল খল হাসিল ।
রজতের শুভ্রজলে জলস্থল ভাসিল !
তীরস্থিত পুষ্পোদ্যানে পুষ্পরাজি হাস্তাননে
হাসাইয়া জনমন কিবা মরি ফুটিল ।
গুণে বশ দিগ দল, ঢল ঢল সুধারস,
সুধারসস্রাববাহী সমীরণ ছুটিল !
গুঞ্জরবে অলি সবে দিবা ভ্রমে । জুটিল
সাগর-অঘরা মহী খেতাবের পরিল !—
একাকার ত্রিসংসার ! রূপে মন হরিল ।

শুভ্র জল, শুভ্র স্থল, ফল, ফুল, তরু দল,
শুভ্রতর নীলাশ্বর!—কমনীয় কোলেতে
নবশিশু শুভ্রমুখ—হৃদয়ে উথলে সুখ,
ভাসে যথা হেরি মাতা সুখ-সিন্ধু-জলেতে!
ভেসেছে সকলি পুত সুখ-সুখা-রসেতে ।

৭

হায় পূর্ব কথা সব আজি মনে পড়িল।
সুখের সাগরে এই বাড়বাগ্নি জ্বলিল !
চলিয়াছ চল চল, হে যমুনে ! বল বল
সে যমুনা তুমি কিগো, যার কালজলেতে
ভাসিত রাখিকা শ্যাম পুত প্রেমরসেতে!
ফুটিত কণকপদ্ম, বিমল অমৃত পদ্ম—
মধুগন্ধে আয়োদিত হত সব ধরণী ;—
যমুনে ! তুমি কি সেই নবধনবরগী ?

৮

যমুনে ! তুমি কি সেই মৃদুকলনাদিনী ?
কোথা সে গোপের বালা প্রফুল্ল ফুলের ডালা
অধরে মোহনবাঁশী,—বল গাজগামিনি,
কোথা রাখা-মনোহর—পরম পুরুষবর ?
কোথা সে পবিত্র প্রেম ? সুবর্ণের নলিনী ?
সেই মৃত্যু সেই গীত ; সে বাজনা স্থললিত
কোথা সেই মহোৎসব ? তপনের গরিমা ?
ও পবিত্র তব নীর সত্য কি গো কাল চির
কিংবা ভেবে ভেবে মনে পড়িয়াছে
কালিমা ?

কালিমা হৃদয়ে যার, কিসে হাসি কবে তার—
পশিলে কুসুমের কীট সে কুসুম ফুটে না!—
হতাশার চিত্রপটে ইন্দ্রধনু উঠে না ।

৯

কাল অচ্ছ জল তব, তপন তনয়ে !

নহে কতু, পড়িয়াছে কালিমা হৃদয়ে !
উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাস, অত্যাশ প্রাণাস স্বাস
হৃদয়-পাবক-ফ্যাস—সুফুলিজের অবনী !
তোমার এ হাসি নয়!—শশী কি উদ্ভিত হয়
অমানিশাগগনেতে ?—তুমিই যে কেবলি
বাহিরে শীতল রয়ে, অন্তরে গরল বয়ে,
গুমরে গুমরে সদা জ্বলিতেছ ললনে;—
তা নয় তা নয় নয় ; অচল সচল চয়
কাঁদিতেছে—পুড়িতেছে সদা মনোবেদনে।
কাঁদিব না আমি আর, আজিকে পেয়েছি
সার,

তব তটস্থিত যথা তরু লতা বল্লরী—
বায়ুবিলোড়িত জলে, উত্তাল তরঙ্গ দলে
হয় বটে লগু ভণ্ড,—ভুধর কি নগরী,—
সেই ধ্বংসে কিন্তু নয় ধ্বংস সেই সমুদয়—
কাঁপে বটে প্রভাকর—প্রতিদ্বন্দ্ব কেবলি ।
সেই মত আজ সত্য তরঙ্গিত বনুমতী
নীরবিলে ধায়ুবেগ হাসিবেক সকলি;—
ফুটিবে ও কালজলে সরসিজ-আবনী ।

১০

কুলুকুলু ধ্বনি করি প্রবাহিনী চলিল ।
সেই অচ্ছ নীরে কিবা চঞ্চল বিদ্রোহ বিতা
স্বর্ণ ভ্রততী কোলে কুমুদিনী জ্বলিল ।
নিশা হল অবসান, বিহঙ্গ ধরিল গান,
শীতল প্রভাত বায়ু মৃদু মৃদু বহিল ।
পূর্বাস্বরে কেবা আসি ঢেলে দিল হাসি—
রাশি—
আমরি কি রূপ ছুটা !—বনুজ্জ্বলা জানিল !
অতি রমণীয় বেশ, কুসুমে সজ্জিত কেশ,
সুধাময়ী উষাদেবী হাসি উকি মারিল !

আমরি এ কারুকার্য অভুলনা!—অত্যা-
শ্চর্য্য!—

প্রাসন্ন্য সহস্য আস্য পুনঃ রবি উদিল।
আদরে জগতজন নবরসে মাতিল।

১১

অগ্নি উষা সুহাসিনী! অমৃতের আসারে
হাসি যথা মৃদু মৃদু ভাসাইলে সবারে;—
শীতল শিশির জলে জুড়াইলে ধরাতলে—

সজ্জিবিলে সমুদায় পুন নব জীবনে;—
এ হৃদয় কবে বল হাসাইবে? মনানল
জুড়াইবে—পার কি গো? মধুরস মি-
লনে?

হে রবি উঠিলে ভাল মাখিয়া কিরণজাল,
কবে হে উঠিবে হাসি এ হৃদয়-গগনে;—
কৃটিবে পরম পদ্য দেখে তব বদনে।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিন্দন।

বিন্দন ভারতীয় ইতিহাস পটের এক-
খানি প্রধান চিত্র। প্রধান চিত্র বলিয়াই
অদ্যাপি বৈদেশিক সমালোচক গ্রন্থ ইহা
লইয়া কৌতুক-প্রিয় জনগণের সমক্ষে
আশ্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই
আশ্ফালন যাছারা দেখিতেছে, অথবা
লোকপরম্পরায় ইহার কাহিনী শুনিতেছে
তাহাদের কেহ অট্টহাস্যে করতালির
ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, কেহ
য়ুগায় মুখ বিকৃত করিয়া একটা অসহায়
পতিত জাতির দেহে কলঙ্কের দুর্গন্ধ পঙ্ক
ঢালিয়া দিতেছে, কেহ দুঃসহ মর্ম্ম বেদনার
অধীর হইয়া উদ্দেশে তর্জ্জনী সঞ্চালন
করিতেছে, এবং কেহ বা নির্জনে গম্ভীর
ভাবে অতীত ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া
দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘনিঃশ্বাস
ফেলিতেছে। এই বিচিত্র আশ্ফালনের
কারণ কি?

আমরা বলি এই আশ্ফালন কিছু
মাত্র বিচিত্র নহে। ইহা হৃদয়ের অপরি-
বর্তনীয় ধর্ম্ম অথবা প্রকৃতি-তরঙ্গিনীর অব-
শ্যাস্তাবী তরঙ্গ-লীলা। যখন যাহা পরি-
দৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার
প্রভাব বিস্তার করে, মানব প্রকৃতি তখনই
তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, মানব কল্পনা
তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরো-
হণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্গত
ধর্ম্ম নানাবর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই
ধর্ম্ম অথবা এই কল্পনার বলে, সে হয়ত
সমাজে পূজনীয় হইয়া অনেকের হৃদয়গত
শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবার অধি-
কারী হয়, অথবা হয়ত কলঙ্ক ও নিন্দার
পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া দিকারের অধি-
তীয় পাত্র হইয়া থাকে। বনাতুল-বিহা-
রিণী বিহঙ্গী যখন মানবের অগম্য কাননে
থাকিয়া অনন্ত লীলাকাশে মৃদুমধুর সঙ্গীত-

সুধা বর্ষণ করে, এবং আপনার সৌন্দর্য্য-মহিমায় আপনিই মুগ্ধ হইয়া শ্যামল তরুর শাখায় শাখায় নাচিয়া বেড়ায়, তখন কে তাহার বিষয় আলোচনা করে? কোন্ প্রাণিরূপান্তরের প্রতিপত্ত তাহার স্তুতিগীতিতে পরিপূরিত হয়? কোন্ কঠোর সমালোচকের কঠোর সমালোচনার ভীত্বাণে তাহার অমক্ক-রক্ষিত সুন্দর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্তু এই বিহঙ্গী যখন লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী হয়, তখন ইহার সম্বন্ধে কত তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী ইহার বশ, গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে কত বিষয় অজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। তখন কেহ এই বিহঙ্গীকে প্রাণ বিযুক্ত করিয়া উৎকট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করে। কেহবা বিরাগে বিতৃষ্ণায় ইহার কোমল-দেহ-বিচ্ছিন্ন কোমল পালক-রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে থাকে।

ঝিন্দন যদি এই বনবিহারিণী বিহঙ্গীর স্থায় আপনার মহিমায় আপনিই বিমুগ্ধ থাকিতেন; অথবা বিমুগ্ধ হইয়াই আপনার মহিমা বিকাশ আপনিই করিয়া সুখী হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন কাহারও বিযুক্ত বাণ বা প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্য হইতেন না। অনন্ত-প্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর স্থায় অথবা অনন্ত বিস্তৃত জলধি-হৃদয়ে নগণ্য জল-বিন্দুর স্থায় তিনি নীরবে উ-

স্থিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইতেন। কিন্তু ঝিন্দন এরূপ নীরবে সমুপ্ত হইয়েন নাই। অনেকে বিষয়-স্তমিত নেত্রে তাঁহার সমুপ্তান চাহিয়া দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণার রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাঁহার সমুপ্তান আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছে। ওয়াটালুর তীষণ ক্ষেত্রে বাহারা টলে নাই, পলাশির শোণিত স্রোত দর্শনে বাহারা বিচলিত হয় নাই, রাজনীতির রহস্যধারণে বাহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, বাহারা বারিদি বেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতার পূজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হইয়া যাকাপে প্রভুশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে; ঝিন্দন তাহাদিগকেও নিস্তেজ বণিক-প্রকৃতিক বলিয়া উপহাস করিতেন; তাহাদের বিভীষিকাও ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয়ের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইত। এরূপ তেজস্বিনী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে বৈদেশিক সমালোচক গণ আশ্ফালন করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা এই, ঝিন্দন তাহাদের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন, তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহারাই ঝিন্দনের চরিত্র-পটের চিত্রকর হইয়া সজ্জারগের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এ-

তৎ প্রসঙ্গে তাহাদের আশ্চর্যজনক আপনা হইতেই নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মানব মন সহজেই দুর্বল, সহজেই চঞ্চল, ও সহজেই তারল্য-বিকাশক। ইহা ধীরতা ও বিবেকের অবলম্বনে না চলিলে এই অপরূপ সংসার-প্রলয় পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। পদ্মপত্রের উপর বারিবিন্দু যতক্ষণ স্থির ভাবে থাকিতে পারে,—ততক্ষণ মন যদি ধীরতা ও বিবেক বিহীন হয়, তাহা হইলে কর্তব্য বুদ্ধি একবারে স্তম্ভিত হইয়া আইসে। এই কর্তব্য বুদ্ধির স্তম্ভীভাবে যদি অকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে বিদ্বানের চরিত্র অক্ষনে নিঃসন্দেহ সেই অকার্য্যানুপাতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

চিত্রকর চিত্রের যথাযথ স্থলে যথাযথ বর্ণ প্রতিকলিত না করিলে চিত্রখানি যে-রূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হয়, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে বিদ্বানের চিত্রও ঠিক সেই-রূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু পঙ্কিল পদার্থ ও যত কিছু অস্পষ্টা যুগাই সামগ্রী আছে, চিত্রকর অমানবদনে, অসংকচিত্ত হৃদয়ে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া বিদ্বানের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলঙ্কই এই চিত্রের উপাদান এবং একটি নারীকে কলঙ্কিত করিয়া তৎসংলগ্ন একটি প্রবল জাতির উপর সাধারণের বিরাগ উৎপা-

দনই এই চিত্রের উদ্দেশ্য। চিত্রকর এই উপাদান সঙ্কলনে ও এই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও উদারতার বিশেষ প্রশংসা এই, তিনি এই সমস্ত কলঙ্কের ভার বহনে কিছুমাত্র কাতর হয়েন নাই, ইহার উৎকট দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া কিছুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই। সংসার-বিরাগী পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের ন্যায় তিনি সকল প্রকার দুর্গন্ধময় দ্রব্যই আদরে অবিকার চিত্রে হস্তে করিয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইহাতে যুগা, লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে ধীরে কলঙ্কের রেখাপাত করাতে চিত্রের সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনও স্থলে কমনীয়তার বিকাশ নাই, কোনও স্থলে সরলতার স্ফূর্তি নাই, এবং কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্য্যের মদ্যসবিভ্রম নাই। অবাস্তব-সম্ভাতিত অপার জলধিতে যেমন একই নীলিমা ভাসিয়া বেড়ায়, নিষ্কম্প জলধর পটলে আচ্ছাদিত গগণে যেমন একই কালিমা লীলা করে, এই চিত্রের প্রতি রেখাতে সেইরূপ একই কলঙ্ক বিকাশ পাইতেছে। শবাসনা লোলরসনা কধিরাক্রুদেহা দিগম্বরী ভৈরবীর মূর্তিতে অথবা রোমের বীর চূড়ামণির প্রেম ভিখারিণী সৈশরী রাজবালাতেও মাধুর্য্য ও পবিত্রতার আভাস সম্ভবে, কিন্তু এই চিত্রে অণুমাত্র মাধুর্য্য ও পবিত্রতার

রেখাপাত সম্ভবে না। কালের করাল রাজ্যে তীব্র হলাহলময় যত নরক আছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবিম্বই এই চিত্রে প্রতিকলিত হইয়াছে। ঝিন্দনের ও ঝিন্দন-সংস্কৃষ্ট জাতির সহিত যাহাদের সহানুভূতি নাই; ইহাদের অভ্যুদয়ে যাহাদের লাভের স্পৃহা নাই, তাহারা যে এই কলঙ্কময় চিত্রের কলঙ্কিনী আভা দেখিয়া ঘোরতর করতালি-ধ্বনির সহিত অট্টহাস্যে উপহাস করিবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই যে ভারতীয় ইতিহাসপটে এইরূপ কালিমা বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণান্তেও তাহা বলিব না। অনেক বৈদেশিক, দী-রতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, ঝিন্দনের সহিত বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ন্যায়ের দিকে চাহিয়া ঝিন্দনের কার্য্য-কলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাদের প্রতিভাবে পূর্বোক্ত কালিমা অপসারিত হইয়া ঝিন্দনের চরিত্রে যথাযথ বর্ণ প্রতিকলিত হইয়াছে। আমরা যদি একথা স্বীকার না করি তাহাহইলে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষ-প্রকৃতি। দরিদ্র অসহায় ভারতবর্ষ দীর্ঘ নিঃ-শ্বাসের সহিত এই অপক্ষপাত পুরুষসিং-হদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

কি কি পাপ কার্য্য দেখাইয়া বৈদেশিকগণ ঝিন্দনকে কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করিব না। ঝিন্দন ধীরে

ধীরে যখন রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন রণজিতের সহধর্ম্মিণীরূপে পরিগৃহীত হইয়া আপনার ভবিষ্য ক্ষমতার অক্ষপাত করেন, এবং ধীরে ধীরে যখন কোহিনূরের কান্তিতে বিভাসিত হইয়া লাহোরের দরবারে রাজনীতির পর্যালোচনা করেন, বৈদেশিকের নেত্রে তখন তাঁহার যেরূপ পাপীয়সী মূর্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সে মূর্তি ধ্যান করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহার পর ঝিন্দন যখন স্বীয় নিয়-তিনেমির বহুবিধ আবর্তনের পর কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া বারিধি বেষ্টিত অপরিচিত ও অজ্ঞাতস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়েন, এবং এই স্থানে যখন অদৃষ্ট-লিপি তাঁহার জীবনশ্রোতঃ কালের অনন্ত শ্রোতে মিশাইয়া দেয়, তখনও ঝিন্দনকে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অ-ধিক কি, অদ্য যে পুরুষসিংহ ইংলণ্ডে থাকিয়া সকলের নিকট আদর ও প্রীতি পাইতেছেন, ভারতের ললাটমণি রাজরাজেশ্বরী বিক্টোরিয়া ষাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানিত করিতেছেন, কলঙ্কিনী ঝিন্দনের সম্মান বলিয়া তিনিও কলঙ্কী হইয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে লীলামর্কটের ন্যায় হৃত্য করিতেছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের কাহিনী শুনিলেও কর্ণে হস্তার্ণণ করিতে হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই কলঙ্ক, এত সূত্রে সূত্রে মাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, ভারত মহামাগর শতবর্ষ পরিশ্রম ক-

রিয়াও ইহা প্রকাশিত করিতে পারিবে না, হিমালয় স্বীয় গগনস্পর্শী শৃঙ্গাবলী পাতিত করিয়াও ইহা ধূলি রাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা ঝিন্দনকে চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব; কঠোর আঘাতে কঠোর প্রহারে যে অবলার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে তাহাকে আবার পদাঘাত করা যে মহাপাপ, চিরকাল ইহা আমরা মনে রাখিব। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্রলী। অবলা চিরদিনই দয়ার পাত্র। ইহার পর যখন দেখিতেছি, বহুলোকে বহুদিক্ হইতে একটি অবলাকে ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব তাড়না করিতেছে, অবাচ্য তৎসনার স্রুতিফল বাণে তাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিতেছে, এবং মৃত হইলেও নিরন্তর না হইয়া অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণ করিতেছে; তখন কে কোন্ প্রাণে সেই অবলার মৃতদেহে আঘাত দিতে সমুদাত হয়? কে কোন্ প্রাণে তাঁহার শত্রুদের উদ্দেশ্যিত নিন্দাবাদের পুনরুদঘোষণা করে? এই জনাই আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতেছি, বৈদেশিক সমালোচকগণ ঝিন্দনের চরিত্রে যে যে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুদঘোষণা করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিব না। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঝিন্দনের প্রতি যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে, যদি তৎসমুদয় সত্য হয়, তাহা

হইলে প্রকাশ করার দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে, লোকে ঝিন্দনকে যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিনী বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত কি না তাহার মীমাংসা করা কর্তব্য। এই মীমাংসা একবারে অসাধ্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়তর হয় নাই। সুতরাং তাহার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এদিকে ঝিন্দনের যে অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনাবলীর এইরূপ অসম্পূর্ণতায় একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায় কেবল বিষম অন্তর্দাহে অধীর হইয়া ঝিন্দনকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি? হইতে পারে ঝিন্দন অবলাসুলভ কমণীয়তার বশীভূত হইয়া একজনের প্রতি অধিক অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা একজনকে অধিক ভাল বাসিতেন; ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, পক্ষ-নদের অধিষ্ঠাত্রীর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষের মধ্যে গণনীয়। ইহার জন্য ঝিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমরা সঙ্কুচিত নহি। কিন্তু “অপরাধিনী” বলিবার পূর্বে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিব। অনুগ্রহ প্রদর্শন ও ভালবাসা অবলাহৃদয়ের অনিবার্য ধর্ম। ঝিন্দন অবলাহৃদয়ের

অধিকারিণী হওয়াতেই এই অবলাধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারক জগৎ ইহাতেও তাঁহাকে মার্জনা করিল না। ষাঁহার জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর এইরূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

ঝিন্দনের অন্য শত অপরাধ থাকুক, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে আপনার প্রভুত্ব যেরূপ বিস্তার করিয়া সকলের ভক্তি ও ভ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসের স্মৃতিগীতিতে অনন্তকাল বিঘোষিত হইবে। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, যখন আপনার অপূর্ণ প্রভাব ও অপূর্ণ প্রতিভাবলে হুম্মানুহুম্মনরূপে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পঞ্চনদ সমভ্রমে গাত্ৰোত্থান করিয়া তাঁহার লোকাভীত তেজোমহিমার নিকট মস্তক অবনত করিল। দরবারের অমাত্যগণ তখন তাঁহাকে তেজস্বী রণজিৎ সিংহের উপযুক্ত তেজস্বিনী মহিষী বলিয়া ভ্রদ্ধা করিতে লাগিল, এবং রাজ্যের প্রজাগণ তখন তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা ঝিন্দনের এই তেজস্বিতা এবং প্রজাসাধারণের এই ভক্তি ও ভ্রদ্ধার বিষয় কিছু কিছু বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হইতেই ঝিন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে।

ঝিন্দন এত দিন খনির অন্ধকারময় গর্ভে থাকিয়া আপনার প্রভাব আপনিই দীপ্তি পাইতেছিলেন, এক্ষণে খনির গর্ভ হইতে সমুখিত হইয়া চতুর্দিকে সেই দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর পঞ্জাব রাজ্য যে-রূপ অন্তর্বিজ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপ সিংহ এই সময়ে নাবালক; সুতরাং রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল না। ঝিন্দন এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লাহোরের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে যত্ন করেন। তিনি প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন, এবং প্রতি দিনই স্বীয় শিশু পুত্রের রাজ্য নিষ্কটক ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য রাজনীতির গূঢ়তম মর্ম্ম উদ্বেদ করিয়া সকলকে বিম্মিত করিতেন। যে দুই প্রতীপপ্রবাহ পরস্পরের আঘাতে প্রতিঘাতে হিংসাপরায়ণ হইয়া বেলাতুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল; ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একস্রোতে মিশিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল কেশাকেশি, মুষ্টিমুষ্টি, শোণিতপ্রাবে অধীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম হইতে পরস্পরে পরস্পরকে রোষকষায়িত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দর্পের স্পর্শ করিতেছিল, ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একহাড়, এক

প্রাণ হইয়া পরস্পরকে প্রীতিভাবে আলিঙ্গন করে। ষাঁহার হৃদয় এইরূপ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ, ষাঁহার মন এইরূপ উচ্চতর গ্রামে আরুঢ়, সে কখন অসার বা অপদার্থ হইতে পারে না।

যখন ঝিন্দন পঞ্জাবের শীর্ষস্থানে বর্তমান, রাজা লাল সিংহ তখন উজীরের পদে আরুঢ়। *লাল সিংহের কোনও অমাত্যোচিত গুণ ছিল না। পঞ্জাবের সকলেই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিত। লাল সিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া উচ্চতম সৌভাগ্যের অধিকারী হইরাছিলেন বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্যে তাঁহার কোনও গুণ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহ-যুক্তিতেই পর্যাবসিত হইরাছিল, উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইয়া চিত্তের উদারতা সাধন করে নাই; সুশাসনক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করে নাই; রণনিপুণতা কেবল তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত, উহা রণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যাদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লালসিংহ শিখসমাজে ধুমকেতু স্বরূপ ছিলেন। ঝিন্দন এই ধুমকেতুর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই! প্রভূত, নানা প্রকারে উহার প্রশংসা দিয়াছিলেন। ঝিন্দনের চরিত্রের এই অংশ নিতান্ত ক্ষীণ ও নিতান্ত দুর্বল। এই ক্ষীণতা ও এই দুর্বলতা ঝিন্দনের অব-

লাপ্রকৃতির দোষ। ঝিন্দন লাল সিংহের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন এবং তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা একটুকু অধিক ভাল বাসিতেন; সুতরাং অনুগ্রহ ও ভালবাসার পাত্রের দোষ ঝিন্দনের চক্ষে দোষ বলিয়াই পরিগণিত হয় নাই। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, ঝিন্দনের এই দোষ অবলাহুদয়ের দোষ বলিয়াই আমরা চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব।

রণজিতের মৃত্যুর পর খালসা সৈন্যের বিশৃঙ্খলা ও যথেষ্টাচারিতা দেখিয়া ইংরেজগণ আপনাদিগের সীমান্তপ্রদেশ (Frontier) রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। এজন্য বহুসংখ্যক সৈন্য ব্রিটিশ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই উদ্যোগ দর্শনে খালসা দিগের হৃদয় নানাপ্রকার আশঙ্কিত তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ঝিন্দনও এই তরঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবে আধিপত্য করিতেছিলেন, তখন সীমান্ত ভাগে ইংরেজদিগের সৈন্য-শৃঙ্খলা দেখিয়া ভাবিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সীমায় যে রূপ আট ঘাট বাধিতেছেন, তাহাতে ইচ্ছাং পঞ্জাবরাজ্য আক্রান্ত হইতে পারে। পূর্ব-স্মৃতি আসিয়া তাঁহার এই ভাবনার সহায় হইল। ঝিন্দন আবার ভাবিলেন, ইংরেজগণ এইরূপ কৌশলেই ভারতে আপনাদের রাজ্য প্রসারিত ক-

রিয়াছে ; এইরূপ কৌশলেই স্বাধীন রাজ্য সমূহে পরাধীনতার দুর্ব্বল লোঁচ নিগড় পরাইয়া দিয়াছে। এই কৌশলের বলেই দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দীর্ঘকাল হস্ত সঞ্চালন, পাদসন্তাড়ন ও শোণিত মোক্ষণের পর, কালের বিকট স্থলানে শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মধ্যে মুসলমান যোগরত তপস্বীর ন্যায় উর্দ্ধনেত্র হইয়া আপনার পূর্ব্ব গৌরবের ধ্যান করিতেছে। এইরূপ ভাবনায় অধীর হওয়াতেই ঝিন্দন প্রথম শিখ যুদ্ধানলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাধুখ হয়েন নাই। যে আশঙ্কায় খালসাগণ মদমত্ত বারণের ন্যায় শতজু পার হইয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিল, সেই আশঙ্কায়ই ঝিন্দন তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে ঝিন্দনের যে বিশেষ ক্ষমতা বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিব না। ঝিন্দন এবিষয়ে যদি তাঁহার পতির অবলম্বিত নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা পাইত।

লালসিংহও তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম শিখ যুদ্ধে খালসাদিগের পরাজয় হইল। ঝিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একপ্রকার ব্রিটিশ-সিংহের করায়ত্ত হইলেন। স্মরণ্য প্রথম শিখ-যুদ্ধের পরই ঝিন্দনের অদ্ভুত-চক্র এক গ্রাম নিম্নে যাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয় ব্রিটিশ

সিংহের হুর্নিবার ভেজের নিকট পরাভূত হইল না। ঝিন্দন অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্রের নদী পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনারদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। বিদেশী এই আশ্রয়, এই অনধিকারপ্রিয়তার ঝিন্দন মর্মে আঘাত পাইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট (হেনরী লরেন্স) ঝিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। এরূপ তেজস্বিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে আপনারদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেণ্ট ঝিন্দনকে লাহোর হইতে সেখপুরে নির্বাসিত করিলেন। সেখপুরও দীর্ঘকাল ঝিন্দনের লাভণ্য তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রহিল না। পরবর্তী রেসিডেণ্টের (ফেডরিক কারি) মন্ত্রণায় ঝিন্দন সেখপুর হইতে আবার ষায়াণনীতে নির্বাসিত হইলেন। এইরূপ উপহাসপরি নির্বাসনে ঝিন্দনের কিছুমাত্র বিকার পরি লক্ষিত হইল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়, ঝিন্দন অটল ভাবে অবিকার চিত্তে স্বীয় দশা-বিপর্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঝিন্দন এক সময়ে বে লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া

চারিদিকে আপনাব গৌরব বিকাশ করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট অবনতমস্তক ছিলেন; সেই লাহোর পরিভাগ সময়ে ঝিন্দের যেরূপ স্থিরতা দৃষ্ট হইয়াছিল, পঞ্জাব পরিভাগ সময়ে ও সেইরূপ স্থিরতার কিছুমাত্র হানি হইল না। যে পঞ্জাব এতকাল তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র বিনোদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। স্থির হৃদয়ে ঝিন্দন পঞ্জাব পরিভাগ করিলেন। বৈদেশিকের নিকট ঝিন্দের চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া বোধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া ঝিন্দের চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই স্থিরতার জন্য নারী সমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

এই নির্বাসন-ঘটনাই ঝিন্দের সৌভাগ্য-অভিনয়ের যবনিকা পতন। এই যবনিকা-পতনের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে যেন ভয়াবহকাণ্ড সম্ভটিত হয়; ঝিন্দের নির্বাসনই তাহার অন্যতম কারণ। এই ভয়াবহকাণ্ড দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতা-ইতিহাসের শেষ অধ্যায়; এবং দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগ্য-নেমির শেষ আবর্ত। সাগরের দুই উত্তল জলোচ্ছ্বাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে প্রলয়ের স্বপ্ন স্বরূপ

আসিয়া পরস্পরের সংঘর্ষে ভীষণ কোলাহল সমুখিত করে, এবং বহুক্ষণ যাত প্র-তিঘাতের পর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া অনন্ত বারি-রাশির সহিত মিশিয়া যায়, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ও সেইরূপ দুই প্রবল জাতি বিশ্ব-ত্রাস গর্জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া বহুক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ রণ-জিৎরাজ্যে করাল প্রলয়-কাদম্বিনী। ইহার হৃৎকম্পকারী জল-প্রবাহে শিখদিগের প্রভু মহত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহ ইষ্টকের উপর ইষ্টক প্রথিত করিয়া যে মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের প্রবল বাত্যাতেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ শিখ দিগের বীর্ষ্যবিক্রম অসাধারণ বিস্মুরণকারী। গুরুগোবিন্দ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে সাধারণ তত্ত্ব-সমাজে একত্রিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই তাহা পরিপক্ব হয়। যে চিনিয়ান ওয়ালার নাম ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, যে চিনিয়ান ওয়ালার জন্য ভারতবর্ষ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া প্রাণগত অন্ধার পূজা পাইয়া আসিতেছে; যে চিনিয়ান ওয়ালার শিখদিগের দুর্দমনীয় তেজের নিকট ওয়াটালুর্জি ত্রিচীষ তেজও পরাভব মানিয়াছে; দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই সেই চিনিয়ান ওয়ালার পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ হইয়া সক-

লের রসনায় রসনায় লীলা করিতে থাকে। বৈদেশিকের লিখিত ইতিহাস যাঁহাই বলুক না কেন, আমরা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ঝিন্দনের নির্বাসনকেই এই প্রলয়-ঘটনার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিব। অনেকে বলিতে পারেন, ঝিন্দনের নির্বাসনের সময় পঞ্জাবে বিপাকের কোন ও চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কেহই অশ্রুপাত, হাহাকার, শিরে করাঘাত করিয়া এই নির্বাসন-সম্বাদ চারিদিকে ঘুঘিয়া বেড়ায় নাই। পঞ্জাব নিবাস, নিষ্কল সমুদ্রের ন্যায় ধীর ভাবে ঝিন্দনের নির্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে; সুতরাং ঝিন্দনের নির্বাসনকে শিখজাতির সমুৎপাদ ও তন্নিস্কন যুদ্ধ-সম্বটনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহারা মানব প্রকৃতির তত্ত্বানভিজ্ঞ। আমরা শত হস্ত দূর হইতে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি। তাঁহারা যাঁহাকে আত্মাঙ্গের চিহ্ন মনে করেন, আমরা তাঁহাকেই বিষয়-মর্ষ-পীড়ার বিষম দাহন মনে করি; এবং তাঁহারা যাঁহাতে সুখ ও শান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, আমরা তাঁহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনোবেদনা দেখিয়া দুঃখিত হই।

যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে না; তাঁহা সামান্য বাহ্য বিকারের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই দুঃখ দুঃখের অভিনয় প্রদর্শন মাত্র।

যখন দেখি, কেহ দুঃখে অধীর হইয়া দুই হস্তে মস্তকের কেশউৎপাটন করিতেছে, হাহাকারে রোদন করিয়া চারিদিকে জনতা রুদ্ধ করিতেছে, তখন সদয় ভাবে তাঁহাকে দুঃখের অভিনয়কারী বলিয়াই নির্দেশ করিব; কিন্তু যখন দেখিব, কেহ কোন ঘোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে ত্রিয়মান হইয়া অধীচিবিষ্কোভিত সাগরের ন্যায় ধীর ভাবে বলিয়া আছে, মস্তকের এক গাছি কেশও নড়িতেছে না, এক বিন্দু অশ্রুও নেত্র হইতে বিচূত হইতেছে না; হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত স্ততাশন ধস্, ধস্, করিতেছে, কোন বাহ্য ভঙ্গীর সহিত তাঁহার তাপ বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে না; পরমাত্মসংযত, ধ্যানপ্রমিতনেত্র যোগীর ন্যায় নিঃশব্দ ও নিষ্পন্দ ভাবে সে আপনার জ্বালায় আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে; তখন তাঁহাকে কাতর ভাবে দুঃখের জীবন্ত মূর্তি বলিয়াই উল্লেখ করিব। “অপ্প দুঃখ নেত্র বারির সহিতই বিগলিত হয়; অপ্প ক্রোধ ক্রকুৎস্ন ও দম্ব ঘর্ষণের সহিতই নির্বাপিত হইয়া যায়; অপ্প আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিতই বিলয় পায়।” কিন্তু যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রসারিত হয়, যে ক্রোধ শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, যে আশঙ্কা মর্মে মর্মে বদ্ধমূল হইয়া অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করিতে থাকে, তাঁহা কখনও অশ্রুজল, ক্রকুৎস্না ও দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের সহিত বিলীন হয় না। ঝিন্দ-
নের নির্বাসন সময়ে পঞ্জাবের যে নিশ্চল
ভাব লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ দুঃখ,
ক্রোধ ও আশঙ্কা-মূলক। পঞ্জাবের এই
নিশ্চলতা শান্তির নিশ্চলতা নহে; ইহা
গভীর দুঃখ, গভীর ক্রোধ ও গভীর আশ-
ঙ্কায় নিশ্চলতা। এই দুঃখ, ক্রোধ ও আশ-
ঙ্কায় দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। গুরু
গোবিন্দ সিংহের মহিমা-বলে পঞ্জাবের
অন্তর্নিগূঢ় তুষানল এই যুদ্ধের সময়েই
প্রচণ্ড তত্যাশনে পরিণত হইয়া বিষম ক্ষু-
লিজক্রীড়া প্রদর্শন করে। যে বীর শ্রেষ্ঠ
চিনিয়ান ওয়ালায় বিজয় বৈজয়ন্তীতে
পরিশোভিত হইয়াছিলেন; যুদ্ধের সময়
যাঁহার হস্তে সেনানায়কতা সংরক্ষিত ছিল,
সেই পুরুষ-পুঙ্গব সের সিংহও ঝিন্দনের
নির্বাসনে মর্মান্বিত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ
করিয়াছেন, “ইহা সকলেই ভালরূপে
জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাব-
বাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পু-
থিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কি-
রূপ দোরাওয়া, অত্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাত-
কতাসহকারে পরলোক-সুখ-ভোগী রণ-
জিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত ব্যব-
হার করিয়াছে, এবং কিরূপ দোরাওয়া
এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত ক-
রিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ তাহার সমস্ত
প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কান্নাকন্ড
ও হিন্দুস্থানে নির্বাসিত করিয়া সন্ধিতল
করিতে ক্রটি করে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহা-

দের দোরাওয়া শিখগণ এতদূর নিপীড়িত
হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম নষ্ট
হইয়া গিয়াছে; এবং তৃতীয়তঃ, আমা-
দের রাজ্য পূর্বাপেক্ষা গৌরব শূন্য হইয়া
পড়িয়াছে *।” ইহাতে ও কি বলিব ঝি-
ন্দনের নির্বাসনে পঞ্জাব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ
হয় নাই? ইহাতে ও কি বলিব, পঞ্জাব
নিঃস্বপ্নে ঝিন্দনের নির্বাসন চাহিয়া
দেখিয়াছে?

কিন্তু ঝিন্দনের নির্বাসনে কেন প-
ঞ্জাব এইরূপ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইল? কেন
পঞ্জাবের প্রতি রোমকূপে ক্রোধের অনল-
কণা প্রবিষ্ট হইল? কেন পঞ্জাবের শি-
রায় শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল? ই-
হার একই উত্তর, ঝিন্দনের প্রতি পঞ্জাবের
আন্তরিক ভক্তি, আন্তরিক অঙ্কা ও আ-
ন্তরিক ভালবাসা। অঙ্কা, ভক্তি ও
ভালবাসার পাত্রের শোচনীয় দশা কথ-
নই শাস্তভাবে নিরীক্ষণ করা যায় না।
পঞ্জাব যাঁহাকে পরম দেবতার ন্যায়
ভক্তি ও অঙ্কা করিত, মাতার ন্যায়
সরল হৃদয়ে ভাল বাসিত, তাঁহার নি-
র্বাসনে যে পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হল-
লে কালীময় হইয়া উঠিবে, তাহা
সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এক্ষণে
এরূপ ভক্তি, অঙ্কা ও ভাল বাসার পা-
ত্রকে আমরা কোন্ প্রাণে পাপীয়সী ও
কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিব? কোন্ প্রাণে

* সের সিংহের এই উক্তির জন্য
প্রবন্ধলেখক দায়ী নহেন।

এরূপ উজ্জ্বল মূর্তিতে কলঙ্কের পক্ষ লেপিয়া হৃদয় অপবিত্র করিব ? যাঁহারা এরূপ পবিত্র ভাবে দেখিয়াও বিন্দনকে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু । তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পবিত্র ভক্তির অবমাননা করেন, পবিত্র প্রজ্ঞার মুগ্ধচ্ছেদ করেন, এবং পবিত্র ভালবাসার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন । তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন ও সহানুভূতি নাই ।

এই উজ্জ্বল্যেই বিন্দন বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত ভারতবর্ষ বিভাসিত করিয়াছিলেন ; এই উজ্জ্বল্যেই বিন্দনের সমস্ত ক্ষীণতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই উজ্জ্বল্যেই আমরা বিন্দনের এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছি । বিন্দন তেজস্বিনী নারীর অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তভূমি । তিনি লাবণ্যালীলাময়ী ললনা হইয়াও, দৃঢ়তা ও অটলতার আত্মদা ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা হৃদয়ের অধীকারিণী হইয়াও, ঘীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়াও ভীম-গুণাবিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন । ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোনও নারী এরূপ হঠাৎ সমুপস্থিত হইয়া একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত এরূপ তেজস্বিতা ও শাসন ক্ষমতার স্পর্ধা করে নাই । আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, বিন্দনের তরল প্রকৃতিতে অনেক খুঁত থাকিতে পারে । কিন্তু তাহাতে যে সকল অলোক-সামান্য গুণ আছে, তাহার জন্য

বিন্দনকে আদর না করা কাপুরুষতার কর্ম্ম । কবে কখন ক্রিওপেট্টা আপনায় সমোহন রূপ-মাগরে সকলকে ডুবাইয়া প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন, কবে কখন কুইন মেরী হৃদয়ের গরল ঢালিয়া আপনার পাণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন ; বিন্দনের একটা খুঁত দেখিয়াই তাঁহার চরিত্রে সেই ক্রিওপেট্টা বা কুইন মেরীর কলঙ্ক লেপন করা প্রকৃত সামাজিকতার লক্ষণ নহে । দোষকে সকল স্থলেই দোষ বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, এবং গুণকে সকল স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের সহিত গ্রহণ করা উচিত । কোনও বিশ্ব-শত্রু পাষণ্ডের কোনও অলোকসামান্য গুণ হৃদয় দিলে তাহার পাষণ্ড ক্ষণ কাল বিস্মৃত হইয়া তাহার লোকাভীতি গুণের পূজা করা কর্তব্য । যখন দেখিতেছি, এক জন নির্দয় দম্ভা একদিকে মূর্তিমান পাপের ন্যায় সকলের হৃদয়-বৃত্ত স্থির করিয়া সর্ব্বদা বিলুপ্ত করিতেছে ; অপর দিকে অপরিমিত, ও অনবদ্য ভক্তির সহিত মাতার পদসেবা করিতেছে ; এবং অপরিমিত ও অনবদ্য প্রেমের সহিত বনিতার মনোরঞ্জন করিতেছে ; তখন তাহার মাতৃভক্তি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিকট সহজেই মল্লক অবনত হইয়া পড়ে । যখন দেখিতেছি, একজন নিষ্ঠুর দুরাশয় এক সময়ে একজন নির্দোষ নিরীহের উপর অত্যাচারের পরাক্রান্ত দেখাইয়া আপনার দুরাশয়তা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আ-

বার পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে স্নান করিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন ভক্তিরসার্দ্ধ হৃদয়ে স্বীয় অশ্রুজল ভাগীরথীর জল প্রবাহের সহিত মিশাইয়া উর্দ্ধনেত্রে নিষ্পন্দ ভাবে পরম দেবতার আরাধনা করিতেছে; তখন আপনা হইতেই তাহার দেবভক্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ নীচাশয় নির্ভুরগণও যখন সময় বিশেষে হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন বিন্দন এক জনের প্রতি একটুকু অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ দেখাইতেন অথবা একজনকে একটুকু অধিক মাত্রায় ভাল বাসিতেন বলিয়াই যে তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপাত্র হইবেন, হৃদয় থাকিতে আমরা

ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিন্দনকে আজীবন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই দেখিব; আজীবন বিন্দনের চরিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিব। আমরা কখনও অপরের আরোপিত কলঙ্কের কথায় সায় দিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব না। বৈদেশিক গণ যেরূপ জঘন্য ভাবে বিন্দনের চরিত্র আঁকিয়াছেন, যেরূপ জঘন্য ভাবে অসহায় ভারতের একটা অসহায় ললনার উপর কলঙ্কের কালীমা বর্ষণ করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব; এবং চিরকাল ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত সেই জঘন্য চিত্রের প্রতি তাক্ষীল্য দেখাইব।

জীবন প্রভাত।

অক্টম পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

“অসুর-উচ্ছিক্ত গ্রাসি পুষ্ট কলেবর ?
অসুর পদাঙ্করজঃ; শোভিত মস্তকে ?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীৰ্য্য সময়ের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্বদিকে রক্তিমাম্বুটা দেখা যাই-

তেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড় প্রবেশ করিলেন। উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, উকীষ ও তুলার কুর্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ষ ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে ‘ভবানী’ নামক প্রসিদ্ধ খজা। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ ঝক্‌ ঝক্‌ বটে, কিন্তু সুবদ্ব, সুদৃঢ়বদ্ধনী ও পেশীগুলি বর্ষের নীচ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশীওয়া মূর-

খর ত্রিমূল পিজলী সানন্দে তাঁহাকে আ-
হ্বান করিয়া বলিলেন—

‘ভবানীর জয় হউক ! আপনি এত-
ক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।’

শিব । ‘আপনার আশীর্বাদে কোন্
বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি ?’

মুর । ‘সমস্ত স্থির হইয়াছে ?’

শিব । ‘সমস্ত।’

মুর । ‘অদারাত্তি বিবাহ ?’

শিব । ‘অদাই।’

মুর । ‘শায়েস্তাখাঁ কিছু জানেন
না ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানে না ?’

শিব । ‘শায়েস্তাখাঁ ভীত শিবজীর
নিকট সন্ধি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন ;
যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর
যুদ্ধ করিবেন না।’ শিবজী সবিশেষ বি-
বরণ বলিলেন ।

মুর । ‘যশোবন্ত ?’

শিব । ‘আপনি পাত্রে যে সমস্ত
যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার
মন বিচলিত হইয়াছিল ; আমি যাঁহাই
দেখিলাম তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া র-
হিয়াছেন ; পুত্ররাং অনারাসেই আমার
কার্য্য সিদ্ধ হইল।’

মুর । ‘ভবানীর জয় হউক ! উঃ
আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য্য-
সাধন করিলেন তাহা সহস্রের অসাদ্য।
যে অসমসাহসী কার্য্যে প্ররত হইয়াছি-
লেন তাবিলে একগুণে হৃৎকম্প হয়। শি-
বজী ! শিবজী ! এরূপ কার্য্যে আর প্ররত

হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহা-
রাষ্ট্রের কি থাকিবে ?

শিবজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন ‘মু-
রেশ্বর ! বিপদে ভয় করিলে অদ্যাবধি জা-
য়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদে ভয় ক-
রিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন
হইবে ? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে
ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী কখন যেন মহা-
রাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।’

মুর । ‘বীরশ্রেষ্ঠ ! আপনার জয়
অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করি-
বেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশি-
বিরে, একাকী ছদ্মবেশে ? অঙ্গীকার ক-
খন এরূপ আচরণ করিবেন না, আপনার
কি বিশ্বস্ত অনুচর নাই ?’

শিবজী দেখিলেন বিশ্বস্ত পেশওয়ার
নয়নে একবিন্দু জল। হাস্য করিয়া বলি-
লেন,—‘অত্ৰ সতাই একটী মহা বিপদে
পতিত হইয়াছিলাম।’

মুর । ‘কি ?’

শিব । ‘এমন মূর্খকেও আপনি
সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন। আপন
নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে সংস্কৃত
স্মরণ রাখিবে ?’

মুর । ‘কেন, কি হইয়াছিল ?’

শিব । ‘আর কিছু নহে, শায়েস্তা-
খাঁর সভায় বাইয়া ত্রায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়
সমস্ত শ্লোকগুলি তুনিয়া গিয়াছিলেন।’

মুর । ‘তাঁহার পর ?’

শিব । ‘দুই একটী মনে ছিল, তদ্দা-

রাই কার্য্য সিদ্ধ হইল।' সহাস্য বদনে শিবজী শয়নাগারে গেলেন।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব্ব রত্নান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এইটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, স্মৃতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী ও পিতামহের নাম মল্লজী-ভনস্লে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে কল্কতন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি; সেই বংশের যোগপাল রাও নায়েকের ভগ্নী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায়, আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক একজন মুসলমানপীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

আহম্মদনগরের প্রসিদ্ধনামা লক্ষজী যাদব রাওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ হইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে জুলির দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র,

যাদব রাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, স্মৃতরাং বালক বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদদর্শনে যাদব রাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন 'কেমন, তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিবি?' পরে অত্যাশ্চর্য্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'তুই জনে কি সুন্দর জোড় মিলিয়াছে!' এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগু নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন 'বন্ধুগণ! সাফী থাংকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অতু প্রতিশ্রুত হইলেন।' সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চ বংশজ, শাহজীর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই; কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পর দিন যাদব রাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও মেরুপ স্বীকার করিলেন না, স্মৃতরাং মল্লজী আগিলেন না। যাদব রাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশদর্শাদার অভিমানিনী। কথিত আছে যে যাদবরাও রহস্য করিয়াও আপন হুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী

তঁাহাকে বিলক্ষণ দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। মল্লজী সরোষে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন-ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তঁাহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাজী-য়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছিলেন, ‘মল্লজী, তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শাস্ত্র ন্যায় গুণাশ্রিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ন্যায়বিচার পুনঃ স্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্ৰুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তঁাহার সময় হইতে কাল গণনা হইবে ও তঁাহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।’

সে বাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তঁাহার শ্যালক যোগপালও তঁাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহমদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বরোহীর সেনাপতি হইলেন, ‘রাজা ভূম্ভে’ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণী ও চাকান দুর্গ ও তৎপার্শ্ব দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জায়গীর স্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যুদ্ধবরাণ্ডের কোন আপত্তি রহিল না; ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মহা সমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল; ও

আহমদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়স্ক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহমদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশবৎস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আকবরের পর জাহাঙ্গীর ও তৎপর শাহজিহান আহমদনগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান; পরে শেষোক্ত সত্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধকালে শাহজী স্রুগু ছিলেন না। ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহমদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অঘরের অধীনে ছিলেন ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। নয় বৎসর পর তিনি দিল্লীশ্বর শাহজহাঁর পক্ষাবলম্বন করিলে, উক্ত সত্রাট তঁাহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বরোহীর সেনাপতি করিলেন ও অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সত্রাটদিগের অনুগ্রহ আজ আছেত কাল থাকে নাই; তিন বৎসর পর শাহজীর কতকগুলি জায়গীর সত্রাট কাড়িয়া লইয়া ফতেহখাঁকে দান করেন, তাহাতে শাহজী বিরক্ত হইয়া, সত্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে বিজয়পুরের সুলতানের

পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও আপন মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিজয়চরণ করেন নাই।

পতনোন্মুখ আহমদনগর রাজ্য নিজ অসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর স্বাধীন রাখিবার জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একজনকে সুলতান বলিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিলেন, কতকগুলি বিজয়চরণের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহু সংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মাত্রাট শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুলতানকে এককালে দমন করার জন্য অষ্টচত্রাংশৎ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীস্থরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহমদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭) এবং শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাই দ্বারা শাহজীর শত্রুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা লক্ষজী যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভব সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খ্রিঃ অব্দে, শাহজী টুকাবাই নাম্নী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিলেন ও পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন, তথায় তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটি পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতিবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্মচারী ছিলেন। দাদাজী কানাইদেব পুনায় জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; নারায়ণপন্ত নামে অন্য কর্মচারী কর্ণাটের জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খ্রিঃ অব্দে স্বর্ণীভূর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুন হইতে অনুমান ২৫ কোশ উত্তরে ও জুনীর নামে খ্যাত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কর্ণাটাতিমুখে যাইলে, জীজী সপুত্রা পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাই

দেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন ।

শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্বে সেই গৃহে শায়িতাথাকে দেখিয়াছি ।

মাতা পুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্প বয়সেই দক্ষিণ ব্যবহার, বর্ষা নিষ্ক্ষেপ, নানারূপ মহারাজীর খজা ও ছুরিকাচালন ও অশ্বাবোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন । মহারাজীর মাত্রেই অশ্বচালনার তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন । এইরূপ বাণাম ও যুদ্ধশিক্ষার বালকের দেহ শীঘ্রই স্বদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল ।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যাই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না । যখন অবসর পাইতেন দাদাজীর চরণোপাস্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন । শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্বেক হইল, হিন্দুধর্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইল, সেই পূর্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল ; ধর্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল । অচিরেই শাস্ত্রা-

নুযায়িক সমুদয় ক্রিয়া কথ্য শিখিলেন, এবং কথা শুনিতে এরূপ আগ্রহ জন্মিল যে অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন ।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে, শিবজী অল্পকাল মধ্যেই স্বধর্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, ও বোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন । আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে এবং দল্লীগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পার্শ্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্বদা যাতায়াত করিতেন । সেই পর্বত বিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন পথে কোন দুর্গে যাওয়া যায়, কোন কোন দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত । কখন কখন কেবলদিন ক্রমাগত এই পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে বাপন করিতেন ; কোন দুর্গ কোন পথ, কোন উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না । শেষে কিরূপে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও অচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন । তিনি অনেক প্রবোধবাণী

দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া জায়গীর যাহাতে সুচাক্ষুণে রক্ষা হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহা দিগকে বড় ভাল বাসিতেন, ও তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণের মধ্যে যশজীকর, তরু-জীমালজী ও বাজীফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণ দুর্গের কিল্লাদারকে কোন-রূপে বশবর্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণ দুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে; এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়স-ক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণ দুর্গের দেড় কোশ দক্ষিণ-পূর্বে একটি তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন।

বিজয়পুরের স্থলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা ক-

রিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্মচারী শাহজী এসমস্ত বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সন্ধানশ ইহবার সম্ভব তাহা অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া শিবজীর পিতা বিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান পাইয়াছেন তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্যদ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। রক্ত পুনরায় ভৎসনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু বাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যা যেন দাদাজীর দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সম্মুখ ভাবে বলিলেন “বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর; ব্রাহ্মণ, গো-বৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।” রক্ত চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর

হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ ক্ষীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বরংক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কন্দানার নাম পরিবর্তিত করিয়া সিংহগড় রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজীমহিতী সোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনী সময়ে আপন মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভদ্র আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাক্পটুতার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া ও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক বু-

ঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহার নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারাকদ্ধ করিলেন ও তাহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে বদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দী স্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমান অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন একেবারে অস্বীকার করিলেন তখন শিবজী নিজ লোকদ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করেন। শিবজী আপন উদ্দেশ্যসাধনার্থ অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে গর্হিত কার্য্য আর একটা করিয়াছিলেন কি না সম্ভেদ। সমস্ত জৌলী প্রদেশ অধিকার করিলেন

ও সেই বৎসরেই (১৬৫৬) প্রতাপগড় নামক একটা নতুন দুর্গ নির্মাণ করাইলেন, ও আপন প্রধান মন্ত্রী সত্ৰাজপন্তকে পেশওয়া খেতাব দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সত্ৰাজ কঙ্কণদেশে ফতেখাঁর নিকট পরাস্ত হওয়ার শিবজী তাঁহাকে অকৰ্ণ্য বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমূল পিজলীকে পেশওয়া করিলেন। মুরেশ্বরের সহিত পাঠক পূর্বেই পরিচিত হইয়াছেন। সমগ্র কঙ্কণদেশ জয় করিবার জন্য বহু-সংখ্যক সৈন্য জড় হইল।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বরোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। গর্বিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে শীঘ্রই সেই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়তথ্যের নিকট উপস্থিত করিবেন। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ হইল ও নানারূপ কথাবার্তা হইল, রজনী বাগমার্য গোপীনাথের জন্য একটি স্থান নির্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের

সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন 'আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ ককন। আমি যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্মের জন্য করিয়াছি; স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু-দেব ও দেবালয়ের উদ্ভিষ্টকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্মের শত্রুর বিকটচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন ককন, ও আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস ককন।' এইরূপ উত্তেজনা বাক্যের পর শিবজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জয়লাভ হইলে তিনি গোপীনাথকে হেওরা গ্রাম অর্পণ করিবেন। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সেই গ্রাম তাঁহাদেরই থাকিবে। গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যোত্তর হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার হইলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে কার্যাসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যিক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবকারোহণে নির্দিষ্ট গৃহে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন ; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ যাচঞা করিলেন ; তুলার কুর্টি ও উষ্মীষের নীচে লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন ; দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বালা-সহচর তন্নজীমালতীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজলের নিকট আসিলেন,—আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন । শিবজীর উদ্দেশ্য সাধন হইল, কিন্তু এই গহিত কার্যে তাঁহার যশোরাশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে । তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেনা আবুল ফাজলের সেনাকে পরাস্ত করিল, অন্নজী দত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্মচারী পানান্না ও পবনগড় হস্তগত করিলেন, বিজয়পুরের অন্য সেনাপতি রত্নম জমানকে সমুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন ।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না । অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন । শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন শিবজী পিতৃভক্তির পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ

করিয়া পিতাকে রাজার তুলা অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলে ও তিনি পিতার সমুখে আসন গ্রহণ করিলেন না । কয়েকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন । শিবজী পিতা কর্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিকটাক্ষর করেন নাই । শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না ।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধিসংস্থাপন হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয় । আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে । মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ পদাতিক সেনা ছিল ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

শুভকার্য সম্পাদন ।

“যুগে যুগে কপ্পে কপ্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত বহিতে ।
জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্ণ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিলাস্ত প্রদীপ্ত শিখায়,

দহক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র পরম্পরা দধ্ব তির শৌকানলে।”

ঈহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অন্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়া-
ছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ
নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে; এত নিঃ-
শব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দু-
র্গের ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিতে
পারে না।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কএকজন
মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সেই
দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর! দুর্গ-
তলে, পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরা নদী প্রবাহিত
হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্ত কা-
লের নব পুষ্প পত্র ও দুর্ন্দাদলে স্রশো-
ভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে।
উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত
সুন্দর হরিষ্মণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল
দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনা
নগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধাগণ
প্রায়ই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অত-
রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা
সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছি-
লেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিম-
দিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পর
উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায় অনন্ত প-
র্ব্বতশ্রেণী নীল মেঘমালায় বিজড়িত রহি-
য়াছে, অথবা অন্তাচলচূড়াবলস্বিসূর্য্যকি-
রণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে! কিন্তু
বোধ করি যোদ্ধাগণ এই চমৎকার পর্ব্বত

দৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য
চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে
একবারে বহুকালের ব্যস্তিত ফল লাভ
হইতে পারে বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে
পারে, তাহার প্রাকালে মুহূর্ত্তের জন্যও
অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ ও স্ত-
ম্বিত হয়। অতঃ শায়েস্তাখাঁ ও মোগল
সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা
অসমসাহসে মহারাষ্ট্র সূর্য্য একবারে
তির-অন্ধকারে অন্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা
অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্বেক হইতে
লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন
না, ভবানীর আশীর্বাদে অবশ্যই জয় হ-
ইবে, সকলেই এইরূপ বনিয়াছিলেন, ত-
থাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে
নিরীক্ষণ করিলেন তখন কাহারও মনোগত
ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ
বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী
শত্রুসেনার মধ্যে বাইয়া আক্রমণ করি-
বেন! এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজীও ক-
খন লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ! কে-
নই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও
চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশ-
ওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্প বয়সে
তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে
যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিব-
জীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগাড়ের চমৎ-
কার দুর্গ তিনিই নির্মাণ করেন। চারি

বৎসরাবধি পেশওয়ার পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজলে কেশবজী হত্যা করিলে পর যুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওয়া অবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, যুরেশ্বর অপেক্ষা কার্যাদক্ষ কর্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় রিভীর একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলপুস্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণ দুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রাঙ্গগড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্ত ও অজ্ঞা সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্বে তিনিই পানান্না ও পবনগড় হস্তগত করেন, ও শিবজীর কর্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্যদক্ষ ছিলেন।

অখারোহীর সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী পহলকর সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল সৈন্যের সম্মুখ দিয়া বাইরা আরজাবাদ ও আহমদনগর ছাড়বার করিয়া আসিয়াছিলেন।

তাঁহা আমরা খারোহীর সভায় চাঁদখাঁর প্রমুখ্যে শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অশ্বসংখ্যক অখারোহী সেনা কর্তাজী ওজরনামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বাল-মুহুদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল; তন্নজীমালজী ও যশজী কত অজ্ঞা সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাকালের সৌহার্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস ইহারা একগুণে ভুলেন নাই, শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন; শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্বত দুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধামণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমন সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ষ ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অন্য নিশির অসমসাহসিক কার্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

ধীরে ধীরে বলিলেন “সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ! বিদায় দিন।”

কণেক সকলেই নিশ্চয় হইয়া রহিলেন, শেষে মুরেশ্বরপত্ত বলিলেন “ তবে নিরু করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না ? মহাজ্ঞান ! বিপৎকালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি ? ”

শিবজী। “ পেশওয়ারী ! কমা কন, আর অনুরোধ করিবেন না ; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিস্মৃত নাই ; কিন্তু অদ্য কমা কন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য সাধন করিব নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ কখন জয়লাভ করিব ; নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিন জন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলেই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুজিবলে দেশ থাকিবে ? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে ? হিন্দু-গৌরব কে রক্ষা করিবে ? বাজাকালে আর অনুরোধ করিবেন না। ”

পেশওয়ারী বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। শিবজী পেশওয়ারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

“ মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃ-

তুলা, আশীর্বাদ কখন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী ! তন্নজী ! আশীর্বাদ কখন, আমি কার্যে প্রস্থান করি। সকলেই বাষ্পোৎকুল লোচনে বিদায় দিলেন।

পরে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ বালা-মুহুৎ ! বিদায় দাও। ”

দুই জনই খেদে নির্ঝাক ! কণেক পর তন্নজী বলিলেন—“ প্রভু ! কি অপরাধে আমাদের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন ? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গ জয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম ? পূর্বকাল স্বপ্ন করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত ? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পার্বত্যগ-হরে, তরঙ্গিনীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত ? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি কখন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, বিবেচনা কখন আমাদের এখানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই ; আমাদের এরূপ বুজিবল নাই যে পরে রাজকার্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল-মুহুৎকে বঞ্চিত করিবেন না। ”

শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চক্ষে জল ; মুখ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “ ভ্রাতঃ তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই ;—শীত্র রণ-সজ্জা করিয়া লও ।” দুই জনে বিদ্রুদা-তিতে দুর্গের নীচে অবতরণ করিলেন, তথায় বর্ষাকালের সাগংকালিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ত্রায় রাশিরাশি সৈন্য সজ্জিত হইতেছিল । শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ।

দুঃখিনী জীজী একাকী একটি ধরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এই সময় শিবজী আসিয়া বলিলেন—

“ মাতঃ, আশীর্বাদ করুন, বিদায় হই । ”

জীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন “ বৎস ! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি ; কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে ? ”

শিব। “ মাতঃ, আপনার আশীর্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইরাছি ? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইরাছি ? ”

জীজী । “ বৎস ! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন ! ” সম্মুখে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিরা অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল ।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়া ছেন । এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল ; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল ; উদ্বিগ্নকম্পিতস্বরে বলিলেন—

“ স্নেহময়ী জননি ! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চির-জীবন পূজা করি, আপনার আশীর্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিব । ” বীর-শ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন ।

জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, ও বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন “ বৎস, হিন্দুধর্মের জয়সাধন কর ; স্বয়ং দেবরাজ শত্ৰু তোমার সাহায্য করিবেন । ” শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন ।

সমস্ত সেনা সজ্জিত । শিবজী নিঃশব্দে অস্থারোহণ করিলেন ; নিঃশব্দে সৈন্যাগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল ।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অস্পর্শক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল ; শিবজী তাহাকে চিনিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ রঘুনাথজী হাবিলদার ! তোমার কি প্রার্থনা ? ”

রঘু। “ প্রভু যে দিন ভোরণ দুর্গ হইতে পত্নাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন

প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ”

শিব। “অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ ? ”

রঘু। এই পুরস্কার চাই যে ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত হইতে দিন ; যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ করুন। ”

শিব। “ কেন ইচ্ছাপূর্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ ? তোমার এই বিষয়েই বা বিশেষ কি অধিকার আছে ? ”

রঘু। “ রাজন্ ! আমি ক্ষুদ্রতম সৈনিক, আমার বিশেষ অধিকার কি থাকিবে ? এই মাত্র আছে যে আমার এ জগতে কেহ নাই, অনো মরিলে লোকে শোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে আক্ষেপ করিবে একুশ জন মাত্র নাই। আর যদি প্রভুকে কার্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি ; তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল। ”

রঘুনাথের সেই কক্ষকেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিম্বিত, নয়নের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অম্পবরক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট

হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতরে যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শিরনত করিয়া পরে লক্ষ দিয়া অশ্ব অধিরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুন্য পর্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জ্বলিল, বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুন্য তাঁহার এই কার্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী তরঙ্গী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুন্যর নিকটে একটি রহৎ বাগানে পহুছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই অকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল-বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্মর শব্দ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুন্যভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুন্যর গোলমাল নিশ্চক্ৰ হইল, দীপাবলি নির্বাণ হইল, নিশ্চক্ৰ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ

করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃংগালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল ।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল ; শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল ; সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না ।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন ; বহুলোক দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রাঙ্গণ পথ দিয়া আসিতেছে ;—এই বরষাতা !

বরষাতা নিকটে আসিল । পুনরায় চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাজ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে । অনেকে অঝোরোহী, অধিকাংশ পদাতিক ।

শিবজী নিঃশব্দে বাল-সুহৃদ তরঙ্গী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন । পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র । ‘হয়ত এই শেষ বিদায়’ এই ভাব স্কলের মনে জাগরিত হইল ও নরমে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক । নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন ।

যাত্রীগণ শায়েস্তারখাঁর বাটর নিকট দিয়া যাইল ; বাটীর কামিনীগণ প্রবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন । ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণ ও শয়ন করিতে গেলেন ; যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিশং জন খাঁসা-

হেবের গৃহের নিকট লুকায়িত রহিলেন । ক্রমে বরষাতার গোল খামিয়া গেল । শুভকার্য্য সম্পাদিত হইল ।

রজনী আরও গভীর হইল ; শায়েস্তারখাঁর রন্ধন গৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল, খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিত্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও আশ্চর্য্য করিলেন না ।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, বুর বুর করিয়া বালুকা পড়িল । নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিন্নের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা ! পিপীলিকা সারের ন্যায় বোজ্জগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে ! তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া শায়েস্তারখাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন ।

শিবজী সন্ধি প্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ; সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনঃ হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন ।

পলায়নার্থে এক ঘারে আসিলেন, দেখিলেন বর্ম্মধারী মহারাজীর ঘোড়া ! অত্র ঘারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন । সতরে সমস্ত দ্বার বন্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন,

এমত সময়ে সতয়ে শুনিলেন ‘হর হর মহাদেও’ বলিয়া মহারাজীরগণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকের হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশজন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টিত করিল।

শীঘ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল; কোন ঘরের দীপ নির্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিশাচের জ্বর চীৎকার করিয়া হতা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাতের ঝন্ঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদের মুহুমুহুঃ উল্লাসরব, ও আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আত্মনাদে প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্ষা হস্তে লক্ষ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। ‘সনাতনধর্মের জয় হউক’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুকার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্ষাঘাতে ঘোর ভয় করিয়া শায়েস্তাখাঁর শরণঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল;

শিবজী দেখিলেন সর্বসম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর নিক্রমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে; তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য! শিবজী এক মুহূর্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কোবে খজা রাখিয়া বলিলেন, ‘যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দেও।’

‘কাফের! হতাকারীর এই দণ্ড!’ শমশের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত, শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্বেই শমশেরের উজ্জ্বল খজা আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

মুহূর্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইফদেবতা ভবানীর নাম লইলেন; সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটি বর্ষা আসিয়া খজাধারী শমসেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার! ‘

‘হাবিলদার! এ কার্য আমার স্মরণ থাকিবে।’ কেবল এই মাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক দিয়া রজু অবলম্বন করিয়া শায়েস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েক জন যাঁওলী সেই গবাক্মুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খজোর আঘাতকরিতাছিল তাহা শায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী ছেদন হইল, কিন্তু

শায়েস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না কিরিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল কতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইরাছিল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বা-
রন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরীগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, ত্রীলোক ও পলাতকগণের আত্মনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, ও তখনও মাউলীগণ, মোগলদিগের হংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অম্পর্ক আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত প্রাণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর রথ প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন ও শত্রুর ও সেরূপ প্রাণনাশ বাহাতে না হয় তাহার যথেষ্ট যত্ন করিতেন। আদেশ করিলেন, ‘আমাদের কার্যাসিদ্ধি হইয়াছে, তীক শায়েস্তাখাঁ আর আমা-
দের সহিত যুদ্ধ করিবে না; একগণে ক্রুত-
বেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।’

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনার্যাসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও সিংহগ-
ড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল; পুনা হইতে শায়েস্তাখাঁ ঘুমিতে পাইলেন ম-
হারাত্রিসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে কৃষ্ণ মোহনসিংহ সিং-
হগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গ-
ড়ের কামানের গোলায় ছিন্নতর হইয়া
পলায়ন করিল। কতকাল ও তঁহার
অধীনস্থ মহারাত্রীর অধিনায়ক বহুদূর
পর্যন্ত পশ্চাচ্চাযন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও
যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শায়েস্তাখাঁ
সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরং-
জীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে
নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিম্না করিলেন ও
যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর
পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন।
আরংজীব দুই জনকেই অকর্তৃণ্য বিবেচনা
করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও নিজপুত্র
সুলতান মোরাজীবকে দক্ষিণে পাঠাই-
লেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য
যশোবন্তকে পুনর্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বি-
শেষ কোন যুদ্ধকার্য হইল না। ১৬৩৪ খৃঃ
অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর
কাল হওয়ার শিবজী সিংহগড়েই আত্মা
সমাপন করিয়া, পরে রায়গড়ে যাইয়া
রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনামে
মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা
এখন এই মনতপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহু দিবস হইল জোরগদগ
হইতে আসিয়াছি, চল এই অবসরে এক-
বার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

মৌক্তিক।

পাঠক, অনেক দিন হইল যে মণি-
কার তোমার সুন্দর গ্রীবায হীরককণ্ঠ
পরায়ণাছিল, অদ্য সেই আবার এই মৌ-
ক্তিক হার লইয়া তোমার সমক্ষে উপ-
স্থিত। মুক্তা নানা আকারের ও নানা
মূল্যের, রহৎ হংসডিম্বের ন্যায় মুক্তাও
আছে, এবং সর্বপ প্রমাণ অতি ক্ষুদ্র মু-
ক্তাও আছে। আবার এক একটি মু-
ক্তার মূল্য একাদশ লক্ষ মুদ্রারও অধিক,
আবার দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা যে
মুক্তা ভক্ষ্য করেন, তাহার মূল্য এক-পয়-
সারও কম। আমার এই হারে সুন্দরের
কাক-চাতুর্য্য নাই। এবং ইহার গুণ
ব্যাখ্যা করিতে “মেলেনী মাসী” ও
নাই। কিন্তু মুক্তাগুলি বহুমূল্য—কেন না
বহুবহু সংগৃহীত। যদি তুমি একবার প-
রিধান কর তবেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।

মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে
একটি কাব্যীয় প্রবাদ আছে। অর্থাৎ বৈ-
শাখ মাসে যখন নূতন জল পতিত হইতে
আরম্ভ হয়, তখন শক্তি গুলি মুখবাদান
করিয়া জলের উপরিভাগে বিচরণ করিতে
থাকে, পরে যে দিবস স্বাভীনক্ষত্রে যোগ
হয়, তখনকার রক্ষিজল শক্তির অভ্যন্তরে
পতিত হইলেই মুক্তার উৎপত্তি হয়।

ভেরোনা নগরবাসী রোমীয় পণ্ডিত

প্লিনি এই ভারতীয় প্রবাদের সহিত স্বীয়
কল্পনা মিশাইয়া মুক্তার উৎপত্তির এই-
রূপ বিবরণ দিয়াছেন যে “কস্তুরিকা-
গৃহীত নীহারকণার গুণানুসারে মুক্তার
গুণের তারতম্য হয়। শিশিরবিন্দু পরি-
ষ্কৃত হইলে মুক্তাও পরিষ্কৃত হয়; এবং উহা
অপরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও অপরিষ্কৃত হয়।
যখন সেই বহুমূল্য বিন্দু শুষ্কিতগর্ভে পতিত
হয়, তখন বায়ু মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে, মুক্তার
পাংশুবর্ণ হয়; শুষ্কিতে যত শিশির পরে
তত পড়িলে মুক্তা রহৎ হয়। বিদ্যাদুকাম হ-
ইলে অকস্মাৎ শুষ্কির মুখকন্দ হওয়াতে মুক্তা
অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। শিশিরবিন্দুগ্রহণ স-
ময়ে বজ্রপাত হইলে মুক্তাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম
খোসার ন্যায় হইয়া যায়।”

ইতালি দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবিও
পূর্বোক্তরূপ কল্পনা করিয়াছেন। মুক্তার
কল্পিত উৎপত্তি যত অদ্ভুত না হউক, প্র-
কৃত উৎপত্তি বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।
প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন
যে কস্তুরিকা-জাতীয় অনেকগুলি মৎস্যের
এক প্রকার পিড়া হইতে এই বহুমূল্য-
পদার্থটি উৎপন্ন।* ডাক্তর বেয়ার্ড

* ১৭১৭ খৃঃ অঃ কুমার নামা পণ্ডিত
বলেন প্রাণীদিগের শরীরে ইহা একপ্রকার
পাথরি যোগ।

কছেন, কখন কখন শক্তি ও তন্মধ্যস্থ মৎস্যদেহের অন্তরে বালুকণা বা অপর কোন পদার্থ প্রবেশ করাতো একপ্রকার বিজাতীয় কণুয়ণ উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্ত মৎস্যটি ঐ পদার্থের উপরে একখানি অতি সূক্ষ্মত্বকু বিস্তার করে, এবং উহাকে স্থির শরীরস্থ একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। কখন কখন অপর কোন জন্তু শক্তিমধ্যস্থ প্রাণীটিকে বহির্গত করিবার জন্ত শক্তি-দেহের কোনস্থল বিদ্ধ করে ; কিন্তু উক্ত প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ পূর্ব কথিত উপায়ে ঐ বিদ্ধস্থল আবরণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। এই উভয় কারণ হইতে যে মৌক্তিকের উৎপত্তি তাহা শক্তির অভ্যস্তরেই দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবেত্তা লিলিয়স এই শেষোক্ত উপায়ে মুক্তা উৎপাদন করিয়া স্বদেশস্থ রাজার নিকট বহু সম্মান ও গৌরবান্বিত উপাদি প্রাপ্ত হন। চীন দেশীয় লোকদিগের নিকট ইহা অনেক কাল হইতে বিদিত আছে। তাহারা জীবিত কস্তুরা ধরিয়া তাহার গাত্রে নানা পরিমাণের রক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেয়, অনেক কস্তুরা এইরূপে বিনষ্ট হয়, কিন্তু অনেকের অভ্যস্তরে এই কৃত্রিম উপায়ে নানা আকারের মুক্তা উৎপন্ন হয়।

ডাক্তর বেরার্ভের মতে অপর একপ্রকার মুক্তা শক্তি মধ্যস্থ প্রাণীতে জন্মে, এবং উহাই সর্কোৎকৃষ্ট। সর এভারার্ড হিউম কছেন যে প্রাণি শরীরে প্রাপ্তকল্প

কণুয়ণ হইবার কারণ এই উহাতে এরূপ কতকগুলি অণু উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে শাবক জন্মে না, অর্থাৎ উহা মৃত হইয়া যায়। শক্তি-মৎস্য যেরূপ অপর ডিম্ব প্রসব করে, ইহাদিগকে তজ্জপ প্রসব করে না। উহা বিজাধারেই দ্বিতীয় বৎসর পর্যন্ত থাকে। প্রাণিশরীর হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া বিজাধার ক্রমে রহৎ করিতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ঐ বিজাকোষের উপরে একটি সূক্ষ্মত্বকু জন্মে। এবং পূর্বোক্ত পদার্থে সেই অণুগুলি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া ক্ষুদ্র গোল মুক্তা উৎপন্ন হয়। শক্তির অভ্যস্তরস্থ মুক্তাগুলি কখন গোল, কখন বাদামী আকারের হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে অতিকুত্র মুক্তার উল্লেখ করিয়াছি তাহাদিগকে মুক্তা-ঝুরি কহে। ইংরেজীতে উহার নাম বিজ-মুক্তা। এই মুক্তা-ঝুরিগুলির প্রাচীন সময়ে বহুধা ব্যবহার ছিল। কারণ প্লিনি এক স্থলে কছেন যে, ‘স্রীলোকেরা পাদুকাতে পর্যন্ত মুক্তা পরিধান করিত।’ এদেশীয় স্রীলোকেরাও পূর্বের বেশরের দুলে ইহা ব্যবহার করিতেন, এবং অধুনা সীতি ও সুমকা প্রভৃতির দুলে ইহা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। শক্তি-মৎস্যের পীড়া নিবন্ধন মুক্তার যে উৎপত্তি হয়, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। যাহারা মুক্তা সংগ্রহ করে, তাহারা বলে যে মৎস্য অক্ষত শক্তি-গর্ভে মুক্তা প্রায়ই পাওয়া যায় না ;

কিন্তু ভগ্ন ও অসমান শুদ্ধি-গর্ভে মুক্ত। স-
চরাচরই দেখা যায়।

এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার স্থানে
স্থানে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এসি-
য়ায় সিন্ধুনদের পিলতী নামক মোহানায়,
করাচীনগরে, করমণ্ডল উপকূলস্থ টিউট-
করিন নগরে, লঙ্কার কণ্ঠাচী উপসাগরে;
মালকাস্ প্রাণালীতে, লোহিত সাগরে, পা-
রস্য উপসাগরস্থ খরকদ্বীপে, এবং জাপান ও
ফিলিপাইন দ্বীপের নিকটে মুক্তা পাওয়া
যায়। এতদ্ব্যতীত মুরিদাবাদের কোন
কোন বিলেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়।
ইউরোপের মধ্যে স্কটলণ্ডে অধুনা যথেষ্ট
উৎকৃষ্ট মুক্তা মিলে। কথিত আছে যে
দুইশতাব্দী পূর্বে রোমানেরা ইংলণ্ডেইতে
প্রভূত পরিমাণে মুক্তা সংগ্রহ করিত।
প্লিনি বলেন যুলিয়স্ সিজার ভিনস্ দে-
বীরে যে কঙ্কালিকা উপহার দেন, তাহা
ব্রিটানীয় মুক্তায় খচিত ছিল। ঊনবিংশ
শতাব্দীতে পার্থস্যারের নদীজাত লক্ষটা-
কার মুক্তা বর্ষে বর্ষে লগুনে বিক্রীত হই-
য়াছে, এমন কি এখনও যাহারা কন্‌গো
নামক উপকূলে ভ্রমণ করিতে যান, তা-
হারা এক ঔন্সপরিমিত ব্রিটানীয় মুক্তা
২০০ টাকা হইতে ৫ টাকা মূল্যে যত ইচ্ছা
ক্রয় করিতে পারেন। কসিয়াতে নবো-
গরড্, ভার্, স্বভ, প্রভৃতি প্রদেশে; এবং
সাক্সনি, বেভেরিয়া, বোহিমিয়া, এবং
সিলিসিয়ার নদীতে অদ্যাপি যথেষ্ট মুক্তা
অন্বে।

আমেরিকায় মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নি-
য়ার উপকূলে, সেন্টমাস, নবগ্রেগেডা,
এবং ব্রিটিস পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপসমূহে
বহুল পরিমাণে মুক্তা পাওয়া যায়। এত-
দ্ব্যতীত এণ্‌জেরিয়া ও সুলুদ্বীপে, মাগ্রে-
রিটা দ্বীপে, ও পানামা উপসাগর প্রভৃতি
স্থানেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। পা-
রস্য গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ একমাত্র বেহারিণ
দ্বীপে বর্ষে বর্ষে ২৪ লক্ষমুদ্রার মুক্তা সং-
গ্রহীত হয়। করাচি নগরের নিকট যে
সকল ক্ষুদ্র মুক্তা সংগ্রহীত হয়, তজ্জন্ম
গবর্ণমেন্টকে বর্ষে বর্ষে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা
কর দিতে হয়। কি প্রাণালীতে মুক্তা সং-
গ্রহীত হয়, তাহার সঞ্চিত বিবরণ নিম্নে
প্রকটন করিলে, বোধহয় পাঠক বর্ণের
বিরক্তিকর হইবে না।

লঙ্কা দ্বীপই মুক্তার জন্য পৃথিবী মধ্যে
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; অতএব কণ্ঠাচী উপসা-
গরে মুক্তা-সংগ্রহের বিবরণই আমরা নি-
শিদ্ধ করিতেছি। প্রতিবৎসর গবর্ণ-
মেন্ট হইতে উক্ত উপকূলের জরিপ হয়।
জরিপ শেষ হইলে এক বৎসরের নিমিত্ত
নিলামে ঐ জমা বিক্রীত হয়। ফেব্রুয়ারি
মাসে আরম্ভ হইয়া এপ্রিল মাসের প্রথম
ভাগে মুক্তা সংগ্রহ শেষ হয়। সাকলো
ছয় সপ্তাহ বা দুইমাস কাল ডুবাকরা
মুক্তাসংগ্রহ করিতে পায়। কিন্তু এই
সকল ডুবাক মালাবার উপকূলবাসী রো-
মান কথলিক খৃষ্টান, ইহাদের এই সময়
এতগুলি পক্ষ ও উপবাসাদি আছে যে,

মোট ৪০ দিনের অধিককাল কাজ করিতে পারে না। মুক্তাসংগ্রহব্যাপার যে দিন আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব দিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় একটি কামানের শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ কণ্ঠাচী উপসাগর হইতে সমুদায় নৌকা ছাড়িয়া দেয়। প্রভাতের সময় নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা পৌঁছবে, এবং দিবা দুই প্রহর পর্যন্ত ডুবুরী মুক্তা সংগ্রহ করে। দ্বিপ্রহরের পর তথা হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া বেলাবেলি কণ্ঠাচী উপসাগরে প্রত্যাবর্তন করে। অমনি শুল্কি গুলি তীরে উঠাইয়া নিলাম করা হয়। প্রত্যেক নৌকায় ১০ জন ডুবুরী ও দশজন নাবিক থাকে। তরাতিত নৌকার অদ্যাক্ষরূপে একজন কর্ণধার এবং “হাজু-দমী” নামে মালাবারাস্থ এক এক জন পুরোহিত বা ওঝা থাকে।

একবারে ৫ জন করিয়া ডুবুরী অবগাহন করে, তাহার উদ্দেশ্য হইলে, অবশিষ্ট পাঁচজন অবগাহন করে। কাপ্তান ফুয়ার্ট কহেন ডুবুরী সাধারণতঃ প্রতি ডুবে ৫৩ হইতে ৫৭ সেকেন্ড পর্যন্ত জলের তলে থাকে; কিন্তু অর্থ দিলে ৮৪ হইতে ৮৭ সেকেন্ড পর্যন্ত থাকিতে পারে। অনেক পাঠক বোধ হয় ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। ভরসা করি নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, ৮৭ সেকেন্ড জলের নীচে থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিয়া-

ছেন যে সুস্থ শরীরে প্রৌঢ়াবস্থ পুরুষদিগের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭৫ বার পর্যন্ত চলে; সুতরাং ৮৭ সেকেন্ডে ১০৯ বার নাড়ী চলে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটিকা যন্ত্রের দোলদণ্ড প্রতি সেকেন্ডে একবার করিয়া দোলে, এবং মনুষ্যের শ্বাসও সুস্থাবস্থায় প্রতি সেকেন্ডে গড়ে একবার করিয়া বহে, সুতরাং ৮৭ বার শ্বাস ত্যাগ করিতে যত সময় লাগে ডুবুরী তত সময় জলের নীচে থাকে, একি সাধারণ ক্ষমতা! অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতিবশতঃ ডুবুরী জলের নীচে ৬। ৭ ঘণ্টা থাকিতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্রের সাহায্যে। যাহা হউক, আমরা পুনশ্চ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

ডুবুরীদিগের কটীদেশে একটি করিয়া জালি থাকে, সংগৃহীত শুল্কিগুলি তাহার মধ্যে রাখে। শীঘ্র শীঘ্র জলের ভিতর অদিরোহণ করিবার জন্য রজ্জু দ্বারা একটি ফাঁস প্রস্তুত থাকে; এবং তাহাতে একখণ্ড রহৎ প্রস্তর সংলগ্ন থাকে। নীচে নামিবার সময় ঐ ফাঁসের মধ্যে পদস্থাপন করে। আর একগাছি রজ্জুও ডুবুরীদের কটীদেশে সংলগ্ন থাকে। অনেকক্ষণ জলের নীচে থাকিয়া কষ্ট হইলে, তাহার এই রজ্জুটি নাড়িতে থাকে; তৎক্ষণাৎ নৌকাস্থিত লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া তুলে। উঠিবার সময় পূর্বোক্ত ফাঁস হইতে পানি বাহির করিয়া লয়। ডুবুরী উত্তর কর্ণ তুলি দ্বারা বন্ধ করে,

এবং যতক্ষণ জলের নীচে থাকে, এক হস্তে নাসিকারন্ধ্র চাপিয়া রাখে। তা-হার দিনে ৪০ হইতে ৫০ ডুব পর্য্যন্ত দেয়, এবং প্রতিডুবে প্রায় একশত শক্তি উত্তোলন করে।

ডুবাকদের পক্ষে হাঙ্গরের ভয়ই অ-তান্ত। যে পর্য্যন্ত হাঙ্গড়দমী ওঝারা মস্ত্র দ্বারা হাঙ্গড়ের মুখ বন্ধ না করে, তাবৎ ডুবাকরা জলে নামে না। যতদিন মুক্তা সংগ্রহব্যাপার চলিতে থাকে, ও-ঝারা কুলে থাকিয়া পূজা, নানাবিধ অনু-ষ্ঠান, ও নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট করে। কখন কখন ওঝারা নৌকাতেও থাকে। যতক্ষণ ওঝা নৌকায় থাকে, ততক্ষণ ডুবাকরা অকুতোভয়ে অগাধ জলে ঘাইতে ও পরাঙ্মুখ হয় না। মুক্তা সংগ্রাহক ব-ণিকেরা ওঝাদিগকে বেতন দেন। ডুবাকরা মুক্তার কোন অংশ বা তাহার মূল্য স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে। শক্তিগুলিকে মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখে, এবং তাহার উপরে দড়মার বেড়া দেয়। কিছু দিন পর পচিয়া শক্তিগুলি বিধা হইয়া যায় ও মুক্তা বাহির হয়। অতঃপর মুক্তাগুলিকে প্রক্ষা-লিত, পরিষ্কৃত, ও সরঞ্জু করা হয়। মুক্তা দ্বারাই এই প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত হয়, তদ্বারা মাগিয়া মুক্তা পরিষ্কার করে।

শ্বেত, মন্ডল, উজ্জ্বল মৌক্তিকই সর্বশ্রেষ্ঠ। জেফ্রি নামা একজন প্রসিদ্ধ বত্তুজীবী ব-লেন যে “দুগ্ধবৎ শ্বেত, অতুজ্জ্বল, অক্ষত, কনকরহিত মুক্তাই সর্বোৎকৃষ্ট।” বর্ণ-

বিশিষ্ট মুক্তা তাহার মতে অকর্মণ্য। সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তাই উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইয়ারিং প্রভৃতিতে অণুরূপিত মুক্তাই অধিক ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা ঈষন্নোহিত বা ঈষৎ পীত মুক্তাই অধিক মনোহর জ্ঞান করেন। জেফ্রি এইরূপে মুক্তার মূল্য নিরূপণ ক-রেন;—প্রায় চারিরতি পরিমিত মুক্তার মূল্য চারি টাকা; ৮ রতি পরিমাণ হইলে ১৬ টাকা; ১২ রতি পরিমাণ হইলে ৩৬ টাকা। অর্থাৎ ৪ রতিতে এক ‘কেরাট’ হয়, সুতরাং যত ‘কেরাট’ হইবে তা-হার বর্ণ লগু, এবং সেই বর্ণফল দ্বারা এক কেরাটের মূল্য ৪ টাকাকে গুণ কর। কিন্তু প্রাচীন কালীন অনেক মুক্তার কথা শুনা যায়, যাহার মূল্য এই নিয়মে নিরূ-পিত হয় নাই। এমন কি, এখনও কোন মুক্তা অতি উৎকৃষ্ট বা সুন্দর হইলে, তাহার মূল্য পরিমাণানুসারে হয় না।

অস্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে কে-বল শক্তিই মুক্তার উৎপত্তি স্থান নহে। ভাব প্রকাশে যথা:—

“শঙ্খো গজশচ ক্রোড়শচ ফণিমৎস্যশচ
দধরঃ।
বেগুরেতে সমাখ্যাতান্তজজৈ মৌক্তিক
যোনয়ঃ ॥”

অর্থাৎ শঙ্খ, হস্তী, শূকর, ভুজঙ্গ, মৎস্য, কচ্ছপ, বংশ প্রভৃতিতেও মুক্তা জন্মায়। রাজ নির্ঘণ্টে জাতিভেদে অ-র্থাৎ মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

“মাতঙ্গোরোগমীনপোত্রিশিরসম্বন্ধসার-
শঙ্খানুভূত
শুক্লীনাশুনরাত্ত মৌক্তিক মণিঃ স্পষ্টো
ভবতাস্থধা ॥ ”

মুক্তার লক্ষণ সম্বন্ধে রাজ নির্ঘণ্ট বলেন—
“ নক্ষত্রাত্ত শুদ্ধমতান্ত মুক্তং স্নিগ্ধং স্থূলং
নির্মলং নিব্রণঞ্চ ।
ন্যস্তংধত্তে গৌরবং যত্নুলায়াং তস্মি-
ন্থালাং মৌক্তিকং সৌখাদায়ি । ”

যে মুক্তা নক্ষত্রের ন্যায় শুভ ও উজ্জ্বল,
অত্যন্ত বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্থূল, নির্মল ও ব্রণ-
রহিত, এবং তুল্যতে স্থাপন করিলে যা-
হার গুণকল্প অমুভূত হয়, সেই নির্মল মৌ-
ক্তিকই সুখদায়ি অর্থাৎ প্রশস্ত ।

রাজ নির্ঘণ্টকার পুনশ্চ মুক্তার বি-
শেষ লক্ষণ কহিয়াছেন । যথা—

“ ছায়াপাটলনীলপীতধবলান্তরাপি
সামান্যতঃ ।

সপ্তানং বহুশো ন লঙ্ঘি
রিত্তিচেচ্ছোক্তৈরকং তুল্যনং ॥ ”

যদিচ অপর সপ্তবিধ মুক্তা শৌক্তিকের
অর্থাৎ শুক্তি-গর্ভজাত মুক্তার তুল্য বহু-
ছায়াবিশিষ্ট না হউক, তথাপি পাটল,
নীল, পীত, ধবল এই কএক প্রকার ছায়া
তৎসমুদারে সাধারণতঃ আছে ।

ভোজ রাজতন্ত্র নামে একখানি উৎ-
কৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থে ছায়া দ্বারা নানাবিধ
মুক্তার পরীক্ষা করিবার বিবরণ লিখিত
আছে । আমরা এস্থলে বহু অসময় করি-
য়াও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না । সুতরাং কথ্য

বলিব কি আমরা একখানি হস্তলিখিত
রাজনির্ঘণ্টে মুক্তাসম্বন্ধে আরও যে সকল
প্রমাণ পাইলাম, তাহা লিপিকরের প্রমাদ-
বশতঃ এত অশুদ্ধ হইয়াছে, যে তাহার
কোনও অর্থসংগ্রহ হয় না । অধিক কি,
আমরা যে কএকটি বচন উদ্ধৃত করিলাম
তাহারও স্থানে স্থানে অনেক ভ্রম রহিল ।

এতদ্দেশীয় ভিক্ষুদিগের মতে মুক্তার
নানাগুণ, এবং উহা তাঁহার নানাবিধ
ঔষধেও ব্যবহার করেন । কিন্তু ইউ-
রোপীয় চিকিৎসকেরা একথা গ্রাহ্য ক-
রেন না । তাঁহার বলেন যে, সামান্য
চুণ এবং মুক্তাভস্মে কোনও প্রভেদ
নাই । বস্তুতঃ আমরা স্থলান্তরে মুক্তার
যে রাসায়নিক গুণের উল্লেখ করিয়াছি,
তাহাতে এতদ্বয়কে একই পদার্থ বলি-
লিয়া বিশ্বাস হয় । যাহা হউক বৈদ্যক
শাস্ত্রমতে মুক্তার গুণ এই ।

“ সারকত্বং, শীতত্বং, কষায়ত্বং, স্বাদুত্বং,
লেখনত্বং, চক্ষুষ্যত্বঞ্চ । ” ইতি রাজবল্লভঃ ।

অর্থাৎ মুক্তায় সারকত্ব, শৈত্য, কষা-
য়ত্ব ও মুখপ্রিয়ত্ব গুণ আছে । ইহা দ্বারা
লেখন অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা যে দাগ করিয়া
দেওয়া যায়, সেই গুণ এবং চক্ষুরোগের
উপশমক গুণও আছে ।

“ রূপাত্ত্বং বলপুষ্টিদত্ত্বঞ্চ ” ইতি ভাবপ্রকাশঃ ।

ইহাতে পুং শক্তির বৃদ্ধি, বল ও পুষ্টি
প্রদান করে ।

“ মৌক্তিকঞ্চ মধুরং স্নানীতলং দৃষ্টিরোগ-
শমনং বিদ্যাপিছং । ”

রাজস্বক্ষমপরিচোপনাশনং ক্ষীণবীৰ্য্যবল-
পুষ্টিবর্জনং ॥, ইতি রাজনির্ঘণ্ট—

‘ইহা মধুর, স্নগীতল, দৃষ্টিরোগ ও
যক্ষ্মারনাশক; এবং ক্ষীণবীৰ্য্যাদিগের বল-
পুষ্টিবর্দ্ধক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপর কএকটি
পদার্থের সহিত মুক্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব
নিরূপণ ও তুলনা করিয়াছেন। প্রতিঘন
ফুটে যত গুরুত্ব তাহা ঠেন্দে দেওয়া যাই-
তেছে। এক ঠেন্দ অর্দ্ধ ছটাক।

চীনাবাসন	২৬৮৫	অর্থাৎ	৭৪.৭	সের
চক্ৰমকি প্রস্তর	২৫৯৪	“	৮১.	“
স্ফটিক	২৬৪০	“	৮২.৩	“
প্রবাল	২৬৮০	“	৮৩.৭	“
মুক্তা	২৬৮৪	“	৮৩.৯	“
হীরক	৩৫৩৬	“	১১০.৫	“
গোমেদক	৩৮০০	“	১১৮.৬	“
নীলকান্তমণি	৩৯৯৪	“	১২৪.৮	“
পদ্মরাগমণি	৪২৮৩	“	১৩৩.৮	“
অয়স্কান্তমণি	৪৯৩০	“	১৫৪.	“

যে দশটি পদার্থের তুলনা করা গেল,
তদ্ব্যতীত মুক্তা পাঁচটি অপেক্ষা ভারী,
এবং অবশিষ্ট পাঁচটি অপেক্ষা লঘু। মুক্তা
লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ লঘু;
কিন্তু জল অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ ভারী;
অজারক চূর্ণের দ্বারা হেতু মুক্তা এত
দৃঢ়; অল্প পদার্থ (এসিড্) মধ্যে মুক্তা
নিষ্ক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ অব হইয়া যায়।
অর্থাৎ এসিডের সহিত সোডা, মিলিত হ-
ইলে যেরূপ বুদ্বুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে, মুক্তা

অবীকরণ কালেও ঠিক তজ্রূপ হয়। ফলতঃ
সোডা যে পদার্থ, মুক্তার রাসায়নিক উ-
পকরণও তাহাই। অব হইয়া গেলে
অতি সূক্ষ্ম একটি ড্রু মাত্রাবশিষ্ট থাকে।
সময়ে সময়ে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে
অনেকে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু
জেকুইন নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত
এবিষয়ে যতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তত
আর কেহই নহে। বাজারে মাসের
যে মুক্তা বিক্রয় হয়, উহাই জেকুইনের আ-
বিষ্কৃত। সংপ্রতি কতিপয় প্রসিদ্ধ মুক্তার
সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া আমরা প্রস্তা-
বের উপসংহার করিতেছি।

প্রাচীন পুরাণবৃত্তে দেখা যায়, একদা
মার্কস্ এটনি ও ক্লিওপেট্রা কোন ভোজে
বাগ্নি রাখেন। তাহাতে রূপ ও ধনে গ-
লিতা রাণী স্বীয় কর্ণভূষা হইতে দুইটি বহু-
মূল্য মুক্তা লইয়া একটি সেকারয় অব করিয়া
পান করেন; অপরটি এটনি কাড়িয়া ল-
ইয়া রক্ষা করেন এবং তাহা দ্বিগুণিত ক-
রিয়া ভিনসুদেবীর কর্ণভূষায় প্রদত্ত হয়।
উহার মূল্য সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ
বলেন ৮০৭২৯১৫০ টাকা*, কাহারও
মতে ৭৬০০০০ টাকা† এবং কাহারও
মতে ৮৪০০০০ টাকা‡

জুলিয়াস সিজর ক্রটাসের জননী সা-
র্ভিলিয়াকে উপহার স্বরূপ যে একটি মুক্তা

* পেটাসর্নকৃত প্রাগিতত্ত্ব। † এন্-
সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ১৭ ব। ‡ ম-
ণ্ডার্নকৃত অভিধান।

দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য কাহার মতে ৫০০০০ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা, * কাহার মতে ৪৮৪১৭৫ মুদ্রা। †

এ, জে, বি, হোপ নামা পার্লামেন্টের সদস্য বিশেষের নিকট একটি মুক্তা ছিল, অত বড় মুক্তার কথা এখন আর বড় শুনা যায় না। উহার ওজন ১৮৬০ আনা, বেড় ৪৮ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। মূল্য প্রায় ১৯০০০০ টাকা। ‡

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে টেবালিয়ার নামে একজন পরিব্রাজক পারস্যাদ্বিপতির নিকট একটি মুক্তা দেখেন, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ইঞ্চি; বেড় প্রায় ৩৮ ইঞ্চি এবং মূল্য ১১০০০০ একাদশ লক্ষ মুদ্রা। § ইহার আকৃতি অশুকার, অক্ষত ও অরগ। আরব্য দেশস্থ কেটিকা নামক স্থানে ইহা ক্রীত হয়। কেহ অনুমান করেন যে, পারস্যের পূর্বতন সুলতান ফতেআলি সার এই মুক্তাটি ছিল।

* পেনিসাইক্লোপিডিয়া † পেটাস্ননকৃত প্রাণিতত্ত্ব।

‡ ব্রেভিসের বৈজ্ঞানিক অভিধানের বিবরণও প্রায় এইরূপ।

§ মণ্ডার্স অভিধানমতে এইরূপ এবং বিটনের সার্বভৌমিক অভিধানের মতও এই; কেবল বিটনের মতে দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। পেনিসাইক্লোপিডিয়ায় মতে মূল্য ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার। হেডেনের সময়-নির্ণায়ক অভিধানমতে মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে ১ লক্ষ।

হংসডিম্বাকার একটি পানামা উপকূলজাত সুল্লর মুক্তা স্পেনের রাজ্য দ্বিতীয় ফিলিপকে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহার আয়তনও একটি কপোতাণ্ডের স্থায় হইবে। উহার মূল্য পেনি সাইক্লোপিডিয়ায় মতে চল্লিশ সহস্র; কিন্তু হেডেনের অভিধানানুসারে ১৩৯৯৬০ মুদ্রা। †

ডি বুটী নামা পণ্ডিত কছেন যে সম্রাট দ্বিতীয় রডল্ফের মুকুটে হংসাণ্ডবৎ ৩০ কে-রাট অর্থাৎ ১৮ ভরি ওজনের একটি মুক্তা ছিল। ইহার মূল্যের নিরূপণ কেহ করেন নাই। সাধারণ নিয়মানুসারে গণনা করিলে ৩৬০০ টাকা হইবে। ইহার নাম “অভূম্বন।”

ভিনিসের গবর্নমেন্ট ক্রমের বাতসা সোলেমানকে যে মুক্তাটি উপহার দেয়, তাহার মূল্য ১৬০০০০ একলক্ষ বাট হাজার টাকা।

দশম লিও নামে রোমান কাথলিক দিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ (পোপ) কোন ভিনিসিয়ান মণিকারের নিকট এক লক্ষ চারি সহস্র মুদ্রায় একটি মুক্তা ক্রয় করেন।

স্পেনের রাজধানী মেড্রিডনগরবাসিনী একটি মহিলা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন দেশ হইতে একটি মুক্তা ক্রয় করিয়া আনেন, তাহার মূল্য তিনলক্ষ তের শত মুদ্রা।

† পেনিসাইক্লোপিডিয়ায় সন ১৫৭৯।

কসিয়ার মন্সোনগরের জোসিমা চি-
ত্রশালিকার পেলিগ্রিনা নামে চিত্রনিভ
শুভ্র, সম্পূর্ণ গোল, অত্যন্ত একটি মুক্তা
আছে। ইফইগিয়া কোম্পানির কোন
জাহাজের নিকট লেঘহরণ নগরে জো-
সিম নামা একব্যক্তি উহা ক্রয় করে। উ-
হার ওজন প্রায় ১৯ রত্ন পরিমাণ, এবং
সামান্য হিসাবে মূল্য ১৩৩৬ মুদ্রা। উহা
মন্সোনগরস্থ আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে অতি
বিখ্যাত।

কতিপয় বর্ষ গত হইল মাস্ত্রাজ নগ-
রের কোন প্রদর্শনে একটি অদ্ভুৎ জড়াও
রত্ন প্রদর্শিত হয়। উহা একটি অর্ধমৎস্য-
নারীরূপ, মস্তক ও বাহু শ্বেত চুনি প্রস-
রের, হস্ত দ্বারা কেশ বিস্তার করিতেছে,
বক্ষ একটি দীর্ঘাকার জাপান-মুক্তা, উহাও
চন্দ্রবৎ শুভ্র ও অতি সুন্দর। মৎস্যার্দ্ধভাগ
হরিরবর্ণের চুনি প্রান্তরে নির্মিত। এই মুক্তা-
টিকে অনেকে বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছি-
লেন।

শ্রীজ—

কবি কাঞ্চনাচার্য্য।

এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অনন্ত
গর্ভে কত রত্ন অপূর্ণ প্রভাষ প্রস্টিত
হইয়াছে এবং তদনন্তর কালের করাল
গ্রাসে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা কাল-
গ্রাসে অস্পষ্ট রহিয়া অত্মপি অতিক্রম
আলোকে মনুষ্যের লোচনগোচর হই-
তেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ?
দুর্লভ অনাধারজাতির কুরহস্তেই বা কত
মহাত্মার যশঃশরীর ভস্মীকৃত হইয়াছে, কে
তাঁহা বলিতে পারে ? দুরদৃষ্ট যে কত প্র-
কার যুক্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের স-
র্বোজ্জ্বল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে,
তাঁহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত ম-
হাত্মার নামমাত্র, কত রসার্চিত্ত ভাবকের
গ্রন্থের নামমাত্র আমাদের শোকেয় ছেতু-
ভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও
গ্রন্থকারের একখানি ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ দৃষ্টি-

গোচর হইলেও আমরাইগের অংকুরণ এই
মন্ডেহে আকুল হইয়া উঠে, যে ইহার অ-
বশ্য অন্ত্র গ্রন্থ ছিল—এ রসমাগরের অ-
বশ্য অপার প্রবাহ ছিল। বাস্তবিক, মৎ-
স্কৃত সাহিত্যমাগরে অবগাহন করিলে ত-
থ্যপ্রাসাদশ্রেণীদর্শনে তত্ত্বানুসন্ধারীর ত্রায়,
একরূপ অপূর্ণ বাকুলতা আশিয়া হৃদয়ে
উপস্থিত হয়। যাহাইউক, সে কথা সম-
য়ান্তরে আলোচ্য। অন্য যে বিষয় আমা-
দিগের বিবক্ষিত, তাহার অবতারণা করা
যাইতেছে।

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে তাঁহার নাম
উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি একজন রসার্চ-
চিত্ত মুকবি। ধনঞ্জয় বিজয় নামক অতি-
ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ তাঁহার কবিত্বের নিদ-
র্শন-স্বরূপ বর্তমান আছে। এখানি বা-
য়োগ। রূপকের যে দশ প্রকার ভেদ ক-

স্পিত হইয়াছে, ব্যায়োগী তাহার অন্য-
তম। অলঙ্কারগ্রন্থে ব্যায়োগের যে সকল
লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, ইহা সেই সমস্ত
লক্ষণে সংযুক্ত। উত্তরকালরচিত বলিয়াই
হউক, বা প্রয়োজনাবশ্যতাই হউক,
সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে ইহার নাম, বা ইহার
শ্লোক উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত হয় নাই।
ছন্দের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্মর-
চিত “সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-
শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী” নামক যে গ্রন্থে
সংস্কৃত কবিতাগুলির গ্রন্থের পরিচয় ও
সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে
ধনঞ্জয়-বিজয়কার কাঞ্চনাচার্যের নাম উ-
ল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। গ্র-
ন্থের ক্ষুদ্রাঙ্গতা যে তাঁহার উল্লেখ না ক-
রিবার কারণ, এরূপ আমরা মনে করি না।
মহামণি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও তাহা শিরো-
ধার্য্য। অন্যথা অমর, ময়ূর ভট্টাদির এত
সম্মান কেন? যদিও কাঞ্চনাচার্য্য ময়ূর-
ভট্টাদির সম্পূর্ণ তুল্যাক্ষ নহেন, তথাপি
স্বকবিশ্রেণীতে অবশ্য পরিগণনীয়, তা-
হাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্মৃতসমর্থ-
নার্থ তাঁহার গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে কি-
ঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে নান্দীশ্লোকদ্বয়
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি উদাত্তভাব-
পূর্ণ। প্রথম শ্লোকটি বিষ্ণুবিষয়ক। যথা;—
হরের্লীলাবরাহস্য দংষ্ট্রাদগুঃ স পাতকঃ।

হেমাদ্রিকলসা যত্র ধাত্রীচ্ছত্রাশ্রয়ঃ দধৌ।

প্রলয়কালে নিখিল জগৎ ভলপ্লাবিত

হইলে ভগবান্ নারায়ণ বিশাল বরাহমূর্তি
ধারণ করিয়া দশনদ্বারা ধরণীমণ্ডলকে উ-
দ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই সময়কে অধি-
কার-করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ করিতে-
ছেন;—নীলাচ্ছলে বরাহমূর্তিধারী ভগ-
বান্ বিষ্ণুর সেই বিশাল দশন তোমাদি-
গকে রক্ষা করুন, যে দশনের উপরি পৃথিবী
ছত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যে
দশন সেই পৃথিবীরূপ ছত্রের দণ্ড স্বরূপ
হইয়াছিল এবং স্বর্ণময় স্রমেক যে উর্দ্ধকৃত
পৃথিবীরূপ ছত্রের কলসস্বরূপ (ছত্রের
শিরঃস্থিত বস্ত্রবিশেষ) হইয়াছিল। পা-
ঠকগণ দেখুন, সংক্ষিপ্তবাক্যে কতদূর
অলৌকিক ভাবের পরিব্যক্তি হইয়াছে।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোকটি কালীবিষ-
য়ক। যথা;—

তদঃ প্রমাণ্ডু বিপদঃ প্রণতাতিহস্তা।

ত্ৰাত্তং পদং মহিষমূর্দ্ধনি চণ্ডিকায়ঃ।

বৈদী যদিয়নখরাংশু-পরীতশৃঙ্গঃ

শক্রায়ুধাঙ্কিতনবাসুধরপ্রভোহভূৎ ॥

ভগবতীর মহিষাসুরের সহিত সময় সময়
অবলম্বন করিয়া কবি কহিতেছেন,—দেবী
চণ্ডিকার প্রণতজনের পীড়াহর সেই চরণ
তোমাদিগের বিপত্তিনাশ করুন, যে চরণ
মহিষরূপী অসুরের মস্তকে স্থাপিত হইলে
সেই চরণের অকণনখশ্রেণীর প্রভাষ মহি-
ষের কুটিল শৃঙ্গদ্বয় সুরঞ্জিত হওয়ায় ঘোর-
রক্তবর্ণ মহিষাসুর ইন্দ্রধনুঃশোভিত নবমে-
ঘের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকে কি
অপূর্ব সৌন্দর্য্যভাব উদ্ভাবিত হইয়াছে!

বিরাট নৃপতির উত্তর গোপুত্র হইতে
যে অসংখ্য গো রাজ্য দুর্ঘোষাদি ক-
র্তৃক বলপূর্ব্বক ছত হয়, তাহাদিগকে
যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অর্জুন কর্তৃক সেই
সকল গৌর প্রত্যানয়ন এ প্রেমের বর্ণনায়।
শরৎকাল যুদ্ধাদির অনুকূল বলিয়া প্রেমের
প্রারম্ভেই শরৎ সূচনা করা হইয়াছে। অন-
ন্তর নায়ক ধনঞ্জয়ের যুদ্ধযাত্রা। যাত্রা-
কালে নায়কের হৃদয়ভাব দেখুন;—
অর্জুনঃ। (সোৎসাহং) অনুকূলং দৈবং-
লক্ষ্যতে যতঃ,

যা লতাশ্রিষাতে সৈব লগ্না সম্প্রতি পাদয়োঃ।
কুরুরাজোভিষাভব্যঃ স্বয়মেব সমাগতঃ ॥

অর্জুন উৎসাহের সহিত বলিতে-
ছেন, দৈব অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে।
যে লতাকে অশ্রবণ করিতেছি, সেই লতা
পদদ্বয়ে আসিয়া সংলগ্ন হইল। যে কু-
রুরাজের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রার্থে উৎসুক ছি-
লাম, তিনি স্বয়ংই উপস্থিত!

যুদ্ধে প্রবল দায়াদরূপ শত্রু পরাজয়ে
বশঃসুখলাভউৎসাহে উৎসাহিত হই-
লেও তাহাদিগের গোহরণরূপ দুষ্কার্য্য
স্মরণ করিয়া নির্কিন্নচিত্তে কহিলেন,—
“রে সুর্যোধন! পূর্ব্বপুরুষ গণ বিপুলভূ-
জবলে যে রাজ্য অর্জন করিয়াছিলেন,
তুই কপটপাশকীড়াচ্ছলে সেই রাজ্য হ-
স্তগত করিয়া অদ্য গোহরণে প্ররক্ত হইয়া-
ছিস্। ছাধিক্! আমাদিগের কুলগুরু ভগবান
চন্দ্রমা তোর দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হইলেন।”

কিয়ৎকণ পরেই যুদ্ধোপকরণাদিসহ

বিরাটকুমার আগমন করিলেন। অর্জুন
রথারূঢ় হইলেন ও বিরাটকুমার সারথি
হইয়া বেগে রথচালনা করিতে লাগিলেন।
কএকটি শ্লোকে সারথিমুখে অশ্ব ও রথের
গতি অতিসুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। অবিল-
ম্বেই গোপালক সকল দৃষ্টিগোচর হইল।
অর্জুন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিলেন,—

রে রে গোপালা অলংবিবাদেন। তথাহি ;
সিদ্ধন্তঃ ককণারসেন হৃদয়ং যাবন্ন বৎসা অমী-
মাতুর্মার্গবিলোকনব্যাসনিনো মুঞ্চন্তি হৃদা-
রবান্।

যাচন্তে নহি যাবদেব শিশবঃ পাতুং পয়ঃ
সোৎস্রুকা-
স্তাবদগাব ইচ্ছতাবেত ভবতাং চেতোজ্বরঃ
শাম্যতু ॥

“রে রে গোপসকল! তোমরা বি-
বাদ দূর কর। এই যে গোবৎস সকল মা-
তার পথের প্রতি সোৎস্রুকে দৃষ্টিনিক্ষেপ
পূর্ব্বক ককণারসে হৃদয় আর্দ্র করিতেছে,
ইহারা যাবৎ হৃদয়ব না বরে, আর শি-
শুগণ উৎসুক হইয়া যাবৎ দুষ্কপানের জঘ-
প্রার্থনা না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গো-
সকল ঐস্থানে আছে বলিয়া জানিও।
তোমাদিগের মনের উদ্বেগশান্তি হউক।”

অনন্তর অনতিদূরে কুরুসৈন্যরাশি স-
ন্নিবেশিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইল।
অবিলম্বে দৃষ্ট হইল অশ্বসমূহের খুরা-
ভিষাতে উল্লিখিত ধূলিরাশি ‘জীর্নকপৌতক-
ঠকটি’ দারণ পূর্ব্বক নভস্তল আচ্ছন্ন ক-

রিতেছে, ‘ভর-পূর্য্যমাণ’ গভীর শঙ্খ-
নাদে দিগন্ত প্রতিবাদিত হইতেছে, উর্ধ্বে
পক্ষিকুল ভয়ে ক্রত উড়য়মান, নিম্নে
আরণ্যপশুগণ তাড়শ সন্ত্রস্তচকিত। ক্রমে
রথ সৈন্যশ্রেণীর নিকটবর্তী হইতে লা-
গিল। বিপক্ষবীরগণ অর্জুনকে একাকী
উত্তরের সহ প্রতিবলে অবগাঁহন করিতে
দেখিয়া নানাবিতর্ক করিতে লাগিল। এই
সময়ে কুঙ্করাজ সেনানীদিগকে সজ্জিত
করিতেছিলেন। পার্থ রাজপুত্র উত্তরকে
তাহা দেখাইলেন। উত্তর কহিলেন, দেব,
বিপক্ষযোদ্ধৃবর্গের বলবীৰ্য্য ও স্বরূপ অব-
গত হওয়া সারথির একান্ত কর্তব্য। পার্থ
কহিলেন, ঐ দেখ, রোযকষায়িতলোচন
হিড়িম্বাভীর সম্মুখেও যে সাহসী বিমদ-
রের অঙ্গ হইতে নির্য্যোকের নায় শ্রৌপ-
নীর হৃদয়-স্থল হইতে লজ্জাহুকূল্যকল আ-
কর্ষণ করিয়াছিল, সে ঐ দ্রুশ্যমান, কুঙ্ক-
রাজের দক্ষিণভাগে। (১) কুমার কহি-
লেন, সাহসের পরাকাষ্ঠা বটে! পার্থ
কহিলেন, এদিকে দেখ (২) অন্য অঙ্গ-

(১) রোযোৎকর্ষকষায়িতোল্লগদৃশোপাংগে

হিড়িম্বপ্রিয়ঃ

পাকালীহৃদয়স্থলঃ সরভসং লজ্জাহুকূল্য-

কলঃ।

নির্য্যোকঃ গণিনস্তনোদিব বলাৎ সেনাব-

রুফঃ পুরা

সোহিতং সাহসিকাংগীতুরূপেঃ দ্রুশ্যমান-

স্তিষ্ঠতি ॥

(২) অন্যঙ্গনাপরিহৃতিপ্রণয়ন কীর্ত্যো-

নাসংসর্গ চিরপরিহার করিয়াছেন বলিয়া
প্রণয়বশে ধবলবেশা কীর্তিদেবী পলিত-
চ্ছলে যাহাকে আনিজন করিয়াছেন,
যিনি দৃষ্টযুদ্ধে সুবিশিষ্ট জামদগ্ন্যের বি-
জেতা, তিনি ঐ দেবব্রত ভীষ্মদেব, বিপুল-
যশাঃ আমাদিগের পিতামহ। এই সময়ে
বৈমানিকগণ যুদ্ধদর্শনলালসায় নভোম-
ণ্ডলে অগভীর হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র
সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক দিকে অগণ্য
যুদ্ধদ্রুমদ কর্ণাদি বীরগণ, অপরদিকে অস-
হার রথী পার্থ সমরে প্রবেশ করিয়াছে।
দেখিয়া বুঝিলেন, বিপুলতেজোময় সহ
অপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। এদিকে
কুমার উত্তর অগ্রে অবলোকন করিয়া
কহিলেন, দেব! কুঙ্করাজই আসিতেছেন।
পার্থ কহিলেন, তবে আমাদিগের মনো-
রথ পূর্ণ হইল। অবিলম্বে রাজা দ্রুশ্যোদন
রণারোহণে পুরোবর্তী হইয়া পার্থের অ-
ভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, (৩)
অহে সাহসিক! বনবাসের ক্রোধান্বিত
কি জীবনে এমন নির্ব্বিদ উপস্থিত হই-
য়াছে, যে তুমি একাকী এই অসংখ্য যো-
দ্ধার সহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? দ-

বালিজিতো ধবলয়া পলিতস্কুলেন।

দ্রুদাহবপ্রকটনির্জিতজামদগ্ন্যো-

দেবব্রতঃ পৃথুযশাঃ স পিতামহোনঃ ॥

(৩) বনবাসপারিক্রোধান্বকিং নির্ব্বিরোসি

জীবনে।

যদভীরোকএব মনোকৈর্য্যোদ্ধুমুদ্যতঃ ॥

নঞ্জয় সোপহাসে (৪) কহিলেন, পার্থ এ-
কাঁকী কালকেয়ের সহ নিবাতকবচগণকে
ভস্মীভূত করিয়াছিল ; একাকীই বান্দে-
বের ভগ্নীকে হরণ করিয়া ছিল, আর
সেই একব্যক্তিই খাণ্ডববন অনলে দগ্ধ
করিয়াছিল। পার্থের সমরে এ পশু নৃতন
নহে। দুর্যোধন কহিলেন, উপহাসে প্র-
য়োজন কি, পরীক্ষাশূল সংগ্রামই উপস্থিত
হইয়াছে। পার্থ মহাসো কহিলেন, কুক-
নাথ ! এস্থান হইতে অপসরণ কর ; সে
অনাধি দূতক্রীড়া, যাহাতে রূপদরাজ-
পুত্রীকে দাসী করিয়াছিলে ; এখানে
শরশলাকাপাতপূর্বক প্রতি নৃপতির শর-
রূপ অঙ্কে ক্ষত্রিয়দিগের দূতক্রীড়া হইয়া

(৪) একোনিবাতকবচাম্ সহ কালকে-
গ্নৈর্ভস্মীচকার ভগিনীমহরজ শৌরেঃ ।
একেন খাণ্ডববনং জুহুবেহনলে চ পার্থস্য
নাভিনব এষ রণেশ্ব পশুঃ ॥
দুর্যো।। অলমৈতৈকপহাঁসঃ উপস্থিতো
নিকষোপলোপমঃ সংগ্রামঃ ।
নায়কঃ । (মহাসম্ ।)

অপসর কুকনাথ দূতমন্তাদৃশং তৎ জ-
পদনৃপতিপুত্রী যত্র দাসীকৃতাসীৎ । ইহ
হি শরশলাকাপাতপূর্বকং সগর্ভং প্রতি-
নৃপতিশরীকৈঃ ক্ষত্রিয়দূতকৈলিঃ ॥
দুর্যো।। (সামর্থ্যং) ।

করিবদনবলয়ভূষিতকরশিরতাক্রকার্থ-
কাভ্যাসঃ ।

নর্তনশালাংপ্রবিণ প্রবীরপুংসোচিতো-
হি সংগ্রামঃ ॥

থাকে। দুর্যোধন সরোষে বলিলেন,
যাহার হস্ত শুরিকালকার্থ কাভ্যাস প-
রিভাগ করিয়া হস্তিদন্তনির্ধৃত বলয়ে ভূ-
ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অভ্যাস
নৃত্যশালায় প্রবেশই উচিত, এস্থানে নহে ;
এ সংগ্রামস্থান, প্রবীর পুংসের উপযুক্ত।
বিরটপুত্র সকটাক্ষে উত্তর করিলেন, (৫)
আর্য্য ! আপনি ইহাকে যে চিরপরিভাক্ত
কার্থকাভ্যাস বলিতেছেন, তাহা যুক্তই
বটে। যেহেতু ইন্দ্রপ্রেরিত গন্ধর্ব্বগণ যখন
আপনাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, ত-
খন রূপাপরবশ নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশ-
ক্রমে আপনাদিগের যোচনাধী ইনি যে
শরপঞ্জর রচনা করিয়াছিলেন, অতি বি-
হ্বলতা প্রযুক্ত আপনি তাহা দেখিতে পান

(৫) কুমারঃ । (সোপহাসম্) আ-
র্য্যোনং চিরপরিভাক্তকার্থকাভ্যাস ইতা-
ভিধৎসে তদযুক্তং ।

সংক্রন্দনপ্রহিতখেচরবর্গবন্ধ-
যুগ্মংরূপাকুলনিজাঞ্জলশাসনেন ।
ভীমানুজেন বিহিতা শরপঞ্জরক্ৰী-
নালোকিতাহি ভবতা নৃপ বিহ্বলেন ॥
দুর্যো।। সূত অলং বিপ্রজনোচিতবাক্-
লহেন । বিষমেয়ং ভূমিঃ । রথসঞ্চারো-
চিতাং ভুবমবতরাম । ইতি নিজ্রান্তৌ ।
বিদাদধরঃ । নায়করথং নির্দিশ্য । দেব !

ভ্রমন্দনস্যন্দনবাজিরাজি-
খুরক্ষতক্ষুরজঃপতাকাঃ ।
বিপক্ষবক্ষেহরগিমস্থনোষ্ঠ-
প্রতাপবহ্নিরিব ধূমেনখাঃ ॥

নাই । দুর্যোধন কহিলেন, হৃত ! ব্রাহ্ম-
ণের ন্যায় বাক্কলছে প্রয়োজন কি ?
এতুনি অতি বন্ধুর, রথসংখ্যারোপযুক্ত ভূ-
মিতে অবতরণ কর । অনন্তর উভয়ে রণ-
ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন । অশ্বসমূহের
খুরাহত ধূলিরাশি উদ্ভিত হইতে লাগিল ।
আকাশে বিদ্যায় অর্জুনের রথের প্রতি
নির্দেশ করিয়া কহিলেন, দেব দেখুন আ-
পনার আত্মজের রথযোজিত অশ্বসমূহের
খুরোদ্ধত ধূলিরাশি বিপক্ষদিগের বক্ষঃ-
স্থলরূপ অরণিদগুজাত প্রতাপবহির ধূম-
রাশি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । এ-
দিকে যুদ্ধঘোষণা হওয়ার অশ্বের হেয়ারবে
হস্তীর রংহিতে, বিপুল জ্যাঘাতশব্দে যুদ্ধ-
বাদ্যারাবে ও মদহস্তিনিবহের স্তম্ভলগ্নি
ঘটানিনাদে যুদ্ধস্থলে তুমুল কোলাহল
উদ্ভিত হইল । অর্জুন অস্ত্রত শিক্ষাবলে
অতি লঘুহস্তে বাণবর্ষণে নিমেষমধ্যে কা-
হাকে খণ্ডিতগণ্ড, কাহাকে ভগ্নকোদণ্ড,
কাহাকে শীর্ষকহীন, কাহাকে নির্ভিন্ন-
চক্ষুঃ, কাহাকে ভগ্নভুজ, কাহাকে ক্ষত-
বক্ষঃস্থল করিয়া ফেলিলেন । ইন্দ্রের পার্শ্ব-
চর বিদ্যায় পার্শ্বের রূতহস্তায় নিমেষ
মধ্যে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের অপূর্ণদশা দেখিয়া
সবিস্ময়ে সবাঞ্চে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেব
দেখুন দেখুন, (৬) সৈন্যরাশিতে এই
রণভূমি ভাঙ্গমাংস দুর্দিনের আকার ধারণ

(৬) বিদ্যায়ঃ । দেব পশ্য পশ্য
যুদ্ধস্তির্মদবারি বারগগণৈর্মঘায়িতং

কার্দু কৈ-

করিয়াছে । তথাহি, মদজাবী মাতঙ্গযুগ ব-
র্ষুক মেঘজালের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এই
বিচিত্র কার্দুকগুলি ইন্দ্রধনুঃ বলিয়া বোধ
হইতেছে, খেতচ্ছত্র সকল শিলীকু পুষ্পের
শোভা ধারণ করিয়াছে, আর অস্ত্রসংঘটনে
সমুদ্ভূত বিকিণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খদ্যোত পু-
ঞ্জের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এবং জ্বলন্ত-
নারাচসকল অশনির ন্যায় বোধ হইতেছে ।

অতঃপর যে ভয়ঙ্কর ও মনোহর যুদ্ধব্যা-
পার বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাহার প্রদ-
র্শনে বিরত হইলাম । কারণ, সজেকপে
পরিচয়-প্রদানই আমাদের উদ্দেশ্য ।
কিন্তু নিতান্ত অন্যায় হয় বিবেচনা করিয়া
২টীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক-
বির বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিব ।

প্রাচীনকালে যেরূপ অলৌকিকভাবে
যুদ্ধদৃশ্য বর্ণিত হইত, এ কবিও সে প্রণালী
পরিচ্যাগ করেন নাই । ক্রমে বীরশ্রেষ্ঠ
স্রোণাচার্য্য দুর্যোধন কর্তৃক ভৎসিত হ-
ইয়া অর্জুনের প্রতি বৈনায়কঅস্ত্র প্রয়োগ
করিলেন । তখন বিমানচারিগণ দেখিলেন,--
সিন্দূরাকর্ণমৌলিভিঃ স্বদশনপ্রোতাস্থদ
স্রোণিভি
লীলোদন্তকরাগ্রমাকতভর-প্রোজুততারা-
গণৈঃ ।

রেতৈঃ শক্রশাঃ সনাগিতমধশ্চতৈঃ শি-
লীকুপ্তিতং ।

খদ্যোতাসিতমস্ত্রঘটনসমুদ্ভূতস্ফুলিঙ্গৈঃ স্ফুর
নারাচৈরশনায়িতং রণভূবাসৈর্নৈর্নাত-

সায়িতম্ ॥

পাদাঘাতচলৎকুলঙ্কিতধরৈঃ সঙ্গীর্ণমাল-
ক্যাতে
হের্ষাজ্জবিনিঃস্বতৈর্গদমুখৈঃ স্তম্ভৈরমৈর-
ষ্বরসু ॥

পাথ' অবিলম্বে সিংহাজ্জপ্রয়োগে
তাঁহার নিবারণ করিলেন ;—
দংষ্ট্রাজ্যোতিঃ-খচিতগগনৈঃ কেশরাটো-
পভীমৈ-
কলাঙ্গুলৈঃ ক্ষিতধরগুহাসঞ্চরজ্বরনাদৈঃ ।
দিগ্ভৈরন্তর্নখরশিখরোংখাতকুন্তস্থলাস্বগ্
ধারাস্বাদবাসনবিবশৈঃ কাপিনীতাগজেষ্ট্রাঃ ॥
ইত্যাদি ।

বিদ্যাধর কহিলেন, দেব! জয়ের
আর অপেক্ষা নাই। ভীষ্মের অশ্বসকল
হত, দ্রোণাচার্য্যের সারথি নিহত, কৈশোর
রথ চূর্ণীকৃত, দ্রোণপুত্রের ধনুর্লতা ছিন্ন
হইয়াছে, কৃপাচার্য্য বিচেতন হইয়াছেন
ও কুরুনাথ ভয়ঙ্কর নিজ সৈন্যগণের সহ
পলায়ন করিতেছেন এবং অর্জুনের তাঁহার
পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন। প্রতীহারী
নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, দেখুন দেখুন,
দুর্যোধনের অত্যাচিত উপস্থিত। বিদ্যাধর
কহিলেন, ভয় নাই, বিমুখের উপরি “ই-
ন্দ্রতনয়ের” অস্ত্র কখনও নিপতিত হয়
না। বাস্তবিক তাহাই হইল। পাথ' নিরুত
হইলেন। সমরও শেষ হইল এবং গৌস-
কল প্রত্যাভিষিক্ত হইয়া গৌরবকদিগকে
সমর্পণ পূর্বক পৌরজন কর্তৃক অভিন-
ন্দিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। অতঃপর
ভাতৃচতুষ্টয়ের সহিত উদীয় দিলন, অজ্ঞা-

তবাস হইতে মুক্তি, বিরাটের অনুন্নয় ও
কন্যাদান সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কবি
গ্রন্থসমাপ্তি করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ
শ্লোকটি পাঠে প্রতীত হয়, যে মণ্ডন না-
মক কবির সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা
ছিল। কিন্তু হায়! কোণার মণ্ডন! তাঁ-
হার প্রতিযোগীর কাব্যে উদীয় নামো-
ল্লেখ মাত্রেই পৃথিবীতে এককালীন তাঁহার
অস্তিত্ব আমাদিগের বোধবিষয় হইতেছে,
অন্যথা তাহারও সম্ভাবনা ছিলনা হায়!
মানবেরা যে যশঃ কীটিকে অবিনশ্বর ব-
লিয়া অভিমান করেন, তাহারও এইরূপ
নশ্বরতা এবং যশোলিপ্সাজনিত পশুিত
মণ্ডলীর যে অন্যান্যবিরোধ সমাজে নিন্দ-
নীয়, তাহারও এরূপ সফলপ্রসবিতা!

ধনঞ্জয়বিজয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লি-
খিত হইল, ইহাতেই পাঠক গ্রন্থকারের
কবিত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন।
তদ্বিবয়ে বাগাডম্বর নিম্প্রয়োজন। হৃদয়-
গত রসভাবোচ্ছ্বাস ভাষায় যথায়থরূপে
স্ফুটীকৃত হইলেই কবিতার উৎপত্তি হয়।
পাঠমাত্রেই প্রতীতি হয় যেন উহা কবির
লেখনী হইতে সচ্ছন্দপ্রবাহে নির্গত হই-
য়াছে। কবিকে তন্নিমিত্ত সামান্য প্রয়াস-
পরম্পরাও স্বীকার করিতে হয় নাই।
উহা পাষাণোশ্ব উৎসধারা, মনুষ্যের হস্ত-
ব্যায়ামোৎক্লিষ্ট জলগণ্ডূষ নহে। কবি-
তার বাহ্য নিদর্শন স্থূলতঃ এই দেখা যায়,
যে উহাতে অনাবশ্যক শব্দমাত্রও লক্ষিত
হয় না, স মন্তই প্রকৃতরসের পরিপুষ্টির নিমিত্ত

প্রযুক্ত হয় । বিশেষতঃ সংস্কৃত কবিতার আর এক রীতি এই যে কতিপয় পদ স্তোত্র-
তিগোচর হইলেই তাহার স্বরূপ উপলব্ধি
হয় । অলক্ষ্য ব্যবহৃত স্থান হইতে বন্ধু-
জনের স্বর শুনিয়া যেমন প্রভাতিজ্ঞা জন্মে,
অশ্রুতপূর্ব্ব প্রকৃত কবিতা অরণেও তেমনি
তৎক্ষণাৎ উহা কবিনির্ম্মিত বলিয়া পরি-
চয় সঞ্চার হয় । এতদ্ব্যতীত শরদারস্ত-
কালীন প্রভাতবর্ণনাবসরে,—

দারাদিগুণমুরৈরিণো রতিপতেঋতুজি-

লোকীজিতঃ

ক্ষারংপক্ষজকোটরোদরজুষো নিদ্রাবি-

রামে শ্রিয়ঃ ।

প্রভাতজন্মরালপক্ষপটহর্ষনিপ্রবন্ধানুগং
ভূঙ্গী মঙ্গলগাথিকৈব সততং প্রোৎকু-

জতি প্রাজ্ঞে ॥ ৭

(৭) এই বর্ণনায় রাজার নিদ্রাভঙ্গস-
ময়ে বৈতালিকমধুর তাললয়ানুগত মাস্তু-
লিক গীতপ্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হইয়াছে । কিন্তু
ইনি সামান্য রাজা নহেন । ইনি জগতের
উৎপাতস্বরূপ দৈত্যগণের নিহন্তা বীরশ্রে-
ষ্ঠের মহিষী, ত্রিভুবনবিজয়ী রতিপতির জ-
ননী, অসং ত্রিভুবনসৌন্দর্য্যরূপিনী লক্ষ্মী
দেবী । সুকোমল কমলগর্ভ তাহার শ-
রনাগার । প্রভাতে রাজহংসকুল জাগ্রত
হইয়া অলস পক্ষপুটের সঞ্চালনশব্দসহ-
কারে সেই কমলময় সরোবরে অবতরণ
করিবে, মধুকরী অগ্রে অগ্রেই আগ-
মন করিয়া মধুর গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছে ।

এই কবিতা যখনই আমাদেরিগের কর্ণে
প্রবেশ করে, তখনই ইহার রচয়িতাকে—
স্বভাবের এই দ্বিগুণবৈচিত্র্যবিধাতাকে কা-
ব্যজগতের অন্যতর বিধাতা বলিয়া আমা-
দিগের প্রতীতি জন্মে । বাস্তবিক, গায়-
কের অসম্পূর্ণগীত রাগপ্রবাহ, চিত্রকের
অসম্যক্ অঙ্কিত রেখাময় আলেখ্য এবং
কবির ক্ষীণধারায় অভিন্নমুখ বাগমূত সহ-
জেই স্ববিভবসামগ্র্যের পরিচয় দেয় ।
যদিও মূল আদর্শের সমক্ষে ইহা অকিঞ্চি-
ৎকর,—মহাভারতকে সহস্রশাখ অক্ষয়
বটরূপ বলিলে ইহা তাহার একটি শাখা-
রও তুলনীয় কি না সন্দেহ, তথাপি ইহা
রমণীয় । সেই বিশালমূর্ত্তি পাদপের
যেমন এক ভয়বিম্বয়বিমিশ্র অপূর্ব্ব শোভা,
সেই রূপকে বালাদশায় কতিপয় ঘনসর-
সশািমলপল্লবশোভিত ক্ষুদ্র একটি শাখা-
রূপে অবলোকন করিলে তাহারও তেমনি
আর একরূপ অপূর্ব্ব ললিতকান্তি আমা-
দিগের হৃদয়কে মুগ্ধ করে । সংসারে
এরূপ শোভা গ্রহণ করিতেও হৃদয়ের দ্বার
স্বভাবতঃ উদ্ঘাটিত হয় সন্দেহ নাই । জিশা--
মুখসুপ্তা লক্ষ্মীদেবী সেই স্বরগঙ্গীতে স-
মুদ্বোধিত হইলেন; অমনি কমলদল উ-
দ্ঘাটিত হইতে লাগিল; লক্ষ্মীদেবী নয়-
নোন্মীলন পূর্ব্বক বহিরাবিভূত হইয়া অমৃ-
তনিস্যন্দিনী দৃষ্টিপাতে ত্রিজগৎ সমুদ্ভা-
সিত করিলেন । ইহা অপেক্ষা প্রভাত-
বর্ণন আর কত মধুর হইতে পারে ?

ডেস্‌ডিমোনা।

১

নিশীথ রজনী, ধীর অন্ধকার
যেহেছে সাইপ্রস্ শত প্রসরণে,
কুম্ব-কোমল শান্তির আধার
মার অঙ্কে যথা চিত্তাশূন্য মনে

২

নিজা যায় শিশু, তেমতি স্নন্দর
সাইপ্রস্ শুরে ভুমধ্য সাগরে
বীচিরবচ্ছলে মনোমুগ্ধকর
ধীরে ধীরে ধীরে অবগণ বিবরে :

৩

সুমের অক্ষুট সংগীত ঢালিয়া
হরিছে চেতনা ; সাগরে আঁধারে,
আঁধারে সাগরে দেহ নিশাইয়া
রাজত্ব করিছে আজ চারি ধারে।

৪

ধীরে ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্র বীচিমালা খেলিছে পুলিনে,
যথা নিজাগত শিশুর শরীরে
সঞ্চালন কর জঘনী বতনে।

৫

এ দিগন্ত ব্যাপী আঁধার ভেদিয়া
ভরে ভরে যেন তারকা জ্বলিছে,
লোহিত বিভার দিশি উজলিয়া
সুদূরে আঘেয় তরঙ্গ খেলিছে।

৬

নির্জন-নিশুন্ধ-সাগরসৈকতে
ধূমবর্ণ-গণ্ড-শৈলের প্রমাণ
শোভিতেছে হুর্গ, নিখিত জগতে
দাঁড়াইয়া যেন কত্র নিজা যান।

৭

আঁধারে ডুবিয়া উচ্চ হুর্গচূড়ে
কাদম্বিনী-কোলে ফট্ ফট্ করি
স্নন্দর বিচিত্র বৈজয়ন্তী উড়ে
নিঃশব্দে ভ্রমিছে সশস্ত্র প্রহরী।

৮

নিখিত জগত গভীর নিজায়
হুর্গকক্ষে এক সতী ডেস্‌ডিমোনা
কুম্ব-কোমল ধবল শয্যায়
নিজা যায় ;—যেন বিশদ-বসনা

৯

ভিক্টোরিয়া লিলি রূপে আলোকরি
সরসীর জলে রয়েছে ফুটিয়া
কিধা জ্যোতির্ময়ী তারকা আমরি।
যেন সে কক্ষেতে পড়েছে খসিয়া—

১০

জ্বলিতেছে দীপ যেন স্নান-জ্যোতিঃ
ভবিষ্যৎ অরি ; কিছুই জামেনা
সোণার প্রতিমা প্রেম-মূর্তিমতী
নিজা যায় স্রুখে সতী ডেস্‌ডিমোনা !

১১

উদ্ধমুখী হয়ে নিমিত্তা স্মরী ;
দক্ষিণ মৃণাল-ভুজ পুগঠিত
স্থাপিত কোমল স্কীত বকোঁপরি,
বাম বাহু নিম্নে হেলায় লম্বিত ।

১২

স্মর শৃঙ্খলা বিহীন হইয়া
লাবণ্য মাখান ললাটে কেমন
চূর্ণ কুস্তলের লহরী পড়িয়া
নয়ন নাসাঐ করিছে চুষন ।

১৩

প্রশান্ত ললাটে, মুদিত নয়নে,
কোমল কপোলে, স্ফুস্ম নাসাশিরে
অলকাবলীতে, কর্ণ-আভরণে,
কীণ দীপালোক খেলে ধীরে ধীরে ।

১৪

“—অকারণ নহে, নহে অকারণ,
কিন্তু সে কারণ—নিশার কুস্তলে
মুক্তা-রূপিণী স্ফটিক হৃদয়
হাসে যে তোমরা, লো তারা কুস্তলে,

১৫

“সে কারণে হার,—সে পাপ-কারণ
বলিব না আমি শু’নোনা তোমরা ;
শুনিলে সে কথা রোধিবে প্রবণ,
অজ শিহরিবে হবে জ্যোতিঃ হারা ।

১৬

“—কিন্তু রক্ত-পাত,—তার রক্ত-পাত
করিবনা ; তার সোণার শরীরে,
করিব না আমি কভু অজ্ঞানত
কিন্তু তথাপিও বধিব তাহারে ।

১৭

“যদি নাহি বধি, যদি এ ধরায়
এ কাল-সাপিনী আরও কিছু দিন
ধরে পাপ-দেহ, নাহি জানি হার !
কত হতভাগা কত জ্ঞানহীন

১৮

“বাক্তিরে সে বিবে করিবে জর্জর !
তার বাণ্ডার আমারি মতন
রূপে মুগ্ধ হয়ে কত মূৰ্খ নর
পতঙ্গের মত হইবে পতন ।

১৯

“নিবাইব এই প্রদীপ এখনি ।
—তার পর ?—এই ঘোর পাপিতার
জীবনপ্রদীপ । কণকবরণি
লো জ্বলন্ত-শিখা তোরে একবার

২০

“নিবাইয়া পুনঃ দীপ্ত করা যায়,
কিন্তু সুধামুখী কলো বিষধরি,
জীবনপ্রদীপ জ্বলাইতে হার
পারিবি কি যদি নির্দোষিত করি ?

২১

“এই হন্তে যদি প্রাণ-পুষ্প তোর
ছিঁড়ি একবার, জীবন্ত রাখিতে,
অভাগিনি, আর নহে সাধ্য তোর ;
শুকাইবে এক দিবসে নিশিতে ।

২২

“এ স্মরতি পুষ্প পূর্বে ছিঁড়িবার
একবার আমি দেখিব আগিরা ”
এই বলি সেই প্রেমপ্রতিমার
বিদ্বাদরে স্বীয় অধর স্থাপিয়া

২৩

করিল চুম্বন, সতী শিহরিল।
 “আর একবার—এই শেষ বার”
 সহসা ললনা জাগ্রত হইল।
 পরাজিতা যুগ্ম-বীণার বঁহা

২৪

কহিল। সুন্দরী,—“ওকে প্রাণেশ্বর ?
 “আমি, ডেস্‌ডিমোনা” কহিল। ওথেলো
 “হইল রজনী দ্বিতীয় প্রহর
 শোও এসে কেম জাগিতেছ বল ?”

২৫

যথা অগ্ন্যুৎপাত আশঙ্কা না করি
 আগ্নেয় গিরির নিকটে আসিয়া
 নিত্য কর্ণ যত দিবস শব্দরী
 করিতেছে লোক নিশ্চিন্ত হইয়া ;

২৬

কিন্তু অচলের উচ্চ হৃৎ কুটি
 শিলা, তাম্র, ধাতু, উত্তপ্ত-অঙ্গার
 সহসা যেমন অন্তরীকে উঠি
 মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস করে চারি ধার।

২৭

সেই রূপ হার শুদ্ধা ডেস্‌ডিমোনা
 ওথেলোর হৃদে রোরব অনল
 গর্জিছে যে তার কিছুই জানেনা ;
 যেন নিরমল উষার কমল।

২৮

“দৈবরোপাসনা করেছ কি আজ ?
 যদি এখনও নাহি করে থাক,
 করি কোন মর্মা গরহিত কাজ
 চাও যদি কখন, শীতলীকে ডাক”

২৯

সুগভীর স্বরে ওথেলো কহিল।
 “একি কথা আজ কহিছ প্রাণেশ ?”
 বিম্বিত হইয়া সতী উত্তরিল।
 ওথেলোর মুখে দৃষ্টি অনিমেষ

৩০

স্থাপিতা সুন্দরী দেখিল। সত্তরে
 ওথেলোর আক্লি ভীষণ মুরতি ;—
 চক্ষু দুটি ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে
 বৈদ্রাভিক তেজে পাইছে ক্ষুরতি ;

৩১

দেহের জামিমা হয় অনুমান
 বাড়িয়াছে যেন, অধরে কবির,
 কটিবন্ধে জ্বলে অস্ত্র ধরশাণ,
 স্নেহ মাখা নহে স্বর সুগভীর।

৩২

তীব্রতর স্বরে কহিল। ওথেলো
 “কহিলাম বাহা কর শীত্র করি ;
 এইস্থানে আমি জমি কণ কাল
 অপ্রস্তুত ভাবে তোমারে, সুন্দরী

৩৩

বধিবনা আমি ; অন্তিম সময়
 অন্তর্ধামী যিনি সম্মুখে তাঁহার
 খুলেদেও পাপ-কুটিল-হৃদয় ;
 বধিবনা আমি আত্মাকে তোমার।”

৩৪

যেন ডেস্‌ডিমোনা দেশায় বিহ্বল
 কিছুই দেখেনা, কিছুই বোঝেনা ;
 চক্ষে ঘোরে যেন কক্ষ-ধরাতল,
 বলি বলি করি বচন সরে না

৩৫

অবশেষে ধীরে কহিলা সরলা,
“বধিবে আমারে কহিছ কি তাই ?”
“তাই কহিতেছি” দ্রুত উত্তরিলে;
“তবে এ দাসীয়ে তাঁর পদে চাই

৩৬

“দিউন ঈশ্বর” এতেক কহিয়া
অক্ষ-পূর্ণ দুটি কমল-নয়ন
আকাশের পানে ধীরে উঠাইয়া
নীরবিলা সতী ; নীরবে তখন

৩৭

দুইটি মুকুতা খসিয়া পড়িল !
ক্রোধাক্রম ওখেলো তাহা দেখিলনা;
জানিস্ দুর্দৃষ্টি জানিস্ ওখেলো,
এ মুক্তার দুটি নাহিক তুলনা !

৩৮

নিরদয় মূঢ় কহিল অমনি ;—
“তবে তাই হোক” নতুনতম স্বরে
কহিলা সুন্দরী “অধিক রজনী
হয়েছে প্রাণেশ, ঘোর নিদ্রাভরে

৩৯

“আশি দুটি তব লোহিত বরণ,
পরিহাস ছাড়, আইস শযায় !”
জাননা অভাগি নিদ্রিত এখন
হইবে আপনি অনন্ত-নিদ্রায় ।

৪১

কহিল ওখেলো ; “নিজ ব্যভিচার,
পাপীর্ষা-ধারেক কর লো স্মরণ ।”
মুহুরা কঁসালে মুকুতার ধার
ভয়স্বরে সতী কহিলা তখন ;

৪১

“—ওখেলো প্রাণেশ ! মুক্তকণ্ঠে আজ
কহিতেছি আমি ধর্ম্মে সাক্ষী করি
তোমারই মুরতি সতত বিরাজ
করে এ হৃদয়ে দিবস শরীরী ।

৪২

“একদেবে আমি ভঞ্জি ভক্তিভরে ;
সেদেব ওখেলো ! তুমিই আমার
এই উর্দ্ধময় সংসারসাগরে
জীবন-তরীর তুমি কর্ণধার ।

৪৩

“অপর পুরুষে অপবিত্র ভাবে
একবার যদি নিরখিয়া থাকি,
যবে দেহ হতে প্রাণ উড়ে যাবে
হে ঈশ্বর ! তুমি ডুবাইয়া রাখি

৪৪

“অতল-অনন্ত রৌরব-অনলে
দিও অভাগীর অনন্ত যাতন ।”
এতেক কহিয়া তাসি অশ্রুজলে
ছিন্নতন্ত্রিসম থামিলা তখন ;

৪৫

কিন্তু ভয়ে ভয়ে দেখিলা চাহিয়া
ক্রোধী ওখেলোর শরীর কাঁপিছে,
চক্ষু রক্তবর্ণ, অধর বহিয়া
ফোটে ফোটে লাল কখির পড়িছে !

৪৬

“চুপ্ ডেস্‌ভিমোনা !” কহিল ওখেলো
মেঘমন্ড্রসম সুগভীর স্বরে ।
“করিলাম চুপ্ কি হয়েছে বল ?”
ডেস্‌ভিমোনা সতী কহিলা কাতরে ।

৪৭

“কি হয়েছে হায়, কি হয়েছে বল ?”
কহিল। ওথেলো,—“কি হইবে আর
বাছি বাছি যেই শুভ শতদলে
যতনে তুলিয়া হৃদয়ে আমার

৪৮

“কহিছু স্থাপন, এক বিষধরী
তাহা হতে হায়, বাহির হইয়া
মর্ম্ম স্থানে মোর মংশেছে স্নানরি !
কি যে হইয়াছে, কাজ কি কহিয়া !

৪৯

“দেখ ডেস্‌ডিমোনা শুন কথা মোর
আসন্ন সময় তব সন্নিহিতে,
জীবন-বামিনী শীঘ্র হবে ভোর
নিজ অপরাধ কও অকপটে।

৫০

“কৃত পাপ কেন করি অস্বীকার
পাপের উপরে পাপ চাপাইবে !
কেমনে বহিবে এত পাপভার
পরকালে তব কি গতি হইবে ?”

৫১

“প্রাণনাথ ! “চুপ্ চুপ্ ! পাপিয়সি !
ওথেলো কাহারো প্রাণনাথ নয়,”
তথাপি কাতরে কহিল রূপসী
“তুমিই আমার আছ প্রাণময়।

৫২

কেশিওকে আমি—ধর্ম্মে সাক্ষী করি
কহি বার বার—কেশিওকে আমি,
ওথেলো তোমাকে তিলার্দ্ধ পাসরি,
ভজি নাই কভু, তুমি মোর স্বামী !”

৫৩

“ভজি নাই তুমি ? পিশাচি, পাপিনি !
ভজি নাই তুমি”—ওথেলো গর্জিল ;
“কেমনে লো তবে কহিলো সাপিনি !
আমার কন্মাল কেশিও পাইল ?”

৫৪

“আমি দেই নাই !” “তুমি দেও নাই ?”
“আমি দেই নাই ওথেলো প্রাণেশ !
আমি দেই নাই জানেন গোঁসাই
বুঝি সে কোথাও পড়িয়া পাইল !”

৫৫

“ডাক কেশিও রে, সুখাও তাহারে
সে যা সত্য জানে করুক স্বীকার !”
“প্রভারণা আর করিতে আমারে
নারিবে পাপিনি ! সব দোষ তার

৫৬

স্বীকার করেছে ; ডেস্‌ডিমোনার,
ওথেলোর পত্নী—না না তাহা নয় ;
ডেস্‌ডিমোনার সহ ব্যভিচার
করেছে কেশিও অনেক সময়।”

৫৭

কহিল। সুন্দরী কঁাদিতে কঁাদিতে
“ওথেলো, এমন অসত্য বচন
পারেনা কেশিও কখন কহিতে।
‘সত্য’ বিষ হাসি হাসিয়া তখন

৫৮

ওথেলো কহিল ;—“কহিতে পারেনা ;
দুহু কেশিওর চিরদিন তরে
দৃঢ় বদ্ধ মুখ, নীরব রসনা।”
“তবে” ডেস্‌ডিমোনা কহিল। কাতরে

৫৯

“ভবে কি কেশিও হয়েছে নিহত ?”
 “দেখ ডেস্‌ডিমোনা” উত্তরিল মুঢ়,
 “এই শিরোদেশে কেশ সংখ্যা যত
 কেশিওর এত সংখ্যক প্রচুর

৬০

“যদি—শুনিছ ত ?—খাকিত জীবন,
 ক্ষুধার্ত হ্রস্ব শার্দূলের প্রায়
 করিতাম আমি একত্রে চর্ষণ !
 তার সদ্য উষ্ণ শোণিত-ধারায়

৬১

দাবানলসম যে মহা অনল
 দহিতেছে হায় ! মরম আমার,
 নিবায়িতা তাহা হ’তাম শীতল !
 তার পরে—না না কহিবনা আর”—

৬২

“মরেছে কেশিও বিনা দোষে হায় !”
 এতেক কহিয়া কাঁদিল স্নানরী
 “হায় ! হায় ! আজ্‌ আমি নিকপায়”
 “কেশিওর তরে, কিলো বিষধরি ।”

৬৩

গর্জিল ওথেলো—“কেশিওর তরে
 করিস্‌ আক্ষেপ সম্মুখে আমার ?”
 এতেক কহিয়া মহাক্রোধভরে
 অগ্নিসর হল মুঢ় হ্রস্বচার ।

৬৪

“ওথেলো, প্রাণেশ !” সজল নয়নে
 পতিপ্রাণা স্ত্রী কহিল কাতরে
 “য়েখে এস যোরে গহন কাননে
 ভয়াল ভল্লুক বখার বিচরে ।

৬৫

“সেইখানে আমি চিরদিন রব
 বিরক্ত তোমারে কভু করিব না ;
 যত কষ্ট হয় মনে মনে সব
 ব’ধোনা আমারে পরাণে ব’ধোনা !”

৬৬

“বধিবনা তোরে ? পিশাচি ! পাপিনি !
 বধিবনা তোরে ?” যোর সিংহরবে
 গরজিল মুঢ় ;—“একাল সাপিনী
 থাকিলে সংসারে সর্বনাশ হবে ।,,

৬৭

অশ্রুজলে ভাসি, কর যোড় করি
 কহিল। সাবিত্রী শোক-ভগ্ন-স্বরে,—
 “পোঁহাইলে এই কাল বিভাবরী
 বধে অভাগীরে ! আজি দয়া করে

৬৮

“প্রাণেশ ওথেলো ! আজি দয়া করে
 জীবিত থাকিতে দেও এ ধরায় !
 তব চিরদাসী অগ্নিমে কাতরে
 তব পদে মাত্র এই ভিক্ষা চায় !”

৬৯

“না না তা হবে না—কখনই হবে না,
 —দ্যাখ্‌ পলাইতে পুনঃ চাস্‌ যদি,
 অত্ৰাঘাতে যাতে দ্যাখ্‌ ডেস্‌ডিমোনা
 বহায়িব তোর শোণিত নদী !”

৭০

পতিপদতলে লুঠিত হইয়া
 কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তরিল। স্ত্রী,
 “তবে মুহূর্তেক দাঁড়াও ডাকিয়া
 লই দয়াময়ে—অগতির গতি ।,,

৭১

“না না না আর না”—এতেক কহিয়া
কজ্জলপী মূঢ় অর্জ-লক্ষ্ম দিল,
দূঢ় লোহ জিনি বজ্রাঙ্গুলি দিয়া
দগ্নিতার গলা চাপিয়া ধরিল।

৭২

“ঘার খোল, প্রভু, খোল খোল ঘার,,
“কে তুমি?” চমকি ওথেলো কহিল;
“ঘার খোল আগে” সঙ্গে সঙ্গে তার
বারংবার ঘারে আঘাত পড়িল।

৭৩

খুলিল দুয়ার। দাসী এমিলিয়া
উর্দ্ধ্বাঙ্গে আসি পশিল কোঠায়;
“যাও যাও প্রভু, যাও দেখ গিয়া
রডারিগো হত হইয়াছে হায়!,,

৭৪

“পড়িয়াছে কিসে রডারিগো মারা?
নহে সে কেশিও—কখন?—এখন?
হইয়াছে যম আজ মাতগয়ারা
একের বদলে অন্যের নিখন।,,

৭৫

“হায় অকারণে মোর প্রাণ যায়!
জানাইও নাথে প্রণাম আমার,
চলিলাম এমি বিদায়! বিদায়!,,
“—ওষে গলা কর্তী ডেসডিমোনার!,,

৭৬

“উঠ উঠ সবে! হায়! হায়! হায়!
কহ ঠাকুরাণী” কীদি এমিলিয়া
সুখাইল দাসী ডেসডিমোনার,—
“কাহার একাজ কহনা ভাঙ্গিয়া?,,

৭৭

“আমি নিজে মরি কারো দোষ নয়!,,
কীণ-ভগ্ন-স্বরে কহিলা ললনা,
“পতি-পদে মোর প্রণাম নিশ্চয়
জানাইও এমি! ভুলোনা! ভুলোনা!,,

৭৮

কহিতে কহিতে নীরব-রসনা
চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন স্পন্দহীন কায়,
স্ফটিক হৃদয়া সতী ডেসডিমোনা
হইলা মগন অনন্ত নিদ্রায়! জ্বীদী—

পাগিনি।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি এক্ষণে
কোথায়? ইহার নির্ঘাতি কে? কোন্
সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন্-
ময়েই বা কোন্ দেশের লোকেরা ইহার
প্রচার করিয়াছিল? কে কে ইহার উন্নতি
করিয়াছিল? ইহা কি আদিমতম ভারত-

বাসীদিগের মাতৃভাষা ছিল? না তাঁহা-
দের অস্তুবিধ ভাষা ছিল, তাহাই সংস্কার
পূর্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া
প্রচার করিয়াছিলেন? এসকল নির্ণয় করে
কাহার সাধ্য? এই বর্ষায়সী ভাষার উৎ-
পত্তিকাল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। উ-

পরে যে “পাণিনি” মুকুটার্ণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই বর্ষায়সী ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলিয়ায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বুদ্ধতম, কিন্তু এই ভাষার কোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহাকে সুদঃপ্রসূত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিত্তার পর-পারে লুক্কায়িত আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে—আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাহারা সংস্কারক বা উন্নতি করেন তাঁহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শতবর্ষ ইহলোক তাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদেরই দু পাঁচ জন পূর্ব পুরুষ, যাহারা সংস্কৃত লইয়া কিকিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনের নাম-মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে যাহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা স্বর্গীয় সূত্রা পানের ক্ষোভ নিরুত্তি করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারি, ঔপমনিব, যাস্ক, গলব, শাকলা, তৈজসিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইনি দেবভাষা বলিয়া পরিচিত হি-

লেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশরুক, আপিশালী, শাকটায়ন, ব্যাড্ডি, পাণিনি, কাতায়ন, ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্য-কুলের নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিলেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যদিগের মধ্যে পাণিনি সর্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্বী আচার্য্যদিগের মত চলে না, সর্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও দুই একটা মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তাঁহারই বা এত মান্য কেন? তিনি কোন্ দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক? কাহার পুত্র? এসকল জানিবার জন্য অনেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদাৰ্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরও বিষয় প্রবৃতি হয় না। পাণিনির সমস্তাদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্মূল কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া দ্বিজ্ঞানদিগকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্মোই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে স-

কৃষ্ট না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যথার্থ নির্ণয় দুঃসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভুতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান লইয়াই থাকেন। অনুমানও কখন কখন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্কৃত। ভ্রান্ত অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম ‘ঐতিহ্য’। ঐতিহ্য কি, তাহা বলিতেছি। যাহা রূপরাম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বর্ত্তকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যথার্থ-নির্ণয়পক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে অভ্যস্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নিমূল কম্পনা বর্জন করিয়া অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

পুরাতত্ত্ব জ্ঞানিবার দুইটি মাত্র উপায়

আছে, যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ। তৎকালের কি তৎপরবর্তী কালের লিপি, ঘটনাবিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এই সকল উদ্ধার আলসন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্বা-পর বিকল্প, একদিকে সংলগ্ন, একদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও এই রীতি। এই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাণিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আচার্য্য হেমচন্দ্র স্বরূপ অভিধানচি-
স্তামণির মর্ত্যাকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ
করিয়াছেন। যথা—

“অথ পাণিনৌ, শালাতুরীয়দাক্ষেরৌ।”

শালাতুরীয় ও দাক্ষের এই দুইটি শব্দ
পাণিনি নামক মুনিবোধক। এই লি-
পির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া
গেল। বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রচারক শঙ্করা-
চার্য্যকেও পাণিনির নামোল্লেখ করিতে
দেখা যায়। যথা—

“নচ পাণিনিম্মতিবিরোধঃ—”

(১ম অং)

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে
যে, পাণিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ববর্তী,
কেন না শঙ্করাচার্য্য উক্ত পরিমিত কালের
লোক। যথা “নিধিনাগেইভবন্যাক্ষে”

ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

জৈমিনীসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। কেননা শঙ্করাচার্য্য স্বরূত বেদান্ত ভাষ্যের ১ম অধ্যায়ে “ যজুশাস্ত্রতাপর্য্যবিদামনুক্রমণম্ ” এই উক্তি করিয়া, শবরস্বামীর বাক্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মোচিত পূজা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মতম শবরস্বামীও পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

“ নহি ব্রহ্মিণেন্দেন আপাণিনেবাবহারতঃ
আদৈবঃ প্রতীয়েরন্ পাণিনিরুতিমনমুন্য। ”

(১ অং, ১ পাদ)

অতএব, ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে পাণিনি অত্যান ১২। ১৩ শত বৎসরের পূর্ববর্তী। যেহেতুক শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার হান নহে। অমর সিংহকেও পাণিনির অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাণিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্বে বর্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে।

মগধেশ্বর শেবনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য মুণিকেও পাণিনির উল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—‘ অশ্বত্থঃ ’ ‘ ক্রবোবাচি ’ ‘ আধারোহিধি করণম্ ’ ‘ ক্রবমপায়েহপাদানম্ ’ এই সকল পাণিনিসূত্র তিনি স্বরূত ন্যায়ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্য ২৩ শত বৎসরের কোন এক অনির্দিষ্ট কালের লোক।

এস্থলে ন্যায়ভাষ্য পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সে সংশয় এই যে, ন্যায়-ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎসায়নকৃত; কিন্তু আমি বলিলাম চাণক্যকৃত। এই সংশয়-তত্ত্বজ্ঞের জন্য, চাণক্য ও বাৎসায়ন যে একব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে।

চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্বকালে গুণ, বংশ, কার্ষা, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত, সুতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে। তাঁহার বাৎসায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চাণক্য, ত্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত, ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জ্যোনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বরূত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্ত নামগুলিই পর্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

“ বাৎসায়নে মল্লনাগঃ কোটিলশচণ-
কাঙ্গরঃ।
ত্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহঙ্গুল-
শচঃ। ” (মর্ত্যাকাণ্ড)

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎসায়নের কৃত তাহারও প্রমাণ আছে। উদ্যোতকর মিশ্রকৃত বাস্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিলস্বামীকৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিলস্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন। পক্ষিলস্বামী বাৎসায়নকে চাণক্য ভিন্ন অন্য কোন বাৎসায়ন কল্পনা

করা যায় না। সূত্রায় এই চাণক্যের নীতিশাস্ত্র, শাস্ত্রশাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রশাস্ত্রে ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এ-জন্য এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেফনন্দ্রের পূর্ববর্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অতীন ২৫০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্বারা কোন একটা নির্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৫০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটি নির্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অন্তরণ করিয়া আসিতে হয়।

কোন কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্গসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারত-বর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে-কালরাত্রিতুল্য ক-রালরাত্রের মধ্যভাগে বটরক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানপুত্র রুতবর্মা ও ক-পাচার্য্য জীবন্তনা পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে

কেন্দ্র করিয়া নিম্নে আগমন করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সূত্রায় অত্র কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতির্শাস্ত্রে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিনী নামক প্রাচীন ইতিবৃত্তগ্রন্থে ও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—“গতেষু ঘটস্থ সাক্ষিষু ত্র্যধিকেষুচ বৎসরে। অভ-বনুকুপপাণ্ডবঃ।”

কনির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জন-প্রতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কাল সংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অদ্যাবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাজ প্রচলিত হইল। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাজ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আখ্যাতটীয়া গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাজ বর্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের রত্নাস্ত্রখটিত মহাভারত, ভগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মধ্য নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভোগ করে। শত বৎসরান্তে প-

রিবর্তিত হইয়া অন্য নক্ষত্রে গতি হয় । স্বর্ষ্যের যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয় । এতাদৃশ সপ্তর্ষি-মণ্ডল যুগ্মতিরের রাজ্যকালে যথা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দোখিতেছি । এই কালে প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল । তাহার পরেও যুগ্মতিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন । তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে । এই যুগ্মতিরের কনিষ্ঠ অর্জুন, তৎপুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয় ; এই জনমেজয়ের পরে নৈমিষারণীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয় । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এতদ্ব্যপো অত্যান ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে । এই ভারতে পুরাণকালের এবং তৎসমকালের যে কোন মহাত্মা, সকলেই সন্নিবিষ্ট আছেন, কিন্তু ইহাতে যাক্ষ, পারস্কর, শাকটায়নাদির উল্লেখ নাই । কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তি অন্যান্য পুরাণেও নাই । যখন মহাভারতের পরবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাক্ষ পারস্করাদির

অসত্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অত্যান ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক । পাণিনি মুনি স্বীয় সূত্রে ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাক্ষ, পারস্কর, শাকটায়ন, এবং ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক নিম্নবর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন । এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অবরোধ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে । এখন পাঠক দেখুন, পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্ সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা করিতেছেন ? বর্ত্তমান সময় হইতে অত্যান ২৫০০ বৎসরের পূর্বে এবং কলির প্রবর্ত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন ।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত সতর্কতা হইতে পারে না । এক্ষণে দেখা যাউক, ঐতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয় ।

ঐতিহ্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্ণয়ই স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভ্য সত্যটি দৃঢ় হয় । ঐতিহ্য গ্রহণ করিবার অবলম্বন অধিক নাই, রহৎ কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর ও রহৎ কথামঞ্জরী, এই গ্রন্থদ্বয় দ্বারা আছে । এই গ্রন্থদ্বয়েই পাণিনির জীবনীর ঐক্য আছে । অতএব রহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া

তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কএকটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

রহৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক একজন শব্দ-শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা;—

“যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ

বর্ণাএবহিশদ্যাঃ” (সূত্রভাষ্য ২অং)
রহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনিনিজেই ‘শালাতুরীয়’ নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শালাতুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি নিজে তৎদেশ-বাসী নহেন।

রহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে রহৎকথার মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে। কেবল রহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সভাভিত্তির উপর কথারচকেরা মূলকার দিয়া বাহুল্য রচনা করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের স্বভাব। তন্ত্রির আকাশকুসুমের ভ্রায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না। যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা;—

“প্রবন্ধ-কর্ণনাং শ্লোক সভাং প্রাজ্ঞাঃ
কথাংবিদুঃ।

পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মত্যাধারিকা
বুধৈঃ ॥”

অতএব যুক্তি-লভ্য অর্থের সহিত রহৎকথার যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে, তাহা সভা বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? রহৎকথা পাণনিকে নন্দের সমকালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক। রহৎকথা বলিয়াছেন পাণিনি ও ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোল্ডকুকের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ববর্তী। ইউরোপীয় অত্যাশ্রয় পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ববর্তী ছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ নন্দের সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ববর্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এই রূপস্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে নন্দের তুল্যকালজন্মাচারণকা-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং স্বাক্ষ পাণ্ডুরাদির বহু অর্বাচীন। তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দ

সমকালিক হইতে পারেন না। আমাদিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দ্রের সমকালিক। ইহার পূর্ববর্তী বলিতে পারি না, কেমনা, তাহা হইলে তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাক্ষ প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণসূত্রে আনিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? তাঁহার বাসভূমি কোথায় ছিল? এবিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক।

পূর্বের বলিয়াছি যে পাণিনির আর দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দাক্ষেয়। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক ‘অটক’ নামক স্থানের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সূত্রে ‘অভিজনশ্চ।’ এই সূত্র আর তাঁহার শালাতুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি গুঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি এই যে, শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাস-ভূমিও

নহে এবং জন্মভূমিও নহে। তবে কি? উহা তাঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি এবং বাসভূমি। যথা—

পাণিনি ‘অভিজনশ্চ’ সূত্রের পূর্বে ‘তদস্যা নিবাসঃ’ এই একটি সূত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, নিবাস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটি র্ত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা, “যত্র সংপ্রত্যুষাতে স নিবাসঃ যত্র পূর্বপুরুষৈ কথিতং সো’ভিজনঃ” যে স্থান পূর্বপুরুষের বাস ছিল তাহা অভিজন এবং যাহা বর্ত্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস। এতদূশ অভিজন অর্থে পাণিনি নিজে ‘শালাতুরীয়’ নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেন না,—‘অভিজনশ্চ’ এই সূত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ করিয়া, ‘তুদী শালাতুর বর্গতী কৃচবরা-ড্‌চ্ (৪।৩।৯৪) এই সূত্রটি নির্মাণ করিয়া, শালাতুর শব্দের উপরে ঢক্ প্রত্যয় করিয়া ‘শালাতুরীয়’ রূপনির্মাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন “শালাতুর” গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, তখন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। সুতরাং পাণিনিকে ব্রহ্মকথার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেননা ‘অভিজনশ্চ’ এই অর্থে নিষ্পন্ন শালাতুরীয় নামের দ্বারা ব্রহ্মকথার ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।

“জীবতিতু বংশো তদপত্যং যুবা ,”
পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষিণ
জীবদশায় সম্ভান ভিন্ন যে দাক্ষিণ ও দা-
ক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত বিদ্যা-
বিশারদ আচার্য্য গোল্ডফুর্করের দৃষ্টিতে
তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি
পাণিনি ও ব্যাডিকে তুলা-কালিক বলিতে
পারেন নাই এবং ঐতুলটি তাঁহার সকল
সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছে।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত
জানা যায় যে, পাণিনি অত্যানু সাক্ষি
সহস্র বৎসরের পূর্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্র-
হণ করিয়াছিলেন ; নবনন্দ্রের দ্বিতীয় কি
তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাঁহার
পূর্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালাতুর
গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগ-
ধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস
করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পাণিন্
উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের
সম্ভান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্য-
বাসী ব্যাডির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ স-
ম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল।
ইহার পিতার নাম ঠিক জ্ঞাত হওয়া যায়
না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দে-
বল। কোন্ দেবল তাহা জানা যায় না।
ফল মহাত্মারতীয় ঋষি দেবল নহেন। ইনি
ব্যাকরণাচার্য্যগণের শিরোভূষণ। এ-
কালে আচার্য্য গোল্ডফুর্করের মত সমা-
লোচিত হইতেছে।

গোল্ডফুর্করের মতে পাণিনি খ্রীষ্টজ-
ন্মের ৬০০বৎসরের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
কিন্তু নন্দ্রের তুলাকালিক, ন্যায়-ভাষ্য
পাণিনি সূত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের
মূলে কঠোরাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ
অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমা-
দিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমরা
দুঃখিত হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্য ও স্মৃ-
তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয়
তাহার অপমান করিতে পারি না। অ-
তএব, স্ববিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমা-
দের প্রগল্ভতা মার্জনা করিবেন।

আচার্য্য গোল্ডফুর্কর কেবল মাত্র
ব্যাকরণ সূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া
তদীয় কাল, দেশ, এবং তদানীন্তন গ্রাম্য-
বলীর যে সত্তা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা
অযৌক্তিক। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল
প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ
দেখিয়া, তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া
দেয় মাত্র। এতদ্বিধ কোন ইতিহাস নি-
র্ণয় করিয়া, দেয় না। প্রকৃতি প্রত্য-
য়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন
পূর্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যব-
স্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।
কিন্তু পারিভাষিক বা নিরুপ সঙ্কেতযুক্ত
শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছু মাত্র প্রভুতা
নাই, স্মৃতির ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ
শব্দের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহা
সত্য কি অসত্য নির্দর্শন দেখাইতেছি।
পূর্বাণে একটি শব্দ আছে “পঞ্চাত্র”

“পঞ্চাত্রোপী নরকং ন যাতি” যে পঞ্চাত্র রোপণ করে তাহার নরকে গতি হয় না। এই পঞ্চাত্র শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আত্মরক্ষ, বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বশ্ব, বট, জাতিপুষ্প, নাড়িষ, এই সকল রক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাত্র বলে, ইহাতে আত্মের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা পঞ্চাত্র হইল।

যদিও পঞ্চাত্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে ইয়া থাকে এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্তী আচার্য্যেরা বা বৈয়াকরণিকেরা তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জনাই ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জন আছে।

আর একটি শব্দ আছে “ষোড়শী”। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন, ষোল সংখ্যার পুষ্টি। কাব্য লেখকেরা বলিয়াছেন “যুবতী” স্ত্রী। পুরাণে আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত উনবিংশশিঙ, আবার বেদে বলে একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। ইহা পূর্বে উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণদিগের সর্বস্বধন সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যার পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্বেদের সহস্র

স্থানে আছে। “অতি রাত্রে ষোড়শীং গৃহ্মতি নাতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্মতি” ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণস্থত্রে দ্বারা কোন ইতিবৃত্তি নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না সেইরূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্যবহার করিল বলিয়া সেই দুইজনের মধ্যে একটা লক্ষ্যমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিথিল মূলযুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্য্য গোল্ডফুকের ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্থ গ্রন্থকে পাণিনির পরতাবী বলিয়া লোকে রূথা মোহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি সূত্র আছে “অরণ্যান্ মনুষ্যে” মনুষ্য অভিধেয়ে “আরণ্যকঃ” এই পদ নিপ্পন্ন হইবে। যথা—আরণ্যকো মনুষ্যঃ অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাণিনির পূর্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না, কিন্তু উহা মনুপ্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে ছিল? ইহাতে তাহার সিদ্ধান্তের জন্ম হইয়াছে।

ন্যায় দর্শন ও সাঙ্খ্যদর্শন ও পারিভা-

ষিক শব্দ। এই পরিভাষা গুলি শিষ্যস-
ম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণ
আমরা যাহাকে যোগদর্শন ও পাণ্ডুল-
দর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম “সাঙ্খ্য-
প্রবচন”। আমরা যাহাকে উত্তর মী-
মাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত
নাম “উত্তরকান্ত”। এইরূপ উপনিষদ শব্দ
সাক্ষেতিক। পাণিনি মুনি ব্যাস ও তাঁ-
হার ক্রমানুসারে নিম্নবর্তী পাঁচজন শি-
ষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চি-
নিতেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজন্যবর্গকে চি-
নিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ
আছে। নায়, সাঙ্খ্য, আরণ্যক প্রভৃতি
পাণিনির জ্ঞাত ছিলনা, কিন্তু তাঁহার অ-
নেক পূর্ববর্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত
ছিল? ইহা কিরূপ সত্য, বিজ্ঞ পাঠকগণ
বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে
উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা
সকল আর্থ গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি
নহে, দুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন
আছে। একদেশে নহে, দুইদেশে নহে,
সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে।
অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও
অপ্প সাহসের কার্য নহে।

“নির্বাণোহবাতে” “আশ্চর্য্যমনিতো”,
এই সকল সূত্র দেখিয়া এবং ইহার “অ-
দ্ভুত ইতিবক্তব্যম্” ইত্যাদি রূতি ও ভাষা
দেখিয়া গোল্ডস্ট্রুকের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন
যে, পাণিনির পূর্বে নির্বাণ শব্দের মুক্তি-
বাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া যা-

ওয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্য্য শব্দেরও
অদ্ভুতার্থদ্যোতকতা ছিলনা। আমরা এবি-
ষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করিব না; যেহেতু
তাহা নিম্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি
যে তিনি কি জন্য “পানংদেশে” এই
সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? তিনি
পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইত কিনা তাহা
নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়া, ই
ত্রটির আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ
কি “পানং দেশে” সূত্র আছে বলিয়া
বলিতে পারেন যে পাণিনির পূর্বে বা
পাণিনির সময়ে পান শব্দে দেশ বাস্থান
বুঝাইত—তরলখাদ্য বুঝাইত না? ফলতঃ
মহামহোপাধ্যায় গোল্ডস্ট্রুকের এই স-
কল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন
সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি সূত্র-
স্থান মাত্র রচনা করিয়া ছিলেন, রূতি কি
ভাষা তাঁহার নহে। অতএব অন্যের প্রদত্ত
উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার
নির্নীত হইতে পারেনা।

আর একটি গুরুতর বিচার উত্থাপিত
হইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্ডস্ট্রুকের পা-
ণিনি-সূত্রের মধ্যে অথর্ষবেদের উল্লেখ
দেখিতে পান নাই বলিয়া অনুমান করি-
য়াছেন যে পাণিনি অথর্ষবেদ অবগত
ছিলেন না। অথর্ষবেদটি তাঁহার পর
রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্যক্ত ক-
রাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাই-
য়াছে। তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন—
“আথার্বণিকস্যেক লোপশ্চ” (৪।৩)

“কপি বোধাদাঙ্গিরসে” “দাঙি-
নায়ন হাঙ্গিনায়নথর্কর্গিক—”(৬।৪)

এই সকল হুত্রে যে অথর্ক-শব্দ আছে
এবং আঙ্গিরস শব্দ আছে, তাহার অর্থ
তৎকালে কি ছিল? আমরা দেখিতেছি
অথর্ক শব্দের চতুর্থবেদবোধকভিন্ন অন্য
অর্থ ছিল না। অথর্ক শব্দের যদি চতুর্থ
বেদ কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ
থাকিত, তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন
নাই কেন? এবিষয়ে তাঁহার অনুমান এই
যে পাণিনি যখন অথর্কবেদ বা অথর্ক-
ঙ্গিরস এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই
তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁ-
হার ন্যায় পণ্ডিতের এই অনুমানকৌশল
দেখিয়া আমরা হুঃখিত হইয়াছি। এই পা-
ণিনি কেবল “ছন্দসি” “ছন্দসি” ব-
লিয়া গিয়াছেন। “দৃষ্টংসায়” বলিয়া
গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ,
ঋগ্বেদ, কি কোথাও এরূপ স্পষ্ট করিয়া
বলেন নাই। অতএব পাণিনির সময়ে
যদি কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ক
বেদও থাকিবে না ইহাতে আমাদিগের
আপত্তি নাই।

ঋগ্বেদে যে যে স্থানে অথর্ক শব্দ আছে
তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ
৬। ১৬, ১৪। পুনশ্চ ১০, ১৮, ২ তৎ-
পরে ১০, ২১, ৫। ৮, ৯। পুনশ্চ
১০। ৮৭। ১২।—৯। ১১। ২। পুনশ্চ
১০, ১৪, ৬। ১। ৮০। ১৬। ৮৩। ৫।

৬। ১৬। ১৩। পুনরায় ১০। ১২০।
৯। ১। ১১২। ১০। ঋগ্বেদ সংহিতা।

অনেকের ভ্রম আছে অথর্কাদ্গিরস
মুনি অথর্ববেদের রচক। কিন্তু অথর্ক-
ঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে? তাহা অধিকাংশ
ব্যক্তি জানেননা। মহাব্যাস উদ্যোগপর্কে
ইহার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বৃহস্পতি।
দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গির। ঋষির
পুত্র। পৌরাণিক মতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া
ইহাকে অথর্কাদ্গিরস উপাধি প্রদান ক-
রেন, কারণ ইনি অথর্ক-বেদোক্ত মন্ত্রের
দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই
বেদে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পাণিনিহুত্রে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আ-
চার্য্য গোল্ডফট্ট কর তাঁহাকে পাণিনির পু-
র্কবর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইক্ষণে
সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অথর্কাদ্গিরস
মুনির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। ইত্যাদি।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্ডফট্ট কর যে
সিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার করিয়াছেন, তাহা
আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত
বোধ হইতেছে না। কিন্তু তিনি যে পাণিনি
সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎ-
পাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করি-
য়াছি। এই গ্রন্থ তাঁহার কীৰ্ত্তি-সুভাষ-
রূপ চিরকাল সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল
করিয়া থাকিবে।

আমরা পাণিনি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়
স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। ত্রীয়ামদাস সেন।

উকীলের প্রজানীতিসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা।

জ্যৈষ্ঠমাসের বান্ধবে ভারতের প্র-
জানীতি-শির্ষক যে প্রবন্ধ প্রকটিত হয়,
তাহা পাঠ করিয়া অনেকে ক্ষুব্ধ, কেহ বি-
রক্ত, কেহ বা ক্রোধান্বিত হইয়াছেন।
বাস্তবিক উহাতে সত্য মিথ্যা যে প্রকারে
জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রব-
ন্ধের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় এবং লেখকের মত-
নিশ্চয় নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু
আমাদের বিশ্বাস যে, লেখক স্বেচ্ছা-চতুর ;
এবং মনোহুঃখে দক্ষ-হৃদয় হইয়া গরল-
রূপে অমৃত উদ্দীর্ণ করিয়াছেন। আমা-
দের এ প্রকার বিশ্বাস করিবার কারণ
আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রবন্ধলেখক ‘উকীল’ বলিয়া আত্ম-
পরিচয় দিয়াছেন ; তাহাতেই যথেষ্ট ঈ-
র্জিত করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রত্যেক
কথাই বিতর্ক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে,
প্রতিচিত্রের ওকালতীর আবরণ উন্মোচন
করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ সে ভাবে
দৃষ্টি করিলে বিতর্কাত্মক প্রবন্ধলেখকের
সহৃদয়তা, স্বদেশবৎসলতা, এবং কর্তব্য-
প্রিয়তার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।
আর আমরা যাহা মনে করিয়াছি, লেখ-
কের যদি সত্য সত্যই সেইরূপ অভিপ্রায়
হয়, তাহা হইলে তাঁহার লেখনভঙ্গী অ-

বশ্যই প্রশংসার যোগ্য। দিনকাল বি-
বেচনা করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতেই
বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশল-বল প্রদর্শিত হয়।

দুর্বলপক্ষ অবলম্বনে প্রতীয়মান ক-
রিতে হইলে যে পক্ষ অবলম্বন করিতে
হয়, আমাদের উকীল তাহাই অবলম্বন ক-
রিয়াছেন। তাহার পর, যাহাকে সম্বো-
ধন করিয়া বলিতে হইতেছে, তাহার মন
ভুলাইবার জন্য যে কৌশলের আশ্রয় গ্র-
হণ করিতে হয়, উকীল তাহাও করিয়া-
ছেন। তথাপি যাহাদের বুদ্ধি জড়প-
দার্থ নহে, যাহারা সর্দ্ধবিষয়ের অন্তস্তল-
প্রবেশী, তাহাদের চক্ষে উকীল ধূলা দিতে
পারেন নাই, কেহই পারে না, কারণ পা-
রিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভা-
ষিয়া দেখিতে গেলে উকীল ব্যবসায়ানুচিত
কার্য্য করিয়াছেন বলিলেও বলা যায় ;
যাহার উকীল তাহারই ক্ষতি করিয়াছেন
বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তবে নথীতে যে
রত্নাস্ত সকল সমগ্রমাণ, তাহার ব্যতিক্রম
বা বিপরীত গমন করিবার অধিকার তাঁ-
হার নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি নিষ্কতি
পাইবেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অ-
বস্থা বিবেচনা করিয়া মুদ্রণশাসনীব্যবস্থা

অনুচিত প্রবর্তন নহে, এবং আবশ্যিক, উকীল এই প্রতিজ্ঞার উপপত্তি সাধন জ্ঞাত যে কএকটি পদার্থে আমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই—

“প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে মূত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর, একতা সংসাধিত হইলে মন্ত্রলেন আশা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণ রূপ হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণে ঘেরাপ্রসার, পূর্বে এমন ছিল না।

চতুর্থতঃ রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক, আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যিক, এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।”

তাহার পরেই উকীল বলিতেছেন, ইংরেজ আমাদের রাজনীতি বিষয়ের গুরু,— ইংরেজ দেবতা! এবং ইহা হইতে যে কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা উকীলের ভাষাতেই ব্যক্ত হউক;—

“অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের

গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্বথা আমাদের কাম্য, তখন যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্য্য-মিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, ওদ্বিষয়ে সর্বথা আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। সকল লোকের বিদ্যা বুদ্ধি কখনই সমান হইতে পারে না; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন দেশের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তি-বন্দ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করে। সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষদিগের সাধু এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা সেই দেশের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।”

পরিশেষে উকীল সিদ্ধান্ত করিলেন যে “যদি প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য এবং বিপ্লব-প্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্তব্য। অকুরেই উপদ্রবের বিনাশ সাধন ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্ম্মের অপলাপ হইবে, আমাদের সর্বনাশ হইবে।”

যিনি রাজ্যেশ্বর তিনি রাজ্যের শান্তি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, শান্তি রক্ষা তাঁহার কর্তব্য কর্ম্ম—এই সামান্য অবি-

সংবাদিত তত্ত্বের সংস্থাপন জন্য চতুর উকীল এত বাগাড়ম্বর করিতেছেন, ইহা মনে হইলে হাস্য-সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু মুদ্রণশাসনীব্যবহার-সমর্থন পক্ষে ইহার অধিক কিছু বলিবারও নাই। প্রবন্ধলেখক উকীল সাজিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, যে কটুক্তি কর, কটাক্ষ কর, যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাও কিন্তু লক্ষ্য ঝাম্পের অবসান এইখানেই হইবে। সেই জন্ত ইহার পরেই ‘উকীল’ নীরব, আর সে তর্কের গাঁথনি নাই, বিচার-প্রসূতির বেগ-শালীতা নাই। ফল স্থির হইল যে, যে কথার জন্ত ওকালতী, তাহা প্রতিপন্ন হইবার নহে। “জোর যার, মূলুক তার” এই নীতিই মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন। যদি তাহা না হইত, তবে কথা বার্তা না কহিয়া, প্রমাণ প্রয়োগ না দেখাইয়া ‘উকীল’ সহসা গর্জন করিয়া বলিতে পারিতেন না যে “ইহার সূত্র লইয়া বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণ্ডগোল করা অত্যাশ্রয়।”

কেন? শান্তি রক্ষাই কি ব্যবস্থার সূত্র? তবে দণ্ডবিধি আছে কেন? যষ্টি সহস্র বিলাতী সজ্জন ভারতে অকৃৎসন করিতেছে কেন? রাজ্যের শস্য ধ্বংস করিয়া পঙ্গপালের মত এত লাল পাগড়ি, নীলজামা ভারতের বুকের উপর অহোরাত্র দাপট করিয়া বেড়াইতেছে কেন? ভারতবাসীর হৃদয়-শোষিত শোণিতকে রক্ততরুণে পরিণত করিয়া এই

অযুত রাজকর্মচারী আর অকর্মচারী কি কেবল বল্লীক স্তূপ নির্মাণ করিতেছেন?

ফলকথা, মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার সূত্র শান্তি রক্ষা নহে, ইহার অপূর্ণ সূত্র আছে। ন্যায়ভীতি, স্বপ্রবর্তিত পক্ষপাতশূন্য বিচারপ্রণালীর মূলোদ্ভেদ, এই ব্যবস্থার মূল সূত্র। দোদীও প্রতাপ চালনা এই ব্যবস্থার প্রাণ। অপ্রিয় প্রকৃত কথা শুনিলে অনিস্ফুট এই ব্যবস্থার নিদান।

কিন্তু উকীল একথা স্বীকার করিতে পারেন না, সেই জন্য এতলে নীরব। এই আত্ম-ঘাতক তর্ক পরিবর্তন না করিলে ওকালতী চলে না, সেই জন্য অমৃতাশূন্য এক তৃষ্ণার ছাড়িয়া উকীলকে এই স্থল উল্লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে।

তথাপি শ্লেষবিশারদ প্রবন্ধলেখক উকীলের মুখে যে কথা স্বীকার করাইয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহাই পর্যাপ্ত। উকীলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে “ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্বদা সুন্দর হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই বা বাতুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না।” বাঁহারা এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, বিরক্ত বা ভীত, তাঁহারা ইহার অধিক কি বলেন? বঙ্গবাসী কাদিবে, কিন্তু “মা গো!” বলিয়া কাদিতে পাইবে না;—ভারতবর্ষের ভাষার প্রতি এই নিষ্ঠুরাচরণ, মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার দোষ। বর্ণ-ভেদ জাতি-ভেদ, ধর্ম-ভেদ মনে না করিয়া ইংরেজ

বিচারক অপক্ষপাতে ম্যায়ের তুল্যদণ্ড ধরিয়া রহিয়াছেন; সে বিচারক ইংরেজ রাজেরই নিয়োজিত, কিন্তু ভারতবর্ষের মুদ্রাকরের বিচার তিনি করিতে পাইবেন না—ব্যবস্থার এই স্থলে অভাব। রাজার বৃকে বসিয়া রাজার বাড়িতে রাজার স্বজাতি ভারতের জন্য মুদ্রিতাক্ষরে অশ্রুপাত করিলেন, ভারতের ক্ষুদ্রতম পুস্তক-বিক্রেতা সেই লিপি আনাইয়া বিপণির গৌরব বাড়াইল, মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা তাঁহাকে দণ্ড দিবে—ব্যবস্থার এই বাহুল্য।

উকীল স্পষ্ট করিয়া, এ কথা গুলি বলিলেন না, বলিতে পারিলেন না। বলিতে হইলে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইত। প্রবন্ধ-লেখক এস্থলে উকীলকে এই কথাগুলি বলিবার জন্য উৎপীড়ন করেন নাই, কিন্তু যাহা বলিতে হইত তাহার আভাস দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা কঠোরতর বা অধিকতর অন্তর্ভেদী শ্লেষ আর কি হইতে পারে ?

ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন জন্য উকীলকে নথীর বিপরীত প্রসঙ্গ করিতে হইয়াছে, ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষকে উপলক্ষ করিয়া আজি কালি রাজনীতিসম্বন্ধে উপস্থিত, এই এক অতিরিক্ত কথা ব্যবস্থার হেতুবাদের পোষক বলিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থার প্রবর্তনিতা একথার উল্লেখ করেন না, নুতরাং আমরা ইহার যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য নহি। তবে সংক্ষেপে

আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যে ১৮৫৭। ৫৮ অব্দের সহিত তুলনা করিলে, বর্তমান কালকে শান্তি এবং নিশ্চিন্ততার মূর্তি বলিয়া পরিচিত করা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে নীরবে, নিষ্কিরোধে, নিরুপদ্রবে বরদার গায়েকবাড়ের রাজ্যচ্যুতি এবং কারাদণ্ড অধিক দিনের কথা নহে, মনে রাখিতে হইবে যে, যে নিজাম বেরার রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য ইংরেজরাজের সঙ্গে বহুদিন ধরিয়া বচসা করিয়া আসিতেছেন, তিনিই আবার ইউরোপে ইংরেজের সাহায্য কামনায় নিজ সৈন্য সামন্ত দিবার জন্য ব্যাগ্র; মনে রাখিতে হইবে—না, ভারতেশ্বরীর জয় হউক ! তাঁহার প্রতিনিধি এবং মন্ত্রিবর্গ যে কথার উল্লেখ করেন নাই, তাহার প্রতিবাদ জন্য কেন সময় নষ্ট করিব ?

তথাপি আমাদের বোধ হইতেছে যে প্রবন্ধলেখক একথার উল্লেখ করিয়া ইংরেজরাজপুরুষগণের উপর কঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার লিখনভঙ্গীতে মনে হয় যেন রাজপুরুষগণ ব্যবস্থার পরিবর্তন জন্য যে সকল কারণে চালিত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিতে তাঁহাদের সাহস নাই, অথবা সত্যের প্রতি তাহাদের আজি কালি অশ্রদ্ধা বা অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ এতাদৃশ হীনভাবাপন্ন হইয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করি না। নথীতে যাহা নাই, উকীলের সে কথা আমরা গ্রাহ্য করিলাম না।

এখন পূর্বকথার প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উকীল যে সকল প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইলেও মূল প্রতিজ্ঞার পূরণ হয় না; মূল প্রতিজ্ঞার সহিত তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিছুমাত্র নাই এবং এই সম্বন্ধ সংস্থাপনজন্য উকীলও প্রয়াস পান নাই। প্রবন্ধলেখকের চতুরতা—বুঝিবার বস্তু, আশ্বাদনের বস্তু, সরস এবং স্মৃতি। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইয়া দিই।

১ম;—ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিলনা, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। যদি ইহার পরেই বলা যায়—অতএব মুদ্রণশাসনীব্যবস্থা আবশ্যক, তাহা হইলে বক্তাকে বাতুল বলিতে কেহই সঙ্কোচ করিবেনা।

২য়;—ইংরেজরাজ্যে আমাদের বিলক্ষণ উন্নতি—অতএব ব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা বলিলে হাসিতেও লজ্জা বোধ হয়।

৩;—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার এক্ষণ পূর্বাপেক্ষা অধিক। উক্ত কথা, কিন্তু তাই বলিয়া কি মুদ্রণশাসন?

৪র্থ;—রাজনীতি বিষয়ে আমরা বালক, ইংরেজ আমাদের গুরু, ইংরেজ দেবতা। তাহাতেই কোন্ বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার “মহীপালের গীত” ভাব অপসারিত হইতেছে? বয়োবৃদ্ধি সহকারে কি বালকতারও বৃদ্ধি হয়? আজি চল্লিশ

বৎসর আমরা মুদ্রণ-স্বাধীনতা পাইয়াছি; এ চল্লিশ বৎসর কি আমাদের বয়স বাড়ে নাই, না কি বয়স কমিয়াছে? আর “দেবতার মত” ইংরেজ এতকাল আমাদের গুরুগিরি করিয়া যদি এই ফল ফলাইয়া থাকেন, তবে সে গুরুর কলঙ্কের কি সীমা আছে? তাহাইহলে সে গুরুকেও দিক্! আমাদের মত শিষ্যকে শত্রুর দিক্! যদি সপাদ শত বৎসর এহেন গুরুর চরণোপান্তে বসিয়া শেষ কালের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হইয়া থাকে তবে উচিত যে, হয় এই গুরুমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া আপন বাস্তবীভিটায় বসিয়া মুদিখানা খুলিয়া প্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা দূর করেন;—নয় এই শিষ্য বন্দ স্ব স্ব গলদেশে রজ্জুবন্ধন পূর্বক সাভিনিবেশচিহ্নে বিচালি চর্কন আরম্ভ করেন। প্রবন্ধলেখক রসিক, আমরাও কম নহি। কিন্তু লোকে সহজে বুঝেনা, এ ক্ষোভ আমাদের উভয়েরই রহিয়া গেল।

যাহারা স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া ভারতবর্ষে বিদ্রোহভাব উত্তেজিত করে, তাহাদেরই জনা মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ হইয়াছে, উকীল অন্তঃসলিলা নদীর মত এই কথা তাহার প্রবন্ধের ভিতরে ভিতরে অর্দ্ধ আবরিত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনটি কথা উৎপাদিত হইতেছে।

১ম;—বিদ্রোহভাবের উত্তেজনকারী কেহ আছে কিনা? যদি থাকে তবে কেন আছে?

২য়;—স্বাধীনতাপ্রিয়তার সহিত রাজভক্তির নিত্য বৈরতাব কি না?

৩য়;—মুদ্রণব্যবস্থার বিদ্রোহভাবের দমন সম্ভবপর কি না?

ভারতীয় প্রজার অন্তরে বিদ্রোহ-ভাবের অস্তিত্ব আমরা একেবারে অস্বীকার করি। ভারতের কৃষক, বণিক, ভূ-স্বামী—যাহাদিগকেলইয়া ভারতবর্ষ,—তাহারা ইংরেজ-রাজ্যের স্থায়িত্ব-কামনা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না। উকীলও একথার স্মৃচনা দিয়াছেন; তবে এবিদ্রোহভাবের জন্য কোথায় অবশেষ করিতে হইবে? উকীল ইহার উত্তর দেন নাই, উত্তর দিতে অক্ষম।

উকীল এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু “অসন্তুষ্ট” আখ্যাদিয়া এক শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহাদেরই স্বন্ধে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি উকীল যে সমুদয় বিশেষণের দ্বারা ইহাদিগকে পরিচায়িত করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; প্রবন্ধলেখক এই স্থলেই স্বেচ্ছ-দক্ষতার পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

উকীল স্বয়ং বলিতেছেন,—“পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাহাদের ক্ষুদ্র-বৃত্তির স্ফুর্তি হইয়াছে, যাহাদের চিত্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জন্মভূমি ও মাতৃভাষার নামে যাহাদের অন্তঃকরণ তরঙ্গায়িত হয়—তাহারাই—“অসন্তুষ্ট”। ইহাদের “সংখ্যা অল্প নয়” তাহাও উকীল স্বীকার করি-

তেছেন। ইহাদের “অসন্তোষের” কারণ নির্দেশ করিতেও উকীল সংকোচ করেন নাই; কারণ “তাহারা ভারতবর্ষের দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজা আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজ্যে বিদেশীয় দেহ পুষ্ট হইতেছে, ভারতবর্ষে বিজাতীয় রীতিনীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবর্তিত হইতেছে”। তদুপরি—ভারতবর্ষের দুঃখের কাহিনী “ঈর্ষ্যা, দান্তিকতা বা অসদভি-সন্ধি-বিজৃম্বিত নহে।”

এইবার সারসংগ্রহ করিয়া দেখ, যাহারা স্বদেশ-বৎসল, যাহারা সুশিক্ষিত, যাহারা সচ্ছন্দ, তাহারাই উকীলের মতে অসন্তুষ্ট; অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রদর্শী, যাহারা ইতিহাসের অনুশীলন করে, যাহারা কাল-ধর্ম বুঝিতে সক্ষম, তাহারাই অসন্তুষ্ট! ভয়ঙ্কর কথা! আমরা ইহার অনুমোদন করি না, কারণ তাহাইলে রাজার দোষ আছে, এবং রাজার স্বার্থার্থ্য দোষ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই বলিতে হইবে। আমাদের শঙ্কা হইতেছে, প্রবন্ধলেখক এই স্থলে মর্ম-দুঃখে অধীর হইয়া আত্ম-বিস্মৃতির পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি বলিয়া রাখি, যাহারা রাজার কার্যে ত্রুটি দেখিয়া ব্যথিত হয়, আর সেই ত্রুটি রাজ-গোচরে জ্ঞাপন করে, তাহাদের রাজ-ভক্তি নিতান্তই প্রবল; নহিলে এতটি তাহারা দেখাইয়া দিত না, ত্রণ লুকাইয়া

রাখিত ; যত দিনে অভ্যস্তর হ্রিত হইয়া অজ্ঞেদের প্রয়োজন না উপস্থিত হইত, ওতদিন নীরব থাকিত । ইহারা কখনই রাজদ্রোহী হইবার ব্যক্তি নহে ; ইহারা কাহাকেও রাজদ্রোহিতা শিখাইবে না ।

তথাপি মনে করা ষাউক যে, ইহারা ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে বিদ্রোহী এবং বি-প্লবপ্রিয় করিবার জন্য যত্ন করিতেছে । সে যত্ন কি মুদ্রিতাক্ষরে রাজার নয়নো-পরি করিবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে পারে ? তবে একথা লইয়া মুদ্রণশাসনী ব্য-বস্থাকে ন? দিনে ডাকাইতি করা যাহাদের অভ্যাস, তাহারা ই গৃহস্থকে কখন কখন পত্র লিখিয়া জানায় বটে । পরাধীনতাই আমাদের অভ্যাস ; অপহৃত স্বাধীনতা কা-ড়িয়া লইতে আমরা কখনও শিখি নাই ; কখনও উদ্যোগ করি নাই, কখন চেষ্টাও করি নাই । তবে এ “ মড়ার উপর খাঁ-ড়ার ঘা ” কেন ?

স্বাধীনতা ভালবাসিলেই যে কাহা-কেও রাজদ্রোহী হইতে ইহবে, ইহার অর্থ নাই, “ উকীল ইহার হেতুবাদ করিয়া-ছেন, এবং সুল্লর দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন । মোটামুটি বলা যায়, ইউরোপ এবং আ-মেরিকা স্বাধীন ; অথচ তথাকার লোক স্বদেশের রাজার অধীন । উকীলের প-রিভাষা অনুসারেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অধীনতার রূপান্তর-ধাত্ত । ইংরেজ-রাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং ব্যক্তি-প্রগমন, ও

আয় ব্যয়ের বিধানাদি বিষয়েও ভারত-বাসী ক্রমে ক্রমে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে । সুতরাং রাজপ্রসাদানুসারেই ভারতবাসী স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হ-ইতেছে । স্বাধীনতা কামনা রাজার অনু-মোদিত এবং রাজার অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হইতেছে । তবে কেন ভারতবর্ষের প্র-জাবন্দ স্বাধীনতা ভালবাসিবে না ? এত-দ্ভিন্ন ইংরেজরাজ আমাদিগকে নিত্য নিত্য বলিতেছেন, তোমরা স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য হইলেই আমরা তাহা প্রত্যর্পণ ক-রিব, ভারতের উপকার-জন্যই ভারতে আমরা আসিয়াছি । ইহাতে এই বুঝা যায় যে, স্বাধীনতারদিকে দৃষ্টি না রাখি-লেই বরং ভারতবাসী প্রতাবাগ্রস্ত হইবে, রাজদ্রোহ প্রতীপ-গমন চেষ্টার দোষে দোষী হইবে । এত যে অমূল্য শিক্ষা ইংরেজ আমাদিগকে দিতেছেন, ইহা কি কেবল আমাদিগকে দাসত্ব এবং পশুত্বে অবনীত করিবার জন্য ? উকীল বলেন, তাহা নহে ; আমরাও বলি তাহা কখনই নহে ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে আমাদের চরমলক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা যেমন আ-মাদের রাজার অভিপ্রেত, তেমনি উকী-লেরও বাঞ্ছনীয় । ভারতের একতা যে অভিলষিতবা, উকীল তাহা একাধিকবার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; সে একতার পরিণামে মঙ্গল হইবে, উকীল তাহাও বলিয়াছেন । সে মঙ্গল যদি স্বা-

ধীনতা না হয়, তবে কি? মুদ্রণশিল্পে যদি স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তবে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা যে কেবল নিষ্প্রয়োজন, তাহা নহে, প্রভূত, নিতান্ত অব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া ভিরঙ্করণীয়।

প্রসঙ্গাধীন ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্রোহ-ভাবের দমন যে অসাধ্য এবং অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ-রাজের বিকৃতচার্য্য করা কাছার-ও অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মুদ্রিতাক্ষরের আশ্রয় গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে আদৌ অতিযত্নে তাহা পরিবর্তন করিবে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহিবর্গ হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রে প্রবন্ধ প্রচার করে নাই, এইরূপ শুনা আছে। চর্কিত চর্কণে প্রবৃত্তি থাকিলে, এই স্থলে বলিতাম যে ভারতবাসীর হৃদয়ে সত্য সত্যই যদি বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে সংবাদ পত্রাদির প্রচারে অপসারিত হইবারই কথা। বাঙ্গা-যন্ত্রের রক্ষণ-বন্ধু নিত্য উপকারই করিয়া থাকে; তাহাতে অনিষ্ট হয় না।

অতএব, উকীলের কথা যথাবৎ বিস্তারিত করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতেছে যে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা সমর্থন করিবার চেষ্টা বৃথা, সে চেষ্টা কৃতকার্য্য হইবার নহে। ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা গর্হিত নহে, বরং ইংরেজরাজ সর্বথা তাহার আশ্রয় করিতেছেন। তবে এই সংপ্রবৃত্তির স্বে-

প্রয়োগ এবং পুষ্টি সাধন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা একবার দেখা যাউক।

উকীল যথার্থই বলিয়াছেন, যে ইংরেজ আমাদের গুরু। সাত শত বৎসর স্বার্থপর দস্যুর অধীনে থাকিয়া আমরা যে প্রকারে হৃদশাপন্ন হইয়াছি, এই গুরুর অনুগ্রহে এখন আমরা তাহা বুদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছি। নিস্বার্থ ইংরেজরাজের কৃপাবলে মহাবেগে আমরা উন্নতিপথে সঞ্চালিত হইতেছি। প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে এখন আমরা তীব্র আলোকে আনীত হইয়াছি, এখন বিস্ময়ে, শুদ্ধভাবে, সংকুচিত নেত্রে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এবং পূর্বতন হৃদশার স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। এই মহোপকারের জন্য, জন্ম জন্ম আমরা ইংরেজসমীপে রুতজ্ঞ রহিব।

অধিকন্তু ইংরেজ আমাদের একমাত্র উপস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছেন, যে এখন আমরা মার্শমেনের কথায় ভুলিয়া তদীয় গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি না। অতিপূর্বে আমরা কি ছিলাম, স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাই; এখন সামান্য “সাধারণী” ও আমাদের অশোকের জয়ন্তস্ত দেখাইয়া দেয়, প্রাচীন তাপস-কুলের আশ্রমে—আমাদের লইয়া যায়, এবং তীর্থস্থলের মহিমা গান করিয়া, আর্ধ্যসন্তানের চিরন্তন সধন—একধর্মতা, একপ্রাণতা মনে করিয়া, দেয়। উকীল এই সত্যের প্ৰশংসারোধ করিতেছিলেন, নহিলে তাঁহার ওকালতী

চলে না । কিন্তু ইংরেজ-গুণের প্রসাদে
আমরা তব্রানুগমন করিতে শিখিয়াছি,
তব্র জানিয়াছি । আর আমরা বাক্‌ছলে
ভুলি না । ইংরেজরাজ আজিও মন্বাদি
ঋষির সম্মান রক্ষা করিয়া, আৰ্য্য জাতির
একতা প্রতি মুহূর্তে আমাদেরই হৃদয়ে
জাগরক করিয়া দিতেছেন । বাস্তবিক
ভারতবর্ষের আদিম সভ্যতা, স্বাধীনতা—
এবং উন্নতাবস্থার চিত্র নিয়ত আমাদের
নয়ন-সমক্ষে না ধরিলে, আমরা এত
সুদূর অমূল্য গুরুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারিতাম না, ইংরেজ-বান্ধিত আমাদের
স্বাধীনতা প্রকৃতির পুষ্টি সাধন হইত না ।

এ সমুদয়ই উকীল আমাদেরই দিকে
খাইয়াছেন । উকীলের প্রজানীতিকে
আমরা রত্নাকর বলিয়া অভিহিত করিব ।
খুঁজিলেই ইহাতে রত্ন পাওয়া যাইবে ।
ইহাতে উত্তাল-তরঙ্গ আছে, বাড়বানলের
শঙ্কা আছে, কুস্তীর হাদ্বরের ভয় আছে,
—সত্য ; তথাপি ইহা—রত্নাকর । জল
দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না । মন্থন-
দোষে ইহাতে গরল উঠিতে পারে, কিন্তু
অমৃতও ইহাতে পাওয়া যায় ।

আর প্রস্তাব বাতুল্য করিব না ; উকী-
লকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা এই স্থলে
কান্ত হইব ।

বঙ্গবিধবা ।

(জ্ঞানদাসের ছন্দানুকৃতি)

১

সখিরে কি কব মনের দুখ ;
কি মুখাও সেই কি কহিব তোরে,
ভাবিতে বিদরে বুক ।
(সখিরে) বিধাতা করিল জনম দুখিনী,
যুবতি বিধবা বালা ;
(হার) অনুদিন সেই, নয়নের জলে,
ঘুচাই মনের জ্বালা ।

২

সখিরে, আমি ছেন অভাগিনী,
নাহি জানি পতি, কিবা সে যুবতি,

বিবাহ কি নাহি জানি ।

(সখি) মা বাপ নিদয়, শৈশব সময়ে,
পর হাতে সঁপি দিলা,
(আমি) অনিচ্ছাতে সেই, খেলি নু তখন,
সে এক হুংখের খেলা ।

৩

সখিরে, কি কব প্রাণের জ্বালা ;
ছিড়িয়া কলিকা, কটক লতায়,
বিঁধিয়া গাঁথিল মালা ।
(সখি) তাতেও আবার, বিধাতা বিমুখ ;
সেও মালা ছিঁড়ে গেল ;

(আমি) ধূলায় পড়িয়া, যাই গড়াগড়ি,
এ মোর কপালে ছিল !

৪

সখিরে, বিধাতা নিষ্ঠুর অতি ;
হুংখের অনলে, দহিতে নিয়ত,
গড়েছিল। এমুয়তি ।

(সই) হেন যদি বিধি, করিলা অবিধি,
কেন না হরিলা স্মৃতি ;
কেন লো স্বপ্ননি, বাসনা কামনা
(পাপ) হৃদয়ে করিলা স্থিতি * ।

৫

সখিরে, কাল নিশি অবসানে ;
দেখেছি যেরূপ, পাশরিতে নারি,
ঠৈরয় না ধরে প্রাণে !

(সখি) কুসুম কাননে, একাকী বিরলে,
যখন ছিলাম বসি ;
(আমি) সহসা দেখিছু, হাসিতে হাসিতে,
ভূতলে নামিল শশী ।

৬

সখিরে, কি কব রূপের কথা ;
সে মুখ স্মরিতে, ঝড়ে হুনয়ন,
মরমে উপজে ব্যথা !

(হার) কিবা অনুপম, সে শ্যাম মূরতি,
বদনে প্রীতির ভার ;

(সই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে,
হরে নিল মন আমার ।

৭

সখিরে কিবা সে মধুর ভাষা ;

শুনিতে শুনিতে বাড়িল পিয়াস,
না পুরিল মন আশা !

(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল কাকলি,
কছিল। ককণ সুরে ;
“(বড়) ভাল বাসি আমি, তোমারে সুন্দরি,
এসেছি তোমার তরে ।”

৮

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী ;
“ভাল বাসি তোরে” এমধুর কথা,
জনমে নাহিক শুনি !
(হল) আলু খালু প্রাণ, হারাইনু জ্ঞান
হইনু পাগল পারা ;
(তখন) খসিল বসন, ঘন বহে শ্বাস,
স্থির হুনয়ন তারা !

৯

সখিরে, কি কব এ পোড়া মুখে,
মনে হল সাধ, কণ্ঠহার করি,
পরি সে রতনে বুকে ।
(আমার) মনে হল সাধ, পড়িনু প্রমাদে,
দুক দুক ছিয়া কাঁপে ;
(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদি কেহ,
পুড়িব কলঙ্ক তাপে !

১০

সখিরে, বলিতে বিদরে ছিয়ে !
নেহারিনু আমি, সেইরূপ রাশি,
নয়নে নয়ন দিয়ে ।
(তখন) সেই সুধাকর, কোমল দুকর,
কণ্ঠেতে করিল দান ;
(অমনি) সাপটিয়া সই, ধরিনু উরসে,
পরশে অবশপ্রাণ !

* স্থিতি করিলা সর্করুপে ব্যবহৃত ।

১১

সখিরে, আচম্বিতে এ কি হল ;
 অধরে চুস্থিতে, পূর্ণিমার চাঁদ,
 আকাশে মিশিয়া গেল ।
 (সখি) হইতাম যদি, বন বিহঙ্গিনী,
 উড়িতাম তার তরে ;
 (আমি) হইতাম স্মৃষী, বারেক নিরখি,
 সেই পূর্ণ শশধরে ।

১২

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী,
 এ পাপ পরশ, সহেনা সে দেহে,
 হায় আগে নাহি জানি !
 (আহা !) পাই যদি পুনঃ সেই স্মৃধাকরে,
 দেখিয়া শুচাই ক্ষুধা ;
 (আমি) দূর হতে সই, চকোরের মত,
 খাই সে মুখের স্মৃধা !

১৩

সখিরে, পাসরিয়া ভয় লাজে ;
 যোগিনী হইয়া বেড়াইব সখি,
 গহন কানন মাঝে ।
 (সখি) কখন কাঁদিব, কখন হাসিব,
 কতু পড়ি ধরাতলে ;
 (আমি) নখরে কাটিয়া, সরোবর সই,
 ভরিব নয়ন জলে !

১৪

সখিরে, সেই সরোবর মাঝে ;
 কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাসিয়ে,
 দেখিতে সে দ্বিজরাজে ?
 (আমি) আকাশের পানে, থাকিব চাহিয়া,
 ঐরূপ করিব ধ্যান ;
 (সখি) না পাইলে তারে, অগাধ সলিলে,
 ডুবিয়া তাজিব প্রাণ !

১৫

সখিরে, কি কাজ বিলম্ব করি ?
 আর এক পথ, আছেরে আমার,
 শোন তবে সহচরি ।
 (সই) সাজাইয়া চিতা, জ্বলন্ত অনলে,
 পাপ দেহ কর ছাই ;
 মনের আগুন, মিশিবে আগুনে,
 (আমার) বেঁচে থেকে কাজ নাই !

১৬

সখিরে, সেই মুখের স্মৃশান পরে ;
 অশোক বকুল, তমালের তরু,
 রোপিস্ বতন করে ।
 (যখন) পথিক আসিয়ে পথশ্রান্ত হয়ে,
 বসিবে সে তরুতলে ;
 (তখন) কহিস “ এখানে, বজ্রের বিধবা,
 পুড়িয়াছে চিতানলে ! ” (পথিক)

জীবনপ্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।

“মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া হুকু হুকু করি
শুনি যদি পদশব্দ”।

মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদ্বর্গে আসিয়াছি-
লেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত ও উৎক্লিষ্ট
হয়, সেইদিন প্রথমপ্রেমের আনন্দময়ী ল-
হরীতে আর একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া
গিয়াছিল। ছাদে সজ্জার সময় যখন সন্ধ্যার
দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ যোদ্ধার উপর
পতিত হইল, বালিকার হৃদয় যেন সহসা
অজ্ঞাতপূর্ব উদ্বেগে চমকিল ও স্তম্ভিত
হইল। আবার চাহিলেন, আবার সেই
উদার বদন মণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধ-
বেশধারী অবয়ব দেখিলেন, প্রথমপ্রেমের
তরঙ্গবেগে বালিকার হৃদয় উৎক্লিষ্ট হ-
ইতে লাগিল।

সেই উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথকে
ভোজন করাইতে বাইলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়-
মান হইয়া দেব-বিনিমিত অবয়বের দিকে
চাহিয়া রহিলেন, সময়ে সময়ে স্পন্দন

হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া
রহিলেন। আবশ্যিকমতে সম্মুখে আসি-
লেন, প্রেমবিদগ্ধা বালিকা তখনও নয়ন
কিরাইতে পারিলেন না; যখন চারিচক্ষুর
মিলন হইল, তখন লজ্জারূপ-বদনা ধীরে
ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে নূতন এ-
কটি ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহারদিকে
সোচ্ছবে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ
এরূপ বিচলিত-চিত হইয়া ভোজন করি-
তেছেন কেন? তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস কি
জনা? হস্ত কাঁপিতেছে কি জনা? জগদী-
শ্বর! ঐ দেবপুরুষ কি এই অভাগিনীকে
মনে স্থান দিয়াছেন?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে
দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, প্রাণ সেই
দিকে ধাবমান হইল। যখন বিদায় লইয়া
যোদ্ধা অশ্রুজট হইয়া চলিয়া গেলেন, সন্ধ্যার
প্রাণটিও লইয়া লেগেন, কেবল দেহ-
মাত্র প্রস্তর-প্রতিমূর্তির ন্যায় সেই মন্দিরে
দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্র-
স্থান করিলেন, পুরুষের মন উচ্চাভিলাষে
যুদ্ধ-উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল; রমণী
একাকী গাবাক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া
নিঃশব্দে দয়-বিগলিত ধারার অশ্রু বিমো-

চন করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় নিঃশব্দে বিদীর্ণ হইতেছিল ।

বালিকা একথা মুখ ফুটিয়া বলিবে কিরূপে, এ মৰ্ম্মভেদী দুঃখ জানাইবে কাহার কাছে ?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন । অশ্রু ও অশ্রুরোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিম্পন্দে সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । দিবালোকে পৰ্ব্বতমালা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর, যতদূর দেখা যায়, পৰ্ব্বত-রক্ষ সমুজ্জের লহরীর মত বায়ুতে তুলিতেছে । উপরে পৰ্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছজল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে । নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটার দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিষ্রর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পৰ্ব্বত-কন্ডা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, ও মেঘ বিবৰ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-ছিন্নোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছেন । কিন্তু সরসু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না । তিনি কেবল একমাত্র পৰ্ব্বতপথের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মন সেই দিকে প্রাধান্যবিত হইয়াছিল । চাহিয়া চাহিয়া বালিকা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না ; তাঁহার নয়ন পুনরায় জলে আধৃত হইল, শীত্ৰই অব্যাহত ধারা বহিয়া গও ও বক্ষঃ-

স্থল সিক্ত করিল । বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল ।

শূন্য-হৃদয়ে সরসুমালা সংসারকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন ; স্নেহময়ী কন্ডা পিতার শুশ্রূষায় ব্যাপ্ত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা অব্যাকৃত্য ও অব্যক্ত, প্রকল্প মুখখানি কেবল স্নেহ-জ্ঞান, ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ত্রায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন । ধৈর্য্যই রমণীর প্রধান গুণ, ধৈর্য্যই রমণী ব্যাকাল অবধি অভ্যাস করেন । এই বিষয় সংসারের নানা শোক দুঃখে, পীড়ায়, যাতনায়, বিষম উদ্বেগে, সকল সময়েই নারী ধৈর্য্যধারণ করিয়া সংসারকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন । অসহ্য শোকযাতনা হৃদয়ে গোপন রাখিয়া হাস্যমুখী স্বামীর সেবা করেন, দুর্ক্সহনীয় পীড়া তুচ্ছ করিয়া স্নেহময়ী সযত্নে সন্তানকে লালন পালন করেন । শুনিয়াছি, পুরাকালে তাপসেরা ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র যাতনা সহ্য করিতেন । কিন্তু যখন আমি সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রেমময়ী রমণীকে সহস্র যাতনা, সহস্র দুঃখ, সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও স্বামীর দিকে একনিষ্ঠচিত্ত থাকিতে দেখি ; যখন স্নেহময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের অসংখ্য ও অসহ্য যন্ত্রণা হেলায় সহ্য করিয়া পুত্র কন্ডাদিগকে সযত্নে লালন পালন করিতে দেখি, তখন আমি তাপসদিগের কথা বিস্মৃত হই, সংসারের মধ্যে গৃহস্থিণী তাপসীদিগের সহিষ্ণুতা দেখিয়া

বিম্বিত হই। সরযুবালা রমণী, স্নতরাং বাল্যকাল হইতে সহগুণ অভ্যাস করিয়া-
ছিলেন; নিঃশব্দে পিতার শ্রাব্য করিতে
লাগিলেন, সংসারের কার্য নিরীহ ক-
রিতে লাগিলেন, হৃদয়ের উদ্বোধন নিঃশব্দে
হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময়
নিকটে বসিলেন; স্বহস্তে পিতার শয্যা
রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে
আপন শয়নাগারে বাইলেন, অথবা সেই
নিশ্চর রজনীতে পুনরায় ধীরে ধীরে সেই
গবাক্ষ পার্শ্বে বাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন
করিয়া রহিলেন।

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন
গতে সন্ধ্যা হইল, সপ্তাহ অতীত হইল,
মাসকাল অতিবাহিত হইল, সে তরুণ-
বোদ্ধা আর আসিলেন না, তাঁহার কোন
সংবাদও আসিল না। সরযুবালা সেই
পার্বত্যপথ চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

“এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিছরি,
ফেলি দূরে বর্ষা, চর্ম্ম, আসি, তুণ, ধনু,
তাজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।”

মধুসূদন দত্ত।

জনার্দন স্বভাবতই সরলস্বভাব লোক
ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেব-
পূজায় রত থাকিতেন, প্রভাতে ও সায়ং-

কালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ ক-
রিতে যাইতেন, কদাচ বাগীতে থাকি-
তেন। তিনি একমাত্র কন্যাকে অতিশয়
ভাল বাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে
নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত
না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প
বলিতেন, সরযু বসিয়া শুনিতেন। এত-
দূর প্রায়ই আপন কার্যে রত থাকিতেন;
কন্যাও পূর্ববৎ পিতার সেবা করিতেন,
গৃহকার্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার হৃদ-
য়ের চিন্তা ও কখন কখন ঈষদ্ ব্রান মুখ-
খানি জনার্দন লক্ষ্য করেন নাই।

বালিকার হৃদয়ে সহসা যে ভাবগুলি
উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না;
একদিন সন্ধ্যাকালে ও একদিন প্রাতে
সরযুর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্বেক
হইল, তাহা এক সপ্তাহে বা এক মাসের
মধ্যেই বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। যদি সর-
যুর মাতা থাকিত, বা ছোট ছোট ভগ্নী
বা খেলবার সঙ্গিনী থাকিত, বা জ্ঞাতি
কুটুম্ব অনেক থাকিত, তবে সেই মাতাকে
দেখিয়া বা খেলায় রত হইয়া সেই নব-
ভাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু
সরযু জন্মাবধি একাকিনী, পিতা ভিন্ন
তিনি আপনার লোক কাহাকেও কখন
দেখেন নাই, কাহাকেও জ্ঞানিতেন না,
স্নতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চি-
ন্তাশীল। প্রথমযৌবনে যেরূপ দে-
খিয়া সহসা সরযুর হৃদয় আলোড়িত হ-
ইল, মন উন্মত্ত হইল, অপূর্ব স্রবের উ-

জ্ঞান হইল, সরযু এখন সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন ; দিনে, সায়ংকালে, প্রভাতে, সেই চিন্তা করিতেন, স্মরণে সে মূর্তি বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরাক্রিত হইতে লাগিল ।

সে চিন্তা কি ? সরযু সেই তরুণ সেনাপতির চিন্তা করিতেন । তিনি এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, হুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর এ অভাগিনীকে স্মরণ রাখিবেন, বলিরাহিলেন সে কথা কি এখন মনে আছে ? পুরুষের মন ! নানা কার্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে । জীবন আশাপূর্ণ, অন্য এই কার্য সাধন করিব, কল্যাণ অপর কার্য সিদ্ধ করিব, এইরূপ নানা আশায় অতিবাহিত হয় । আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্বদা উজ্জ্বলপূর্ণ থাকে । রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্যে নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ থাকে ! কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে ? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আমাদের জগৎ ; জীবিতেশ্বর ! সেটিতে যেন নৈরাশ করিও না । ধীরে ধীরে এক বিলুপ্ত জল সরযুর গগনস্থল বহিয়া পড়িল ।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথা ভাবেন ?

একালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে ? হায় ! নব নব আনন্দে আমার কথা অনেক দিন বিস্মৃত হইয়াছেন ! তাঁহার রমণীর অভাব কি ? স্মৃতির অভাব কি ? নবীন যোদ্ধা এতদিনে অভাগিনীকে বিস্মৃত হইয়াছেন ! হায় ! নদীর উগ্র পান্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর উগ্র কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না ! আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন, পুরুষের খেলার দ্রব্য । মুহূর্তে তাহাদের খেলা সাক্ষ্য হয়, পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও দুঃখপূর্ণ ! নীরবে সরযু আর একবিন্দু জল মোচন করিলেন ।

নিশীথে যখন সেই উন্নত হুর্গ ও চারিদিকে পার্বত্যমালা চন্দ্রের স্রুধাকিরণে নিস্তব্ধে স্তব্ধ হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রেরদিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, কে বলিবে ? বোধ হইত যেন, সেই পার্বত্য-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব খেতবর্গ, আরোহীর সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে ! যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিতেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুরবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুরগোল বাহুতে সুরবর্ণের বাজু, দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্ষা ! যেন যোদ্ধা আবার আহ্বার করিতে বসিলেন, সরযু তাঁহাকে ভো-

জন করাইতেছেন; অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্ত ধারণ করিয়া একবার মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাঁদিতেছেন। যোদ্ধার প্রশান্ত শীতল বক্ষে সরযু মুখ খানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিতেছেন! উঃ! সে দিন কি কখন আসিবে? সে আনন্দময় প্রতিমাকে কি সরযু আর দেখিতে পাইবে?

চিন্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের ছিল্লোলের ন্যায় একটির পর আর একটি আইসে, তাহার পর আর একটি। সরযু আবার ভাবিলেন যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন সেনাপতি বহু খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযুকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপালোক জ্বলিতেছে, বাজ্র বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযু জানে না, ভাল দেখিতে পাইতেছে না। যেন সরযু কল্পিত-কলেবরে সেই দেব প্রতিমূর্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের হস্তে আপন শ্বেদাক্ত কল্পিতহস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। উঃ! আনন্দে বালিকা-হৃদয় স্ফীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু সঞ্চারনা করিতে পারিয়া সেই বীরের শীতল হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মুহূর্ত্ত ক্রন্দন করিতেছেন। সরযু! পাগলিনী হইও না।

আবার চিন্তা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতিপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযু সেই পরম ধনকে পাইয়াছেন। পার্শ্বতের নীচে ঐ যে নন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিষর্গ নন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে স্নগ্ধ রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুতীরের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুতীর সরযুর! যেন দিব্যবাসনে সরযু স্বহস্তে রত্ননকরা সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুতীর সম্মুখে নন্দর দুর্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন, পার্শ্বে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। যেন সরযু দূর ক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুতীরভিত্তিতে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, শিশুসন্তানকে কোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শিশুর মাতাকে প্রণাম আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। উঃ! সরযুর মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সরযু ধন মান চাহে না, সূবর্ণ রোপা চাহে না, খ্যাতি পদ চাহে না; ভগবন্! সরযুকে সেই ক্ষুদ্র কুতীর, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দাও।

গভীর নিশীথে প্রান্ত হইয়া সরযু

সেই ছাদে স্রুণু হইয়া পড়িলেন ; অনেক কক্ষণ নিত্রা যাইলেন ; ভীষণ অগ্নি দেখিলেন । দেখিলেন ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সহস্র মোগল সহস্র মহারাজীরে হিন্ন যন্তক বা হিন্ন বাহু পতিত রহিয়াছে, ক্ষেত্র রক্তে আৱৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই নবীনযোদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছেন ! যোদ্ধার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতেছে ও উজ্জলতাশূন্য নয়নদ্বয় সরযুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । সরযু শিহরিয়া চীৎকার শব্দে জাগরিত হইলেন, দেখিলেন স্বর্ষ্য উদয় হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, ও এখনও কাঁপিতেছে, তাঁহার দীর্ঘ কেশপাণ, বাহু স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর আলুলারিতরূপে রহিয়াছে ।

এইরূপে এক মাস, দুইমাস তিন মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু সে নবীনযোদ্ধা আর আসিলেন না । গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, তাহার পর শ্রবণ শরৎকাল শুভ্রচন্দ্র ও তারাৱলীকে সঙ্গে লইয়া যেন ক্ষণেকের সুখাপূর্ণ ও শান্ত করিল, কিন্তু সরযুর তপ্ত-হৃদয় শান্ত হইল না । শীত আসিল, চলিয়া গেল, আবার মধুময় বসন্তকাল আসিল, পুষ্পগুলি দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মঞ্জরিত হইল কিন্তু পূর্ববসন্তে সরযু যে মধুময়ী মূর্তি দেখিয়াছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি আর কিরিয়া আসিলেন না ।

বৎসরকাল অজীত হইল, সরযু সেই পর্ত্ত-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন,

কিন্তু সে পথে সে নবীনযোদ্ধা আর দেখা দিলেন না ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

নৈরাশ ।

“বিবাদে নিখাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমার সম্মুখে !”

মধুসূদন দত্ত ।

কয়েক মাসের চিন্তার অবশেষে সরযুর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মুখ শ্রান হইল, নয়নদুটী দীর্ঘ কালিমাবেষ্টিত হইল । যে লাৱণ্য দেখিয়া দুর্গের সকলেই গিম্বিত হইতেন, সে অপূর্ব প্রকৃষ্ট লাৱণ্য আর নাই ; শরীর শীর্ণ, ওষ্ঠদুটি শুষ্ক, নয়নের প্রকৃষ্ট জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে । শরীরে যন্ত্র নাই, মনেও প্রকৃষ্টতা নাই । জনার্দন সময়ে সময়ে সন্মুখে জিজ্ঞাসা করিতেন “সরযু ! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে কেন ?” অথবা “সরযু ! তোমার খাওয়া দাওয়ার কচি নাই কেন ?” কিন্তু সরযু উত্তর দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে পারেন, এই জন্য দীর্ঘকাল করিয়া অন্য কথা আনিতে, স্মরণান্ত সরল-অভাব জনার্দন কিছুই জানিতে পারিলেন না ।

কিন্তু অগ্নি বজ্রাৱৃত হইলে সেই বজ্রকে দাহ করে, যন্ত্রসম্ভোপিত চিন্তা সরযুর হৃদয় স্তরে স্তরে দহ করিতে লাগিল । শরীর আরও অবসন্ন হইতে লা-

মিল, বদন-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুস্থর কোটর-প্রবিষ্ট হইল, বালিকার শরীর আর সহ করিতে পারিল না, সরযু সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভীষণ জ্বরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, বালিকা জ্বালার অস্থির হইয়া “জল” “জল” করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া নানারূপ কথা কহিতে লাগিল।

জনার্দন যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কারণ জানিতেন না। শারীরিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন।

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল। বালিকার শরীর কখন কখন ঘর্ষে আপ্ত হইত, কখন বা শীতে কটকিত হইয়া উঠিত। সর্বদাই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু তাহা এরূপ ভীত ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা যাইত না।

স্বল্প রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্বদাই নড়িত, কখন কখন বালিকা বাহু প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিত।

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কত রূপ চিত্তার উদ্বেগ হইত, তাহার স্বপ্নে কত রূপ আকৃতির আবির্ভাব হইত, তাহা কে বলিবে?

কখন সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিত,

বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, স্বর্গের প্রথর তাপে সে বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই মরুভূমিতে সেই রৌদ্রে বালিকা একাকী গমন করিতেছে। উঃ! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে; জল! জল! এক বিন্দু জল দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, গাত্রচর্ম দগ্ধ হইতেছে, জল! জল! জল! সে মরুভূমিতে রক্ষা নাই, গোম নাই, কেবল তপ্ত বালুকা, সরযুর পদ দগ্ধ হইতেছে। আকাশে মেঘ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর রুদ্ধ করিতেছে! সরযুকে কে জল দিবে? সহসা অট্টহাস্য শুনা যাইল, সরযু সেই আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ তাঁহার কষ্ট দেখিয়া বিজপ করিয়া হাসিতেছেন; বালিকা ক্রোধে ওখেদে তর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুরুরোগী চীৎকার করিয়া উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল।

আবার স্বপ্ন দেখিল। নিবিড় বন, অন্ধকার, জনশূন্য! সেই বনের মধ্য দিয়া সরযু বেগে পলাইতেছে, একটা ব্যাঘ্র তাঁহার পশ্চাত্তাপমান হইতেছে। চীৎকারশব্দ করিয়া সরযু পলাইতেছে, তাঁহার শব্দে বন প্রতিশ্রুতি হইতেছে, বনের কটকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর জ্বলিতেছে, পা জ্বলিতেছে, এ জ্বালা কিছুতে নিবারণ হয় না? সহসা সম্মুখে কি দেখিল? দেখিল সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্মুখে দ-

ওয়াসমান রহিয়াছেন, তীত সরযুকে বাম-
হস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনার
খজ্ঞাঘারা ব্যাক্রমে ধরাশায়ী করিলেন।
উঃ! সরযুর প্রাণ শীতল হইল; প্রান্ত
রোগীর অস্থিরতা নিবারণ হইল, রোগী
গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। চিকিৎসা
সকল এই মূলকণ দেখিয়া সে দিন
চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস পর্যন্ত সরযু
রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া রহিল। সময়ে
সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে
চিকিৎসকেরাও জীবনআশা ত্যাগ ক-
রিতেন। জনার্দন স্ত্রীর মৃত্যু অবধি এক-
রূপ উদাসীন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশী-
লনে ও পূজাকার্যেই রত থাকিতেন, এক
দিনের জন্তও শাস্ত্রপাঠে নিরত থাকিতেন
না। কিন্তু অল্প সংসারের মায়া কাহাকে
বলে বুঝিলেন; রক্ত নিরানন্দে সেই শ-
যার নিকট বসিয়া থাকিতেন, স্নেহময়ী
কস্তার জন্ত হৃদয় শোকে উথলিতে লা-
গিল, সেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া
থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার
শুশ্রূষা করিতেন। অনেক দিনে, অনেক
যত্নে, ক্রমে ঔষধি সেবনে রোগের উপ-
শম হইতে লাগিল; অনেক দিন পরে স-
রযু শয্যা হইতে উঠিলেন, অন্ন আহার ক-
রিলেন, এ-দিক ও-দিক পদচারণ করিতে
সমর্থ হইলেন; কিন্তু তখন বদন-মণ্ডল এ-
কেবারে প্যাপুবর্ণ, শরীরে যেন রক্ত বাহ্য
কিছুই নাই।

রজনী একপ্রহর হইয়াছে, ক্ষীণ দু-
র্বল সরযু ছাদে উপবেশন করিয়া গ্রীষ্ম-
কালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করি-
তেছেন। তিনি এখনও অতিশয় ক্ষীণ, শ-
রীরের জ্বালা এখনও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই, এই
জনাই বায়ুসেবন করিতে ভাল বাসিতেন।

ধীরে ধীরে গত গ্রীষ্মের কথা মনে
আসিতে লাগিল, যে যুবক তাঁহাকে রখা
আশা দিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারই কথা
মনে আসিতেছিল। চিন্তার তীব্রতা এ-
খন নাই, কেননা শরীর অতি দুর্বল, চি-
ন্তাশক্তিও দুর্বল। যেমন মন্দ মন্দ গতিতে
সরযু পদচারণ করিতে পারিতেন, তাঁহার
চিন্তাশক্তিও সেইরূপ ধীরে ধীরে পূর্ব
বৎসরের কথা জাগরিত করিতেছিল।

নিশির মন্দ মন্দ বায়ুতে যেন ধীরে
ধীরে পূর্বস্মৃতি আনিতে লাগিলেন; গলদেশে
সেই কঠমালা হুলিতেছিল, সেইটীর দিকে
দেখিতে লাগিলেন। দে-
খিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গণ্ডস্থল
দিয়া গড়াইয়া পড়িল; ভাবিলেন “ যদিও
তিনি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি
কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? রতদিন
জীবিত থাকিব, এই কঠমালা সযত্নে হৃদয়ে
ধারণ করিব। ” আর এক বিন্দু জল গা-
ড়াইয়া পড়িল, কঠমালা দিবার সময় যে
মিষ্ট কথাগুলি রঘুনাথ বলিয়াছিলেন
তাঁহা স্মরণ হইল; রঘুনাথের মুখপানি
মনে পড়িল; বোধ হইল, যেন রঘুনাথ সেই
মিষ্টম্বরে আবার ডাকিলেন “ সরযু! ”

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, পরে খেদে অঙ্গ হারিয়া ভাবিলেন “হায়! আমি জানি হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাহাকে দেখিতে পাই, এখনই বোধ হইল যেন তিনি সেই মিস্ত্রিরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ভগবন্! এবি-
ড়ঘুনা কেন!”

আবার সেই কোকিল-বিনিমিত শব্দ শ্রুতিতে পাইলেন—“সরযু!” সরযু চমকিত হইয়া পঞ্চাংদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—রঘুনাথ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

“দেখিব প্রেমেরস্বপ্ন জাগি হে হৃদয়ে!”

মধুসূদন দত্ত।

দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আসিলেন, সহসা নত হইয়া সরযুর পদ-
যুগল ধরিয়া বলিলেন “সরযু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাতকী এ জগতে নাই, কিন্তু তুমি আমাকে মার্জনা কর।”
রঘুনাথের চক্ষুজলে সেই পদযুগল সিক্ত হইল।

আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জার সরযু বাঞ্ছনা হইলেন, রঘুনাথকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আর কি করিলেন, তিনি জানেন না; আনন্দে তাঁহার শরীর বায়ুভা-
ড়িত পত্রের মত কাঁপিতে ছিল। বাঁহার প্রেমময় মুখখানি এক বৎসর অবধি চিন্তা

করিতেছিলেন, বাঁহার উপর হৃদয়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর! সরযু কি সেই হারাধন করিয়া পাইলেন?

রঘুনাথ পুনরায় কল্মিতস্বরে বলিলেন “সরযু! তুমি আমার চিন্তা করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পীড়ায় তুমি আমার নাম করিয়াছিলে;—
আর আমি,—আমি কোথায় ছিলাম? সরযু এ পাপিষ্ঠকে কি তুমি মার্জনা করিতে পার?” সরযু চাহিয়া দেখিলেন—
চন্দ্রালোকে দেখিলেন, সেই কক্ষকেশ-শোভিত, উদার দেবনির্মিত মুখখানি সিক্ত, —সেই ভ্রমরনির্মিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! সরযুর নয়নও শুষ্ক রহিল না।

রঘুনাথ আবার বলিলেন “উঃ! এ পাণ্ডু-বদন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছিলে?” পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরযুর হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন,
“কিন্তু সরযু! যদি তুমি এই হৃদয়ের ভাব জানিতে, দিবাতাগে, নিশীথে, শিবিরে, ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও দেবী-বিনির্মিত মূর্তি কত ভাবিয়াছি যদি জানিতে, তবে বোধ হয় তোমাকে যে দাক্ষণ কষ্ট দিয়াছি তাহাও মার্জনা করিতে। জগদীশ্বর! আমি কি জানিতাম যে সরযুলা এ অভাগার জন্য চিন্তা করেন, এ অভাগাকে মনে রাখিয়াছেন?”

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন, চারিচক্ষুর মিলন হইল, চারি চক্ষুই জলে ছল ছল করিতেছে, উভয়ের হৃদয় স্ফীত হইতেছে, সরসুর দুইটা হাত রঘুনাথ স্ব-হস্তে ধারণ করিয়াছেন, উভয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ, মুখে আর বাক্য নাই; মন, প্রাণ, হৃদয়ের বেগবতী চিন্তা যেন সেই সজল নরনে প্রকাশ পাইতেছে ।

চন্দ্র ! রঘুনাথ ও সরসুর উপর সুরধা-বর্ণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই । তখন বরসে যখন মন প্রথম প্রেমোন্মাদে উৎক্লিষ্ট হয়, যখন নবজাত সূর্য্যারম্ভের ন্যায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিল্লোল মানসজগতে গড়াইতে থাকে, যখন বহুবিচ্ছেদের পর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, যখন পরস্পরের প্রেমে আমলিত হইয়া উভয়ে জগৎ বিস্মৃত হয়, স্বামি কাল বিস্মৃত হয়, দোষ গুণ বিস্মৃত হয়, নীচে পৃথিবী, উপরে আকাশ বিস্মৃত হয়,—কেবল সেই প্রণয়সুখ ভিন্ন সমুদয় বিস্মৃত হয়,—তখন, তখনই যেন এ জগতে ইস্ত-পুরী অবতীর্ণ হয় ।

চন্দ্র ! আরও সুরধা বর্ণ কর । বান্ধব ! ধীরে ধীরে বহিয়া যাও, এরূপ সুরের স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাও নাই । সরসু অমুচিৎ কার্য্য করিতেছেন তাহা জানেন না, অজ্ঞাত পুষ্পের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন তাহা জানেন না ; কেবল

যে মূর্ত্তি এক বৎসরকাল ধ্যান করিয়াছি-লেন, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই নবীন মুখ-গুণ, সেই চক্ষু, সেই কেশ, সেই ওষ্ঠ, দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন । আর র-ঘুনাথ ! একি ভ্রমোচিৎ কার্য্য ? রঘুনাথ জানেন না, রঘুনাথ উন্মত্ত !

সেই চন্দ্রালোকে, নিমন্তর নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ সরসুকে জানাইলেন, সরসু পুলকিত শরীরে সেই মিষ্ট কথাগুলি শুনিত লাগিলেন । একবৎসরকাল অবধি রঘুনাথ নানাস্থানে, নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তোরণে আ-সিবার জন্য একদিনেরও অবকাশ পান নাই । এক্ষণে শিবজী রায়গড়ে বাইয়া রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসনপ্র-ণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়াছেন । রঘুনাথ দরিদ্র হা-বেলদার মাত্র, তাঁহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি সরসুরত্বকে কি রূপে পাইবেন ? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেষ্ঠার ক্রটি করিবেন না, রঘুনাথ সেই র-ত্নটী কুড়াইয়া বন্ধ ধারণ করিবেন, অথবা চেষ্ঠায় অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিবেন । রঘুনাথ অদ্যই দুর্গে আসিয়াছেন, আসি-য়াই সরসুর পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন, রাত্রিতে একবার সরসুকে গোপনে খা-কিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আসিয়াছিলেন । কিন্তু সে পাণ্ডুবদন দে-খিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই,

ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সরযু তাহা মাৰ্জ্জনা করিবেন। রঘুনাথ পুনরায় কলাই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, সরযুর চিন্তা, সরযুর মুখখানি কখনও বিস্মৃত হইবেন না। সরযুকে এক একবার এই দরিত্র সেনার জন্য চিন্তা করিবেন।

পুলকিত শরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আহা! তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল, দক্ষ শরীর জুড়াইল, কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, পিতা শয়ন করিয়াছেন, সরযুর কি রঘুনাথের নিকট বসিয়া থাকা উচিত? এই কথা সহসা মনে জাগরিত হওয়ার সরযু উঠিলেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, পরে বলিলেন—

‘রঘুনাথ!’ সেই মিষ্ট নামটি উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রঘুনাথের হৃদয় হৃত্য করিয়া উঠিল। বলিলেন ‘সরযু! সরযু! আর একবার ঐ মিষ্টস্বরে ঐ নামটি উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা অদ্য বিস্মৃত হইব, এক বৎসরের কষ্ট অদ্য ভুচ্ছজ্ঞান করিব।’

সরযু লজ্জা সংবরণ করিয়া বলিলেন ‘রঘুনাথ! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জয়ী করুন। এ অভাগিনীর তাহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই। তাহা ভিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই।’ ধীরে ধীরে সরযু শয়নাগারে যাইলেন।

সে দিন রঘুনাথ তোরণ-দুর্গে রহিলেন, পরদিন প্রাতে কিসাদারের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল; সরযুর চিন্তা পূর্ববৎ বলবতী; কিন্তু পূর্ববৎ খেদযুক্ত নহে। তিনি আনন্দের, স্বপ্নের চিন্তাই করিতেন; মায়াবিনী আশা কানে কানে বলিত ‘শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, শীঘ্র রঘুনাথ জয়ী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।’ সরযুর শরীর ও পূর্ববৎ পুষ্টতা ও লাবণ্যধারণ করিল। দেখিয়া জনার্দন পুনরায় নিশ্চিত হইলেন, পুনরায় শাস্ত্রানুশীলনে মন দিলেন।

কএক মাস পরে সংবাদ আসিল, যে সম্রাট অম্বরাধিপতি জয়সিংহকে শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। জনার্দন পূর্বপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন; কিসাদারের অনুমতি লইয়া তোরণদুর্গ হইতে বাত্মা করিলেন। জনার্দন সরল-হৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে শত্রুশিবিরে যাইতে দিতে কিসাদার বা শিবজী কোন আপত্তি করিলেন না; বিশেষ ভয়ানকরংগারা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন হয় শিবজীর এই ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন না।

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দন কত্ভার সহিত তোরণদুর্গ ত্যাগ করিলেন, কত্ভার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল।—কেন?

সরযুর চিন্তামালিকা দূর হইল, সরযুর

লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইল, সরসুর হৃদয়া-
শয় ঢুক ঢুক করিতেছে, সরসুর মুখে স-
র্বদা হাসি।

সরসুর আনন্দে পিতা আরও আন-

ন্দিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে রাজ্য জ-
য়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন। পাঠক!
আমরা ভোরগদুর্গে থাকিয়া কি করিব,
চল আমরাও সেই স্থানে যাই।

নিশীথচিন্তা।

বিরহ।

প্রেমের পুষ্টি মিলনে, না বিরহে ?
ঈহাদিগের হৃদয় আছে, এবং হৃদয়ে
প্রীতির পবিত্রপ্রতিমা অঙ্কিত আছে ;—
ঈহারা প্রেম আর বিরহকে ব্রজলীলার
কথা মনে না করিয়া, হৃদয়রহস্য ও অ-
খ্যাত্ত্বের নিগূঢ় কথা বলিয়া মনে ক-
রেন, সেই সাধুহৃদয় প্রেমিকেরা এই প্র-
শ্নের উত্তর ককন। আমার চক্ষে প্রেমের
মোহময় সম্মিলন যেমন সুখপ্রদ, বিরহের
বিষাদময়বহিও তেমনই উপকারজনক।
একটিতে প্রীতির আলস্র, আর একটিতে
প্রীতির উল্লীপনা। যে বিরহের যজ্ঞীয়
অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই, সে প্রেমের আ-
ভোগ ও আবেশ কাহাকে বলে, তাহা
জ্ঞানে না। যে সম্মিলনসুখের নিখল
অমৃতরাশিতে অবগাহন করে নাই,—হৃ-
দয়ে হৃদয় নিশীথিয়া মানবহৃদয়স্থ তরল ত-
রঙ্গের সেই গভীর সঙ্গীত জবণ করে নাই,
বিরহের বিষবক্ত্রণায় যে কি শিক্ষা, কি
সম্পদ, কি মেঘাবৃত জ্যোৎস্না, কি মধু-
ময় হুঃখ আছে, তাহাও সে জানিতে পার
না; কলভঃ বিরহ নিরবচ্ছিন্ন বিপদ মছে।

বিরহে প্রেমের পরিশুদ্ধি,—প্রীতির
পবিত্রতা। যে প্রেম নিরাবিল ও নিখল
নহে, তাহা প্রেমের বিভ্রম মাত্র, তাহা
মনুষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট, অথবা মনুষ্য-
ত্বের উচ্চতর আদর্শে বঞ্চিত, পশু-প্রকৃতি-
সম্পন্ন ইতর জনেরই ভোগে আসিতে
পারে; প্রকৃত মনুষ্যের উপভোগ্য হয়
না। স্তবরাং প্রীতি যাহাতে সর্বতো-
ভাবে আবিলতাশূন্য হয়, ইহাই প্রার্থ-
নীয়;—হৃদয় যাহাতে প্রীতির নাম ল-
ইয়া পক্ষে গিয়া ডুবিয়া না পড়ে, ইহাই
বাঞ্ছনীয়। বিরহে সেই নিরাবিল মাধুর্য্য,
সেই পঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য প্রেমের প্রথম স্বাদ।
হৃদয়, বিরহে দগ্ধ হইয়া, অগ্নিদগ্ধ কাকনের
ন্যায়, হৃদয় কান্তি ধারণ করে,—এবং
হুঃখের মুগ্ধরদাহমে পুড়িয়া পুড়িয়া প-
বিত্রতার মোহনমূর্ত্তি সম্মর্শন করে। এই-
রূপে ইচ্ছা লালসাশূন্য হয়, লালসা এক
বারে বিনষ্ট না হইলেও প্রীতিতে পরিণতি
পায়, এবং মনুষ্যের প্রাণ স্মৃতির উপাসনা
করিতে প্রথম শিক্ষা পাইয়া দেবপ্রকৃতির
সোপানপরম্পরায় ধীরে ধীরে আরোহণ

করে। ঈদৃশ শিক্ষাকে কোন প্রকারেই সামান্য শিক্ষা বলিতে সাহস পাই না।

শোক কি? না স্মৃতির উপাসনা। এবং স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যের গৌরব। মুহূর্তের জন্ত যে অমুরাগ, তাহা মানব জাতির অধস্তন জীবসমূহের শোভা পায়,—মনুষ্যে শোভা পায় না। মনুষ্যের অমুরাগ অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিতৃপ্ত হয় না,—স্বর্গা, চন্দ্র, ও নক্ষত্রনিচয়ের স্মৃতি ও বলিয়াকেও পরিহাস করিয়া একবারে কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না পারিলে, কৃতার্থ হয় না। এই নিমিত্তই মনুষ্যের জন্য মনুষ্যের শোক,—এবং এই নিমিত্তই শোকে মনুষ্যের এক অলৌকিক, অনির্বচনীয়, অকল্পিত সুখ। যাঁহারা শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সংসারের রূপা কথা কহিয়া সাহসনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনার তাঁহারা হৃদয়-শূন্য। আর,—যাঁহারা বিবিধ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা মমতার অনিত্যতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থশূন্য বাক্য শুনাইয়া শোকাকুল হৃদয়ের মর্মস্থান হইতে লোকান্তর-গত প্রিয়জনের প্রতি-মূর্ত্তিখানি পুছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়, তাঁহারা মূঢ়। আমার নিকট শোকের প্রতিষ্ঠাতি, সাধনার প্রতিষ্ঠাতির ন্যায়, যার পর নাই সুন্দর ও পবিত্র,—এবং শোকাকুলের দৃষ্টি সুধাবর্ণিণী। আমি আর্জুনাদকে শোক বলি না, এবং প্রিয় বিচ্ছেদের প্রথম আঘাতে যে এক অসহনীয় জন্মে, তাঁহাকে

ও শোক বলিয়া ব্যাখ্যা করি না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, শোকের নাম স্মৃতির উপাসনা, এবং যে ঐরূপ উপাসনার ভাবে শোকাকুল, সে সার্থক-জন্মা। মনুষ্য যখন শোকে ঐরূপ শান্ত, স্থস্থির ও ধীরপ্রকৃতি হয়, তখন তাঁহার জন্য দুঃখ না হইয়া, প্রভূত তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মে,—এবং মনুষ্যের স্নেহ ও মনুষ্যের মমতা যে নিত্যই একটি কথার কথা, খেলার সামগ্রী অথবা মায়ায় ছলনা নহে, ইহা অনুভব করিয়া মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধাতে হৃদয় তখন অবনত হইয়া পড়ে। যে সংসারে স্বার্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা, ক্ষতিলাভ-গণনাই মনুষ্যের একমাত্র শিক্ষা, এবং ভোগের আবর্ত্তচক্রই মনুষ্যের বিলাসক্ষেত্র, যদি সেই সংসারেও শোকের প্রকৃত সম্মান না হয়;—যে সংসারে প্রীতি প্রাতঃসূর্যের কিরণ-স্পর্শে বিকশিত হইয়া সন্ধ্যাগমেই শুকাইয়া যায়, মনুষ্যের মমতা সৈকত-ভূমিতে জলরেখার ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়, অমুরাগের তরঙ্গ বসন্তকালীন স্রোতস্বিনীর লীলাতরঙ্গের ন্যায় এই খল খল হাসিতে থাকে, এই আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই পুনরায় লীলাজলে বিলীন হইয়া যায়, যদি সেই সংসারেও স্মৃতির উপাসনা মনুষ্যচিত্তে সমুচিত পূজা না পায়, তবে জানি না মনুষ্যের শেষ গতি কি?

বিরহও শোকের ন্যায় স্মৃতির উপাসনা। সুতরাং বিরহও শোকের ন্যায়

সম্মাননীয়। যাহার হৃদয়ে শোকের দীপ-
শিখা লুকাইত ভাবে জ্বলিতে থাকে, সেই
শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির পরিমলমুখজীতেও
যে গাভীর্ষ্য, বিরহসন্তপ্ত প্রেমিক ব্যক্তির
পরিমলমুখ-মাধুরীতেও সেই গাভীর্ষ্য।
শোক সূদীর্ঘবিরহ;—বিরহ শোকের সা-
ময়িক ভোগ। শোকে যে শিক্ষা, বিরহেও
সেই শিক্ষা;—শোকে যে শুদ্ধি, বিরহেও
সেই পরিশুদ্ধি। প্রভেদ এইমাত্র, শোক
অনেক দুর্ভাগ্য মনুষ্যের নিকটেই আশা-শূন্য
অন্ধকার। বিরহের অন্ধকার আশাপ্রদ।

অপিচ, বিরহে প্রেমের পরীক্ষা। দৃষ্টি
যখন মুখেরা নর্ষ-সখীর ন্যায় হৃদয়ের কথা
হৃদয়ের নিকট কহিয়া দেয়, রজ্জুর ন্যায়
বন্ধনীর কার্য করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদ-
য়কে প্রস্তুত করিতে যত্নশীল রহে,—জি-
হ্বায় বাহ্য প্রকাশ পায়না, অন্তরের অন্ত-
রতমস্থাননিহিত সেই নিগূঢ় কাহিনী প্র-
কাশ করিয়া প্রিয়জনের চিত্তবিনোদন করে,
নিতান্ত অসারচিত্ত ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যও তখন
প্রীতির হিম্মোলে ক্ষণকালের তরে ভা-
সিতে পারে। তাদৃশ যত্নসিদ্ধ প্রীতির আর
গৌরব কিসে? সেই প্রীতিই প্রীতি, যাহা
আপনার বলে আপনি জীবিত রহে;—সেই
প্রীতিই প্রীতি, যাহা কালের তরঙ্গাঘাতে
এবং অবস্থার ঘূর্ণপাকে আহত ও প্রত্যাহত
হইয়াও সম্পূর্ণরূপে অটল থাকে; সেই প্রী-
তিই প্রীতি, যাহা চকুর প্রলোভন এবং চির-
প্রিয় প্ররোচনার বঞ্চিত রহিয়াও আশা ও
নৈরাশো, আলোকে ও অন্ধকরে হৃদয়পুত্ৰ-

লের ধ্যান করে। ইহারই নাম প্রণয়ের তপস্যা
এবং প্রীতির যদি কিছু পরীক্ষা থাকে, সেই
পরীক্ষা বিরহের এই সূদীর্ঘ তপস্যায়।

এই সংসারে কে না প্রণয়ের খেলা
খেলে? এবং কে না প্রণয়ের খেলা খে-
খেলিয়া আত্মবিড়ম্বনা, এবং মনুষ্যের অ-
বমাননা করে? মুহূর্ত্ত পরে যাহাকে ভু-
লিয়া যায়, মনুষ্য তাহাকে প্রাণাধিক
বলে। নয়নপথের অন্তরালে গেলেই যে
একবারে হৃদয়েরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে,
মনুষ্য তাহাকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া স-
স্তাষণ করে। যাহাকে হর্ষ ও বিষাদ,
সুখ ও দুঃখ, কোন সময়েই মনে পড়েনা,
এবং অতি দীর্ঘ বিরহেও যাহার জন্য
মন পোড়ে না,—মনুষ্য যাহাকে ছাড়িয়া
আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই ভোগ করিতে
পারে,—এবং যাহার অদর্শন ও অভাবে
আপনাকে কোন অংশে অঙ্গহীন জ্ঞান না
করিয়া জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই নিবিষ্ট
রহিতে সমর্থ হয়,—কি হৃণা কি লজ্জার
কথা, মনুষ্য তাদৃশ দূরস্থ জনকেও নিকটে
পাইলে প্রিয়সস্তাষণের মধু বিলাইয়া পু-
লকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। প্রীতির পর-
মায়াধ্য পবিত্রতা লইয়া এইরূপ লৌকিক
খেলা খেলিতে আমার সাহস হয়না,—
এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের এইরূপ ছল-
নার খেলা দেখিতেও আমার আর প্রাণে
সহেনা। প্রীতির নাম অমৃত। যুগান্তব্যাপি
তপস্যা বিনা এ অমৃতে মনুষ্যের অধিকার
হয়না;—প্রীতি অবনীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ;

মম্বা বহুদিনের সাধনায় আপনায় আ-
ত্মাকে নরকম্পর্শ হইতে প্রকাশিত করিতে
না পারিলে, এই স্বর্ণে প্রবেশ-পথ পা-
য়না। যদি হৃদয়ে প্রকৃত প্রীতিই পরিস্ফুট
হইল, তাহা হইলে আর বিরহ কি? এবং
বিরহে দুর্ভাবনা কি? এই নিখিল জগৎ
নৈশানিশুকৃত্যায় অভিভূত হইয়া নিতায়
কোড়ে অচেতন রহে, বিরহিণী প্রীতি
তখন তপস্বিনীর ন্যায় জাগ্রত রহিয়া, স্বে-
খও নয়, দুঃখও নয়, স্বেদুঃখের মিশ্রণও
নয়, মনের সেই যে এক অনির্বচনীয় অ-
বস্থা, প্রিয়-চিন্তার আবেশে তাহাতে ডু-
বিয়া পড়ে। আত্মার গান্ধীর্ষ্য এবং প্র-

কৃতির গান্ধীর্ষ্য তখন এক হইয়া যায়। প্র-
কৃতির যে সকল প্রকল্প সৌন্দর্য্য অন্য
সময়ে চক্ষে পড়ে না, প্রেমালোক-প্র-
দীপ্ত মনুষ্যচক্রে যামিনীর তিমিররাশি
ভেদ করিয়া তাহা তখন দেখিতে পায়।
অতীতি যে সকল অপার্থিব ধনি কখনও
শুনিতো পায় না, দূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায়
তাহা তখন অতীতিপথে প্রবেশ করে,—
এবং মধ্যে যত কেন ব্যবধান থাকুক না
হৃদয় তখন হৃদয়ের সহিত আলাপ করিয়া,
যিনি সকল হৃদয়ের শেষগতি এবং প্রী-
তির আদি প্রঅবণ, তাঁহার অমৃতময়
কোড়ে লীন হয়।

কবিতা পুস্তক *

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া
প্রীত হইয়াছি। ইহাতে যে, ক-
বিতা বিনিবেশিত হইয়াছে, র্ন ও
ভ্রমরের পাঠকবর্গ অবশ্যই তাহা পড়িয়া-
ছেন। কিন্তু তাঁহার এই কবিতাগুলিকে
বক্ষিম বাবুর বলিয়া জানিতেন না। এই-
ক্ষণ তাহা জানিতে পাইয়া, পাঠসময়ে হৃ-
তন আনন্দ লাভ করিবেন।

যদি চিত্রনৈপুণ্য অথবা কল্পনার বৈ-
চিত্র্যই কবিত্বশক্তির প্রধান পরিচয় হয়,
তাহা হইলে বাবু বক্ষিমচন্দ্র বসুদেশের

একজন প্রধান কবি। তাঁহার আয়েষা,
তাঁহার স্বর্ধ্যমুখী, তাঁহার মৃণালিনী, তাঁহার
তিলোত্তমা, দময়ন্তী শকুন্তলার প্রণয়-সখী
হইবার যোগ্য। এসকল দেবদূর্ভেদ, দে-
বজনম্পৃহণীয় পবিত্রপুষ্প যাঁহার মানস-
কুঞ্জে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনি কবিস-
মাজে আদরের আসন পাইতে অধিকারী।
তাঁহার অপরাপর উপাদেয় কাব্যকাব্যের
মধ্যে শৈবলিনীর প্রতাপরায় পার্থিব উ-
পকরণে গঠিত হইয়াও এমনই এক অপা-
র্থিব সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত রহিয়াছে যে,

* জীবকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শনযন্ত্রালয়ে রাধানাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যতকাল ইচ্ছা নিরীক্ষণ কর, চক্ষু কখনও ফিরিতে চাহিবে না ! আমরা যখন প্রতাপের প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করি,— প্রতাপের গভীরা প্রীতি, গভীরতর মহেশ্বের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হই, তখন প্রতাপচরিত্র-স্রষ্টাকে শুধু প্রশংসা করিতে আমরা গের প্রবৃত্তি হয় না । আমরা তখন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার তাঁহার নিকট অবনত হই, এবং কাব্যশাস্ত্রই যে প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র, তাহা অনুভব করিয়া কবিকে হৃদয়ের সহিত সাধুবাদ দেই । ফলতঃ বঙ্কিম বাবুর তুলিপাতশক্তি অসামান্য । বাঁহার হৃদয় নাই, এবং হৃদয়ে প্রীতির আবেগ এবং কল্পনার প্রবাহ নাই, তিনি এইরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্যও এইরূপ চিত্রনৈপুণ্য দেখাইতে পারেন না ।

কিন্তু বঙ্গীয়পাঠকসমাজে এসকল গুণে কবিদের পরীক্ষা হয় না । এদেশে কবিদের পরীক্ষা কর্ণে । বাঙ্গালির কবি ঠুংরী তালের তরলতরঙ্গ তুলিয়া আপনি নাচিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে নাচাইবে ;—নহিলে সে কবি নহে । বাঙ্গালির কবি কথায় কথায় ছড়া কাটিবে, কথায় ছটায় বাহবা দেওয়াইবে, এবং অকথায়ও কথা সৃষ্টি করিবে ;—নহিলে সে কবি নহে । সংক্ষেপতঃ বাঙ্গালির কবি কেবলই গীত গাইবে, সে গীতে ভ্রমরগুঞ্জের অনুকরণ না হইয়া ভেকধ্বনির অনুকরণ হউক, তাহাতে দোষ নাই । কিন্তু তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন গাইতে হইবে । যদি প্রাচ্য সমালোচনা কিংবা রাজনীতির কথা লইয়া

আলোচনা করিতে হয়, তাহাও গুড়গুড়ী ভট্টাচার্য্য কিংবা ভূতপূর্ব প্রভাকরের রীতিতে ছন্দোময়ী গীতিকবিতায় লিখিত হওয়া চাই । এই জন্যই বঙ্কিম অত্যাধুনিক গদ্যাকাব্যও অকাব্য বলিয়া উপেক্ষিত, এবং এই জন্যই বঙ্কিম যারপর নাই জঘন্য, ও অস্পৃশ্য পদ্য প্রবন্ধ কাব্য বলিয়া আদৃত ।

বঙ্কিম বাবুর সমস্ত লেখাই পদ্যো । সুতরাং বঙ্গদেশের সাহিত্যামুরাগী রসিক সম্প্রদায়ের নিকট তিনি উপন্যাস-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং আসমানী ও হীরণ্য, এবং অলবলা ও বিদ্যাভিগঞ্জের স্ততিগায়ক বলিয়া সমাদৃত থাকিলেও সুকবি বলিয়া এতদিন পরিচিত ছিলেন না । তাঁহার এই কবিতা-পুস্তক সেই অভাব পূরণ করিবে । বিংশতি বৎসরের প্রগাঢ় চিন্তাশ্রমে যে ফল ফলে নাই, এতদ্বারা জীর্ণ সেই ফল ফলিবে । বাঁহারা স্কট ও নাটকের কল্পনার সহিত বাঙ্গালির কল্পনার তুলনা করিতে পারেন, সেই অস্পৃশ্যক অসামাজিক ব্যক্তিরাই এত দিন তাঁহাকে সুকবি বলিয়া সম্মান করিতেন, এইক্ষণ আপামর সাধারণ সকল শ্রেণির পাঠকই তাঁহার নাটনী ছন্দের কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ও নির্ভীকচিত্তে কবি বলিবে । বঙ্কিম বাবু মনস্তাত্ত্বিক উচ্চশৈলে সমাসীন রহিয়াও বাঙ্গালি ভুল ইবার মোহমত্তে কিরণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্ত

পংক্তি নিচয় পাঠ করিলেই পাঠকগণ ছ-
দয়াজম করিতে সক্ষম হইবেন।

“ এই মধুমাसे, মধুর বাতাসে,
শোন লো মধুর বাঁশী।

এই মধুবনে, জীমধুহৃদনে,
দেখ লো সকলে আসি ॥

মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাসে।

মধুর আদরে, মধুর অদরে,
মধুর মধুর হাসে ॥

মধুর শ্যামল, বদন কমল
মধুর চাহনি তায়।

কণক নুপুর, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায় ॥

মধুর ইজিতে, আমার সঙ্কটে,
কহিল মধুর বাণী।

সে অবশি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
দৈরঘ নাহিক মানি ॥

এরূপ রঞ্জেতে, পংলো অঞ্জেতে,
মধুর চিকণ বাস।

তুলি মধুকুল পর কানে তুল,
পুরাও মনের আশ ॥

গাঁথি মধুমালা, পর গোপবালা,
হাসিলো মধুর হাসি।

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী ॥

২

চল যথা বাজে, যমুনারকূলে,
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।

ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি,

জল জল পরকাশি ॥

ধীরে ধীরে রাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ।

ধীরে ধীরে শুন, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ ॥

ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল।

ধীরে ধীরে বায়, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার তুল ॥

ধীরে বাবি তথা, ধীরে কবি কথা,
রাখিবি দোহার মান।

ধীরে ধীরে তার, বাঁশিটী কাড়িবি,
ধীরেতে পুরিবি তান ॥

ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশিতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।

ধীরে ধীরে চূড়া, কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে ॥

ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।

ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবি চলে ॥

যে দেশে জয়দেবের জন্ম, বিদ্যাপতির
বিচিত্র বিলাস, এবং সর্বত্রই ত্রজবি-
লাসী শ্যামধনের বংশীধ্বনি, সেই দেশ
ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথাও এইরূপ ল-
লিত কবিতা লিখিত হইতে পারে না,
এবং সেই দেশের প্রেমালস অধিবাসী
ভিন্ন অন্য কেহই এইরূপ কবিতার প্রকৃত
রস পান করিতে সমর্থ হয় না। আমরা
মৃণালিনী ও গিরিজায়ার কল-কণ্ঠ নিঃসৃত

সুকোমল সংগীত অবগ করিয়া বহুদিন হইল এইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম যে, বঙ্কিম বাবু ইচ্ছা করিলেই একজন উৎকৃষ্ট গীতি-কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। এই কবিতাপুস্তকের প্রত্যেক কবিতাই এইক্ষণ আমাদেরিগের সেই অনুমানকে সমর্থন করিতেছে। ললিত পদ-বিন্যাস, সুললিত ছন্দোবদ্ধ, প্রাঞ্জল ভাষা এবং রসের মৃদুলহরী এই কয়টিই সাধারণতঃ গীতিকবিতার প্রধান গুণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, অন্ততঃ বঙ্গদেশের গীতি-কবিতা এই সাধারণ গুণেই প্রণয়-ব্যবসায়িদিগের মধ্যে সুপরিচিত। আমরা বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পড়িয়া

দেখিলাম, বঙ্কিম বাবুর কবিতানিচয়ে এ সকল গুণের কিছুমাত্রও অভাব নাই। তাঁহার ভাষা কখনও মুক্তার ন্যায় মধুর-হাস্যোচিত বিনোদন করে, কখনও প্রগল্ভার বঙ্কিমকটাক্ষে চিত্তবিদারণ করে;—কখনও ভাবের আবেশে আপনা হইতে ভুলিয়া ভুলিয়া পড়ে, কখনও মৃদুসমীর-সঞ্চালিত তরঙ্গিনীর ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া এবং খেলিয়া খেলিয়া যুগপৎ নরন মন মোহন করে। অভাবের মধ্যে এই দেখিলাম, ইচ্ছাতে উদ্দীপনা নাই, কিন্তু আবেশ আর উদ্দীপনা একত্র থাকিতে পারে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

১। “প্রবন্ধমালা। জ্বরজনীকান্ত” গুপ্ত প্রণীত।” এই পুস্তকে অজ্ঞদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়, প্রতাপ সিংহ, রামায়ণের সাধারণ ধর্ম ও নীতি, সংযুক্তা এবং গুরু-গোবিন্দ সিংহ এই পাঁচটি প্রবন্ধ বিনিবেশিত হইয়াছে, এবং এই পাঁচটি প্রবন্ধই আমাদেরিগের বিবেচনায় ছাত্রশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার বাঙ্গালা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থখানি ছাত্ররসি পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক

মধ্যে পরিগৃহীত হইলে, আমাদেরি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার দর্শিবে।

২। “পাঠমঞ্জরী। নীতিপূর্ণ পদ্যাদ্যময় সরল পাঠ।” এখানিও রজনী বাবুর দ্বারা প্রণীত হইয়াছে, এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, রচনার প্রাঞ্জলতা এবং বিষয়ের সারগর্ভতা এই উভয় গুণেই সেই উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে। ইহা চলনসহ পুস্তক অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্টতর।

জীবনপ্রভাত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা জয়সিংহ।

“নরকুলোত্তম তুমি———

বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!”

যধুবৃন্দন দত্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব শায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্ত সিংহ উভয়কেই অকর্ণগণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোরাজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায়, সম্রাট অবশেষে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করিয়া অমরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলাওয়ার খাঁ নামক একজন নিকুমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেষ-যোগে জয়সিংহ পুনরায় উপরিভূত হইলেন। শায়েস্তাখাঁর ন্যায় নিকৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, তিনি দিলাওয়ারখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, ও অগ্নি সিংহগড় বেষ্টিত করিয়া

রাজগড় পর্যন্ত সৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাধুষ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দণ্ড প্রতাপ ও পরাক্রম তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না,—তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বর্ণায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভয়োদায় হইলেন, ও বাব বার জয়সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে জানিতেন, এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশেষ মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ

করিয়া বলিলেন “ দ্বিজবর ! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম ; রাজা শিবজীকে জানাইবেম যে দিল্লীর সম্রাট তাঁহার বিক্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সে জন্য আমি বাক্যদান করিতেছি । আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না । ” রঘুনাথ এই আশ্বাসবাক্য শিবজীর নিকট লইয়া গেলেন ।

ইহার কএক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন গ্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল—

“ মহারাজের জয় হউক ! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন । ”

সভাসদ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন । বহু সমাদরপূর্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরান্তরে আনিলেন, ও রাজ্যগদিতে আপনার দক্ষিণ দিকে বসাইলেন ।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন । রাজা জয়সিংহ কণেক মিফলাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, “ রাজন্, আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন,

এই শিবির আপনার গৃহের মায় বিবেচনা করিবেন । ”

শিব । “ রাজন্, এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ ? রঘুনাথ পশু দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে । আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি । ”

জয় । “ হাঁ, রঘুনাথ নায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে । রাজন্, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিব, দিল্লীস্থর আপনার বিক্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত করিব, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না । ”

এইরূপে কণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল ; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না ; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ভাগ করিলেন, হস্তে গাণ্ডুল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল ।

বলিলেন—“ রাজন্ ! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুর হইয়া থাকেন, সে খেদ নিশ্চয়োজ্জ্বল ! আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না । অদ্যই রজনীতে আমার আশ্রয়লা

হইতে অর্থ বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন, আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত্র আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম কদাচ বিশ্বরণ করিব না।”

রাজা জয়সিংহের এতদূর সাহস্যা-দেখিয়া শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—

“মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দু-ধর্মের জন্ত, যে হিন্দুগো-রবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহত্ববান, সে উন্নত উদ্দেশ্য, অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনায় শিবিরে আসিয়াছিলাম, সে জন্তও এখন খেদ করিতেছি না।”

জয়। “তবে কি জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছেন?”

শিব। “বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত-গাইতে ভালবাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি সাহসী, সত্য ও ধর্ম থাকে তবে রাজপুত্র-শরীরে আছে। এ রাজপুত্র কি বরনাধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজ জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?”

জয়। “ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত

দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুত্রেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যতদিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; বিধির নির্বন্ধে পরাধীন হইয়াছেন। মেও-য়ারের বীরপ্রবর প্রাচীনায়নীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনের ও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।”

শিব। “আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, সাহাদের সহিত আপনাদিগের এতদিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্ত?”

জয়। “যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিরা গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি; যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।”

শিব। “সকলের নিকট সকল সত্য কি সত্য পালনীয়? সাহাদরা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্মের বিক্কাচারী, তাঁহাদের সহিত কি সত্যসঙ্গ?”

জয়। “আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রের ইতিহাস পাঠ করুন, সহস্র বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন কখনও সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে আপদে, সর্বদা সত্যপালন করিয়াছেন। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা

নাই, কিন্তু সভাপালনের গৌরব আছে । দেশে বিদেশে, মিত্র মণ্ডো, শত্রু মণ্ডো, রাজপুত্রের নাম গৌরবাধিত । ক্ষত্রিয়রাজ টোডর মল্ল বলদেণ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িয়া পর্য্যন্ত দিল্লীধরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন, কেহ কখনও স্তম্ভ বিশ্বাসের বিকলচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকটও যাহা সভা করিয়াছিলেন তাহা পালন করিয়াছিলেন । মহারাষ্ট্ররাজ ! রাজপুত্রের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুত্রের কথা লঙ্ঘন হয় নাই ।”

শিব । “মহারাজ ! যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রহরী ; তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিকক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ।”

জয় । “যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই । তাঁহার মাড়গারদেশ মক্কািমগ, তাঁহার মাড়গারী সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই । যদি যশোবন্ত সেই মক্কািমতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সহায়ে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার,— হিন্দুধর্ম রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম । যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্মান করিতাম । অথবা

যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আদেশ ও স্বার্থ রক্ষার্থে বীরপ্রবর প্রতাপের ন্যায় সেই মক্কািমতে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম ! কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীধরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্যসাধনে ত্রুটি হইয়াছেন । সে কার্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ত্রুটি গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য হয় নাই ; যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি মান করিয়াছেন । তিনি সিপ্রানদী তীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য করিতেন না ।”

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত নহেন ! কণেক পরে আবার বলিলেন,—

“হিন্দুধর্মের উন্নতি চেষ্টা কি গর্হিত কার্য ? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য ?”

জয় । “আমি তাহা বলি নাই । যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য ত্যাগ করিয়া, জগতের সাক্ষাতে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, আপনার সহিত যোগ দিলেন না ? আপনি যেতুপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জন্য ? সম্রাটের কার্যে থাকিয়া গোপনে বিকলচরণ করা কপটাচরণ । ক্ষত্রিয়রাজ ! কপটাচরণ কি ক্ষত্রোচিত কার্য ?”

শিব । “তিনি আমার সহিত প্র-

কালো ঘোগ দিলে দিল্লীর অন্য সেদা-
পতি পাঠাওতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে
পরাস্ত ও হত হইতাম।”

জয়। “বুদ্ধে মরণ অপেক্ষা কত্রি-
য়ের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?
কত্রিয় কি বুদ্ধে মরণ ডরে?”

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল তিনি
বলিলেন,—

“রাজপুত! মহারাজীরেও মৃত্যু
ডরে না, যদি এই অকিঞ্চৎকর জীবন
মান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়,
হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত
হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্তে
এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজ-
পুত! তুমি অব্যর্থ বর্ষা ধারণ কর, এই ক-
দয়ে আঘাত কর, মহাসাবদনে প্রাণত্যাগ
করিব। কিন্তু যে হিন্দু গৌরবের বিষয়
বালাকালে স্বপ্ন দেখিতাম, বাহার জন্য
শত বুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত
করিলাম, এই বিংশ বৎসর পার্বতে, উপ-
ত্যাকার, শিবিরে, শত্রু মধ্য, দিবসে,
সায়ংকালে, গভীর নিশীথে, চিন্তা করি-
য়াছি, আমি মরিলে সে হিন্দুধর্মের, সে
হিন্দুস্বাধীনতার, সে হিন্দু গৌরবের কি
হইবে? যশোবন্ত ও আমি প্রাণ দিলে
কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে?”

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি
শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন,
কিন্তু পূর্ববৎ স্থিরভাবে দীর্ঘে দীর্ঘে উত্তর
করিলেন—

“সত্যপালনে যদি সমাজে হিন্দু-
ধর্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে?
বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতাবীজ অকু-
রিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে
হইবে?”

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেককণ
পর পুনরায় দীর্ঘে দীর্ঘে বলিলেন—“ম-
হারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য
জান করি, আপনার ন্যায় ধর্মজ্ঞ তীক্ষ্ণ-
বুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই,
আমি আপনার পুত্রতুল্য। একটি কথা
জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সং-
পরামর্শ দিন। আমি বালাকালে যখন
কঙ্কপ্রদেশের অসংখ্য পার্বত ও উপত্য-
কার ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে নানা-
রূপ চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদয় হইত।
ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে
স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করি-
তেছেন, যেন দেবালয়সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে
ব্রাহ্মণদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে, গোব-
ৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্মবিরোধী মুসল-
মানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উ-
ত্তেজনা করিতেছেন। আমি বালক ছি-
লাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে খজা
গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় ক-
রিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম।
যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি,—হিন্দু
নামের গৌরব, হিন্দুধর্মের প্রাধান্য, হিন্দু
স্বাধীনতা সংস্থাপন! সেই স্বপ্নবলে দেশ
জয় করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য

দিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি। কত্রিরাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্ন যাত্রা? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন।”

বহুদূরদর্শী, ধর্মপরায়ণ, রাজা জয়-সিংহ কণেক নিমন্ত্রণ হইয়া রহিলেন; পরে গভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন “রাজন! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিস্মৃত নাই, আমি শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট, তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রাম সিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত্র স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! তোমার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে; চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে যত চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না,—যত্ন, চেষ্টা সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তার জর্জরিত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে, এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাজ্যীয় জীবন অক্লান্ত হইতেছে, মহারাজ্যীয় যৌবনভেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্রাবৃত হইবে। শিবজী! তোমার স্বপ্ন

স্বপ্ন নহে, ভাবানী তোমাকে বিখ্যাত উজ্জ্বল করেন নাই।”

উৎসাহে, আনন্দে, শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগল প্রাসাদের একমাত্র শুভ স্বরূপ রহিয়াছেন কি জ্ঞাত?”

জয়। “সত্যপালন কত্রিরধর্ম, যাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসামান্য সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।”

শিব। “ভাল, সত্য পালন কখন, কপটাচারী আরংজীবের নিকট ও আপনার ধর্মচরণ দেখিয়া দেবতারও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরী দ্বারায়ণও স্বার্থের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিকঙ্কচরণ করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিম্ননীর?”

জয়। “কত্রিরাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিম্ননীর, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিম্ননীর। মহারাজ্যীয়দিগের গৌরব-রক্ষা অনিবার্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ রক্ষা পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আ-

যার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্যাণ তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জ লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখযুদ্ধ কখনই শিখিবে না।^{১০} যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বালাগুরু, গুরু ন্যায় ধর্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মহারাজারদিগকে সম্মুখ-রণশিক্ষা দিন, চতুরতা বিন্মৃত হইতে বলুন আপনি হিন্দু-শ্রেষ্ঠ। আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শত শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাজার শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্যের ফল বহুকালব্যাপী,—বহুদেশব্যাপী হইবে। মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বুদ্ধ বহুদর্শী রাজপুত্রের কথা গ্রহণ করুন।”

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন,—

“আপনি গুরু গুরু! আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য! কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব?”

জয়। “জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্যাণ তোমার জয় হইতে পারে; অদ্য তুমি আরংজীবের

অধীন হইলে, ঘটনাক্রমে কল্যাণ স্বাধীন হইতে পার।”

শিব। “জগদীশ্বর তাহাই কখন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা রাখা। এবং ভবানী হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

জয়সিংহ জেয়ং হাসিয়া বলিলেন—
“শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এরূপ শরীর কত দিন থাকিবে?—কিন্তু যতদিন থাকিবে সতাপাশনে বিরত হইবে না।”

শিব। “আপনি দীর্ঘজীবী হউন।”

জয়। “শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন;—আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব দিল্লীর এরূপ সেনা বিদ্রোহাচরণ করিবে না;—কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাজার গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অবিচল্য! স্বদেশের বচন গ্রাহ্য কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রাহ্য কর, মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দুতেজ আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে হিন্দুর গৌরব নাম, তোমার গৌরব নাম, প্রতিধ্বনিত হইবে।”

শিবজী অশ্রুপূর্ণ লোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “ধন্য-জান। আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মস-

মর্পণ করিয়াছি ; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পু-
নরাগ স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্র-
বর ! আর একদিন আপনার সহিত সা-
ম্মাং করিব, আর একদিন পিতার চরণে-
পাশ্বে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব । ”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দুর্গবিজয় ।

“ চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিদ্ধ যথা স্বস্থি বায়ুসহনির্ঘেষে । ”

মধুসূদন দত্ত ।

শীত্বেই সন্ধিস্থাপন হইল । শিবজী
মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ
জয় করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন,
বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে
স্বাভিমান্য দুর্গ অধিকার বা নির্মাণ করি-
য়াছিলেন তাহার মধ্যেও ২০টী ফিরাইয়া
দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আবংজী-
বের অধীনে জায়গীর স্বরূপ রাখিলেন ।
যে প্রদেশ তিনি সত্ৰাটকে দিলেন তাহার
বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ ক-
তক প্রদেশ সত্ৰাট শিবজীকে দান করি-
লেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শ-
জুজী পাঁচ হাজারীর মনসবদারপদ প্রাপ্ত
হইলেন ।

শিবজীর সহিত বুদ্ধ সমাপ্তির পর রাজা
জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য হস্বে করিয়া
সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার

যত্ন করিতে লাগিলেন । শিবজীর পিতা
বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থা-
পন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন
করেন নাই, কিন্তু শিবজীর বিপদকালে
বিজয়পুরের মুলতান সন্ধি বিন্যাসন হইয়া
শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কচিত
হয়েন নাই । সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়-
সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের
মুলতান আলী আদিলশায়ের সহিত যুদ্ধা-
রম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউনী সৈন্য-
দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করি-
লেন ।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সম্ভাব
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও পর-
স্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল ।
উভয়ে সর্বদাই একত্র থাকিতেন, ও বৃদ্ধ
পরস্পরের সহায়তা করিতেন । বলা বা-
হুল্য, যে শিবজীর একজন তরুণ ছাবেল-
দার সর্বদাই জয়সিংহের একজন পুরো-
হিতের সদনে যাইতেন । নাম বলিবার
কি আবশ্যক আছে ?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দনও
ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগি-
লেন, সর্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন :
রঘুনাথও যখন পারিতেন পুরোহিতের
আবাসস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন ।
এরূপ অবস্থায় রঘুনাথ ও সন্তস্বর সর্বদাই
দেখা হইত, সর্বদাই কথা হইত, উভয়ের
জীবন, মন, প্রাণ প্রায়শঃ প্রায়শঃ অনির্ব-
চনীয় আনন্দসহরীতে প্রাণিত হইতে লা-

দিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযু অপেক্ষা কে স্থখী? সরলচিত্ত জনার্দন তাহা-দিগের স্বদয়ের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন তাহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা কহিতে দেখিতেন, কিন্তু রঘুনাথ “বাড়ীর ছেলে”, নিষেধ করিতেন না। রঘুনাথও জনার্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কএক মাসের মধ্যে বিজয়পুর অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পর্বত দুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্বে শত্রুকে তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্তেরাও পূর্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটই তাহার শিবির ছিল, সাংরংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময়, গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে কত্মমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমতে দুর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর কত্মমণ্ডল দুর্গ নির্মিত হইয়াছে। পর্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, একগনে বুদ্ধকালে সেই পথ কল্প হইয়াছে;

অত্যাশ্রয় দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলাভাঙ্গি পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্বত আরোহণ করিবার আদেশ দিলেন; তাহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্বত-বিভালের ন্যায় সেই রক্ষ ধরিয়া, শৈল হইতে শৈলাবৃত্তে লক্ষ দিতে দিতে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও রক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও বা লক্ষ দিয়া, সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ। সহস্র সেনা এই রূপে পর্বত আরোহণ করিতেছে, কিন্তু শব্দমাত্র নাই, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশীথে কেবল নৈশবায়ু এক একবার সেই পর্বত-রক্ষের মধ্য দিয়া মর্ম্মর শব্দে বহিয়া যাইতেছে।

অন্ধকৈ পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক। চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন; শত্রুরা কি তাহার আগমন-বার্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্যাস্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুপ্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে যে অন্ধকারে আবৃত

হইয়া কেহ ভূর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। ক্ষণকাল চিন্তাকুল হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে রক্ষণ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাক্ষীয়াগণ সেই পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় রক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্বতে উঠিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর একটি পবিত্র স্থানের নিকট আসিয়া পড়িলেন, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্য যাইলে, উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন; রক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে দেখিলেন প্রায় ১০০ হস্ত পরিমাণ স্থানে রক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় রক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই ১০০ হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে ভূর্গে আসিবার পূর্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের স্মৃতিবিজ্ঞান মাতুলী যোদ্ধা

তন্নজী মালিকীকে ডাকাইলেন; দুইজনে সেই রক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে তন্নজী চলিয়া যাইলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শরীর সিক্ত, কেশ ও সমস্ত পরিচ্ছদ হইতে জল পড়িতেছে। তিনি শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিলেন; শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তাঁহাই ইউক, অন্য উপায় নাই।” তিনি পুনরায় সেনাদিগকে চলিবার আদেশ দিলেন, তন্নজী অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

রক্ষির জল অবতরণ দ্বারা এক স্থানে প্রস্তুত ক্ষয় পাইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্বে উচ্চ, মধ্য গভীর, রক্ষির সময় সেই গভীর স্থান জলে পরিপূরিত হইত, এখনও তাঁহাতে জল আছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে পর দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় সম্ভবতঃ শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল ও সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই স্রোতের মধ্য দিয়া পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে অনন্তনাদে পর্বতজল অবতরণ করিতেছে, সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, সেই জল

ভাদ্রিয়া সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল ! অচিরে উপরিস্থ রক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহস্রা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষস্থলে তীর লাগিয়াছে ! আর একটা তীর, আর একটা, আরও বহু সংখ্যক তীর ! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য জলপ্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য রক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীর নিক্ষেপ থামিয়া গেল, শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা সন্দেহ করিয়াছে মাত্র, এখনও স্পর্শ বুঝিতে পারে নাই। তিনি দুর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা আলোকের স্থলে দুই তিনটা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরীগণ এদিক ওদিক ঘাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবল মাত্র ৩০০ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে !

শিবজীর চির সহচর তন্নজী মালভীও এ সমস্ত দেখিলেন ; ধীরে ধীরে বলিলেন “রাজনু ! এক্ষণ ও নামিয়া যাইবার সময় আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য

হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।” বিপদরাশির মধ্যে শিবজীর সাহস ও উৎসাহ সহস্র গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। তিনি বলিলেন “জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য কস্মণ্ডল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।” শিবজীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, স্বর স্থির ও অকম্পিত, তন্নজী দেখিলেন অত্র পরামর্শ রূপা, বলিলেন “বিপদের সময় প্রতুপার্শ্ব ভিন্ন তন্নজীর অস্ত্র স্থল নাই, অগ্রসর হউন।”

শিবজী নিম্নদিকে সেই রক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে তুলাইবার জন্য এক শত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোঁল করিতে আদেশ করিলেন। এক দণ্ড কালের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে গোঁল শুনা যাইল, সেই দিক হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকলে সেই দিকে ধাবমান হইল। এ দিকে প্রাচীরোপরি যে দুই তিনটা আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল। তখন শিবজী বলিলেন “মহারাজীয়াগণ ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও ! তন্নজী ! বাল্যকালের মৌহুতের পরিচয় অত্র প্রদান কর।” পরে রঘুনাথজীউকে পার্শ্বে দেখিয়া বলিলেন “হাবেলদার ! এক

দিন আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, অদ্য বাঁচাও ।” প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইলেন, অচিরে ভূর্গপ্রাচীরের নিকট পৌঁছাইলেন । রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ষত রক্ষকের ভিতর দিয়া মর্ম্মর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে ।

কদ্রমগুলের প্রাচীর হইতে শিবজী পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর এক জন প্রহরী ;—রক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে । একজন মাউলী নিঃশব্দে একটা তীর নিক্ষেপ করিল,—হতভাগা প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল ।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত লোক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল ; শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন, আর লুক্কায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, মৈত্রেয়কে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন ;

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের “ হর হর মহাদেও ” ভীষণনাদ গগনে উদ্ভিত হইল, এক দল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল, আর এক দল রক্ষকের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্ৰহস্তে প্রাচী-

রারোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল । মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া “ আল্লাহু আকবর ” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কুম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্ষা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া আসিয়া রক্ষমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল ।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও রক্ষমধ্যে ভীষণকাণ্ড হইয়া উঠিল । প্রাচীরের উপরস্থ মুসলমানেরা সবল বর্ষাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ অব্যর্থ তীর সঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল । রাশি রাশি মৃত দেহ প্রাচীর-পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধৃগণ সেই মৃত দেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া খজা বা বর্ষা চালন করিতে লাগিল, রক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারীদিগের শরীর রঞ্জিত হইয়া যাইল । শত শত মুসলমানেরা রক্ষের ভিতর পর্ষত আসিয়াছিল ; শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লক্ষ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, পবলপ্রতাপ আফগানদেরাও যুদ্ধে অপরূপ নহে, রক্তশ্রোত সেই পর্ষত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল । রক্ষের অন্তরালে ঝোপের ভিতর, শিলারশির পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর ও বর্ষা সঞ্চালন করিতে লাগিল, রক্ষপত্র ও

রক্ষাধার ভিতর দিয়া অব্যাহত স্রোতে সেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্রীণতর করিতে লাগিল, আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের ঘন ঘন সিংহনাদে ও আত্মদীনের আত্মনাদে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে “শিবজী কি জয়” এইরূপ বজ্রনাদ উদ্ভূত হইল। মুহূর্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, মৃতদেহাশ্রিত উপর দাঁড়াইয়া, রক্তাধ্বত বর্ষার উপর ভর দিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা এক লক্ষ ক্রমশঃ প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন; তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও দুই একজন প্রহরীকে বর্ষা ও খজা চালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে “শিবজী কি জয়” শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবেলদার।

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎক্লেশ লেচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘ মূর্তিরদিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্ৰাক্ষর করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদঘর রক্তে আধ্বস্ত, বিশাল বক্ষের চর্মে দুই একটা তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ হস্তে রক্তাধ্বত, অতি দীর্ঘ বর্ষা, উজ্জল নগ্ন গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকেশে আবৃত। শত্রু-

রাও পোতের সম্মুখে উর্ধ্বাশ্রিত নায়, এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মুহূর্তের জন্য সচকিতে সরিয়া গেল, সেই দীর্ঘ বর্ষাধারীর নিকট সহসা কেহ আসিল না, মুহূর্তের জন্য বোণ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্ষা হস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকাল মাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল; পরেই আফগানগণ, শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া, চারিদিক হইতে বেগে আসিতে লাগিল; রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল ক্রমশঃ ঘেরা নায় আসিয়া বেষ্টিত করিল। রঘুনাথ খজা ও বর্ষাচালনে অবিহীন, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়।

কিন্তু মাউলীগণও ক্ষান্ত রহিল না। রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সকলে সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল; বাণেশ্বর নায় লক্ষ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, দশ পঞ্চাশ, দুই তিন শতজন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খজাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল। সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহার মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না কিন্তু তখনও সিংহবীর্য প্রকাশ করিয়া গতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

সেই তুমুল হতাকাণ্ডের মধ্যে আর একটা বজ্রনাদ উদ্ভূত হইল; শিবজী ও তন্নজী প্রাচীর হইতে লক্ষদ্বিগু ভূর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুঝিল, আর এখানে যুদ্ধের আবশ্যকনাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইল। পাঠানগণ প্রায় হত কি আহত, মহারাক্ষীরদিগের পশ্চাৎকাবন করিতে অসমর্থ !

শিবজী বিদ্যুৎ-গতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত, সহস্র মহারাক্ষীর বর্ষাঘাতে প্রাচীর ও দ্বারদেশ কম্পিত হইল, কিন্তু ভাঙ্গিল না। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাক্ষীরেরা সেই প্রাসাদ বেষ্টিত করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন “ দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব, প্রাসাদবাসী সকলে বিনষ্ট হইবে। ” নির্ভীক পাঠান ভিতর করিলেন “ অগ্নিতে দগ্ধ হইব, কিন্তু কাফেরের সন্মুখে দ্বার খুলিব না। ”

তৎক্ষণাৎ শত মহারাক্ষীর মশাল আনিয়া দ্বারে ও জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গীগণ তীর ও বর্ষা নিক্ষেপে প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, শত মহারাক্ষীর মশালহস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গাংক্ষ, পরে কড়িকাট, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। দুর্গের উপরে নৌচের পল্লিগ্রামে, বহুদূর পর্যন্ত পর্বতে ও উপত্যকায় সেই আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে !

বীরের বাহা সাধা, পাঠান কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সম্ভ্রম যোদ্ধার সহিত বীরেরত্নায় মরিতে বাকি ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎ খাঁ ও সঙ্গীগণ লক্ষ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এক এক জন এক এক মহাবীরেরত্নায় খজা চালনা করিতে লাগিলেন, সেই খজা চালনায় বহু মহারাক্ষীর হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টিত করিল, তাঁহারা শত্রুর মধ্যে চন্দ্রকান্দ পাক্রম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন হত হইলেন। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, তখনও সিংহবীর্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়াছে, চারিদিকে খজা উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর

আদেশ প্রদত্ত হইল “কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।” ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে খজা কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাজীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্যাস করিতেছে এমন সময় শিবজী দেখিলেন দুর্গের অপর পার্শ্ব হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় ছয়শত আফগান সৈন্য রাশীকৃত হইয়া আসিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্ব পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেইদিকে গোলকরাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল; ধূর্ত মহারাজীয়েগণ ক্ষণেক রক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্বতের তল পর্যন্ত সেই একশত মহারাজীয়েদের পশ্চাৎপদ করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্বত ও উপত্যকা উদ্ভীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কপ্ত হইল। শিবজী অল্প সংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দু-

র্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে অপর পার্শ্ব হইতে পাঁচ কি ছয়শত যোদ্ধা আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

স্বতীক্ষণ নয়নে দেখিলেন দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্ক্যাপেক্ষা দুর্গমস্থান। চারিদিকে পরিখা, তাহার পর প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। তাহার মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ জুলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর রাশি হইয়াছে, তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্তের মধ্যে দেখিলেন অধিক সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর হইতে পারে না।

মুহূর্তের মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন; স্বয়ং তন্নজী ও দুইশত সৈন্য সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্ব তিরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার গবাক্ষের পার্শ্ব পার্শ্ব তিরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্ষাধারী যোদ্ধাগণকে সন্নিবেশিত করিলেন; কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্য করিয়া তন্নজীকে কহিলেন “এই আমাদের শেষ উপায়, কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্বেই বোধ হয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, অঙ্ককারে সহসা আক্রমণ করিলে তাহার ভয় দিয়া পলায়ন করিবে। তন্নজী, দুইশত সৈন্যসহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর,

আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি। ”

তন্নজী। “ তন্নজী এখানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাজার পুত্র ও এখানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজ! সম্মুখ যুদ্ধে সকলেই অপটু, কিন্তু যদি এস্থান আক্রান্ত হয় তবে আপনি না থাকিলে কাহার কৌশল-বলে এ প্রাসাদ রক্ষিত হইবে? ”

শিবজী দ্বিধা-হাস্য করিয়া বলিলেন “ তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধলুপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু না, এই স্থানেই আমার থাকা কৰ্তব্য। আমার হাবেলদারদিগের মধ্যে কে তিন শত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানগণকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে? ”

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একে বারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকারদিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন “ হাবেলদার! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাজতে অনুরোধ ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর। ”

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত নিঃ

নমাইয়া তিন শত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন।

শিবজী তন্নজীর নিকে চাহিয়া বলিলেন “ ঐ হাবেলদার রাজপুত জাতীয়; উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার কখন বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে না, কেবল যুদ্ধকালে, বিপৎকালে, সেই সাহস ও বিক্রম কার্যে পরিণত করে! এক দিন পুনর আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর,—আমি এপর্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্যা রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচিত পুরস্কার পাইবেন। ”

রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই; একেবারে তিন শত মাউলীর সহিত বর্ষা-হস্তে দুর্দমনীয় ভীষণ বেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিশং হস্ত দূর হইতে সকলে অব্যর্থ বর্ষা নিক্ষেপ করিল, পরে “ হর হর মহাদেও ” ভীষণ নাদে ব্যাঘ্রের মত লক্ষ দিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িল। সে বেগে অমাত্মিক ও অনিবার্য, যুদ্ধের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত আফগানসৈন্যীও ছারখার ও ভিন্ন হইয়া গেল, উন্নত মাউলীদিগের অব্যর্থ ছুরিকা ও খজা

আঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল ।

কিন্তু আফগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অপটু নহেন ; জেগীচুত হইয়াও হটিল না, পুনরায় উঠেঃস্বরে যুদ্ধনিবাদের করিয়া মাউলীদিগকে বেষ্টিত করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে যে দৃশ্য দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য । নিবিড় অন্ধকারে শত্রু মিত্র দেখা যায় না, আপন হস্তের অসি ভাল দেখা যাইতেছে না, মৃতদেহে সেই স্থান পরিপূর্ণ হইল, রক্ত স্রোতরূপে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বর্ষা, খজা, ছুরিকা অব্যাহত পরিচালিত হইতেছে, যুদ্ধনিবাদের মেদিনী ও গগন পরিপূর্ণিত হইতেছে ; বোধ হয় যেন এ মনুষ্যের যুদ্ধ নহে, শত সহস্র রক্তলোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছে ।

ঘন ঘন ভীষণনাদে বেকনকারী আফগানগণ মুহূর্ত্তঃ সেই তিন শত যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব যোদ্ধাগ্রেনী কম্পিত হইল না । সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জনে মুসলমানেরা সেই বীর-প্রাচীরে আঘাত করিতেছে, কিন্তু পর্কততুল্য সেই বীর প্রাচীর অনায়াসে সে আঘাত প্রতিহত করিতেছে । মৃতের শরীরে চারিদিক প্রাচীরের ন্যায় হইয়াছে, মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর বেগে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে শ্রেণী ভিন্ন হইল না ।

সহস্রা “শিবজীকি জয়” এইরূপ বজ্রনাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দুর্গের তিন চারি স্থলে রুহৎ রুহৎ অট্টালিকা অগ্নিতে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও সেই দিক হইতে যুদ্ধনিবাদের করিয়া আরও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিতেছে । যে একশত জন মহারাষ্ট্রীয় ধূর্ততার সহিত আফগান সৈন্য দুর্গের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আফগানগণ দুর্গে প্রত্যাগমন করিলে তাহারাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ একগুণে সেইদিক হইতে আসিয়া কয়েকটি ঘূহে অগ্নিদান করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল । আফগানদিগের দুর্গ শত্রু হস্তগত হইয়াছে, প্রাসাদ জ্বলিয়া গিয়াছে, অন্যান্য অট্টালিকা জ্বলিতেছে, সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু, মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহার করিয়াছিল, আর পারিল না, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিল । রঘুনাথ তখন উঠেঃস্বরে আদেশ দিলেন ‘পলাতককে বন্দী কর, হত্যা করিও না ; শিবজীর আদেশ পালন কর ।’ পলাতকগণ অস্ত্র বিসর্জন করিয়া প্রাণ যাচুঞা করিল,—তঁাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইল ।

তখন রঘুনাথ দুর্গের অগ্নি নির্বাণ করিয়া, প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন ; গোলা বাকদ ও অস্ত্র-শস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত ক-

রিলেন, বন্দীদিগকে একটি ঘরে কঙ্ক ক-
রিয়া রাখিলেন ; দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত
স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া
শিবজীর নিকট যাইয়া শির নমাইয়া স-
মস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

উষার রক্তিমাজ্জটা পূর্ব দিকে দৃষ্ট

হইল ; প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু
ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল ; সমস্ত
দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ ! যেন এই সুন্দর
শান্ত পাদপমণ্ডিত পার্বত্যশেখর যোগী
ঋষির আগ্রহ,—যেন যুদ্ধের পৈশাচিক
রব কখন এখানে প্রুত হয় নাই !

কে গাহিল !

১

কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—

ছুটিল সঙ্গীত-স্রোত ভাঙ্গায়ে গগণ,

একি—এথে ভেসে যায় হৃদয় আমার,

নিশীথে কে করে হেন সুধা-বরিষণ !

আবার—আবার গায়

পুনঃ চিত্ত ভেসে যায় ;

নারীকণ্ঠ ? বটে তাই,

ছুটিয়া গবাক্ষে যাই—

দেখিলাম, কি দেখিই কি বলিব ছায়া,

স্থির-সৌদামিনী-লতা পড়িয়া ধরায় !

২

জ্যোৎস্না-প্লাবিত দূর সরসির তটে,

কৌমুদী-কিরণ-স্রোত পাবাগ সোপানে,

পড়িয়া প্রতিমা খানি যেন চিত্রপটে

বিস্তৃত নয়ন দুটি গগণের পানে।

বাম গণ্ড বাম করে,

বাতাসে কুণ্ডল নড়ে,

নিশিগন্ধা বসন্তের

কিছা শশী শরদের—

ললিত সপ্তম গায় সঙ্গীত লহরী
পীযুষ প্রবাহে মত্তা নীরব শরীরী।

৩

আবার সঙ্গীত-স্রোত উঠিল উথলি,

আবার প্রকৃতি-চিত্ত উঠিল আকুলি ;

নাচিল সরসিঙ্গল, নাচিল পাবন,

নাচিল শাখায় পাতা লতায় প্রসূন।

হরষিত নীলাশ্বরে

হাসিয়া কিরণ ঝরে,

মরি কি গভীর তান,

আকুল করিল প্রাণ ;

অবসে মূহুর্ত খাদে গড়ায়ে পড়িল,

হৃদয়ের স্রোতসম সঙ্গীতে মিশিল।

৪

শুনিয়াছি বসন্তের কোকিল-কুঞ্জন,

শুনিয়াছি বাঁশরীর মধুর নিকর,

বসিয়া তবুর তলে, মাথার উপরি

ছুটিয়াছে পাপিয়ার সঙ্গীত লহরী,

হাসিপূর্ণ বিষাদধরে

মর্তকী মধুর স্বরে

গাহিয়াছে মূলতান,
শুনিয়াছি সেই গান
কিন্তু হেন উষাদিনী জীবন্ত রাগিণী,
শুনি নাই হেন গীত চিত্ত-বিপ্লাবিনী।

৫

শুনিলাম—কিন্তু কত শুনিবনা আর
সুধুই হারানু চিত্ত সঙ্গীত অবগে,
সুখের পিপাসা চিত্তে কেন দুর্গ্নিবার,
সুখের সামগ্রী কেন দুর্লভ জীবনে?

ইচ্ছা করে দিবানিশি
এই গবাক্ষেতে বসি,
ওই সুরমধুর গান
শুনিয়া যুড়াই প্রাণ,

বুঝেনা স্বাধীন পাখী পাখিকের মন,
যুড়ায়ে আপন চিত্ত করে পলায়ন।

৬

শুনিব না আর যদি গাহ একবার
হৃদয়-কবাট আমি করি উন্মাদন,
গাহ তুমি বরষিয়া সুধা-পারাবার,
রেখে দেই চিত্তে আমি করিয়া বন্ধন;

কি শয়নে কি স্বপনে
উথলি উঠিবে প্রাণে,
বাজিবে তরঙ্গ বুকে
উঠিবে উথলি সুখে,

তুলিয়া সপ্তমে তুমি গাহ বিহঙ্গিনী
বেঁধে রাখি বন্ধঃস্থলে তব প্রতিধ্বনি।

শ্রীঃ—

ভারবি।

অসীম বারিধি-হৃদয়ে যেমন অনন্ত রত্ন-
বাজি, অমল কবিহৃদয়ে সেইরূপ অনন্ত
ভাবরাশি। বারিধি-হৃদয়ের রত্ন যেমন বহি-
র্ভূগতে অপূর্ণশোভা বিকাশ করে, কবি-
হৃদয়ের ভাব সেইরূপ অন্তর্ভূগতে স্বর্গীয়
সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া থাকে।
কবির হৃদয়-সাগর অনন্ত মাধুর্য্যে আতট
পরিপূর্ণ। ইহাতে কোথাও পঙ্কের কা-
লিমা নাই, ফেণের আবিলতা নাই, এবং
পার্থিব বিকারের মলিনতার সঞ্চার নাই।
তুহার-ক্ষেত্রের অসীম বিস্তারে যেমন একই
ধবলতা হাসিতে থাকে, নিরন্তর গগণের
অনন্তবক্ষে যেমন একই নীলিমা খেলিয়া

বেড়ায়, কবির হৃদয়ে সেইরূপ একই পবি-
ত্রতা, একই মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।
কবি সকলস্থানেই মধুর ও উদাত্ত ভাবের
বিকাশ দেখিতে পান। তাঁহার হৃদয়
ক্ষুদ্রপ্রাণ সফরীর ন্যায় অল্পমাত্র জলেই
নাচিয়া বেড়ায় না, উহা অগাধ জলসঞ্চায়ী
রোহিতের ন্যায় গভীর জলেই থাকিতে
ভালবাসে। সাধারণে যাহা দেখিলে
বিস্ময় ও আতঙ্কে জড়ীভূত হয়, ভয়ে শু-
কায় যাহা এবং ভাবনায় ত্রিস্তম্ভ হইয়া
পড়ে, কবি তাহাতে অপূর্ণ সৌন্দর্য্যের
অপূর্ণ আভাস দেখিয়া অসীম আনন্দমা-
গরে নিমগ্ন হইয়েন। তরঙ্গ-লীলাময়ী তর-

দ্বিনীর বিকট হান্য, জলধির প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, অভ্রংলিহ গিরিবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এবং স্থাপদসমাকীর্ণ গহন বনের ভীষণ পরিপূর্ণতার তাঁহার হৃদয় আতঙ্ক, ভয় ও ভাবনায় অবশ হইয়া পড়ে না। তিনি প্রকৃতির এই চিত্রের অভ্যন্তরেও ভীমকাস্ত সৌন্দর্যের রেখাপাত দেখিয়া আনন্দরস উপভোগ করেন, এবং নিজের হৃদয়-স্রোত সাধারণের অগম্য, অচিন্ত্য, ও অপ্রাপ্য অমৃতপ্রবাহে মিশাইয়া দিয়া সারস্বতীশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবি এই সারস্বতী শক্তির রূপাবলে নরলোকে থাকিয়াও দেবলোকের পবিত্র সূত্র সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে পবিত্রসলিল জাহ্নবীর খরস্রোতের ন্যায় নিরন্তর অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। যক্ষ-পীয়র ও মিন্টন এক সময়ে এই অমৃত প্রবাহে ইংলণ্ড প্লাবিত করেন, এবং কালিদাস ও ভবভূতি এক সময়ে এই অমৃত ধারায় ভারতের বিশুদ্ধ হৃদয় শীতল করিয়া লোকের হৃদয়গত অজ্ঞার পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইলেন। বহুযুগ অতীত হইয়াছে, বহুবৎসর অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তথাপি এই প্রবাহ বিশুদ্ধ হয় নাই। ট্রাট্‌ফোর্ড ও লাণ্ডক এবং উজ্জয়িনী ও পদ্মনগর হইতে যে দারা উদ্গাত হইয়া ছিল, তাহা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মন প্রাণ শীতল করিয়া আসিতেছে।

ভারবির সম্বন্ধেও এই সকল কথা

প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারবির কবিতা ওজস্বিনী, প্রখর দীপ্তিমতী ও মাধুর্যশালিনী। কিন্তু কালিদাস যেমন বিশ্বসংসারের সকল মধুর সৌন্দর্য্যরাশি একস্থানে গাঁথিয়া পাঠকের হৃদয় বিমুক্ত করেন, ভারবি সেরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করেন না। তিনি পাঠকের সম্মুখে গভীর ও উদাত্ত বিষয় স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখেন, সেই গভীর ও উদাত্তাবশয়ে গভীর ও উদাত্ত ভাব সংযোজিত করেন। এবং সেই ভাবের সহিত এমন একটু তীব্র মদিরা, এমন একটু মনোমদ উগ্ররস ঢালিয়া দেন যে, তাহার আত্মদমাত্র শরীর কণ্টকিত হয়, হৃদয় ওজস্বিতায় বিকশিত হয় এবং ধমনীমধ্যে প্রতাপ শোণিত-স্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া উঠে। কালিদাস স্বীয়চিত্রে দীরে দীরে মাধুর্যের রেখাপাত করেন, এবং যেখানে যে রং ফলাইলে সেই মাধুর্য্য অধিকতর বিকশিত হয়, তদনুসারে দীরে দীরে আপনার তুলি সঞ্চালিত করিতে থাকেন; ভারবি স্বীয়চিত্রে উৎকট বিষয়ের সমাবেশ করেন, এবং যে ভাবে সেই বিষয়গুলি মাজাইলে তাহার উৎকটতা বিকশিত হয়, তজ্জন্ত যত্ন করিতে থাকেন। কালিদাসের কবিতা মনন-বাত-হুলিতা বাসন্তীলতা, ভারবির কবিতা ফলাবনত পত্র-সুশোভিত বিশাল নৈদাঘতক; একটি জমর-চুষিত, অপূর্ণ-বিকশিত প্রভাতকমল, অপ-রটি প্রস্ফুটিত বাতসঞ্চালিত স্থলারবিন্দ;

একটি শূণীতল সুবিশুদ্ধ শারদী জ্যোৎস্না, অপরিষ্কার আলময়ী পবিত্র বহ্নিশিখা। একটি কলনাদিনী গিরি-নিঝরিণীর ন্যায় মৃদু মধুর স্বনিতে কর্ণ পরিতৃপ্ত করে, অপরিষ্কার ফেণায়মান তরঙ্গমানিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় উদাত্ত ভাবের সঞ্চার করে। একটি ব্রীড়াময়ী তরুণীর ন্যায় মৃদু মধুর ভাবে অঙ্গলতিকা হুলাইয়া হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থিত্তরসে পরিপ্লুত করে, অপরিষ্কার প্রৌঢ়া কামিনীর ন্যায় তীব্র রস বিকাশ করিয়া হৃদয়ের প্রতিপ্তর অভিষিক্ত করিতে থাকে; একটি “কুটে অথচ ফাটিয়া পড়ে না, তবে অথচ বিগলিত হয় না,” হাসে অথচ ধ্বনি করে না; অপরিষ্কার ফাটিয়াই শোভা বিকাশ করে, বিগলিত হইয়াই শিরায় শিরায় তীব্রতেজ সঞ্চারিত করে, এবং অটহাস্যে হাসিয়াই দশ দিক্ পরিপূর্ণ করে! সংক্ষেপে কালিদাসের কবিতা কোমল মাধুর্যময়ী, ভারবির কবিতা উগ্র মধুরতাশালিনী।

ভারবির কবিতার সহিত ভবভূতির কবিতার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ওজস্বিনী, তটাবধাতিনী ও আপনার গৌরবে আপনি গৌরবিনী; উভয়েই সমানবেগে সমান দক্ষতার সহিত তীব্র মদিয়া ঢালিয়া দিয়া হৃদয় মাতাইয়া তুলেন; উভয়েই হিমালয়-কন্দর-নিঃসৃত ভাগীরথীর ন্যায় খরতরবেগে ছুটিয়া এক এক সময়ে সমস্ত বিপ্লাবিত করে, এবং যাহা সম্মুখে পায়, তাহাকেই আপনার লোকা-

তীত তেজোমহিমা প্রদর্শন করিয়া ডুবা-ইয়া ফেলে। ভারবি কোন নাটক রচনা করেন নাই, ভবভূতি ও কোন মহাকাব্য প্রণয়ন করেন নাই। নাটকের সহিত মহাকাব্যের তুলনা হয় না। ভিন্ন পদ্ধতির বলে নাটক ও মহাকাব্য উভয়েই ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত। তথাপি আমরা সাধারণতঃ কবিতার উপর নির্ভর করিয়াই ভবভূতি ও ভারবির সম্বন্ধে এই সাদৃশ্য দেখাইলাম। ইহাতে ভবভূতি ও ভারবির কবিতা এক শ্রেণীতে সমাবেশিত ও একস্বত্রে গ্রথিত হইতে পারে। ফলে মধুরতায় যেমন কালিদাস প্রধান, উগ্রতায় সেইরূপ ভবভূতি ও ভারবি শ্রেষ্ঠ।

ভারবি, ব্যাসের সংগৃহীত উপকরণ লইয়া নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বে অর্জুনাভিগমন কৈরাট ও ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্বাদ্বায়ে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত আছে, ভারবি-প্রণীত কিরাতার্জুনীয়েও ঠিক সেই সেই বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইরূপ পরপ্রবর্তিত পথানুবর্তি হইলেও ভারবির কিরাতার্জুনীয়ে কোন অংশে হয় বা অপদার্থ নহে। কালিদাস বায়ীকির পথানুসরণ করিলেও রঘুবংশ জগতে একখানি অতুল্য ও অমূল্য কাব্যরত্ন। ভারবি ব্যাসের উপকরণ লইয়া চিত্র প্রস্তুত করিলেও কিরাতার্জুনীয়ে একখানি অপূর্ব মহাকাব্য। আমরা ক্রমশঃ এই মহাকাব্যের সৌন্দর্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তঁাহারা প্রাচীন কবিদের বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সেই কাব্যে কাব্যকাব্যেরই সমধিক প্রবলতা দেখা যায়। প্রাচীন কবিগণ অযত্নে অনায়াসে যে চিত্র প্রস্তুত করেন, আধুনিক কবিগণ তুলী ঘসিয়া, লতা পাতা আঁকিয়া ও রং ফলাইয়া সেই চিত্রে অধিকতর শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন কবিগণের লেখনী হইতে যে স্বভাবশালিনী চিত্তহারিণী কবিতা অবলীলায় অসঙ্কোচে নির্গত হয়, আধুনিক কবিগণের লেখনী ধীরে ধীরে সেই কবিতামালা সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিতে থাকে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কোন কাব্যেরই দোষ গুণের নির্ণয় হইতেছে না, কাব্যের শ্রেণীভাগ হইতেছে মাত্র। এই উভয় শ্রেণীর কাব্যের একশ্রেণী রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি, অপর শ্রেণী রঘুবংশ ও কীরাতার্জুনের প্রভৃতি। এক শ্রেণীতে স্বভাবের সমধিক বিলাস, অপর শ্রেণীতে শিল্পচাতুরীর সমধিক প্রাদুর্ভাব। এক শ্রেণী অযত্নরক্ষিতা, অনায়াসবর্জিতা আরণ্যলতা, অপরশ্রেণী প্রযত্নপরিরক্ষিতা, আয়াসপালিতা উদ্যান-ব্রতী। এক শ্রেণী তাপসকুমারীর ন্যায় বনবিহারিণী, পবিত্র-দেহা, নিরাতরণা, বিলাসানভিজ্ঞা অথচ স্বভাবিক সৌন্দর্য্যমহিমায় জগতে অতুলনীয়; অপরশ্রেণী রাজকুমারীর ন্যায় বিলাসভবনবাসিনী, অলঙ্কৃতদেহা ও সৌন্দর্য্যগোরবিনী।

ভারবি ব্যাসের অবলম্বিত পথে পাদিয়া স্বীয়কাব্যে এইরূপ শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কীরাতার্জুনের প্রথমেই রাজানির্বাসিত, দ্বৈতবনবাসী যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়। যুধিষ্ঠির এখন কপট দ্বাতকীড়ায় পরাজিত হইয়া বনেচর, এবং রাজচিহ্ন, রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মুনিবেশধারী। দুর্ধ্যোধন কিরূপে রাজ্যাশাসন করিতেছে, কিরূপে সামদণ্ডাদি রাজনীতির প্রয়োগ করিতেছে, জানিবার নিমিত্ত এই মুনিবেশী বনেচর একজন কীরাত-শ্রেষ্ঠকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দেন। কীরাত যতিবেশধারণ করিয়া হস্তিনাপুরে যায়, এবং দুর্ধ্যোধনের রাজ্যাশাসন-ব্যাপার অবগত হইয়া দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করে। এই কীরাত যাহা জানিয়া আইসে, কীরাতার্জুনের প্রারম্ভেই তৎসমুদয়ের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় ভারবির কবি কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারবির কবিতা শিল্পকুশলতায় অতিচিহ্নিত। এই শিল্পের গুণে তাঁহার বনেচর কীরাত, সাধারণ কীরাতগণ অপেক্ষা উচ্চতর গ্রামে আরোহিত হইয়াছে। ভারবির কীরাতে কীরাতগণের সে গ্রাম্যতা নাই, সে মূঢ়তা নাই, সে আরণ্যভাব নাই। ভারবির কীরাত পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও তত্ত্বানুস-

ক্ষায়ী। কিরূপে কোন্ স্থানে, কোন্
বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, কিরূপে ক-
থার আরম্ভ ও উপসংহার করিতে হইবে,
তাহা ভারবির কীরাতের নখদর্পণে স্থিত।
ভারবির কীরাত বিপৎপাতে অধীর হয়
না, যাতনায় অবসন্ন হয় না এবং মজ্জসাধ-
নায় পরাজুখ হয় না। অধিকন্তু ভারবির
কীরাত ভয়ের জন্য মিথ্যা কথা কহে না,
মনস্ত্বষ্টির জন্য তোষামোদ করে না, এবং
পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আত্মপ্রাণায় প্ররত
হয় না। এ কীরাত সত্যবাদী, ধর্মশীল
ও নীতিপরায়ণ,—এ কীরাত গুণচরের
সম্যক্ উপযুক্ত এবং গুণচরের গুণগ্রামে
সম্যক্ অলঙ্কৃত। এই বনবিহারী ধর্মপ-
রায়ণ গুণচর যুগ্মিষ্ঠির সমক্ষে কীরূপ
গম্ভীরভাবে এবং কীরূপ সৌষ্ঠব ও কীরূপ
উদার্যের সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা
করিতেছে, পাঠক শ্রবণ ককন। বনেচর
অভিভাবন পূর্বক কহিতেছে :—

“ক্রিদান্ন যুক্তৈর্হপ চারচক্ষুষো,
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোহনুজীবিতিঃ।
অতোহইসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা,
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

(অনুবাদ) মহারাজ! চারচক্ষু (১)
প্রভৃদিগকে প্রতারণা করা, কার্যে নিয়ো-
জিত অনুজীবীগণের উচিত নয়। এই

(১) চরই রাজাদিগের চক্ষুঃস্থানী।
অর্থাৎ চর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে বেড়াইয়া
বাহ্য দেখিয়া আইসে, রাজাদিগকে তদ-
নুসারেই কার্য করিতে হয়।

জন্য (আমার বাক্য) অপ্রিয়ই (হউক),
প্রিয়ই (হউক), আপনি ক্ষমা করিবেন।
হিতকারি অথচ মনোহারি বাক্য দুর্লভ।

স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোহধিপং
হিতান্ন যঃ সংশ্লুতে স কিংপ্রভুঃ।

সদানুকূলেষু হি কুর্কতে রতিং
হৃপেদ্ব্যমাতোষু চ সর্বসম্পদঃ॥

(অনুবাদ)। যে (অমাত্য) প্রভুকে
হিতোপদেশ দেয় না, সে দুষ্কৃত্যব বন্ধু,
এবং যে (রাজা) হিতকর কথা শুনে
না, তিনিও দুষ্কৃত্যব প্রভু। রাজা ও
অমাত্য (ইহারা সকলেই পরস্পর) এক
মত হইলে সম্পত্তি (সেই রাজ্যে) অচলা
হয়।

নিসর্গদুর্কোদমবোধবিক্রমঃ :

ক ভূপতীনাঞ্চ চরিতং ক জন্মবঃ।

তবানুভারোহয়মবেদি যম্ময়া,

নিগৃঢ়তত্ত্বং নয়বস্ববিদ্বিষাং॥”

(অনুবাদ) ভূপতিদিগের স্বভাব দু-
র্কোদ কার্যপ্রণালীই বা কোথায়, আর
মৃঢ়মতি মাদৃশ জাগিগণই বা কোথায়।
(তথাপি যে) আমি শত্রুপক্ষের রাজনী-
তির গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া আসিয়াছি, সে কে-
বল আপনার ক্ষমতার বলে।

এ উক্তি চরের উপযুক্ত, এ উক্তির
প্রায়স্ত গম্ভীর ও নীতি-বিশুদ্ধ। চর যাহা
দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাই বলিবে, মিথ্যা
কহিয়া অথবা অনুচিত বাগাড়ম্বর করিয়া
সত্যের অপলাপ করিবে না। সত্য কথা
বলিতে গেলে যদি তাহা প্রভুর অপ্রিয়

হয়, এই জন্য চর পুর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন ‘সত্যং ক্রমাৎ, প্রিয়ং ক্রমাৎ ন ক্রমাৎ সত্যমপ্রিয়ম্’ (সত্য কথা ও প্রিয় কথা কহিবে, অপ্রিয় সত্য কথা কহিবে না)। কিন্তু চর কর্তব্যানুরোধে সকল স্থলেই সত্য কথা কহিবে, উহা প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক, তদ্বিষয়ে সে বিচার করিবে না। স্ত্রতরাং প্রভুর অপ্রীতিসাধন ও নীতিশাস্ত্রের অবমাননা-অপরাধের কালন জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই যুক্তিসিদ্ধ। যদি সত্য কহিলেও প্রভুর অপ্রিয়পাত্র হইতে হয়, তাহা হইলে নীরবে থাকাই ভাল; যাহারা এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তী হইয়া সত্য কহিতে ইতস্ততঃ করে, চর দ্বিতীয়বাক্যে তাহাদিগকে নিকন্তর করিয়াছে। এই বাক্যে চর দেখাইয়াছে যে, সত্য কথা অনুজীবদিগের যেমন কর্তব্য, সেই সত্যের অনুবর্তী হওয়াও প্রভুদিগের তেমন কর্তব্য। ইহার পর চর তৃতীয় বাক্যে আপনার অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছে। ভারবি যে দশদিক দেখিয়া কবিতাকুশুম সজ্জিত করেন, এইরূপ পুর্ক্যাপর সজ্জিতই তাহার প্রমাণ।

চর, এইরূপ উদারভাবে ও বিনয়নম্রতার সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা করিয়া, দুর্ঘোষনের রাজ্যশাসনের বর্ণনার প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারবি, দুর্ঘোষনের শাসন-কার্যের দোষোদ্দেশ্যবণ করেন নাই।

ভারবির দুর্ঘোষন যদিও বঞ্চনাবলে রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তথাপি রাজকার্য্যে কখনও উদাসীন বা অব্যবহিততা দেখায় নাই। শাসনকার্য্যে ভারবির দুর্ঘোষন অনেক উন্নত। যুদ্ধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম ও সুরকীর্তিমহিমা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য ভারবির দুর্ঘোষন অনেক সংকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত। চর গভীরভাবে যুদ্ধিষ্ঠিরের সমক্ষে এই দুর্ঘোষনের শাসন-শৃঙ্খলা ও উদার ভাবের বর্ণনা করিয়াছে।

আমরা এই বর্ণনায় দেখিতে পাই, দুর্ঘোষন, গুণে ও যশে যুদ্ধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিবার জন্য সুরাজনীতির বলে পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির গুণে যশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, পৌরুষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সুরাশাসন-মহিমা উত্তরোত্তর পরিবর্জিত হইতেছে। দুর্ঘোষন এক্ষণে অতস্ত্র হইয়া দিবারাত্রি ভাগ করিয়া যথাসময়ে যথাবিধি রাজনীতির প্রয়োগ করিতেছে; অহঙ্কারশূন্য হইয়া লোকের সমক্ষে ভূতাদিগকে বক্রূরন্যায় দেখিতেছে, বক্রুদিগকে ভ্রাতারন্যায় স্নেহ ও আদর করিতেছে, এবং ভ্রাতাদিগকে রাজ্যাধিপতি বলিয়াই পরিচিত করিতেছে। তাহার রাজ্যে শত্রুগণ নিজ্জিত হইয়াছে, মিত্র রাজগণ বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, অপক্ষপাতে ন্যায়ানুসারে বিচার কার্য্য নিরবাহিত হইতেছে। সৈন্যগণ প্রাণপণে রাজ্যরক্ষা করিতেছে, পু-

ধিবী দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া নিরন্তর
ধনপ্রদানে পরিতোষ জন্মাইতেছে, হতা-
শন যজ্ঞস্থলে যথাবিধি সংকৃত ও অভ্য-
র্থিত হইতেছেন এবং নদীমাতৃক ক্ষেত্রস-
কল শাস্যসম্পত্তিতে অগুরুণ শোভা পাই-
তেছে। ভারবির দুর্ঘোষধন এইরূপ সু-
রাজনীতি ও সঙ্কল্পপরায়ণ; চর অবলীলায়
ও অসঙ্কোচে এই দুর্ঘোষধনের শাসনমহি-
মার এইরূপ বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিয়াছে।
এই বর্ণনা প্রগাঢ়তা ও অর্থগাভীর্য্যে পরি-
পূর্ণ। ইহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে
সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু প্রব-
ন্ধের অবয়ব অতিশয় বাড়িয়া উঠিবে তা-
বিয়া আমরা সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে
বিরত হইলাম। যে কয়েকটি কবিতা উ-
দ্ধৃত হইতেছে তাহাতে শাসন-শৃঙ্খলা যে-
রূপ অভিব্যক্ত হইবে, সেইরূপ কবির রা-
জনীতিজ্ঞতা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় অভি-
জ্ঞতাও জানা যাইবে। দুর্ঘোষধনের রাজ্যে
কিরূপে দণ্ডবিধি প্রয়োজিত হইতেছে,
তৎসম্বন্ধে যুধিষ্ঠির-প্রেরিত চর কহিতেছে—

‘বহুনি বাঞ্জর বশী ন মনুনা

অধর্ম্ম ইত্যেব নিরন্তকারণঃ।

গুরুপদিক্ষেন রিপৌ সূতেহপি বা

মিহস্তি দণ্ডেন স ধর্ম্মবিপ্লবম্ ॥

(অনুবাদ) সেই জিতেস্ত্রিয় দুর্ঘোষধন
ধনলোভে অথবা ক্রোধবশতঃ দণ্ডবিধান
করেন না, রাজধর্ম্ম [রক্ষার] জন্যই
লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া, শত্রুই হউক,
(আর) নিজের পুত্রই হউক, অধর্ম্মাচরণ

করিলে সকলকেই প্রাড়্ বিবাকের উপদে-
শানুসারে দণ্ডিত করেন *।

স্থলান্তরে কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধে চর ব-
লিতেছে:—

মুখেন লভ্যাদধতঃ কৃষীবলৈ-

রক্ষতপচ্যা ইব শাস্যসম্পদঃ।

বিতষতি ক্ষেমমদেবমাতৃকা-

শিচরায় তস্মিন কুরবশ্চকাসতে ॥

(অনুবাদ) সেই দুর্ঘোষধনের মঙ্গল-
কর কার্য্যের গুণে নদীমাতৃক কুরুজনপদ
কৃষকদিগের এরূপ সুখলভ্য শস্য-সম্পত্তি
ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে যে, বোধ
হয় যেন ঐ শস্য বিনা কর্ষণেই পরিপক
হইতেছে†।

সন্ধিবন্ধন ও দানের প্রসঙ্গে চর এই-
রূপ বাক্য বিন্যাস করিয়াছে:—

* অধুনি ক রাজ্যপালকগণ প্রাচীন
ভারতের কবির নিকট এই উদারতা ও ম-
হত্ব শিক্ষা ককন। প্রাচীন ভারতের
শাসনকার্য্যে এরূপ উদারতা ও মহত্বের
অনাদর ছিল না।

† এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে,
পূর্বে ভূমিসকল দেবমাতৃক ছিল না, কৃষ-
কগণ কেবল পর্জন্ত দেবের উপর নির্ভর
করিয়াই থাকিত না। পূর্ত্তকার্য্যের গুণে
শস্যক্ষেত্রের নিকট ঋণ প্রভৃতি থাকতে
কৃষিকার্য্যের বিশিষ্ট সুবিধা হইত। এক্ষণে
ঋণীদের রাজ্য অনারুষ্টির জন্য বারম্বার
হুতিক্রম হয়, তাঁহাদের এবিষয়ে ম-
নোযোগ দেওয়া উচিত।

নিরতায়ং সাম ন দানবজ্জিত-

ন্ন ভূরি দানং বিরহস্য সংক্রিয়াম্ ।

প্রবর্ত্ততে তস্য বিশেষ-শালিনী

গুণানুরোধেন বিনা ন সংক্রিয়া ॥

(অনুবাদ) সেই দুৰ্য্যোধনের দান ব্যতিরেকে নির্বোধ সন্ধি প্রবর্ত্তিত হয় না, সদসবিবেচনা ব্যতিরেকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা সম্পন্ন হয় না * ।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের রতন্ত সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:—

মহীভূতাং সসুরিতৈশ্চৈরংক্রিয়াঃ

স বেদ নিঃশেষমশেষিতক্রিয়াঃ ।

মহোদয়ৈস্তস্য হিতানুবন্ধিভিঃ

প্রতীয়তে ধাতুরিবেহিতক্ষলৈঃ ॥

(অনুবাদ) । ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্যকারী সেই দুৰ্য্যোধন সসুরিত চরদ্বারা রাজাদিগের সমস্ত কার্যই অবগত হইতেছেন । কিন্তু তাঁহার কার্য কেবল হিতকর ফল দেখিয়াই জানিতে পারা যায় † ।

* রাজ্যাধিপতিদিগের এই নীতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা উচিত ।

† কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশে দিলীপ রাজার গুণবর্ণনেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা ;

তস্য সংরতমস্তস্য গূঢ়াকারেদ্বিতস্য চ ।

কলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইবা ॥

(অনুবাদ) সেই রাজা দিলীপের মস্তগা এরূপ গোপনে থাকিত, এবং আকার ইঙ্গিত এরূপ নিগূঢ় ছিল যে, তাঁহার কার্য, জন্মান্তরীণ সংস্কারের ন্যায় কল দেখিয়া অনুমান করা যাইত ।

দুৰ্য্যোধন কেন এইরূপ সুরাজতার পরিচয় দিতেছে ? কেন এইরূপ বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুসারে শাসনকার্যের পরিচালনা করিতেছে ? কবি পূর্বেই তাহার উত্তর দিয়াছেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে দুৰ্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম অতিক্রম ও সুরাজতা বিলুপ্ত করিবার জন্য রাজ্য ব্যবস্থিত ও শাসিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে । সুতরাং দুৰ্য্যোধনের এইরূপ সুরাজতাপ্রয়োগ কেবল যুধিষ্ঠিরের যশ ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য । কবি এইরূপ দুৰ্য্যোধনের চরিত্রে একটুকু রং ফলাইয়া যুধিষ্ঠিরের চরিত্র শতগুণে উজ্জ্বল করিয়াছেন । দুৰ্য্যোধন দুরাত্মা, দুৰ্য্যোধন মায়ারাবী, দুৰ্য্যোধন কপটদুহিতে পর-রাজ্যাপহারী ; এ দুৰ্য্যোধন যখন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যপদে সমাসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরের গুণাতিক্রমী—যুধিষ্ঠিরের কীৰ্ত্তিস্পর্ধী হইবার জন্য সর্বোত্তম, সর্বমান্য, সর্বপূজিত ধর্মের অনুশাসন অনুসারে শাসনকার্য নির্বাহ করিতেছে, তখন যুধিষ্ঠির কতদূর মহান, কতদূর উদারচেতা, কতদূর সুরাজতাপরায়ণ ! কবি যুধিষ্ঠিরের কাছেও গেলেন না, তাঁহার চরিত্রপটে একটুকু রেখাপাতও করিলেন না, অথচ অপূর্বকোশলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সুরাজিত করিয়া তুলিলেন,—অপূর্ব প্রতিভাবে যুধিষ্ঠিরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন । ইহা কবিত্বের পরাকাষ্ঠা ।

দুৰ্য্যোধন সুরায়মে প্রজাপালন করি-

লেও যুধিষ্ঠিরের ভয় হইতে নিমুক্ত হয়
নাই; অদ্যাপি যুধিষ্ঠিরের নামে তাহার
মৰ্মবেদনা উপস্থিত হয়, মস্তক অবনত হ-
ইয়া পড়ে এবং হৃদয়, আশঙ্কা ও আতঙ্কে
অবসন্ন হইয়া উঠে। বনবিহারী কিরাত
এসম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছে:—

প্রলীনভূপালমপি স্থিরায়তি

প্রশাসদাবারিধিমণ্ডলভুবঃ।

সন্ধিস্ত্যতোব ভিষ্মদেবাতী

রহো হুরস্তা বলবদ্বিরোধিতা ॥

(অনুবাদ) সমস্ত শত্রু পরাজয় ক-
রিয়া স্থিরোত্তর কালা, সমাগরা পৃথিবী
শাসন করিলেও, সেই দুর্যোধন সর্বদা
আপনার ভয়ে চিত্তিত রহিয়াছেন।
অহো! প্রবলদিগের সহিত বিরোধ কি
কষ্টকর!

কথাপ্রসঙ্গেন জনৈকদাহতা,

দম্ভস্বতা খণ্ডলস্ববিক্রমঃ।

তবাভিধানাদ্ ব্যাধতে নতাননঃ

স দুঃসহান্মাত্রপদাধিবোরগঃ ॥

(অনুবাদ) লোকের কথাপ্রসঙ্গে আ-
পনার নাম করিলে সেই দুর্যোধন, সর্প
যেমন দুঃসহ মস্ত্রে গৰুড়ের পরাক্রম মনে
করিয়া মতশির হয়, সেইরূপ অর্জুনের
পরাক্রম স্মরণ করিয়া ব্যাধিতচিত্তে অবনত
মস্তক হইয়া পড়েন।

এস্থলে কবির কৌশল অধিকতর প-
রিস্কৃত হইয়াছে। কবি এস্থলে দুর্যোধন
অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতা স্পষ্ট দেখা-
ইয়াছেন। কবির কিরাত এস্থলে তোষা-

মোদ করিল না, ব্যাপকতা দেখাইল না,
দুর্যোধনকে নরকে ফেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে
স্বর্গে তুলিল না; অথচ দুই একটি গভীর
রেখায় যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব তেজোমহিমা—
অপূর্ব দেবোপম ভাব স্পষ্ট আঁকিয়া
দিল। যদি এই ভাব মানস-পটে অঙ্কিত
করিতে চাও, তবে যুধিষ্ঠিরের কাছেও যা-
ইও না; কম্পনারনেত্রে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের
প্রতি একবারও চাহিয়া দেখিও না। অগ্রে
দুর্যোধনের প্রতি নয়নপাত কর; অগ্রে
দুর্যোধনের সুরাশন, দুর্যোধনের ভয়,
দুর্যোধনের আতঙ্ক, একে একে স্মৃতিপটে
চিত্রিত কর; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠিরের
উজ্জ্বল কান্তিতে তোমার হৃদয় আলো-
কিত হইবে; তাহা হইলেই শারদী পৌ-
র্ণমাসীর জ্যোৎস্না-বিধৌত নিবাত নি-
কম্প তরঙ্গিণীর ন্যায়, অথবা চন্দ্রালোক-
স্পষ্ট পূর্ণ বিকশিত কুমুদস্থলীর ন্যায় যু-
ধিষ্ঠিরের পবিত্রতাময়ী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্তি
তোমার সম্মুখে হাসিতে থাকিবে। দুর্যো-
ধনের প্রতিবিস্তিতচ্ছবির সম্মুখবর্তী না
হইলে একীর্তির গরিমা, একীর্তির মধুরিমা
বুঝিতে সমর্থ হইবে না। এই ছবিই এ
কীর্তি সন্দর্শনের অদ্বিতীয় আলোকবর্তি,
এবং এই ছবিই এ কীর্তি-মন্দিরের অদ্বি-
তীয় সোপান। অগ্রে এই আলোকবর্তি
হাতে কর, অগ্রে এই সোপানে পা দেও,
তবেই একীর্তির মধুর আভা নয়ন ভরিয়া
পান করিতে পারিবে।

ভারবি এইরূপে এক দুর্যোধনের চিত্রেই

যুধিষ্ঠিরের চারিত্র-সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। “অহো! দুরন্তা বলবদ-বিরোধিতা” এই কথাতেই কত অর্থ গাভীৰ্ব্য! এই একটি সামান্য কথায় যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য কত পরিস্ফুট হইয়াছে, পঞ্চমুখে স্ততিগীত গাইলে অথবা শত পৃথিবীর প্রশংসাবাদ নিখিলেও সেই ঔজ্জ্বল্য তত বিকশিত হইত না। প্রবাসে জীর্ণকুটীরে স্নসজ্জিত-হর্যা-শ্রোভিনী অলঙ্কৃতদেহা স্নন্দরী পদ্মাবতীর সমক্ষে বন-বিহারিণী নিরাভরণা স্নন্দরী কপালকুণ্ডলা যেমন অধিকতর স্নন্দরী হইয়াছিল, রাজা-সনন্থ দুর্যোধনের চিত্রের সমক্ষে বনেচর যুধিষ্ঠিরের চিত্র সেইরূপ অধিকতর স্নন্দর হইয়াছে। দরায়ুস দুহিতা স্নন্দরী না হইলে সেকন্দের সাহের ধর্ম কখনও পরম স্নন্দর বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের স্বরস্বীয় হইত না; কিরাতাজুর্নীয়ে দুর্যোধন স্নন্দর না হইলে কখনও যুধিষ্ঠিরের সৌন্দর্য্য সুস্পষ্ট অনুভব করা যাইত না।

কোন ক্ষুদ্র কবি হইলে হয়ত তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রশংসাস্বন্ধিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া দুর্যোধনকে একবারে নরকে ফেলিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কাব্যের গাভীৰ্ব্য ও ঔদার্য্য একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমকক্ষেই হওয়া উচিত, এবং এই সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৌন্দর্য্যজনক হইয়া থাকে। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য্যই কাব্যের

আত্মা এবং সৌন্দর্য্যই কাব্যের প্রাণ। যিনি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে না পারেন, তিনি কখনও “কবি” নামের অধিকারী নহেন এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কখনও “কাব্য” নামের যোগ্য নহে। ভীমার্জুন-নকুলসহদেব-সহচর যুধিষ্ঠির যদি দুর্যোধনের ন্যায় একজন ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কাব্যের গোঁরব বা সৌষ্ঠব রক্ষা পাইত না। এবং তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র কখনও রমণীয় বা ঔজ্জ্বল্য-বিকাশক হইত না। স্মরণ্য চিত্রকরের চিত্র আত্মাহীন, প্রাণহীন হইয়া অকিঞ্চিৎকর পদার্থের দলে মিশিষ্টা বাইত। ইহাতে কখনও কোন সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইত না।

কুমন্ত্রণায় যদিও দুর্যোধনের চিত্রের মালিন্য জন্মিয়াছে কুমন্ত্রীর পরামর্শে যদিও দুর্যোধন ভ্রাতৃত্বাভ্যাস করিয়াছে; দুষ্কবুদ্ধিতে যদিও দুর্যোধন ‘দুরাত্মা’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তথাপি ক্ষত্রিতেজ, ক্ষত্রিয় সাহস ও ক্ষত্রিয় দর্প দুর্যোধনকে একবারে ছাড়িয়া পলায়ন নাষ্ট। এই তেজ, এই সাহস ও এই দর্প দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুধিষ্ঠিরের গুণাতিক্রমী হইতে প্রবর্তিত করিয়াছে। এদৃশ্য ও দেখিতে স্নন্দর। মহৎ লোকের সহিত দুষ্কাশয়ের এরূপ বিরোধ এবং মহৎলোকের গুণস্পর্শী হইতে দুষ্কাশয়ের এরূপ চেষ্টাও কাব্যের উৎকর্ষ-সম্পাদক।

অধিকন্তু, দুর্যোধনের চরিত্রে পুরাজ-
গুণের আভাস লক্ষিত না হইলে কাব্যের
ঘটনাগত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইত।
কিরাতাজর্জুনীর ঘটনাগত উদ্দেশ্য,
কিরাতবেশধারী ভবানীপতি মহাদেবক-
র্ত্তক অর্জুনের বাহুবলপরীক্ষা ও তদনন্তর
অর্জুনের অরাতিদমন অস্বলাভ। এই উ-
দ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অর্জুনের অ-
রাতিপক্ষকে বিশিষ্ট প্রবল ও সহায়স-
ম্পন্ন করা উচিত। প্রতিদ্বন্দীকে বিলক্ষণ
প্রবল না দেখিলে তাঁহার দমন জন্য দুষ্কর
কার্য্যানুষ্ঠানে প্ররতি জন্মে না। দুর্যো-
ধনকে রাজনীতি-কুশল, সমাগরা সঙ্গীপার
অগ্নিতীয় অধীশ্বর ও রণপণ্ডিত সেনাপতি-
সমূহে পরিবৃত দেখিয়াই অর্জুন অস্ত্রলা-
ভের নিমিত্ত ভ্রাতৃচতুর্টয় ও জায়া হইতে
বিক্রিয় হইলেন, একাকী হিম-গিরিতে
দুষ্কর তপস্যা করেন, এবং পরিশেষে ভ-
বানীপতিকে পরিভূক্ত করিয়া ধনুর্বেদ
লাভ করেন। প্রবল অরাতিপক্ষের দমন

জন্ম তৎকণবয়স্ক বীরপুত্রের একপা উৎ-
কট চেষ্টাও দেখিতে স্পন্দর। দুর্যোধন
কৌরবসাগরে নগণ্যজলবিষ হইলে তাহার
বিলয়জন্য বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সেই দুষ্কর
কার্য্য, সেই কঠোর যত্ন অবশ্যই উপহাসকর
ও কাব্যের অপকর্ষ-সম্পাদক হইত। ইহাতে
কাব্যের কোথাও উদ্ভাবনার পারিপাট্য
থাকিত না, কোথাও স্রষ্টির রমণীয় বিকাশ
প্রতিবিম্বিত হইত না এবং কোথাও পবিত্র
সৌন্দর্যের মদালস বিভ্রম লীলা করিত না।
অনন্ত জলধরপটলের ছায়ার যেমন অনন্ত
বারিধিবন্ধ কালীময় হইয়া যায়, একটি চ-
রিত্রের কলঙ্কময় প্রতিবিম্বে সেইরূপ কা-
ব্যের প্রতিচিত্রের প্রতিরেখা কলঙ্কময় হ-
ইয়া যাইত। দুর্যোধনের রাজোচিত গুণ
ও রাজোচিত গৌরব অস্থানে বা অসময়ে
বিকশিত হয় নাই। কবি চিত্রঃক্লিত ক-
রিয়াই অনেক উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ও অনেক
সৌন্দর্যের স্রষ্টি করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

পৃথ্বীরাজচরিত।

পুরাণে কথিত আছে অবনী মৈত্যা-
দানব-দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে ব্যভিচার
হইলে ভগবান বিষ্ণু জীব-শরীর ধারণ
পূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়াছেন। কলতঃ
সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এক একজন মহা-
পুত্রের প্রয়োজন হয়, এবং সেই প্রয়ো-

জন সাধন জন্ম তাঁহারা অবনীতে জন্ম
গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের স্বীয় জীব-
নের পৃথক্ অন্তিম আমরা দেখিতে পাইনা,
কারণ তাঁহারা এক হইয়া অনেক,—তাঁ-
হারা জাতীয় জীবনের আদর্শ-স্বরূপ।
যে দেশে যখন তাঁহারা আবির্ভূত হন,

সেই দেশ ও তৎকালের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহাদিগের জীবন পাঠ করিলেই হয় ; পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের জীবনচরিত্র জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে । নেপোলিয়ান বোনাপার্টী কহিতেন, ফ্রাঞ্চ ও আমি এক ও অভিন্ন, আমার জীবনই ফরাসিশ জাতির জীবন ! ইহা স্বথা গর্ভ নহে, উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসিশ ইতিহাস নেপোলিয়নের জীবন চরিত্রের ছায়া মাত্র । আমরা উপরে যে মহাত্মার নাম স্থাপন করিলাম, তদীয় জীবনচরিত্রও তদ্রূপ দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দু জাতির ইতিহাস । আর্য জাতি কি ছিল, যদি কেহ জানিতে চান, তিনি পৃথ্বীরাজের চরিত্র পাঠ ককন । যদি কেহ আর্য জাতির পুনরুদ্ধার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে পৃথ্বীরাজের উন্নতি ও পতনের বিষয় চিন্তা ককন ।

পৃথ্বীরাজের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সাহসে মন উৎসাহিত, আনন্দে উৎফুল্ল, ও অভিমানে উন্নত হয়, পৃথ্বীরাজ আর্যকুলগৌরবস্থল । আবার পক্ষান্তরে পৃথ্বী-চরিত্র পাঠে, মনে ক্ষোভ হয়, হতাশা হয়, লজ্জা হয়,—পৃথ্বী আর্য জাতির কলঙ্ক ।

পৃথ্বীচরিত্র ঐতিহাসিকদিগের প্রগাঢ় চিন্তার স্থল ; নীতিজ্ঞদিগের উপদেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল ; দেশ-হিতৈষীদিগের আদেশহিতৈষণা লিখিবীর উৎকৃষ্ট স্থল ; এবং কবিদিগের অনুপম ক্রি-

ড়াস্থল । ফলতঃ ইহাতে ইতিহাস, নীতি, কাব্য প্রভৃতির অপরিপূর্ণ উপকরণ বিদ্যমান আছে । বিষয়টি এত গুরুতর যে, একটি প্রবন্ধে ইহার শেষ করা দুঃসাধ্য । অথচ এরূপ প্রস্তাব ক্রমশঃ প্রকাশ করিলেও সাময়িক পত্রিকার পাঠকবর্গের প্রীতিকর হয় না । সুতরাং আমরা যথাসাধ্য এক প্রবন্ধেই ইহার শেষ করিব । এই জীবনীটি যে ভাবে লেখা উচিত, হয়ত আমাদের ক্ষমতার দোষে তাহার কিছুই পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন না । এস্থলে আর একটি কথা উল্লেখ-প্রয়োজন । পৃথ্বীরাজচরিত্র ইতিহাসে বিশেষ কিছুই লেখা নাই । কাব্য হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় । কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের সহিত কবি-কল্পনার এত অধিক মিশ্রণ হইয়াছে যে, কতটুকু কাব্য আর কতটুকু ইতিহাস তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর । আমরা এই প্রস্তাবে কাব্যংশের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বতদূর সম্ভব তাহা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব । কাব্যের উপকরণের আধিক্য দেখিয়া, আমরা একদা একখানি বৃহৎ কাব্য লিখিব বলিয়া স্থির করি, কিন্তু প্রথম সর্গের কিয়দূর রচনা করিয়া নানা কারণে বিরত হই । বর্তমান লেখকের দুটি প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া যিনি “ পলাসীর যুদ্ধ ” রূপ উপাদেয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহাকেই আমরা এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে আহ্বান করিতেছি ।

৩৬টি রাজপুত্র নৃপতিবংশের মধ্যে ষাটশ শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থে তুমার, অজ্জ-মীরে' চোহান, কান্যকুজের রাঠোর, এবং গুজরাটে ভাটীলা এই চারি বংশই প্রবল ছিল। খ্রীষ্টিয় ৭৯২ অব্দে অনঙ্গ পাল কর্তৃক তুমার বংশের স্রুষ্টিপত্তন হয়। নর-সিংহদেব নামধারী * শেষ রাজা ১১৬৪ শাকে রাজত্ব করেন। এই বংশে সর্ব-শুদ্ধ হইব জন রাজা রাজত্ব করেন। অন-হল চোহান বংশের আদিপুরুষ। ৩৮ জন রাজার রাজত্বের পর সোমেশ্বর অ-জমিরের সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইনি তুমার রাজের সহায় হইয়া কান্যকুজ প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে দিল্লীর অধী-নতা স্বীকার করান। দিল্লীস্থ নরসিংহ সোমেশ্বরের উপর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় দুহিতাকে তদীয় হস্তে সম্প্রদান করেন। আমাদের নায়ক এই শুভ প-রিণয়ের ফল। ১১৫৯ শাকে শুভলগ্নে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। রাঠোরপতি বিজয় পাল নরসিংহের দ্বিতীয় কন্যার পানি গ্রহণ করেন, এবং তদীয় গর্ভে কৃষ্ণনে আর্যাকুল-কালিমা কান্যকুজাধিপতি নরা-ধম জয় চন্দ্রের জন্ম হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রাজা নরসিংহদে-বের পুত্রসন্তান জন্মে না। পরৱার স্বীয় দৌহিত্র পৃথ্বীকে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। তিনি মাতাম-

* টডলাহেবের মতে ইহার নামও অনঙ্গপাল।

হের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে অভি-ষিক্ত হন। * এবং এই হইতেই চোহান ও তুমার বংশের একীকরণ হইল, উভয় দে-শই এক অধিপতির শাসনাধীন হইল।

পৃথ্বীরাজ-জনক সোমেশ্বরের অপর এক পত্নী ছিল, সে অতি দুশ্চরিত্রা ছিল। কিন্তু সোমেশ্বর তাহাকেই প্রাণপণে ভাল-

* রাজাবলী নামক গ্রন্থে এই রূতা-ন্তটি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। যথা— সোমেশ্বরের (প্রাচ্য দেশের রাজার) অ-পর এক রাক্ষসী স্ত্রী ছিল। সে নরসিংহের দুহিতার গর্ভজাত প্রথম পুত্রকে ভক্ষণ করে। এবং ক্রমে স্বীয় স্বামীকেও স্বীয় মতাবলম্বী করাইয়া দেশে নানারূপ অত্যা-চার আরম্ভ করে। নরসিংহ দুহিতা পতি ও স্বপত্নীর আচরণে ভীতা হইয়া স্বীয় ভ্রাতা জীবন সিংহের (নরসিংহের পুত্র) আলয়ে গমন করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কালে পিত্রালয়ে পৃথুনামে তাঁহার এক পুত্রজন্মে। জীবন সিংহ অপুত্রক ছিলেন, পরৱার ভাগিনের পৃথুকেই উত্তরাধিকারী রূপে স্থির করেন। কিছু কাল পরে রাজগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে জীবনসিংহ তথা গমন করেন, এই অব-কাশে পৃথু দিল্লীর সিংহাসন অধিকার-করিয়া বসেন। সমরান্তে জীবন সিংহ স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক স্বীয় ভাগিনে-য়ের দুহিতাচরণ অবগণ পূর্বক কোন বাঙ-নিষ্পত্তি না করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পৃথু নির্বিবাদে দিল্লীস্থ হইলেন।

বাসিতেন । ফলতঃ সেই খলমতি কুহকিনীর প্রেম-কুহকে তিনি জড়িত হইয়া কিছু দিন মধ্যে তদীয়হস্তে ক্রীড়াপুতলবৎ হইয়া পড়িলেন । এইরূপে স্বামীকে সম্পূর্ণ আরত্যাধীন করিয়া সেই নর-রাক্ষসী দেশে নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল, ক্রমে দেশ উৎসন্ন হইল, প্রজা ও অধীন সর্দারেরা বিক্রোহী হইয়া উঠিল ফলতঃ কিছু দিন মধ্যে প্রাচীনদেশে সম্পূর্ণ-অরাজকতা উপস্থিত হইল । প্রধান কর্মচারী, সর্দার ও সাধারণ প্রজারন্দের ভাবগতি বুঝিয়া রূপাপাত্র সোমেশ্বরকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ পূর্বক সেই দুরাচারিণী রাজধানী হইতে রাত্রিযোগে একদা পলায়ন করিল ।

পৃথ্বীরাজ অজ্ঞমীরের এই দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া সর্বসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন । এবং সামদানভেদদণ্ড চতুর্বিধ উপায়ে সর্দার, অমাত্য ও প্রজারন্দের বশ করিয়া পিতাকে পুনর্বার পদস্থ করিতে মনন করিলেন । কিন্তু সোমেশ্বরের উপর প্রজাদিগের এরূপ বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ হইয়াছিল যে, পৃথ্বী-রাজ বাধা হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিলেন, এবং দিল্লী ও অজ্ঞমীর সংযুক্ত রাজ্যে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিলেন । *

* রাজাবলীর মতে সোমেশ্বরের প্রার্থনানুসারে পৃথু তাঁহার মন্তকচ্ছেদন পূর্বক রাক্ষসী-সহবাস-পাপ হইতে উদ্ধার করেন ।

ঘটনাচক্রে পৃথী দিল্লীর হইলেন, পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং অজ্ঞমীরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এই উভয় ব্যাপারে তাঁহার অপরাধ কি ? নেপোলিয়ান কহিতেন আমি “ ঘটনার সম্ভান ” † ফলতঃ মনুষ্য মাত্রেই ঘটনার অধীন । একথায় কেহ যেন এরূপ মনে করেন না যে, আমরা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছামতের বিরোধী । মনুষ্য যন্ত্র নহে, ইচ্ছা বিশিষ্ট জীব, সত্য ; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে এরূপ ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত হইতে হয়, যে ইচ্ছার প্রতিফলেও তাঁহাকে ঘটনাজোতে শরীর ঢালিয়া দিতে হয় । আমাদের নায়ককেও তাহাই করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু “ উদয়শ্যুধী প্রতিভার নিত্য-বিদ্রোহিণী স্বর্বা ” তদীয় অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কপ হইল । ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন লোলুপ ক্রুরমতি জয়চন্দ্র সঙ্কিত অভিলাষপরামুগ্ধ হইয়া পৃথীর ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন ; অহুয়াপ-রবশ হইয়া তাঁহার নানারূপ দুর্নাম রটনা করিতে লাগিলেন ; কিছু দিনের মধ্যে দিল্লীর অধীন ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বাধীন ভূপতিবর্গ পৃথীরাজের ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠিলেন । জয়চন্দ্রের মন্ত্রণায় পতন আন্থালরবার রাজা ও মন্দের পু-রিহর বংশীয় রাজারা পৃথীর অধীনতা-অ-স্বীকার করিলেন । এই সময়ে হিন্দু ভূপতিগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইলেন ।

† Child of circumstances.

লোহ-দুঢ়-কলেবর পত্নেন্দ্রের ভোলা-
ভীম দেব ; ধ্রুবতারাসদৃশ সমরে অটল
প্রমদাবংশাবতংশ জীতমাল ; দিল্লী-বি-
পক্ষদলের নিকট করগ্রাহী মেয়োরাদিগ
নমর সিংহ ও মন্দরাদীশ্বর মাক্কুল-পতি
নির্ভীক মহামানী নেহার রাও জয়চন্দ্রের
পক্ষ । চিতোর, নাগোর, সিন্ধু, জলবৎ,
পেশোয়ার, লাহোর, কান্ধারা, কাশী,
গ্রীবাগ, ও দেবগড় প্রদেশসমূহের অধি-
পতিগণ পৃথ্বীরাজের পক্ষ । সিমারের রা-
জারাও ভয়ে পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন ক-
রিয়াছিলেন । তন্মধ্যে বীরকেশরী যো-
গীন্দ্র চিতোরাদিপতির ক্ষিপ্র বিবরণ
এই স্থলে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যিক ।

১২০৬ খ্রীষ্টিয় শাকে সমরশায়ী জয়-
প্রাণ করেন । ইনি কুলদেবতা মহাদে-
বের পরমভক্ত ছিলেন । জনকরাজর্ষির
নাম শিরে জটাঙ্গুট, গ্রীবাগ কমল-পুষ্প-
বীজমালা ; ও কণ্ঠে রক্তাঙ্গর ধারণ
করিতেন । ওদিকে সমরে অসম সাহস,
অপ্রতিমের দৈর্ঘ্য ও অদ্বীত নৈপুণ্য ছিল,
এবং মন্ত্রণায় পরিণামদর্শিতা, প্রাজ্ঞতা,
ও কৌশল ছিল । উদ্ধীপনাবিসয়ে প্র-
ধানবাগ্মী, আচরণে পরমধার্মিক ও সভা
ছিলেন । স্বীয় প্রজা ও অধীনবর্গের যার
পর নাই অনুরাগ-ভাজন ছিলেন । সমর-
শায়ী পৃথ্বীরাজের ভাগিনীকে পরিণয়
করেন ; এবং তাঁহার সহিত ইহার অকু-
ত্রিম সৌহার্দ্য ও বন্ধুতা ছিল । পৃথু ই-
হাকে যথেষ্ট ভক্তি প্রজ্ঞা করিতেন, এবং

ইহার পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম করি-
তেন না ।

পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে মন্দরা
দিগ পুরিহর (বা, মাক) বংশোদ্ভাব নে-
হাররাও জয়চন্দ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন ।
পুরিহর বংশীয়েরা তুমার ও চোহান বংশ-
শীয়দিগের করদ প্রজা ছিলেন । নেহার
জয়চন্দ্রের কুমন্ত্রণায় বার্ষিক কর প্রদানে
বিরত ও স্বাধীন হইতে উদ্যত হন । মহা-
বীর পৃথ্বীরাজ অচিরে তদীয় গর্হ খর্ব ক-
রিয়া নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য করিলেন ।

ষোড়শ শতাব্দীতে কাটাঁরাজপুত্রেরা
যুদ্ধ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে । ই-
হার পৃথু ও জয়চন্দ্রের অধীনে থাকিয়া
বহুযুদ্ধ করে । ঝালায় রাজপুত্রেরাও উ-
ভয় পক্ষেই যোগ দেয় । পৃথু দর বা দদ
নামা ঝালায় রাজাকে সমরে পরাভূত
করিয়া তদ্রূপে এক কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন
করেন । ফলতঃ কিছুদিনের মধ্যে মহা-
বীর অথচ মন্ত্রণাকুশল পৃথ্বীরাজ সমস্ত
রাজপুত্রদিগকে একপ্রকার বশতাপন্ন ক-
রেন । কেহ ভয়ে, কেহ মৈত্রিতে, কেহবা
যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তদীয় প্রাধান্য স্বীকার
করিতে বাধ্য হন । পরিশেষে কান্যকু-
জাদিপতি জয়চন্দ্র ভিন্ন আর কেহই তাঁ-
হার সমকক্ষ ছিল না । এই জয়চন্দ্রের
সহিত ক্রমাগত কলহে উভয় পক্ষ হীনবল
হইয়া পড়ে, সেই সুযোগে ভারতের সর্ব-
নাশ উপস্থিত হয় ।

বায়েনার দাছিম নামক রাজার দুই

কন্যা ও তিন পুত্র ছিল। এক কন্যাকে পৃথ্বীরাজ বিবাহ করেন, এই কন্যার নাম পৃথা। অপর কন্যা মেওয়ারের রাজা বিবাহ করেন। চাঁদ কবি কছেন যে, পৃথার যৌতুকস্বরূপ দিল্লীখ্বর আটজন পরম রূপবতী সখী, ত্রিষষ্ঠীটি দাসী, পারস্য দেশজাত একশত অশ্ব, দুইটি গজ, দশটি চর্য, ও একটি স্বর্ণরোপাখচিত্ত বহুমূল্য শয্যা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত পৃথাকে কাষ্ঠনির্মিত শত পুস্তলিকা, শত রথ, ও শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হয়। কিন্তু দাঃহিমতনয়-ত্রয়কে সহায় পাইয়া দিল্লীখ্বরের যে মহোপকার হয়, তাহার সহিত তুলনায় এসকল বহুমূল্যবত্ত্ব অতি অকিঞ্চৎকর। সর্বজ্যোষ্ঠ কায়মসকে পৃথু প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত করেন; ইনি মন্ত্রণায় রহস্পতিতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে অন্যায়রূপে স্বীয় পত্নীর সতিত্বের উপর সন্দেহ হওয়াতে অকালে আত্মহত্যা করেন। পুন্দির নামা দ্বিতীয় জাতা একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইনি প্রথমে রাজসমীপে অমাত্যরূপে নিযুক্ত থাকেন, পরে লাহোরের শাসনকর্ত্ত্ব পদে বরিত হন। ইহার সহিতই সাহাবুদ্দিনের প্রথম যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধেই ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সর্বকনিষ্ঠ চাঁদরাও খানেখ্বরের যুদ্ধে প্রধান সেনানী ছিলেন, ইহার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। মুসলমানেরা ইহাকে খাওয়ার ও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং

ফেরেস্তা ইহার শৌর্য বীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সাহাবুদ্দিনের সহিত সমরই পৃথু-নাটকের শেষ অঙ্ক। তাহার অভিনয়ের পূর্বে পৃথীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আমরা আরো দুই একটি বিবরণের উল্লেখ করিব। পৃথুর সহিত জয়চন্দ্রের মনোবাদের প্রথম কারণ পৃথুর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ও অতির উন্নতি। ইহার যথাযথ বিবরণ বিস্তৃত হইয়াছে নাগোরকোটস্থ প্রভূত সঙ্কিত ধনলাভ দ্বিতীয় কারণ; রাজহুয়যজ্ঞে পৃথীরাজের অনাগমন তৃতীয় কারণ; এবং পৃথীরাজের সহিত জয়চন্দ্র-দুহিতার পরিণয় দিতে অসম্মতি চতুর্থ কারণ। আমরা ক্রমে এই তিনটি কারণের সংক্ষেপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নাগরকোটনগরে পূর্বতম কোন মূর্তির সঙ্কিত সপ্ততিলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিহিত ছিল। পৃথীরাজ তাহা হস্তগত করিতে বাসনা করেন। কিন্তু জয়চন্দ্র যখন রাজ সাহাবুদ্দিন ও পত্নরাজ ভীমদেবকে সহায় করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে চেষ্টা করেন। তখন দিল্লীখ্বর স্বীয় কুটুম্ব ও সচিব পুন্দিরকে চিতোরনগরে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন, এবং সমরশায়ী নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমরশায়ী স্বীয় প্রিয়তম তনয় কর্ণের হস্তে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত করিয়া পৃথীরাজের সাহায্যার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করেন। প্রায় ৪ কোশ দূরে থাকিতে পৃ-

পৃথীরাজ অমাত্যবর্গসহ অগ্রসর হইয়া সমাদরে সমরশায়ীকে গ্রহণ করেন। উভয়ে মন্ত্রণাপূর্বক এই স্থির করিলেন যে পৃথীরাজ ভীমদেবের বিজ্ঞে যাত্রা করিবেন, সমরশায়ী সাহাবুদ্দিন ও জয়চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা গমন করিবেন। এই মন্ত্রণার পর সমরশায়ী নাগরকোটে উপস্থিত হইয়া প্রবল শত্রুহরের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কোন পক্ষেই জয় পূজার সন্তাবনা কিছু দৃষ্ট হইল না। ইতিমধ্যে পৃথীরাজ ভীমদেবকে পরাস্ত করিয়া নাগরকোটে যাইয়া সমরশায়ীর অমূল হইলেন। প্রজ্বলিত তীষণ দাবানলে প্রবল-প্রভঞ্নের সংযোগ হইল; আর কার সাধ্য যে সে অনলপ্রবাহের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? জয়চন্দ্র ও সাহাবুদ্দিন সত্তরই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। নাগরকোটের বিপুল সম্পত্তি বিক্রয়দিগের হস্তগত হইল; কিন্তু সমরশায়ী তাহার কপর্দক ও স্পর্শ করিলেন না, সকলই পৃথুকে অর্পণপূর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ জয়চন্দ্রের অনঙ্গমুগ্ধরী নামে এক পরমরূপবতী ছদ্মিষ্ঠা ছিল। কন্যা বয়স্কা হইল, কিন্তু মনোমত বর জুটে না। তখন রাজস্বয়ম্বরযাত্রাপদেশে পাত্র নির্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। সেই মহাযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া দিগ্ দিগন্তর হইতে ভূপতি-

রন্দ কানাকুজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেবল জয়চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া পৃথীরাজ তথায় গমন করিলেন না। এই ব্যাপারের নিয়ম এই যে হোমোজের সমস্ত কার্য মুকুটধারিদিগের দ্বারা নির্বাহিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথীরাজের অনুপস্থিতি নিবন্ধন হোমের অঙ্কহানির আশঙ্কা হইল। পরে পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থা লইয়া পৃথীরাজের এক স্বর্ণময় প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইলেন; এবং তাঁহার উপর জাতকোঁধ বশতঃ তাঁহাকে দ্বারবানের দ্বানীয় করিয়া যজ্ঞসভার দ্বারে স্থাপন করাইলেন। লোকপদম্পরায় এই সংবাদ পৃথীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি জবগমাত্র কোঁধে কম্পিত-কলেবর হইয়া সৈন্যে কানাকুজে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বীরকেশরী দিল্লীখরের হস্তে অশুকোপম জয়চন্দ্র শীঘ্রই পরাজিত ও হতমান হইলেন। দ্বারস্থিত কাঞ্চন-প্রতিমা লইয়া পৃথীরাজ জয়োল্লাসে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজস্বয় যজ্ঞ অঙ্গহীন হইয়া কোনমতে সমাপ্ত হইল; পৃথীরাজের প্রতি জয়চন্দ্রের বিবেচ্য ভাব অধিকতর প্রবল হইল। বিজয়ী পৃথু যখন পরাস্ত হুপতিরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া হোমপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশগমননিমিত্ত স্বীয় সৈন্যদিগকে অনুমতি করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় মন্ত্রকে পার্শ্ববর্তী প্রাসাদ হইতে পুষ্পরক্তি

হইল; পৃথু উদ্ধৃতাগে নয়নপাত করিলেন, অমনি এক অনুপমা সুন্দরীর চক্রে আপন চক্ষু মিলিত হইল ।

জয়চন্দ্র যে অভিপ্রায়ে রাজহুয় য-জ্ঞানুষ্ঠান করিলেন তাহা নিষ্ফল হইল ; নিমজ্জিত রাজন্যবর্গমধ্যে অনলমুগ্ধরীর ম-নোমত বর মিলিল না । হোম-প্রাক্‌নে যে বিজয়ী যুবকের প্রতি নয়ন আকৃষ্ট হ-ইয়াছিল, ঘন তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছে, ম-নের মত বরকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, অন্যবরে মন আর যাইবে কেন ? যজ্ঞ স-মাণ্ত হইল, জয়চন্দ্র একদা হুঃখিত হইয়া তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহাকে পতিবে বরণ করিবে ? অনলমুগ্ধরী প্রথ-মতঃ কোনও উত্তর করিলেন না । পরি-শেষে পিতার নিরঙ্কতিশয় অতিক্রম ক-রিতে না পারিয়া যে একটি নাম করিলেন, তাহা শুনিবামাত্র জয়চন্দ্রের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া গেল । চিরশত্রু পৃথ্বীরাজকে কন্যাসম্প্রদান অপেক্ষা তাহাকে জলে নিঃজ্ঞানও শ্রেয়ঃ । হুহিতাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন ; অনলমু-গ্ধরী পিতৃ-নিষ্কাষিতা হইয়া কোন আত্মী-য়ের গৃহে রহিলেন । কিছু দিন মধ্যে এই কথা পৃথুরায়ের কর্ণগোচর হইল । তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্রসহ চন্দ্রতা-টকে কান্যকূজে প্রেরণ করিলেন । তিনি জানিতেন প্রাগসত্যে জয়চন্দ্র এ পরিধরে সম্মত হইবেন না, অতএব স্বদলবলে আরও দূতের অনুগমন করিলেন । এবং জয়-

চন্দ্রকে ঘৃণে পরাভব করিয়া অনলমুগ্ধ-রীকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিলেন । মহাসমারোহে পরিণয় সমাধা হইল । বিধাতার চক্র বুঝাভার । কোন দুলক্ষ্য স্বত্রে কি ঘটে লোকে তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না ।

নবপ্রণয়িনীর রূপলাবণ্যে বীরকুলধ্বজ প্রজারঞ্জক পৃথ্বীরাজ মোহিত হইয়া শৌর্ধ্য বীর্ধ্য বিস্মৃত হইলেন, প্রজাপালন ও রাজ্য-শাসনে বিরত হইলেন । অমাত্যবর্গের হস্তে সমস্ত কার্য্য নাস্ত করিয়া সমস্ত দিন অস্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন । রাজ-কার্য্যে হৃণতির ঈদৃশ ওদাস্যাবলোকনে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিতে লা-গিল । পশ্চিমে যে বিতস্তিপ্রমাণ মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বৃহদা-কার ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর ঘনঘটীরূপে, প্রচণ্ড প্রভঞ্জনরূপে ভারতাকাশে সহসা উদয় হইল । ভারত-শত্রু সাহাবুদ্দিন-যবন ভারতবর্ষে দিগ্বিকল্পিতপে পদার্পণ করিল । ইতিপূর্বেও একদা নাগরকোট নগরে উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অনাভাবে । অর্ব্বলোতে জয়চন্দ্রের মন্ত্রণায় আসিয়াছিল, অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল । কিন্তু অকৃত-কার্য্য হইলেও তখনই জানিয়া যার যে পৃথুও জয়চন্দ্রের গৃহবিবাদে ভারত ক্রমে দুর্জয় ও বীরশূন্য হইতেছে । এতদিন ধূর্ত শৃগালের ন্যায় প্রয়োগ অব্যবণ করিতে-ছিল, এইকণ জ্বলাজ্বার জয়চন্দ্রের আশ-

দ্রুণে ভারতবিজয় সঙ্কল্প করিয়া উপস্থিত হইল ।

যে গৃহ-বিবাদে দশাননের সর্বনাশ হইয়াছিল ; যে গৃহ-বিবাদে কুব্জকুল নিখূল হইয়াছিল ; পুনশ্চ ভারতে সেই সামাজ্যিক রোগ যে দিন উপস্থিত হইল, সেইদিনেই ভারতবাসী হিন্দুগণের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল । সেই দিনই জানা কষ্টকাঁচ ছিল যে সেই ভয়ানক রোগ চরমে কি শোচনীয় ফল প্রসব করবে । কিন্তু হায় ! কাহারই চৈতন্য হয় নাই ! সেই পাপে অদা পবিত্র ভারতবর্ষ স্বেচ্ছের পদাঘাত ! কুলজার জয়চন্দ্র, কি করিলে ? এ পাপের ভোগ কি তোমার ভোগিতে হইবেনা ? কিন্তু, আমরা কি লিখিতে কি লিখিতেছি ? পাঠক, মার্জনা কর, শুন তৎপর কি হইল ।

সাহাবুদ্দিন লাহোরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, তত্রত্য শাসনকর্তা মহাবীর পুন্দির সৈন্যে তদীয় পথারোধ করিলেন । যোরতর সংগ্রামের পর পুন্দির নিহত হইল, বিজয়োৎকল যবন সেনা “আল্লাহ আকবর” ! যোর রণবাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া সগর্বে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । এই বিবরণ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তাহাতেও তিনি বিপদ অমুভব করিতে পারিলেন না । সাহাবুদ্দিন দিল্লির সীমায় পদার্পণ করিলেন, তখনও পৃথ্বী যোহ নিজায় নিমিত্ত । ক্রমে ধামেশ-

বের নিকটবর্তী নারায়ণ গ্রামে * উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল । পৃথ্বীরাজের প্রিয়পাত্র চন্দ্র ভাট যাইয়া এই কুসংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিল । তখন নিমিত্ত শার্দূলের ত্রায় শূঁও-সিংহ পৃথ্বীরাজ গর্জিয়া উঠিলেন । ইন্দ্রিত যাত্র যোর রোলে রণশঙ্খ ও রণভেরী বাজিয়া উঠিল ; নানাদিকে অধীনরাজবর্গকে আহ্বান করিতে দূত প্রেরিত হইল ; শিক্ষিত সৈন্যদলের আশ্ফালনে নগর টলমল করিতে লাগিল । তখন রাজপুতনায় সৈনিক-শাসন-প্রথা † প্রচলিত ছিল, স্মৃতরাং দেশে বহু লোক, সকলেই সৈনিক, সকলেই সমর-কুশল, সকলেই সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত । স্মৃতরাং দুই এক দিনে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ হইল ; এবং ক্রমেই অধীন নৃপতিবর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পৃথ্বীও জয়চন্দ্রের গৃহ-বিবাদে বাঁহারা পৃথ্বীরাজের বিপক্ষ ছিলেন, ভারতের সাধারণ শত্রুদমন করিতে হইবে বলিয়া, তাঁহারা শক্রতা বিস্মৃত হইয়া একত্রে বন্ধুভাবে মিলিত হইলেন । আহা ! ভারতের সে এক সুখের দিন গিয়াছে !

চিত্রলেখ গঙ্গার্ককর্তৃক দুর্যোধন স-

* বোধ হয় এল্‌ফিনষ্টোন প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা ইহাকেই “টিরোরি” নামে অভিহিত করিয়াছেন ।

† Prudal system. টড সাহেব কৃত রাজস্থানের ইতিহাস দেখ ।

ক্রীক বন্দীকৃত হইলে, যুদ্ধিষ্ঠির তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমার্জুনকে আদেশ করিলেন। ভীমার্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “ মহারাজ, আপনকার এ করুণ ধর্মবুদ্ধি, আমরা বুঝিতে পারিনা। যে শত্রু আমাদেরিগকে এত কষ্ট ও এত লাঞ্ছনা দিল, সে বিনষ্ট হইলেও পরম আত্মাদের বিষয়। তাহাকে কিজনা উদ্ধার করিতে যাইব ? ” উদারচরিত্র-প্রশস্তমনা ধর্মতনয় সৌদরয়কে সাজুনা করিয়া কহিলেন—

“ কহিলা যতক পার্থ অন্যথা নাকরি ।

সে মম পরম শত্রু আমি তার অরি ॥

আত্ম পক্ষে ধরে বৃন্দ করিব যখন ।

তারা শত সৌদর আমরা পঞ্চজন ॥

সেই বৃন্দ হয় যদি পরপাকগত ।

তখন আমরা তাই পঞ্চোত্তর শত ॥ ”

কাশীদাম দাস । *

ধন্য যুদ্ধিষ্ঠির ! ধন্য আর্ষাসুতান !
ধন্য ভারতবর্ষ ! আচ্ছা ! এরূপ উদার ভাব
এইক্ষণ আর দেখা যায় না। তাহাতেই
ভারতের এতদৃশ্য। জয়চন্দ্রের সহিত
অত্ম-কলহে পৃথ্বীরাজের অসংখ্য সৈন্য
নাশ হইয়াছিল ; ১০৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষের
মধ্যে মাত্র ৬৪ জন জীবিত ছিল। বাহা
হউক, তথাপি ছিলক পদাতী, ছিলক
অখারোহী, এবং তিনসহস্র সময়-মাতুল

* “ প্রাচীন রোমের গীতি ” নামক
লর্ডমেকলের প্রথম প্রবন্ধের চরমভাগ
দেখ ।

লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চি-
তোরাদিগ প সমরশায়ী প্রধান সেনাদীপদে
বসিত হইলেন। তিন দিবস উত্তর পক্ষ
পরস্পরকে কিছুই বলিলেন না। চতুর্থ
দিবস প্রত্যুবে বুদ্ধারম্ভ হইল।

সাহাবুদ্ধির স্বীয় সৈন্যের পুরোভাগে
অধপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্বক, তাহাদিগকে
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “ বীরগণ !
তোমরা জয়লোলুপ হইয়া স্বদেশ পারি-
ভাগ পূর্বক, ক্রীপ্ত আত্মীয় স্বজন পরি-
ভাগ পূর্বক, এই কাফেরের দেশে আ-
সিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তোমরা প-
ঞ্জাব জয় করিয়াছ, লাহোর জয় করিয়াছ,
এবং সিন্ধুদেশও জয় করিয়াছ মতা; কিন্তু
সে সকল স্থান তোমাদের স্বদেশ মধ্যেই
বলিতে হইবে। এবং যেসকল বিপক্ষের
সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, তাহারাও আমাদের
সমধর্মী এবং একইরূপ রণকোশলসম্পন্ন।
অদ্য তোমরা প্রবল সিন্ধু নদের পর পারে
উপস্থিত হইয়াছ, পৃষ্ঠদেশে ধরজোতা
কাগার নদী বহিতেছে; যদি তোমরা
কাফের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পলা-
য়নে চেষ্টা কর, পলায়ন করিতে পারিবে
না। কাগার তোমাদের পথ রোধ ক-
রিবে, এবং কাফেরের হস্তে একজনও
রক্ষা পাইবে না। যুদ্ধ করিয়া যদি পরা-
ভূত হও, তাহাতেও যে ফল, যুদ্ধ না
করিয়া প্রস্থানপরায়ণ হইলেও সেই ফল।
মৃতরাং শৃগালের ন্যায় প্রস্থান না করিয়া
সিংহ-বিক্রমে আগপণে যুদ্ধ করাই আ-

মাদের উচিত। জয় পরাজয়ের ছিন্নতা নাই, যদি আল্লার দোওয়ায় জয় লাভ করিতে পার, তবে এই সম্মুখস্থিত বিশাল রাজ্য, ও ভারতের মণিকাক্ষম তোমাদিগেরই। আমি তোমাদিগের প্রভু বটি, কিন্তু এসকল আমার হইলে তোমরা যথাযোগ্য অংশলাভে কেহই বঞ্চিত হইবে না। আমার পরিশেষে বক্তব্য এই-যে এই যুদ্ধে জয়ী হইলে তোমাদের পরমারাধ্য মুসলমান ধর্মেরই জয়। এই ধর্ম-যুদ্ধে যদি প্রাণও যায়, তথাপি স্বর্গে যাওয়া সুরমা-নয়না পৈরীদিগের সহবাসে থাকিয়া শত্রু-করোড়িতে সুস্বাদু সুরাপান করিতে পারিবে। মনোহর আলয়ে বাস; সুমিষ্ট খাদ্য; শত শত সুন্দরী রুমী; এসকলই অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিবে।* এপৃথিবীর সুখ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু স্বর্গের সুখ অনন্তকাল স্থায়ী। অতএব এ যুদ্ধের যত্নও মজল। সুতরাং সাহসকর, অগ্রসর হও, শত্রুযুগে ক্ষেদন কর।” ইহা কহিয়া শরাসন হইতে একটি শর নিক্ষেপ পূর্বক পশ্চাৎদিকে সরিয়া গেলেন। অশ্রুদারী যবন-অস্কারোহীগণ “আম্বাহ আকবর!” বলিয়া গগন কাঁপাইয়া নক্ষত্রবেগে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইল।

পৃথ্বীরাজ স্বীয় সৈন্যগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। দক্ষিণ-পা-

* সেলস্কোরান ৭৭, ১৪০, ১৪৯, ১৫১, ২৭২, ৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

শ্বিক সৈন্যের ভার স্বহস্তে রাখিলেন, বাম পার্শ্ব মহাবীর চাঁদরাওয়ের হস্তে ন্যস্ত করিলেন; অধিকাংশ-অস্কারোহী-সম্মিলিত সৈন্যের মূলভাগ বীরকুলচূড়ামণি সমরে অটল সমরশায়ীর অধীনে ছিল। নির্দ্ধারিত হইল যে সমরশায়ী বিপক্ষ সৈন্যের কেন্দ্রস্থান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবেন, এবং সাহাবুদ্দিন ও অপরাপর মহামদীয় সেনাপতিদিগকে কেন্দ্র রক্ষা করিতে নিযুক্ত রাখিবেন। ঠিক সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও বিপক্ষের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিবেন। এইরূপ সূচ্যবস্থা করিয়া পৃথ্বীরাজ এক ভীষণ সমর-মাতঙ্গ আরোহণ করিলেন। এবং অসিচর্ম তিনবার ভাঙিতবেগে দোলায়মান করিয়া সৈন্যগণের চিত্তাকর্ষণ করিলেন। সকলই নীরব, মিস্ত্রক, স্থির ও অটল। তখন জলদাতীর অতিসুখকর অথচ চিত্ত-উত্তেজী স্বরে কহিলেন “রাজপুতকুল ললামবীর-রম্। তোমরা প্রাতঃস্মরণীয় বাপ্পারাও ও মহাবীর খুয়ানের বংশধর, এই কথাটি যেন স্মরণ থাকে। দুরাশ্রা স্বেচ্ছদুরাচার একবার নাগরকোটে তোমাদের অসির তেজ অমুভব করিয়াও পুনরায় পতঙ্গবৎ জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতে আসিয়াছে। এবার বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া তোমাদিগকে পরাস্ত করিতে; তোমাদিগের ক্রীপুত্রকে অনাথ করিতে; স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জম্মভূমিকে জয় করিতে আসিয়াছে। একি সামান্য আপ্সর্জ! বীরপ্রসূ রাজ-

স্থানে যবনের পদার্পণ! আশ্চর্য্য, বেনমাতা রাক্ষসী ইহাদিগকে এখনও গ্রাস করেন নাই! আশ্চর্য্য, কুলদেবতা একলিঙ্গ মহাদেব স্বীয় সর্বসংহারক শূলে ইহাদিগকে নির্মূল করেন নাই! দেবতারা দেখিবেন রাজস্থানে বীর আছে কি না? তাঁহারা তোমাদের শূরত্বের পরীক্ষা করিতেছেন? তবে কি আর এখনও নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে? আর এক মূর্ত্তও কি পবিত্রা জম্বুদ্বীপে স্বেচ্ছপাদপ্রেগুতে কলঙ্কিত দেখিবে? স্বীয় স্ত্রী পুত্রদিগকে ভীকরাও রক্ষা করে। কাপুরুষেরাও স্বীয় কুলদেবতাদিগকে রক্ষা করে। আর অধিকুলসম্ভূত দেবসন্তান রাজপুত্র কি ভীক হইতেও অধম? বাপ্পারাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে খুমানের সঙ্গে সঙ্ঘেই কি রাজস্থানের বীরত্ব লোপ পাইয়াছে? পৃথ্বীরাজেরাশ্রিতের প্রাণ থাকিতে, তোমাদিগের ন্যায় সমরবজ্রী বীরকুল তাঁহার সহায় থাকিতে সে আশঙ্কা নাই। ঐদেখ শত্রুর তীক্ষ্ণশর শব্দ শব্দ করিয়া আসিতেছে, আর বিলম্ব কেন? দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধারণ কর; কটীৎকন কর; অগ্রসর হও। জয় অনুর-নাশিনী বেনমাতা! জয় হর হর একলিঙ্গ।*

* আমরা এস্থলে চরিত্রাখ্যায়কদিগের পদ্ধতি পরিচায়ক পূর্ব্বক কবিদিগের অনুসরণ করিয়াছি। ডাক্তর ফ্রিমেন সেল্লাফের যুদ্ধের পূর্ব্ব উইলিয়ম ও হেরল্ডের মুখে বেরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, (নর্থান-

ছাডিলেন, সেই ছত্রারের সহিত সহস্র সহস্র বীরগর্জ্জন মিশিল, রণভেরী ঘোররোলে বাজিল। চতুর্দিকে “জয় অনুর নাশিনী বেনমাতা,” “জয় হর হর একলিঙ্গ” ভয়ঙ্কর রণনিবাদ উত্থিত হইল, অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, দিগ্‌মণ্ডল ঘোর কোলাহলে পরিপূর্ণ। হস্তীর রুংহিত, অশ্বের হ্রোষারব, পদাতিক ও অশ্বারোহীদিগের আশ্ফালনে যুগ্মপ্রলম্বে ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। চতুর্দিক ধূলী ও কলম্বকুলে আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে কেবল “মারু মারু” “কাট্ কাট্” শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু কয়েক দণ্ড আর ক্রিচ্ছই অবগণ বা দর্শন হইল না।

পূর্ব্বনির্দেশ মতে সমরশায়ী শত্রু সৈন্যের কেন্দ্রভাগ, ও পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও উভয় পার্শ্ব যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। সমর-মাতঙ্গ ও রাজপুত্র সেনার বিক্রম দেখিয়া মহম্মদীয় পার্শ্বিক সৈন্যেরা ভীত হইল; এবং ক্রমে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেন্দ্রস্থানে তখন সাহাবুদ্দীন ও সমরশায়ীতে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। বহুকাল পরে সাহাবুদ্দিন সমরশায়ীর উপর এক্রপ বেগে বর্ষাকন্টোয়েন্ট ও গালাম ৪৫৫ ও ৪৬৮ পৃষ্ঠা) আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়াছি। বোধ হয় ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের কোন অপমান হয় নাই। ইহাতে আমরা যদি দোষী ছই, তবে অনেক চরিত্রাখ্যায়ক ও ঐতিহাসিকই দোষী।

ঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাঁহার প্রাণনাশ হইত, সহসা তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া মহাবীর চাঁদরাও আগ্রসর হইলেন। তাঁহার রণকৌশলে মহম্মদীয় সেনারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তিনি এক্রপ লম্বহস্তে অসিচালন করিতে লাগিলেন যে, এক এক আঘাতে এক এক জনের মুণ্ড ভূমিসাৎ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণ পার্শ্ব পরাস্ত করিয়া পৃথ্বীরাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু চাঁদরাওয়ের অক্ষুত যুদ্ধকৌশল দেখিয়া পৃথ্বী ও সমরশায়ী নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে এবং একএকবার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মূপতিও মহাবীর সমরশায়ীর উৎসাহ পাইয়া ঈর্ষান্বিত বিক্রমে চাঁদরাও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একজন বীরের ভেঙ্গে স্বীয় বহু সৈন্যের নাশ দেখিয়া সাহাবুদ্দিন চাঁদরাওয়ের প্রতি এক্রপ বেগে আঘাত করিলেন যে, ছিন্ন শির হইয়া সেই শূরশ্রেষ্ঠ রণভূমিতে পতিত হইলেন। প্রিয়তম সেনানীর মৃত্যু দেখিয়া শোকে ও ক্রোধে পৃথ্বীরাজ স্বয়ং সাহাবুদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন। দুই এক যুদ্ধের মধ্যে তদীয় বিশাল খজুর আঘাতে যবনরাজ অস্থপূর্ণ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। ভারতের নিত্যস্ত কপাল ভাদ্রিয়াছে, ভারতের সর্বনাশ হইবে, তাই বলিয়াই কেবল তাঁহার প্রাণবিরোগ হইলনা। স্বীয় সৈন্যেরা অচেতন সাহাবুদ্দিনকে ফেলাইয়া যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া

মেঘপালের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইল। সমরশায়ী বিংশতি ক্রোশ পর্যন্ত তাহাদিগকে অনুসরণপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থের সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। লজ্জা ও ক্রোড়ে সাহাবুদ্দিন অবশিষ্ট কতিপয় সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

থানেশ্বর সমরক্ষেত্র হইতে পরাস্ত ও হতমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর সাহাবুদ্দিন আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সে অপমান দগ্ধ অজারবৎ তদীয় হৃদয়ে ধ্বংস করিয়া সর্বদা জ্বলিত। ফেরেস্তা কহেন “একদিনের তরে তিনি সুখে নিদ্রা যান নাই; এবং জাগ্রত হইয়া ও কেবল শোকে ও লজ্জায় দগ্ধ হইতেন।” * যে সকল সৈন্য ও সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে নানামতে অপমান করেন এবং লাঞ্ছনা দিয়া অনেককে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। এইরূপে দুই বৎসর গত হইল।

এই সময়মধ্যে তুরস্ক, তাজিক, আফগান প্রভৃতি মুশিক্ষিত ১২০,০০০ অশ্বরোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়বার ভারতভূমিতে যাত্রা করিলেন। এই সৈন্যাদিগের মধ্যে অনেকের উচ্চাঙ্গ মণিমুক্তা খচিত, ও বর্ম্ম রজতকাক্ষনে সুশোভিত ছিল। † দিল্লীস্থরও

* ব্রিগ্‌স ফেরেস্তা ১ম বালম ১৭৩ পৃ।

† ঐ। মাসমেনকৃত ভারত ইতিহাসে ১ম বালম ৩০ পৃ।

সাহাবুদ্দিনের অতিথিসংকার করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। সার্বজনীন হিন্দু হুপতি দিল্লীখয়ের অমুঘল হইলেন, সর্বশুদ্ধ তিনলক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র সময়মাতঙ্গ, এবং অসংখ্য পদাতি সমভিব্যাহারে পুনর্বার থানেশ্বর সময়ক্ষেত্রে কাগার নদীর পূর্বপারে বাইরা শিবির সংস্থাপন করিলেন। ভারতীয় ভূপতিগণের জয় বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস, যবন বলিয়া ক্রক্ষেপ নাই। ভাগিরথীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া সকলেই শপথ করিয়াছেন, হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা প্রাণত্যাগ করিব*। হিন্দু হুপতিগণ সাহাবুদ্দিনকে বলিয়া পাঠাইলেন, “যদি তোমার স্বীয় জীবনের প্রতি দিক্কার জন্মিয়া থাকে, তথাপি এতগুলি লোকের পরিবারদিগকে কেন অনর্থক অনাথ করিবে? যদি প্রস্থান করিতে চাও, পথ পরিষ্কার আছে। যদি নিতান্তই মরিতে ইচ্ছাইয়া থাকে তবে অগ্রসর হও। আমরা দেবতার নাম করিয়া শপথ করিয়াছি, রজনীমধ্যে প্রস্থান নাকরিলে নিশি অবসান যাত্রা শত্রুবাহ-ভেদী সময় মাতঙ্গ, আহবামোদে-উন্নত যুদ্ধার্থ, এবং শোণিত-পিপাসু সৈনিক লইয়া তোমাকে আক্রমণ করিব।* এবং তোমার হতভাগ্য সৈন্যকে পদে দলিত করিব।”*

ধৃত যবন যেন এই সগর্ভ বাক্যে ভীত হইরাছে, এই ভাণ করিয়া নতভাবে উত্তর করিল, আমি ভ্রাতৃ-আদেশে যুদ্ধ করিতে

* মারেকুত তারভেতিহাস ১৭৫ পৃ।

আসিয়াছি। আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে ভ্রাতার অমুঘতি ভিন্ন স্বদেশে প্রভ্যাগমন করিতে পারি না। বাহাহউক ভ্রাতার নিকট আপনাদের আদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম, উত্তর আসাপর্গাথ যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিবেন। † এই চাতুরিপূর্ণ উত্তরে হিন্দু-রাজগণ আহ্লাদে অধীর হইলেন। হারে কালসর্প রাখিয়া গৃহমধ্যে স্মৃণে স্মৃণিত সন্তোষে নিবিষ্ট হইলেন।

মহাসমারোহে ভোজ ও নৃত্য গীতে প্রমত্ত হইলেন। সকলেই নিরস্ত্র, সকলেই আমোদে মত্ত, সকলেই অপ্রস্তুত। নিম্নত্রে নিশীথ সময়ে ধৃত যবন-পতি সৈকতে কাগার নদী পার হইয়া অতর্কিত রূপে বিপক্ষ শিবির আক্রমণ করিল। ক্ষণমাত্রে নৃত্য গীত স্তব্ধ হইয়া শিবির মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু বহুসংখ্যক সেনানী সেই অল্প সময় মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া শিবির রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন, ইতিমধ্যে অবশিষ্টেরাও প্রস্তুত হইল। তখন সমস্ত হিন্দুসৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চতুষ্কোণবাহ রচনা করিল। সাহাবুদ্দিন বাহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্বার এক প্রভাঙ্গাপরিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাহ পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দুসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে

† এলফিনষ্টোন ৩১১ পৃ, ও মারে ১৭৫ পৃ।

প্রস্থান করিতে ইচ্ছিত করিলেন। তাহার প্রস্থানের ভাণ করিয়া উর্দ্ধ্বাসে পশ্চাৎ হঠিয়া যাইতে লাগিল। হতবুদ্ধি হিন্দুসৈন্যগণ সেই দুরভিসন্ধির মর্ষভেদ করিতে না পারিয়া ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। 'রণজ-যুক সাহাবুদ্দিন এই অবসরে স্বীয় শরীর-রক্ষক বর্ষধারী ষাদশ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সেই ছত্রভঙ্গ হিন্দু সৈন্য-গণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে প্রো-রিত হইয়া অধিকাংশ হিন্দুসৈন্য হত নিহত ও বন্দীকৃত হইল; অবশিষ্ট প্রস্থান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। দিল্লীস্থর স্বয়ং বন্দীকৃত ও হত হইলেন। কিন্তু সেই ভয়ানক দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াও দ্বিতো-রাধিপ সমরশায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণ বীরের ন্যায় বহুকণ যুদ্ধ করিয়া সাহাবু-দ্দিনের অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত সংহার করেন। অবশেষে স্বীয় অধীনস্থ ত্রয়ো-দশ সহস্র সৈন্য ও পুত্র সমভিব্যাহারে সমুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণভূমিতে বীরশয়নে শায়িত হইলেন।

খানেশ্বরের যুদ্ধের সহিত সেন্নাকের যুদ্ধের অনেক বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাহাবুদ্দিনের সহিত উইলিয়ম কন্নাররের, পৃথ্বীরাজের সহিত হেরল্ডের; পরন্তু সমরশায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণের সহিত গার্ণ ও সোয়েন-তনয় হেকোর স্তম্ভর সাদৃশ্য দেখিতে পা-ওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ গৃহ-বিবাদ, এবং

হেরল্ড ও টাকিগের পরস্পর কলহে সান্স-নেরা যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়া ছিল; পৃথু ও জরচন্দের আত্মকলহে রাজপুত জাতির ও তজ্জপ দুর্দশা হয়। তৃতীয়তঃ পোপের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া উইলিয়ম যেরূপ ধর্মযুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এবং হেরল্ড তাঁহাকে উচিত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল; সাহাবুদ্দিন ও তজ্জপ মুসলমান ধর্ম প্রচার করিতে ও পূর্ব পুত্রব গজাননপতির অধি-রুতস্থান উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন ব-লিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ উইলিয়মের শুল্কশিক্ষিত মর্ষণ সৈন্যের স-হিত দেশহিতৈষী সান্সনেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও যেরূপ কিছু করিতে পারিয়া-ছিলনা; সাহাবুদ্দিনের শিক্ষিত সৈন্যের অগ্রেও রাজপুত সৈন্যগণ সেইরূপ পরাস্ত হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ সেন্নাকের যুদ্ধেই যেমন সান্সনেরা সিংহাসনচ্যুত হন ও ইং-লণ্ডে নরমাণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; খানে-শ্বরের যুদ্ধেও তজ্জপ স্বাধীন হিন্দুরাজ-ত্বের ধ্বংস ও স্বেচ্ছাধিকারের সূত্র পাত হয়।

আমাদের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। কিন্তু যবনিকাপতনের পূর্বে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে। পৃথ্বীরা-জের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীভর জ্বলন্ত চি-তার আরোহণপূর্বক তাঁহার অনুযাত হন। সাহাবুদ্দিনকে করপ্রদানে স্বীকৃত হও-য়াতে পৃথুর জনৈক পুত্র সিংহাসনে অধি-

প্তিত হন। কিরূপে জয়চন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল—তদীয় পাপে ভারতের অপরাপর হিন্দু রাজাদের কি দশা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে,

এস্থলে তাহার পুনঃলেখ নিম্নরূপে। ইহাতেই কি ভারতবাসীর চক্ষু দান হইয়াছিল? ইতিহাসই একথার উত্তর প্রদান করিবে।

শ্রীঃ—

যবন ।

“যবন” শব্দের উৎপত্তি কি এবং কোন্ দেশবাসিরাই বা “যবন” নামে অভিহিত হইত, এপর্যন্ত ইহার স্থির মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান হইতে অধিক। “হিন্দু” এই শব্দের মীমাংসা এক প্রকার হইয়াছে। সিন্ধুর অপভ্রংশ ইণ্ডু হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে যবনশব্দে অভিহিত করেন। এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন “যবন” শব্দের সহিত গ্রীক আণিনিয়া (Ionia) শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে; অতএব পূর্বে গ্রীকদিগকেই যবন কহিত। কিন্তু এই কথাই যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি?

এবিষয়ের সত্য অনুসন্ধান করা একান্ত দুঃস্বপ্ন কার্য। অনুমান আশাদিগের প্রধান সম্বল। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ বোধহয় না। প্রথমে যবন শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারিলে,

যবনদিগের আদিমস্থান কোথায়ছিল সহজেই স্থির করা যাইবে, এবং তাহাদের আচার ব্যবহার জানিলে অনেক বিষয়ের সত্য আপনিই প্রকাশ হইবে।

(১) ধাতু—যু (মিশ্রিত করা) + অন—যবন।

“যৌতি মিশ্রতি, মিশ্রীভবতি বা জাতিভেদাতাভাবাদিতি যবনঃ”। যাহাদিগের জাতিভেদ নাই তাহারাই যবন।

তবে কেবল মুসলমান কেন, অনেক জাতিকেই যবন বলা যাইতে পারে।

(২) (Synonymy) সমবাক্য—স্লেচ্ছ = স্লিচ্ছ-অ। স্লিচ্ছ মিশ্রিত করা।

“গোমাংসখাদকো যশচ বিকচ্ছং বহুভাষতে। ধর্মাচারবিহীনশচ স্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥” বৌধায়ন সূত্র।

যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, বহু ভাষার কথাবার্তা কহে এবং যাহাদিগের কোন ধর্ম নাই, তাহাদিগকে স্লেচ্ছ কহে।

ইহংরূপে ইউরোপীয় নৃসভ্য জাতিদিগকেও তবে স্লেচ্ছ বলা যাইতে পারে!

ইহাতে বোধ হইতেছে পূর্বে হিন্দুভিন্ন সমস্ত জাতিকে স্বেচ্ছ বা যবনশব্দে অভিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দ কেবল মুসলমানদিগকেই বুঝায়।

(৩) যবনের আদিনিবাস—

(ক) মধ্য আর্য্যাবর্তের দক্ষিণপশ্চিম দিকে যবনদেশ। পরাশর।

(খ) যে রেখা লঙ্কাদ্বীপকে দ্বিভাগ করে তাহার ৬০° পশ্চিমে যবনদেশ।

বরাহ মিহির।

(গ) ভারতবর্ষের পশ্চিমে যবনদেশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কাবুল, টাটরী, পারস্য, বাঙ্কিয়া ইত্যাদি দেশ সকল পূর্বে যবনদেশ এবং তত্রত্য অধিবাসিদিগকে যবন কহিত। দেখা যাইতেছে “যবন” শব্দ নূতন নহে। বহু পূর্বকাল হইতে ইহার ব্যবহার আছে। তবে কেবল মুসলমানদিগকে যে যবন বলিত না, তাহা একপ্রকার স্থির নিশ্চয়, যেহেতু মুসলমান জাতির উদয়ের পূর্বহইতে একথা প্রচলিত দৃষ্ট হয়।

(৪) যবনদিগের আচার ব্যবহার—

(ক) “যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোইর্জ-মুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পঙ্ক-বাংশচ শ্ৰাঙ্গধারণঃ”। বিষ্ণুপুরাণ।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ রচনার কাল নিকপণ করা অতীব দুর্লভ কার্য। যদি এখানিকে বহুকালের রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহই মুসলমানদিগকে যবন

বুঝায়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পুরাণ গ্রন্থ নহে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলায় কালিদাস লিখিয়াছেন—

“এসো বাণাসগ হৃৎযাহিং জবনীহিং বগপ্পমালাদারিণীহিং পরিবুদো ইদো এক আঅচ্ছদি পিঅবঅম্মো।”

দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠান্তর।

মহারাজ দুশ্যন্তের পরিচারিকাগণ যবনকন্যা ছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কালিদাস মুসলমানদিগকে যবন বলিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানমহিলারা উত্তম নৃত্যকী, এবং প্রায় স্থপতিগণ তাহাদিগকে রাখিতেন।

রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পারস্যাদিপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানকার ত্রীলোকদিগকে কালিদাস যবনী বলিয়াছেন,—

“পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতপ্তে স্থল-বস্তুনা।

ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুং স্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥
যবনীমুখং দ্বানানং সেহে মধুমদং ন সঃ।

বালাতপমিবাজানামকালজলদোদয়ঃ ॥”

পানিনীপ্রণীত সিদ্ধান্ত কৌমুদী নামক ব্যাকরণে যবনবর্গ বুঝাইবার নিমিত্ত একটি শব্দ দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ইন্দ্র বখন ভব সর্ব কত্র মৃড় হিমমারণ, যব যবন মনুলাচার্যাণ আনুক, (যবনানং লি পত্যাম্) যবনানং লিপিবর্মানী। ১। ৪। ৪৩।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যবনগণ হিন্দু-
দিগের চিরপরিচিত।

ভোক্তরাজসভাসদ কবি কালিদাস
প্রণীত (শকুন্তলারচয়িতা কালিদাস নহে)
মালবিকামিমিত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে,
যে মহারাজ পুষ্পমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞ করি-
য়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব সিন্ধুনদী উ-
ত্তীর্ণ হইয়া অপরকূলে উপস্থিত হইলে
একদল যবন তাহাকে আক্রমণ করিয়া-
ছিল।

যদিও ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে
গ্রিক আইওনিয়া শব্দ হইতে যবন শব্দের
উৎপত্তি, কিন্তু সংস্কৃতবিদ পণ্ডিতগণ এ-
কথা বিশ্বাস করেন না। পুরাণে ইহার
যে রূপ মীমাংসা আছে তাহাই তাঁহার
সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় নৈবম্ভতমুপুজ্য পিসধু
তাঁহার গুণের গাভী হরণ করেন এবং এই
নিমিত্ত তাঁহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত
করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদিও তাঁহার
সম্ভ্রামসমুত্তিগণ বেদবিধি অনুসারে ধর্ম-
কর্ম্যানুষ্ঠান করিতেন, তথাপি তাহাদিগকে
যবন বলিত।

একদা সগররাজা হৈ হৈ তামজজব-
দিগকে সমরে পরাস্ত করেন এবং ষোড়শ
অবমাননার চিক্ষুরূপ তাহাদের মস্তক
মুণ্ডন করিয়া বাড়ী হইতে নির্ক্ষাসিত ক-
রিয়া দেন। যথা—

“ অর্জযুগ্মশিরসঃ কাংক্ষিতং সর্বমুণ্ডান
খাপরান্ ।

কাংক্ষিতং অশ্রুদয়ান্ কাংক্ষিতং মুক্তকচ্ছা-
নখাপরান্ ॥ ”

এস্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে অজ্ঞাতি-
চ্যুত ব্যক্তিদিগকে যবন কহিত।

মহাভারতে দেখিতে পাই যবনজাতি
বশিষ্ঠবেদু নন্দিনীর কায়া হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে।

কিন্তু যদ্যপি আইওনিয়া দেবী, মহা-
ভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থে যাহাতে
যবন শব্দের উল্লেখ আছে তাহাদের কাল
নিকপণ করা যায়, তাহা হইলে এবিষয়ের
মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু একাধা
একপ্রকার অসাধ্যসাধন।

(খ) “ যবনানাং শিরঃ সর্বং কাষো-
জানাং তথৈবচ । ”
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

যবনজাতি তাহাদের সমস্ত মস্তক
মুণ্ডন করে।

(গ) যবনঃ শয়ানো ভূতক্ষে । পানিনি ।
যবনজাতি শয়নাবস্থায় ভোজন করে।

• যবনশব্দ।—

যবন-বিস্ত—ধূনা

যবনপ্রিয়—কালমরিচ

যবনালজ—সোরা

যবনিকা—তাঁবু

যবনেষ্ঠ—রসুন

যবনেষ্ঠা—খেজুর

যবনাশ্ব—যবনদেশীয় ঘোড়া।

উপরি উক্ত বিষয় গুলি সুস্থিরচিত্তে
বিবেচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে

বাক্ত্রিয়ার সমীপবর্তী কোন দেশ যবন-দিগের আদি নিবাস। আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এই জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল; কিন্তু কালক্রমে অধর্ম হইতে পতিত হইলে ইহাদিগকে যবন নাম দেওয়া হয়। একথা প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন কার্য নহে যেহেতু আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী কার্য না করে তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কেহ তাহার বাটীতে আহার করে না এক ছঁকায় ধূমপান করে না সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তবে এক্ষণে আর তাদৃশ হিন্দুধর্মের মান সম্ভ্রম নাই। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যদি এই ব্যক্তি কোন সুযোগে পুনর্বার স্বপদ উদ্ধার করিতে পারিলেন ভাল, নতুবা ইহার সন্তান সমুত্তিগণ কালক্রমে নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে তাহারা ই যবন হইবে।

মহাভারতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ গ্রীকজাতির অভ্যুত্থানের বহু পূর্বে রচিত। বিশেষতঃ পুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যবনগণ তুর্কস্বর সন্তান সমুত্তি। পূর্বকালে সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারাবৃত্ত দেশসমূহ হিন্দুদিগের অধিকার ও আবাসস্থান ছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক দল ভারতবর্ষ জয় ও অধিকার পূর্বক তথায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহারা এই দেশের সৌন্দর্য্য রমণীয়তা

ও উর্বরতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আর স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন না। ক্রমে ক্রমে সমস্ত আদিম নিবাসিদিগকে পরাস্ত ও দূরীকৃত করিয়া সমগ্র আর্ধ্যাবর্তে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারিত করিলেন। তাঁহাদিগের যে অংশ স্বদেশে রহিয়া গেল তাঁহাকেই ইহার যবন নামে অভিহিত করিলেন।

এখানে ইহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের সহিত জ্ঞানেরও বিস্তার হইতে লাগিল। স্বর্গীয় সংস্কৃত ভাষা যাহাদিগের মাতৃভাষা হুতরাং তাঁহারা যে স্বল্প কালমধ্যে ভূদনবিখ্যাত হইবেন তাহা বিচিত্র কি? ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনায় সকলে মনোনিবেশ এবং তৎবিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিলেন। ওদিকে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের দিন দিন অধঃপতন হইতে লাগিল; তাহারা আপনাদিগের তেজ ও বীৰ্য্য বিস্মৃত হইয়া নিচ ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, অধর্ম, অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং গোমাহংস ইত্যাদি অখাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে ভারতবর্ষবাসী হিন্দুগণ যে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। হুতরাং তাঁহারা এককালে তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং তাহাদের নাম স্বেচ্ছা ও যবন রাখিলেন।

পূর্বে যবনশব্দ দ্বারা যে কেবল যুস-

লম্বান জাতিকে বুঝাইত না চক্ষু কণ্ঠ বি-
শিষ্ট মনুষ্য মাত্রই ইহা বুঝিতে পারিবেন ।
ইংরেজ ফরাস ওলন্দাজ ইত্যাদি সমস্ত জা-
তিকেকে যবন বলা যাউত । ইহাতে কি বু-
ঝায় ? যে সকল জাতি হিন্দু ধর্ম্মাভিমানী
কার্য্য করিত না তাহাদিগকেই যবন বলিত ।

হিন্দুগণ অতি বিশুদ্ধাচারী এবং সত্যত
ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন । এবং আপনাদিগের
অন্ততঃ ক্ষমতাবলে কি রাজনীতি, কি সা-
মাজিক নীতি, কি বৌদ্ধ, কি যুদ্ধকৌশল,
কি শিল্প বিদ্যা, সর্ববিদ্যায় ভূমণ্ডলে অ-
দ্বিতীয় ছইয়া উঠিলেন । বাস, মিহির, বা-
ল্মিকী, বরাহ, কালিদাস, বশিষ্ঠ, পরাশর,
নারদ, মনু, ঐকৃষ্ণ ইত্যাদি অসামান্য ধী-
শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই কূলে জন্ম-
গ্রহণ করিলেন, স্মৃতরাং ভাষ্যভিমান ও
আত্মাভিমান তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে আ-

চ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । স্বজাতির ও স্বধ-
র্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, ভাল
বাসা ও সহানুভূতি জন্মিল ; এবং তাঁহা-
দের অন্তঃকরণে ঘোর অহঙ্কারের উদয়
হইল ; এমন কি তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য
জাতিকৈ মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতেও
অস্বীকার করিতেন । স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁ-
হাদের এত ভক্তি জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা
ভাবিতেন—ভাবিতেন যথার্থই, তাহা-
দের ভ্রম ছিল না—সেই ধর্ম্মই সকল
ধর্ম্ম ছইতে শ্রেষ্ঠ । যাহারা সেই ধর্ম্ম মানিত
না তাহাদিগকে অসভ্য, স্বেচ্ছ ও যবন ব-
লিতেন । স্মৃতরাং যবন নামে কোন একটি
জাতি ছিল না । আখ্যাগণ হিন্দু ভিন্ন স-
মস্ত জাতিকেকেই যবন বলিতেন ।

ঐহরিমোহন মুখোপাধ্যায় ।

ভালমানুষ।

কেহ বলিতে পার, কি করিলে “ভাল মানুষ” হওয়া যায়? চলিত কথায় যাহাকে ‘ভালমানুষ’ বলে, অর্থাৎ সদসৎ বিবেকশূন্য, মৃৎপিণ্ডসদৃশ নিশ্চেষ্ট-হৃদয়, ‘গো বেচারী’ ভালমানুষের কথা বলিতেছি না। পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্য না থাকিলে এরূপ ভালমানুষ হওয়া যায় না। যিনি সমস্ত বুঝিয়া, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া ‘ভালমানুষ,’—যিনি রম্যবংশের “জ্ঞানে মৌনং, ক্রমা শক্ভৌ, ভ্যাগে ল্লাঘা-বিপর্যয়ঃ” ইত্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া ‘ভালমানুষ,’ তাঁহার কথা বলিতেছি। যিনি বাক্যে সত্যবাদী, মনে অহমিকাশূন্য, কার্যে কলপ্রায়সী,—যিনি পৃথিবীতে অজ্ঞাত, সমাজে অনাদৃত, পরিবার মধ্যে অবহেলিত হইয়াও সদানন্দ;—যিনি বিপদে প্রায়শ্চেষ্ট এবং সম্পদে ধীর, তাঁহার কথা বলিতেছি।—যিনি কর্তব্যানুষ্ঠানে হিতাহিত বিবেচনা করেন না, যিনি সময়ের গতি অনুসারে শ্রম্য কার্যের গতি নিয়মিত করেন না,—যিনি আশাবাক্যে বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া কার্যকালে পলায়ন করেন না, সেই সচ্ছন্দ মহাত্মার কথা বলিতেছি।

কি করিলে ভালমানুষ হওয়া যায়?

নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলে? কত কত নীতি পড়িলাম, কত নীতিশাস্ত্রবেত্তা দেখিলাম, কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে, জ্ঞানের উন্নতির সহিত নীতির উন্নতি হইল। “সত্যকথা বলিও, মিথ্যা বলিও না” ইহাও কতবার কত প্রকার পড়িলাম, মিথ্যাকথার ফল ও কতবার ভুগিলাম, কতবার দেখিলাম; কিন্তু কখন সত্যবাদী হইতে পারিয়াছি কি? কার্যকালে দেখিয়াছি যে, সর্বদা হিতোপদেশকারের কথাই সত্য হয়।

“ন ধর্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং

ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।

স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচাতে

যথা প্রকৃতা মধুরং গবাত্ পুরঃ ॥”

আরিস্ততলের সময় হইতে ইয়ুরোপে

নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে; কিন্তু ইউরোপের নীতি কিছুমাত্র বিশুদ্ধ হইয়াছে কি? সেই মিথ্যাকথা, সেই প্রতারণা, সেই স্বার্থপরতা, সেই নীচাশয়তা, এখনও আছে। তবে একমাত্র প্রভেদ এই যে, পূর্বকার অধিবাসীরা মনোরতি গোপনের এত কৌশল জানিত না। সভ্যতার সঙ্গে তত্ত্বাবহিও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। দুরাত্ম নীতির অবনতিই ঘটিয়াছে।

তবে কিসে ভালমানুষ হওয়া যায় ?
 ধর্মালোচনা দ্বারা ? কত হিন্দু দেখিলাম,
 কত প্রান্তস্বামী, নিরামিষাশী, চন্দনচর্চিত,
 কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলাম ; কত মেও-
 রাজওয়ালা সুদীর্ঘ দাঁড়িবিশিষ্ট মুসলমান
 দেখিলাম ; রবিবারের সন্ধ্যাকালে কত
 অশ্রুবারিপরিশ্রুত ব্রাহ্মভাতা দেখিলাম ;
 কত “ফুক কোটেড” মিসলরী ‘পারসন’
 দেখিলাম ; কখনও ধর্মের সঙ্গে নীতি মি-
 শ্রিত দেখিলাম কি ? খ্রীষ্টানেরা বলেন,
 এবং ব্রাহ্মেরাও দেখাদেখি বলিতে শি-
 খিয়াছেন, যে মনুষ্য জগদীশ্বরের ‘গ্রেস’
 (Grace) ‘দয়াময়ের দয়া’ না পাইলে
 ধার্মিক অথবা বিশুদ্ধচিত্ত হইতে পারে
 না। এই জগদীশ্বরের কণ্ঠা পাইবার প্র-
 ধান উপায় ‘উপাসনা’। এ ‘উপাসনা’
 ও ত অনেককাল করিলাম। উপাসনা-
 গৃহে বসিয়া জগদীশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া
 কতবার আন্তরিক প্রতিজ্ঞা করিলাম, ক-
 খনও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম
 কি ? পৃথিবীর দাক্ষণ প্রলোভনের সা-
 ক্ষাতে, সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত জগদীশ্বর,
 সমস্ত উপাসনা, কোথায় উড়িয়া গেল।
 ইংরাজীতে এক প্রবচন আছে যে, “যদি
 জগদীশ্বরের সাহায্য চাপ, তবে অগ্রে
 আপনি আপনার সহায় হও”। এ প্র-
 বচন সাংসারিক উন্নতিসম্বন্ধে যেরূপ সত্য,
 নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শুদ্ধ
 উপাসনায় সংসারে অন্ন মিলিবে না ;
 শুদ্ধ উপাসনায় চরিত্রের উন্নতিও হইবে

না। “উপাসনা” অর্থাৎ সন্তোষকর
 ব্যাক্য মনুষ্য ভুলিতে পারে। আপনি
 বড় ধনী, আপনি বড় বিদ্বান আপনি বড়
 ব্রহ্মর, এ সকল কথায় মনুষ্য ভুলিতে
 পারে। কিন্তু জগদীশ্বরের কথায় ভুলিবার
 পাত্র নহেন। তাঁহাকে কার্যে ভূলাইতে
 হইবে। চক্ষু মুদিয়া তুমি বড় ব্রহ্মর, তুমি
 বড় জানী, তুমি বড় মহৎ বলিলে চ-
 লিবেনা। *

তবে কি করিলে ভালমানুষ হইবে ?
 এক উপায় আছে। যুক্ত করিলে। প্র-
 তোক মুহূর্তে, প্রত্যেক কার্যে স্বার্থভাগ
 করিতে হইবে। স্বার্থভাগ চাত্রে-উন্ন-
 তির মূলমন্ত্র। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে
 স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকল প্রকার দো-
 ষের মূলেই এই স্বার্থানুরাগ আছে। লো-
 কের মনে স্বকীয় ক্ষমতার আশিকা স্ফুটী-
 ভূত করিবার জন্য মিথ্যা কথার স্রষ্টি।
 লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন
 হইবার জন্য মিথ্যা কার্যের স্রষ্টি। যত
 কিছু দুর্কর্ম করি, সকলই আত্মাকে সন্তুষ্ট
 করিবার জন্য। জনসম্মুখে বলেন যে, কেহ
 কেহ বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যা-
 শায় দুর্কর্ম করে। কিন্তু আমাদের দৃঢ়

* এস্থলে এরূপ বলা হইতেছে না যে
 উপাসনার কোন কার্যকারিতা নাই। উ-
 পাসনার অন্য অনেক প্রয়োজন থাকিতে
 পারে। কিন্তু শুদ্ধ উপাসনায় চরিত্র উ-
 ন্নত হয় না এই কথা বলা লেখকের অ-
 ভিপ্রায়।

বিশ্বাস যে, যাঁহা তোমার আমার নিকট বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায়, হৃদয়কারীর নিকট তাহা স্বার্থানুসন্ধান ব্যতীত জ্ঞান কিছুই নয়।

এই স্বার্থপরতার যে কত প্রকার মূর্তি আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর দশ অবতার; কিন্তু স্বার্থানুরাগের লক্ষ্যকোটি অবতার। পরের উপকারে কিংবা পরের অপকারে এই একই দেবতার পূজা হয়। কেহ কর্তৃপক্ষের পদানুসরণ করিয়া, কেহবা তাহার অগাধাতাচরণ করিয়া এই এক দেবতারই পূজা করেন। ধর্মের প্রবন্ধ ও নাস্তিকতার প্রবন্ধ এই একই দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হয়। ইনি কখন বা সত্যের বেশ ধরিয়া, কখন বা মিথ্যা কথার বেশ ধারণ করিয়া, কখন বা ভীকতার বেশে, কখন বা নির্ভীকতার বেশে, ইহাঁর সেবকদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন। *

ইউরোপের আধুনিক দার্শনিকেরা নীতির ভিত্তি স্বার্থানুসন্ধানের উপর স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, বুঝিয়া দেখিলে প্রবর্তিত্বিতা ও স্বার্থচিন্তা একই প্রকার কার্যপ্রণালীর উপযোগী বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহাদের মতে স্বার্থে ও পরার্থে অবশ্যম্ভাবী বিস-

* এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ষাদিত্যাদি অঙ্গ বুজির কার্য। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে পরের ইচ্ছা করিলে প্রকারান্তরে আপনাই ইচ্ছা করা হয়। মিলের (Utilitarianism) এই মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

এইমত সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে বুদ্ধি বা যে জ্ঞান থাকিলে পরার্থের মধ্যে ও স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সে বুদ্ধি বা সে জ্ঞান অধিকাংশেরই হুস্ত্রাপনীয়। মিলের মত দুই চারি জন অমানুষপ্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন পরার্থে ও স্বার্থে একই প্রতিপাদন অন্যের পক্ষে হুঃসাধ্য। এই মত সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে পরার্থ ও স্বার্থের ভবিষ্যৎ একত্ব বুঝিলেও স্বার্থ ত্যাগ করা বড় সহজ নহে। বুঝিতে পারি যে গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে আমাদেরই ইচ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এই কথাটি বুঝিয়া করজনে স্ত্রীর অসঙ্কার হইতে টাকা বাঁচাইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্য করিয়াছেন? সংস্কৃতে এক প্রবচন আছে। “কাচঃ কাচঃ মণিমণিঃ” সহস্র যুক্তি প্রয়োগ করিলেও কাচ কাচই থাকিবে এবং মণি মণিই থাকিবে। সেইরূপ যতই কেন যুক্তি প্রয়োগ করুন না, মনুষ্যের মধ্যে আস্র পর বলিয়া যে একটা প্রভেদ, তাহা থাকিবেই থাকিবে। যত দিন মনুষ্যের মনে ধর্ম বিশ্বাস প্রবল ছিল, ততদিন পরার্থের মধ্যে স্বার্থানুসন্ধান অনায়াসেই করা যা-

হইতে পারিত। তখন পর কালের দো-
হাই দিয়া স্বার্থে ও পরার্থে একত্ব প্রতি-
পাদন করা যাইতে পারিত। কিন্তু এখন
আমাদের মধ্যে এরূপ কোন পর কালের
উপর বিশ্বাস নাই। সুতরাং এক্ষণে প-
রার্থের মধ্যে ও স্বার্থবলোকন করা বড়
কঠিন ব্যাপার। তবে ঐহ্যারা “বসুধৈব
কুটুম্বকম্” বলিয়া মনে করিতে পারেন,
তঁাহাদের কথা সত্যত্ব। তঁাহাদের নীতি-
শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে; তঁাহাদিগের জন্য
এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে না। অন্য
দেশে যাহাই হউক, আমাদের দেশে
স্বার্থ ও পরার্থ এক বলিয়া বুঝা অভ্যস্ত
কঠিন। শুদ্ধ কঠিন কেন, একরূপ অস-
ম্ভব। যে জাতির মধ্যে ঐকজাত্য নাই,
ঐহ্যাদের চরিত্র গঠনে কাপুরুষতাই প্রবল,
স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার নির্মাণই ঐহ্যাদের
পৌকষের পরাকাষ্ঠা, তঁাহারা যে কখন
পরার্থে ও স্বার্থে একত্ব দেখিবেন, ইহা
আশা করা ও বাতুলের কার্য। আত্ম
পরের প্রভেদ যত আমাদের মধ্যে, এত
আর অন্য কোন জাতিতে আছে কি না
সন্দেহ।

তবে স্থির হইল, স্বার্থ ত্যাগেই নী-
তির উন্নতি সম্ভব। কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ
শিখিবার উপায় কি? নীতিশাস্ত্র পাঠ
করিয়া বা দৈন্যের উপালনা করিয়া স্বার্থ
ত্যাগ শিখিতে পারিব না। সংসারের
প্রলোভন জয় করিব কিরূপ? এক উ-
পায় আছে; সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থা-

কিয়া। প্রলোভন জয় করিতে পারি-
লাম না, সুতরাং প্রলোভন হইতে আত্ম-
রক্ষার একমাত্র উপায় প্রলোভন হইতে
পলায়ন। সংসার হইতে দূরে, বিজ্ঞান
অরণ্যে কৃত্রিম নির্মাণ করিয়া প্রকৃতি দমন
কর। যদি প্রকৃতি দমন করিয়াছ বলিয়া
বুঝিতে পার, তবে পুনরায় সংসারে আ-
সিয়া মিশিও। নতুবা বিজ্ঞান অরণ্যমধ্যে
এই অনন্ত জগতের অনন্তলীলা ধ্যান ক-
রিতে করিতে জীবন কাটাইও।

যদি কেহ কখন এ প্রবন্ধ পাঠ করেন,
তবে তিনি বলিবেন “হঁ। এ নীতি বাঙ্গা-
লির ছেলের বটে। ‘পলায়ন কর’ এ মহা-
মন্ত্র বাঙ্গালির একচেটিয়া।” কিন্তু আ-
মরা জিজ্ঞাসা করি যদি জয় করিতে না
পারি, পলায়ন করিব না কেন? জয়ের
উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, আমার পলায়নের উ-
দ্দেশ্যও তাহাই। তবে যে জয়কে পলা-
য়ন অপেক্ষা ভাল বলি, তঁাহার কারণ স-
ত্য। শত্রুকে জয় করিলে ভবিষ্যতে
তাহা হইতে বিপদের সম্ভাবনা অল্প।
কিন্তু শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিলে
শত্রুকর্তৃক পুনরুৎপাদন অধিকতর সম্ভব।
কিন্তু যেখানে পলায়নই প্রাণরক্ষার এক
মাত্র উপায়, সেখানে পলায়নই জয়ঃ।
পলায়ন করিতে জানিত না বলিয়া রজপু-
তের ধ্বংস হইয়াছে; পলায়ন করিতে
জালে বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি
ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতেছে। যদি তো-
মরা কেহ এমন থাক যে, শত্রুর সহিত

যুদ্ধ করিতে পার, যুদ্ধ কর; আমার তা-
হাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কেহ আ-
মার মত দুর্বল, আমার মত ভীক হয়,
তবে সে পালয়ন করিয়া আত্মরক্ষা করুক,
তাহাতে আপত্তি করিও না। সকলে তো-
মাদের মত বীরপুত্র হইয়া জয় গ্রহণ
করে নাই।

কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, যদি
সকলেই এইরূপ করিতে যায়, তবে সংসার
চলিবে কিরূপে? দুর্গেশনন্দিনীর তিলো-
ত্তমার মত আমি বলি, “চলিয়া কাজ
কি? এককাল যে চলিল এই দুঃখ।” সং-
সার চলিবে কি না তাহা আমি কি জানি?
আমি আপনাকেই বাচাইতে পারি না। সং-
সার যঁহার সৃষ্টি, সংসার পালন যঁহার
কর্তব্য কর্তৃ, তিনি সংসারের কথা ভাবি-
বেন। তুমি আমি সংসারের পরমাণু
মাত্র। আপনার কর্তব্য সাধন করিতে
পারি না, আবার সংসার। আর এক কথা;
সংসারের অসারতা বুঝিলেই সংসার
ছাড়া যায় না। সংসারে যে রাশি রাশি
প্রলোভন রহিয়াছে, তাহারাই সংসার
চালাইবে। যে শিষ্যকুলল নির্ঘাতা এ
সংসার সৃষ্টি করিয়াছিল, সে ইহার রক্ষার
জন্য অথোই সমস্ত উপাদান প্রস্তুত রাখি-
য়াছিল। সংসার রক্ষার জন্য তোমার
আমার মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিবার প্রয়ো-
জন নাই।

পূর্বে এলা হইয়াছে যে, সমাজ হইতে
বিচ্ছিন্ন থাকাই ভালমানুষ হইবার এক

প্রধান উপায়। এ সম্বন্ধে আরও একটি
গভীর তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে। যদি
প্রলোভন জয় করা ভালমানুষের অর্থ হয়,
তাহা হইলে সমাজশূন্য স্থানে থাকিয়া ভা-
লমানুষ হওয়া যাইতে পারে না। কারণ
যেখানে প্রলোভন নাই, সেখানে প্রলো-
ভনজয় কি প্রকারে সম্ভবিত্তে পারে?
আর এক কথা, কেহ স্থলে থাকিয়া সম্ভ-
রণ শিক্ষা করিতে পারে না। শিশু চির
কাল মাতৃকোড়ে শয়ান রহিয়া সঞ্চরণ
শিখিতে পারে না। তবে প্রলোভন হ-
ইতে দূরে থাকিয়া কি প্রকারে প্রলোভন
জয় শিক্ষা করা যাইতে পারে? যদি কেহ
কখন জিতেপ্রিয় হইতে পারেন, তবে
তাহা কেবল সমাজে থাকিয়াই সম্ভব হ-
ইতে পারে। বালক, সঞ্চরণক্রিয়া শিক্ষা
করিবার পূর্বে অনেকবার ভূপতিত হইবে,
অনেকবার দাক্ষণ ব্যথা প্রাপ্ত হইবে, অ-
নেকদিন খাদ্যের কর-ধারণ করিয়া চলিবে।
সম্ভরণশিক্ষার্থী অনেকবার জলে নিমজ্জিত
হইবে, অনেকবার হাবুডুবু খাইবে, অনেক
বার অন্যের পৃষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া
সাহসের সহিত গভীর জলে যাইবে। সে-
ইরূপ। যিনি বিশুদ্ধচরিত্র হইতে চাহেন,
তঁাহাকেও অনেকবার অনেক প্রকার লো-
কের সহিত ঘিণিতে হইবে, অনেকবার
তঁাহারও পদ-স্থলন হইবে, অনেকবার
তঁাহাকেও দাক্ষণ মনস্তাপ পাইতে হইবে,
অনেকবার তঁাহাকেও “সাদুসল নামে
আছে পান্ডুদাম” ইহা বুঝিতে ও ওখার

আশ্রয় লইতে হইবে। সর্বত্র শিক্ষার নিয়মই এই।

এ তর্কটি বড় আত্মসমায়ক, বড় সামান্য-প্রদ। প্রতিদিন যে এই অসংখ্য দুঃস্বপ্ন ও দুঃশিস্তা করিতেছি, এ সমস্তই কি তবে কেবল চারিত্র-উন্নতির সোপানমাত্র? এখানেও কি জগদীশ্বর মন্দরক্ষ হইতে মন্দরফল নিষ্কাশন করিতেছেন? যেমন তিক্ত ঔষধ সেবন না করিলে কঠিন রোগের উপশম হয় না, সেইরূপ কি দুঃস্বপ্ন না করিলে চারিত্র-উন্নতি হইতে পারে না? চরিত্র-সুবর্ণ বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে কি দুঃস্বপ্ন-অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে?

কথাগুলি বড় মিষ্ট। শুনিলে নৈরাশ্য অন্তর্হিত হয়; হৃদয়ের কঠোরতা দ্রবীভূত হয়; মলিন চিত্ত প্রফুল্ল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কথাগুলি অন্যত্র সত্য হইলেও চরিত্র-উন্নতি সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে না।

প্রথমে দেখাযাউক, আমরা হুতন বিষয় শিক্ষা করি কেন? যতদিন আমরা আত্মাদিগের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকি, ততদিন কোন বিষয় শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। চিনের অধিবাসীরা হুতন বিষয় শিক্ষা করে না; হোরগ, তাহার জ্ঞানে যে তাহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। যেহেতু তাহারা তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে। বালকেরা সঞ্চরণ শিক্ষা করে, কারণ তাহাদের পারীক্ষিক রক্ত তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না। এই জন্তই

বলিষ্ঠ বালক অধিক পরিমাণে ও দুর্বল বালক অল্প পরিমাণে সঞ্চরণ-ক্রিয়া সম্পাদন করে। নৈসর্গিক প্রকৃতি বলে বলিষ্ঠ বালক আপন অবস্থায় সহজে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। আবার নৈসর্গিক কারণ বশতঃই দুর্বল বালক সহজে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। এইরূপে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, অভাব ও অসন্তোষই শিক্ষার প্রধান নিয়ামক। বড় মানুষের সম্মানের লেখা পড়া শিখিতে পারে না। কারণ তাহাদের মনে অভাব ও অসন্তোষ বিদ্যমান নাই।

পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতে হইলেও এইরূপ অভাবও অসন্তোষের অপেক্ষা হইবে। কিন্তু পাপের সঙ্গে অভাবের কোন সম্পর্ক নাই। যেখানে যে সুখ আছে, পাপী তাহা অমানবদনে অধিকার করে; যতক্ষণ তাহাদের শক্তি থাকে, ততক্ষণ সেই সুখভোগ করে, এবং সুখের প্রীতিকারিণী শক্তির হ্রাস হইলেই অন্যত্র সুখের আশায় দাবমান হয়। এইরূপ সুখ হইতে সুখান্তরের অন্বেষণে তাহার জীবন অতিবাহিত হয়; সুতরাং সে কখন অভাবের মুখ দেখিতে পায় না। সুতরাং কখন তাহার অসন্তোষও হয় না। সত্য বটে, সে অনেক সময়ে সুখলাভে বঞ্চিত হয়, সত্য বটে সে অনেক সময়ে সুখের পরিবর্তে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সত্য বটে অনেক সময়ে দুঃখই তাহার সুখের পরিণাম হয়; কিন্তু এ পৃথিবীতে সর্বদা সুখী কে? এ

যে ধার্মিক পুরুষ ধীরপদে মন্দ মন্দ গমনে সংসারে বিচরণ করিতেছেন, ঐ যে উনি সর্বত্রই বিচার করিয়া করিয়া কার্য্য করিতেছেন, উনিই কি সর্বদা সুখী? উহারও কি সুখের পরিবর্তে দুঃখলাভ হয় না? যদি সাংসারিক সুখের কথা বল, সে বিষয়ে পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই সমান। পুণ্যবাণের ও দুঃখ সুখ দুইই হয়; পাপীরও দুঃখ সুখ দুইই হয়। জয়ী সিদ্ধার ও পরাজিত কেটো, জয়ী ওয়াশিংটন ও পরাজিত নেপোলিয়ন, দক্ষীকৃত ল্যাটিমার ও সিংহাসনাভিষিক্ত ক্রমওয়েল, এবিষয়ের সাক্ষ্যস্থল।

আর একটি আপত্তি হইতে পারে যে, সাংসারিক সম্পদ সম্বন্ধে পাপীর অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু পাপীর মানসিক শাস্তিসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক অভাব আছে। আন্তরিক নিকষেগ, পাপীর অভাব; এই অভাবের জন্ত সে অনায়াসে সুখের আশায় ধাবিত হয়। যখন সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও পাপী মনের উবেগ দূর করিতে পারে না, তখনই তাহার মনে পুণ্যাশিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হয়। একথাটির মধ্যে অল্প পরিমাণে সত্য আছে। কিন্তু পাপীর মনে অশান্তিও অধিক লক্ষিত হয় না। আমাদের মনে ধর্ম জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তাহা কাহাকেও দাক্ষণ যন্ত্রণায় ফেলে না। যদি আমাদের ধর্মজ্ঞান (Conscience) প্রবল হইত, তাহা হইলে সকলেই, অন্ততঃ অনেক

কেই, পুণ্যপথে চলিত। যে দেশে শাস্তির নিয়ম বলবৎ, সেদেশে পাপের সংখ্যা অল্প। দণ্ডবিধি প্রবর্তিত হওয়া অবধি আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি অনেক কমিয়াছে। সেইরূপ যদি অন্তরের দণ্ডবিধির কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পাপের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। গোল্ডস্মিথ বলেন, “Conscience is a coward” আমাদের ধর্মজ্ঞানের কোন সাহস নাই। পাপের পূর্বে ইহার নিবর্তনা এত অক্ষুট বলিয়া বোধ হয় যে, লোকে ইহাকে অক্লেশে তাক্কিল্য করিতে পারে। আবার পাপের পরেও ইহার তিরস্কার কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় না। সুতরাং মানসিক শাস্তি সম্বন্ধে যে অভাব তাহাও পাপীর বড় অধিক নয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভাব, তাহা পাপীর নাই। এই জন্যই পাপের ও হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এরূপ কোন প্রধান অভাব থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীতে সভ্যযুগের আবির্ভাব হইত।

আর এক কথা, শিক্ষার অন্য এক নিয়ামক দৃষ্টান্ত। যদি দেখিতাম যে অনেক পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের অবশ্যস্বাবী ফল ভোগ করিতেছে; তাহা হইলে পুণ্য শিক্ষা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হইত। কিন্তু সমাজে এরূপ পুণ্যের দৃষ্টান্ত কয়টি দে-

খিতে পাওয়া যায়? খিনি বাছা দৃশ্যে ভারি পুণ্যাত্মা, তাঁহাকেও বিশেষ করিয়া দেখিলে তও সম্রাসী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয়।

এই সকল কারণে পুণ্যকে শিক্ষার বস্তু বলিয়া গণনা করা উচিত হয় না। এতলে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভাব ও দৃষ্টান্ত সে দুইটিই নাই। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন যে পাপ করিতে ক্রমে-ক্রমে পুণ্য শিক্ষা করিব, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা কখনই সফল হইবে না। একটি গল্প আছে যে, একজন মাতাল তাহার পিতাকে বলিয়া ছিল, “ বাবা তুমিও একদিন মদ খাইয়া দেখ, পরে আমাকে তিরস্কার করিও ” পিতা তদনুসারে একদিন মদ খাইয়া নিজেই মাতাল হইয়া উঠিলেন। সেইরূপ যিনি পাপ করিতে করিতে পুণ্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি অবশেষে নিজেই ঘোর পাপী হইয়া উঠিবেন। অতএব প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই পুণ্য শিক্ষার প্রধান উপায়।

সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া যে এক প্রকার অসম্ভব তাহা অনেক দার্শনিক স্বীকার করেন। বহুকাল হইতে এই পুণ্য শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। একটির নাম স্বাতন্ত্র্যবাদ (Freewill) অপরটির নাম নিযুক্তিবাদ (Predestination)। স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে মানুষের নিজ ইচ্ছাই স-

কল কর্ত্ত্বের নিয়ামক। নিযুক্তিবাদ মতে মানুষ কর্ত্ত্বত্বের অধীন। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, আমি ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারি, পুণ্যও করিতে পারি। নিযুক্তিবাদীরা বলেন যে পাপ পুণ্য আবার ইচ্ছার অনধীন। আমি জগদীশ্বরের কর্ত্ত্বত্ব ক্রীড়াপুতল মাত্র। তিনি আমার শিরে পাপ পুণ্যের ভার যেরূপ নাশ করিয়াছেন, তাহা আমি ইচ্ছা না করিলেও ঘটবে, ইচ্ছা করিলেও ঘটবে না।

“ ভগ্না হৃদীকেশ হৃদিস্থিতেন,

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কয়োমি। ”

এই দুইটি মতের মধ্যে কোন্টি সত্য এবং কোন্টি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করা আমাদের কঠোর অসাধ্য। এক্ষণে ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, যে পৃথিবীতে এরূপ একদল দার্শনিক ছিলেন, যাঁহারা পাপ পুণ্য মানুষের ইচ্ছার বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। ইহারা যে পুণ্য শিক্ষা অসম্ভব বোধ করিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মিল স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন; কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে পুণ্য শিক্ষা অতীব কঠিন ব্যাপার। যাহা মার্জিতবুদ্ধি, নিরোক্ত, জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট অতীব কঠিন, তাহা যে ভোমার আমার নিকট এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

জন্সন্ বলেন, “ যে অধিক কথা বলে, সে কতকগুলি অনর্থক বলিবেই ব-

লিবে।' কথা সম্বন্ধে যে নিয়ম, কার্য সম্বন্ধেও তাহাই। 'যে অনেক কার্য করে, সে কতকগুলি কার্য অনায়াস করি-
নেই করিবে।' এমতটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাংসারিক যে সমস্যাদী অ-
পেক্ষা অধিকতর পাপী হইবেন, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

এস্থলে, আমরা কি বলিলাম একবার তাহা স্মরণ করিয়া দেখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদের যুক্তির প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) স্বার্থত্যাগ শিক্ষাই ভাল মানুষ হইবার প্রধান উপায়।

(২) স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়া হইতে পারে না। একজন সংসার ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে কএকটি আপত্তি আছে। যথা—

(ক) সকলে সংসার ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে না।

(খ) সংসার ত্যাগ করিলে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা করা যায় না। স্বার্থত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই সম্ভব।

(৩) আপত্তিখণ্ডন। (আমরা যথা নাথ্য দেখাইয়াছি যে, সংসারে থাকিলে কোনরূপেই পুণ্য শিক্ষা করা যায় না।)

যদি কেহ এ প্রবন্ধ এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কিজন্য আমরা স্বার্থত্যা-

গকে দুর্জয় ও অজয় শত্রু বলিয়া মনে করি। আমাদের অন্য এক প্রবল প্রমাণ এই যে, এতকাল পৃথিবী চলিয়া আসি-
তেছে, তথাপি পৃথিবীতে ভাল মানু-
ষের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে।
যদি সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া
যাইত, তাহা হইলে এতদিন ভাল মানুষের
সংসার পুরিয়া উঠিত।

অন্য কথা বলিবার পূর্বে আমরা ভাল মানুষের কি অর্থ করি, তাহা আরও একটুকু বিশদ করিয়া বলা উচিত বোধ হইতেছে। 'ভাল মানুষ' এ কথাটিতে প্রশংসাবাচক কিছুই নাই। সংসারের উপকার করিব, পৃথিবীর জ্ঞান বর্দ্ধন ক-
রিব, এসকল উদ্দেশ্য ভাল মানুষের নহে। ভাল করিতে পারি, না পারি, কাহার ও অনিষ্ট করিব না; সংকার্য্য করিতে পারি না পারি, কোন অসংকার্য্য করিব না; মহৎকার্য্য করিতে পারি না পারি, অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না; ইত্যাদি ভাল মানুষের উদ্দেশ্য। 'ভালমানুষ' চাহেন না যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হউক; চাহেন না যে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাঁহার কীৰ্ত্তি বিঘোষিত হউক। 'ভালমানুষ' চাহেন নির্মল, প্রসন্ন, রাগদ্বৈবিবর্জিত, শান্তভাবে পন্ন হৃদয়বৃত্তি। মনস্তত্ত্ব জ্ঞানিত পুথিই ভাল মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। (ক্রমশঃ)

জীবনী—

জীবন প্রভাত ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

বিজ্ঞেতার পুরস্কার ।

‘ছিন্ন তুবারের নায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে !
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাম্ব যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভয় ভূগ প্রাকারে ।’
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পর দিন অপরাহ্নে সেই দুর্গোপরি
অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল । রৌপ্য-
বিনির্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্ত বর্ণের
চক্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত
রাজমণ্ডীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা
শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন । চারি
পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া ভ্রমণ করিতে
হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্নের বায়ু-
ছিন্নোলে হুতা করিতেছে । চারিদিকে শত
শত লোক দিল্লীখরের ও জয়সিংহ ও শি-
বজীর জয়বাদ করিতেছে ।

জয়সিংহ সহাস্য বদনে বলিলেন ‘আ-
পনি দিল্লীখরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অ-
বধি তাঁহার দক্ষিণদিক অরূপ হইয়াছেন ।
এ উপকার দিল্লীখর কখনই বিস্মৃত হই-

বেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয়
হইয়াছে ।’

শিবজী । ‘যেখানে জয়সিংহ সেই
খানে জয় !’

সভাসদগণ সকলে সাধুবাদ করিল ।
জয়সিংহ আবার বলিলেন ‘বোধ করি
আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে
পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই
দুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কখনই
আশা করি নাই ।’

শিব । ‘মুসলমানদিগকে স্মৃণ্ড পা-
ইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম স-
কলে জাগ্রত ও সমজ্ঞ ! পূর্বে কখনও
দুর্গজয় করিতে এরূপ যুদ্ধ করিতে হয় নাই ।’

জয় । ‘বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের
সময় বলিয়া রজনীতে সর্বদাই শত্রুরা স-
মজ্ঞ থাকে ।’

শিব । ‘সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয়
করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্র-
স্তুত দেখি নাই ।’

জয় । ‘শিকা পাইয়া ক্রমে সতর্ক
হইতেছে । কিন্তু সতর্কই থাকুক অথবা
নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি অবা-
রিত, শিবজীর জয় অসিবার্হা !’

শিব । ‘মহারাজের প্রসাদে দুর্গ

জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্যাণরজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে পঞ্চাশ জনকে আমি আশ্রয় এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পা-ইব না।’ শিবজী ক্ষণেক শোকাবুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দীগণকে আ-নয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যাকার যুদ্ধের পর কে-বল তিনশত মাত্র জীবিত আছে। সকলের হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সভাসমুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন ‘সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তো-মরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীখবরের কার্যো-নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও,—আমার আদেশে কেহ তোমাদিগের কেশাশ্রম্পর্শ করিবে না।’

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এ-জন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বি-স্মিত হইয়া আফগানগণ অমেকেই দিল্লী-

খবরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার ক-রিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হ-স্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খজুর আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে স-ভাসমুখে দণ্ডায়মান হইলেন, ‘সদর্পে শিব-জীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্মরণ আসন ত্যাগ করিয়া খজুর দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জনা করুন, আপনি এক্ষণে স্বা-ধীন! আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় ভাণ্ডাক্রমে ঘটে, কিন্তু আ-পনার নায়ক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।’

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্জিত নয়নের একটি পঙ্কজ কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভ-দ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎ-খাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য হ-স্তের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া

তাঁহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘ক্ষত্রিয়-রাজ ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম । যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদসাহের উপর পাদসাহ, জমীম ও আসমানের সুলতান, তিনি এই জন্য আপনাকে নূতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন ।’ রক্তের নয়ন হইতে আর দুই বিন্দু জল পড়িল ।

রাজা জয়সিংহ কহিলেন ‘পাঠান-রাজ ! আপনারও উরুপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন । দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদ-বৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই । দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন ?’

রহমৎখাঁ উত্তর করিলেন ‘মহারাজ ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন বাঁহার কার্য্য করিয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না ; যত দিন এ হস্ত খজা ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জঁমা ধরিবে ।’

শিবজী বলিলেন ‘তাঁহাই হউক । আপনি অদ্য রাত্রি বিজ্ঞাম ককন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পূর্বাশ্রম নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবে ।’ এই বলিয়া রহমৎখাঁকে যথো-

চিত সম্মান ও শুজবা করিবার জন্য একজন প্রহরীকে আদেশ দিলেন ।

রহমৎখাঁ স্থিরনেত্রে ক্ষণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন ‘ক্ষত্রিয়র ! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না । আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন সকলে প্রভু ভক্ত নহে । কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল । অনুসন্ধানদাতা আপনারই একজন সেনা । ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্য লজ্জন কল্পিব না ।’ রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরীগণের সহিত প্রাসাদান্তিমুখে চলিয়া গেলেন ।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল । তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা ; তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ উপস্থিত !

জয়সিংহ শিবজীকে এতদাবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘কাস্ত হউন, একের দোষে সমস্ত সৈন্যের উপর ক্রোধ অনুচিত ।’ পরে শিবজীর সৈন্যাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

‘এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন জায়ািয়াছিলে ?

সৈন্যগণ উত্তর দিল ‘এক প্রহর রজনীতে।’

জয়। ‘তাহার খুঁর্সে কেহই এ কথা জানিতে না?’

সৈন্য। ‘রজনীতে কোন একটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।’

জয়। ‘ভাল, কোন সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে?’

সৈন্য। ‘অনুমান দেড় প্রহর রজনীর সময়।’

জয়। ‘উত্তম। এক প্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? ‘অমুক উপস্থিত নাই,’ ‘অমুক কোথায় গিয়াছে?’ ‘অমুক আসিল না কেন?’ তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কথা হয় নাই? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহস্র জনের ম্লানি অনুচিত; তোমরা দেশে দেশে পূর্বতে পূর্বতে গোমে গোমে মহাবীর রাজা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিজোহী থাকে তাহাকে আনিয়া, নাও যদি সে কল্যা-রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তাহার নাম কর, অন্যায় সম্বন্ধে কেন সকলের মান কলুষিত হইতেছে?’

সৈন্যগণ তখন কল্যাণের কথা স্মরণ

করিতে লাগিল, পরস্পরের কথা কহিতে লাগিল; শিবজীর রোষ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, কিঞ্চিৎ স্নেহ হইয়া বলিলেন ‘মহারাজ! অজ্ঞ যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন আমি চিরকাল আপনার নিকট শ্রদ্ধা থাকিব।’

চন্দ্রাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

‘রাজন! কল্যাণ এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবেলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, যখন দুর্গতলে পৌঁছিয়াছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।’

ভীষণস্বরে শিবজী বলিলেন ‘সে কে, এখনও জীবিত আছে?’

বিজোহীর নাম শুনিলেই জন্য সকলে নিশ্চক্ৰ!—একটি নিশ্বাসের শব্দ ও শূন্য যাইতেছে না, সভ্যতলে একটি শূচিকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শূন্য যায়। সেই নিশ্চক্ৰতার মধ্যে চন্দ্রাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—‘রঘুনাথজী হাবেলদার!’

সকলে নিরীক, বিস্ময়শূন্য।

চন্দ্রাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্রাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রকৃতি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় ক্রুদ্ধবর্ণ হইয়া উঠিল, ওঠে দন্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্র-

রাওকে লক্ষ্য করিয়া সন্তোষে বলিলেন—

‘নিম্নুক, কপটাচারি! তোমার নিম্নায় রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু মিথ্যা নিম্নুকের শান্তি সৈন্য নোরা দেখুক।’

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লোহবর্ষা উত্তোলন করিয়াছেন সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

‘মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণ সংহার করিবেন না। তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।’

‘আবার সভাস্থল নিশুন্ধ। নিঃশব্দে সমস্ত সৈন্য রঘুনাথের দিকে অবলোকন করিতেছে।’

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্তির জায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের ষ্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—“উঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি! রঘুনাথ তুমি এই কার্য্য করিয়াছ! তুমি যে প্রাচীরলঙ্ঘনের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া একাকী অগ্রসর হইতেছিলে, পরে তিনশত সেনা যাত্র লইয়া দ্বিগুণ সংখ্যক আফগানকে পরাস্ত করিয়াছিলে, তুমি বিজোহাচরণ করিয়া কিসাদারকে পূর্বে আক্রমণ সংবাদ দিয়াছিলে?” শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, ‘প্রভু, আমি সে দোষে নির্দোষী।’ দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিরুৎসাহ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পাত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সমূহে, রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত; তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ক্রীত হইতেছে। কলাযে রূপ অসংখ্য শত্রু মধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ দীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জন করিয়া বলিলেন—
‘তবে কি জনা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?’

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নময় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

‘কপটাচারি! এই জন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কুকণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।’

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,— ‘রাজ্য! ছলনা, কপটাচরণ

আমার বংশের রীতি নহে,—বোধ হয় প্রভু চন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারেন।’ অদ্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ করিলেন।

রঘুনাথের স্থির ভাব শিবজীর ক্রোধে আচ্ছাদিত স্বরূপ হইল, তিনি কর্কণভ্রাবে বলিলেন—

‘পাপিষ্ঠ ! নিষ্কৃতি চেষ্টা রূপা ! কু-ধর্ম সিংহের আসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।’

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, ‘আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জনা করুন !’

কিশুপ্রায় শিবজী বর্ষা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাগে আদেশ করিলেন,—

‘বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।’

রঘুনাথ সেই বজ্রমুক্তিতে সেই তীক্ষ্ণ বর্ষা দেখিলেন, সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—‘যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।’

শিবজী আর সহ করিতে পারিলেন না, অর্থাৎ মুক্তিতে সেই বর্ষা কম্পিত হইতেছে একপা সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতি সন্মুখিত সম্মান

বিস্মৃত হইলেন, কর্কণ স্বরে কহিলেন—

‘হস্ত ত্যাগ করুন ; রাজপুত্রদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাজারদিগের সনাতন নিয়ম—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড ; শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।’

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন “ক্ষত্রিয়রাজ ! অদ্য যাছা করিবেন, কলা তাহা অনাথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলেন চিরকাল সে জন্য অনুতাপ করিবেন ! যুদ্ধ-নিয়মে আপনি পারদর্শী কিন্তু রক্ত যে পরামর্শ দিতেছে তাহা অবহেলা করিবেন না।’

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন ‘তাত ! আমার পক্ষম বাক্য মার্জনা করুন, আপনার কথা কখন ও অবহেলা করিব না ; কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখন মনে ভাবে নাই।’ পরে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

‘হাবেলদার ! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সন্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে না।’ তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিলেন ‘অপেক্ষা কর ; দুই বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরীগণ ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বি-

স্রোতকে দুর্গ হইতে নিক্রান্ত করিয়া
দাও ।' প্রহরীগণ সেইরূপ করিল ।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ
হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অবিচলিত
ছিলেন, কিন্তু প্রহরীগণ যখন অসি কা-
ড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর ক্ৰ-
মে কম্পিত হইল, নয়নধর অঁরক্ত হইল ।
কিন্তু তিনি সে ভীষণ উদ্বেগ সংযম করি-
লেন । শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃ-
ত্তিকা পর্যন্ত শির নমাইয়া, নিঃশব্দে দুর্গ
হইতে প্রস্থান করিলেন ।

সন্ধার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জ-
গৎ আৱৃত করিতেছে, একজন পথিক
একাকী নিঃশব্দে পার্বত হইতে অবতীর্ণ
হইয়া প্রাস্তরাভিমুখে গমন করিলেন ।
প্রাস্তর পার হইলেন, একটি গ্রামে উপ-
স্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর এ-
কটি প্রাস্তরে আসিলেন । অন্ধকার গ-
ভীরতর হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রহিয়া
রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, অন্ধ-
কারে সে পথিককে আর দেখা গেল না,
তাঁহার পর আর কেহ সে পথিককে দে-
খিতে পাইল না ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

• চন্দ্রাও জুমলাদার ।

'আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দেহ যেন দেহ,
হৃদে জ্বলে হলাহল ।———'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চন্দ্রাও জুমলাদারের সহিত আমা-
দের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ
ধীশক্তি, অসাধারণ বীৰ্য, অসাধারণ দৃঢ়
প্রতিজ্ঞা । তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা
৫। ৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূরহইতে
দেখিলে সহসা তাঁহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎ-
সরের লোক বলিয়া বোধ হয় । প্রশস্ত
ললাটে এই বয়সেই দুই একটি চিত্তার
গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের
কেশ-দুই একটি শুদ্ধ । নয়ন অতিশয়
উজ্জ্বল ও তেজোবাজ্বল, কিন্তু চন্দ্রাওকে
যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিভেন তাঁহারা
বলিতেন যে চন্দ্রাওয়ের তেজ ও সাহস
যেৰূপ দুর্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং
ভীষণ অনিবার্য স্থির প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ ।
সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটি ভাব বিশেষ
রূপে ব্যক্ত হইত । দেহ যেন লৌহবি-
নির্মিত ও অসীম পরাক্রান্ত; যাঁহারা চন্দ্র-
াওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ
গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত
ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অস্পৃশ্য
স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভয়ানক জুমলাদারের সহিত
বিবাদ করিতেন না । এ সমস্ত ভিন্ন চ-
ন্দ্রাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল
তাঁহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না ।
বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দি-
বারাত্র জ্বলিত । অসাধারণ কুচিসংকালমে
আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অ-
তুল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবল-
ম্বন করিতেন, থকাহন্তে সে পথ পরিষ্কার

করিতেন ; শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্রাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অল্প বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। একপা অসাধারণ পুরুষের পূর্ব রক্তান্ত জানা আবশ্যক ; সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশরক্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারি।

ঠাঁহার জন্মরক্তান্ত তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাও জানি না, অতি উন্নত রাজপুতকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতি সিংহ চন্দ্রাওকে বাগ্যাকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য করিত, গজপতির পুত্র কন্যাকে বড় করিত, ও সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিত।

যখন চন্দ্রাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, তখনই গজপতি ঠাঁহার গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, হৃদয়মণীর তেজ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্রাওকে ভাল বাসিতেন, ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত করেন।

সৈনিকের ব্রত ধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্রাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ, যে স্থানে প্রাণনাশের অতিশয় সম্ভাবনা, যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাসীকৃত হইতেছে, রক্তজ্যোত বহিয়া যাইতেছে, ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুকারে ও আত্মের আত্মনাশে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের বালক নিঃশব্দে অনুর-বীৰ্য্য প্রকাশ করিতেছে ; যুদ্ধে রব নাই, কিন্তু ময়ন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত, ললাটে কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ক্রোধ-চ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ ! যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে,—চন্দ্রাও তথায় নাই ; অপ্ৰত্যাশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়াংকালে পাদচারণ করিতেছে ! চন্দ্রাওয়ের উদ্দেশ্য কঁতক পরিমাণে সাদিত হইল, তিনি একগুণে অজ্ঞাত ব্রাহ্মণশিশু নহেন, ঠাঁহার পদবুদ্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্রাও একগুণে একজন অসাধারণ সাহসী তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্যাদারুদ্ধির সহিত চন্দ্রাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম দেখিয়া গজপতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, বিজয়ের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন ‘চন্দ্ররাও ! অদ্য তোমার সাহসেই আমাদিগের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি ?’ চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন ‘প্রভুর সাধুবাদে দাস যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে, আর অধিক সে কি চাহিতে পারে ?’ গজপতি সন্তোষে বলিলেন ‘মনে ভাবিয়া দেখ, বাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল । অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি,—চন্দ্ররাও ! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই ।’ চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—

‘রাজপুত্র বীর কখনও অঙ্গীকার অনাথ করেন না জগতে বিদিত আছে । বীরশ্রেষ্ঠ ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন ।’

সুভানু সকলে নিৰ্বাক নিস্তব্ধ ! গজপতির মাথার যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল ; অসি কোষ হইতে অর্ধেক নিক্ষেপিত করিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—

‘অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্র দেশে জন্ম, রাজপুত্রহিতানিগের দম্ভা মহারাজ্ঞীনিগের সহিত পার্বতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকি-

বার অভ্যস্ত নাই । অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ কর, পরে মহারাজ্ঞীর কৃত্যের সহিত রাজবংশীয়া বালিকার বিবাহ দিবার কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করা বাইবে । এখন অন্য কোন যাজ্ঞা আছে ?’

সুভানু সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন ‘অন্য কোন যাচুঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব ।’

সত্য ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরে বিস্মৃত হইলেন, সেদিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন । চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, প্রায় দুই দণ্ড এইরূপে পাদচারণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের কদম ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল । তাঁহার সে সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে আমরা অশক্ত, সে সময়ে তাঁহার মুখের ভীষণ আকৃতি দেখিলে বোধ হয় অয়ং মৃত্যুও চকিত হইতেন ।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটি দীপ জ্বালিলেন,—একখানি পুস্তকে সমস্ত কি লিখিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন । শেষে বিকট হাস্য মুখ মণ্ডলে দেখা গেল ।

তঁাহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘চন্দ্র! কি লিখিতেছ?’ চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন ‘কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।’

বন্ধু চলিয়া গেল! চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেইটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটি ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নিৰ্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরং-জীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্ধি-ধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতি সিংহ হত হইলেন, কিন্তু যে তীর তাঁহার বক্ষ বিদৌর্ণ করে তাহা শত্রুহস্ত নিক্ষিপ্ত নহে।

তাঁহার পর যখন যশোবন্তের রাজ্যী সেই যুদ্ধে পতির পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল যে গজপতি নামক একজন সেনানীর ভীকতা ও কপটচাচরিতাতেই পরাজয় সাধন হইয়াছে। রাজ্যী সে সময়ে বিচার করিতে অসমর্থ, আদেশ করিলেন যে কপটচাচারীর সন্তান সন্ততি মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হয়, ও সমস্ত সম্পত্তি রাজ্যধীনে লীভ হয়। গজপতির কপটচাচারিতার সংবাদ কে দিল তাহা লক্ষ্য প্রকাশ হইল না।

গজপতির অমাথা বালক ও বালিকা

মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হইয়া পদ-ব্রজে অন্য দেশে যাইতেছিল, রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। রাজ্যীর ভয়ে হতভাগাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেও কেহ সাহস করিল না। পথিমধ্যে একদল দম্মা সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অস্পবয়সেই তেজস্বী; রজনীযোগে দম্মাদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দম্মাপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে প্রভূত অর্থ ও মণি মাণিক্য আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সম্রাট লোক হইলেন। ‘টাকা থাকিলে সব সাজে,—’ চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুত-বংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতি সিংহের একমাত্র হুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন সকলে দেখিতে পাইল, তাঁহার যথার্থ সাহস বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ জায়গীর ও বাহ্যাদেশের দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাজে সমাদর করিলেন। চন্দ্ররাও আরও দুই তিনটি বড় ঘরে বিবাহ করিলেন, বড় লোকের স-

হিত মিশিতে লাগিলেন, বড় রকম চাল অবলম্বন করিলেন। আর কি করিলেন বলার আবশ্যক কি? যে সমস্ত স্ত্রীমণ্ডল কোশলে আমরাই ‘বড় লোক’ হই, সমাজের শিরোভূষণ হই, পদ মর্যাদা রুদ্ধ করি, সঙ্গে সঙ্গে দস্ত ও গাভীরাও রুদ্ধ করি,—চন্দ্রাও তাহাই করিলেন। তবে চন্দ্রাও অসভ্য, তিনি অহস্তে পিতামহের গজপতিক্রমে হনন করিয়া সে উন্নত বংশের সর্বনাশ করিয়াছিলেন—আমরা স্ত্রীমণ্ডল, আমরা চাতুরী ও মোক্ষমা অরূপ স্ত্রীমণ্ডল উপায়ে কত সোণার সংসার ছার খার করি, কেহ নিন্দা করিতে পারে না, কেননা এ সভ্য ‘আইন সম্মত’ উপায়। চন্দ্রাও অসভ্য, যুদ্ধে ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন পদবুদ্ধির চেষ্টা পাইতেন, দেশে দেশে যশোবিস্তারের চেষ্টা পাইতেন। আমরা স্ত্রীমণ্ডল, বক্তৃতা স্বরূপ বাগ্ম্যুদ্বে বা সংবাদপত্র স্বরূপ লেখনীযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়া রাজার নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করি, অচিরে ‘দেশহিতৈষী মহল্লোক’ হইয়া উঠি! চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিতে থাকে, সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে, দেশে দেশে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে—আমরা ‘বড়লোক!’

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

লক্ষ্মীবাই ।

“স্বামী বনিতার গতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা ।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অনাজন,
কেহ নহে মুখ মোক্ষদাতা ।”

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।

ষাটশব্দ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দাবেশী চন্দ্রাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজধানী হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। এক দিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাড়িতে, কয়েক দিন লুকায়িত থাকেন, স্ত্রীমণ্ডল অনাথ অস্পৃশ্য বালককে দেখিয়া কেহই মুক্তিভিক্ষা দিতে পরামুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসার স্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল। নানা দেশে পর্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্বপ্রাপ্তি অবলম্বন করিয়া জীবন বাপন করিল। পূর্ব গোবর কথ্য পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা, বালকের মনে সর্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অতিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ, কাহাকেও বলিত না, কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্বতশৃঙ্গোপরি উ-

পবেশন করিয়া একাকী প্রাণ তরিয়া রো-
দন করিত, পুনরায় চক্কর জল মোচন
করিয়া স্বকার্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব
হৃদয়ে যেন আপনাই জাগরিত হইতে লা-
গিল। অল্প বয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন
কখন প্রভুর শিরশ্রাণ মস্তকে ধারণ করিত,
প্রভুর অসি কোবে ঝুলাইত। সঙ্ক্কার স-
ময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চরণদিগের
গান উল্লেস্বরে গাইত, নৈশপথিকেরা
পর্বতগুহার সংগ্রাম সিংহ বা প্রতাপের
গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অ-
ষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর
কীর্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্যের
কথা, চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের জায়
মহারাজীরদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দ-
ক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন,
চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎ-
সাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট
যাইয়া একটি সামান্য সেনার কার্য প্রা-
র্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, ক-
য়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন,
একটি হাবেলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন,
ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে
পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আ-
মাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়া-
ছিলেম বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিব-
জীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুম-

লাদারের অধীনে একজন হাবেলদারের
মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হ-
য়েম। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরা-
তন ভৃত্য ও আপন বাল্যস্বয়ং বলিয়া চি-
নিলেন; পিতৃহস্তা, বা দস্যুরপী, বা ভগি-
নীপতি বলিয়া জানিতেন না, স্মৃতরাং
তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ ক-
রিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অ-
ভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অস্পৃহা জুম-
লাদারের ললাট অতু পুনরায় কুণ্ডিত
হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বি-
ক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল,
চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। প-
তঙ্গ বা কীট আমাদের পথের সম্মুখে
আসিলে আমরা পদসঞ্চালন দ্বারা দূর্ভা-
গ্যাকে হত করিয়া পথ পরিষ্কার করি—
চন্দ্ররাও ও কোনদিন গোপনে রঘুনাথকে
হনন করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিবেন
ভাবিলেন। কিন্তু যখন রঘুনাথের বংশো-
রাশি তাঁহার নিজের যশকেও স্তান করিল,
যখন লোকে বালকের সাহস দেখিয়া
বিক্রমশালী চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম ও বিন্মৃত
হইতে লাগিল, চন্দ্ররাও তখন মনে মনে
প্রতিজ্ঞা করিলেন ‘এ বালককে ভীষণ-
তর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক,—ইহার যশ
বিনষ্ট করিব।’ চিন্তা করিতে করিতে
চন্দ্ররাওয়ের নয়ন ধ্বংস করিয়া জ্বলিয়া
উঠিল, মৃত্যুর ছায়া যেন সেই কুণ্ডিত ললা-
টকে আবৃত করিল।

চন্দ্রাওয়ের দ্বিঃ প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মজ্জণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অল্প রত্ননাথজী দৈবযোগে এগ্নে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিজোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্রাওও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী ঘাইলেন। পাঠক চল চল, আমরাও এক বার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলেন, বহিঃদ্বারে নহবৎ ঘাঙিড়ে লাগিল, দাস দাসী শশবাস্তে প্রভুর সম্মুখে আসিল, গৃহিণীগণ পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসীগণ সাংক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্রাওয়ের আগমন বার্তা সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইল।

সায়ংকালে চন্দ্রাও অন্তঃপুরে আসিলেন, লক্ষ্মীবাই ভক্তি ভাবে স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহাঃাদির আয়োজন করিয়া স্বামীকে আহ্বান করিলেন। চন্দ্রাও আহাঃে বসিলেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শাস্তা, দীরা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত লো-

কের মধ্যে অপভাবী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃদ্ধ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সাহসনা করিবে? বালিকা পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, এগ্নের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন শান্ত, সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন,, স্বামীর সেবার রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সন্তান ও সদয় হয়েন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দয় বা বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? চন্দ্রাওয়ের হৃদয়ে প্রণয় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, অভিমান, জিহাংসা, উচ্চাভিলাষ, অপূর্ব্ব বিক্রমে সে হৃদয় পূর্ণ; ওথাপি তিনি জীব প্রতি নির্দয় ছিলেন না, দাসী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন, লক্ষ্মীও দাসী স্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, স্বামীর স্বভাব জানিয়া সর্বদা ভীত থাকিতেন, একটি মিষ্ট কথা শুনিলে আপনাকে পরমা ভাগ্যবতী বিবেচনা ক-

মিডেন, শ্যামীর একান্ত প্রণয় কি কখন জানিতেন না, সুতরাং কখন আশী করেন নাই।

এইরূপে সংসারকার্যে ও পতিসেবার এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতি-বাহিত হইতে লাগিল, ধীর শাস্ত লক্ষ্মী যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শাস্ত, নিকরোগ! পূর্বের কথা প্রায় তুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বালাকালের স্মৃতি, বালাকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভাতা রত্ননাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই স্মরণরক্তশূন্য গাওঁস্থল দিয়া মুড়ইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রু বিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্যে প্ররক্ত হইতেন।

ক্রমে চন্দ্রাও আরও চারি পাঁচটি দার পরিগ্রহ করিলেন, কাহারও উচ্চবংশের জন্য, কাহারও বিপুল অর্থের জন্য, কাহারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের জন্য, এই সকল কন্যা গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রাও বালক নছেন, প্রণয় বা সৌন্দর্যের জন্য কাছাকেও বিবাহ করেন নাই। তথাপি লক্ষ্মীবাইয়ের সৃষ্টিগী ঘটে, — তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য নহে, তিনি প্রথম স্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশ-সমুদ্ভূতা এই জন্য। চন্দ্রাও সকলকে ভূরি ভূরি গহনা, ভূরিভূরি অর্থ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতেন, কেহ কোথাও যাইলে অনেক দাস দাসী, অশ্ব, হস্তী পদাতিক ও বাদ্যকর সঙ্গে দিতেন, সক-

লেই জানিতে পারিতেন চন্দ্রাওয়ের পরিবার যাইতেছেন, এ সমস্ত আড়ম্বর তাঁহার আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, রমণীদিগের মনস্তৃষ্টির জন্য তত নহে। বাটিতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয় করিতেন, দাসীর ন্যায় সকলেই প্রভুর সেবা করিতেন।

চন্দ্রাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু দৈবৎ ক্ষীণ। জুগল কি স্নন্দর সূচিকণ, যেন সেই পরিষ্কার শাস্ত ললাটে তুলী দ্বারা স্ফুট। শান্ত, কোমল, রূক্ষ নয়ন দুটিতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গাওঁস্থল স্নন্দর, সূচিকণ, কিন্তু দৈবৎ পাণ্ডুবর্ণ। সমস্ত শরীর শাস্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা, উন্নততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সেইরূপ সৌন্দর্য ও স্রজাগ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাতাবে শুষ্ক, নতশির। পদ্মা-সনা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের চাঁক নয়ন, সুদীর্ঘ রূক্ষ কেশভার, কোমল স্রগোল দেহ দেখিতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্ল সূর্য্যাকিরণ নাই, জীবনাকাশ চিন্তামেঘাচ্ছন্ন।

চন্দ্রাও গজপতিকে হনন করিয়াছেন, লক্ষ্মী ততদূর জানিতেন না, কিন্তু

স্বার্থসাধনের জন্য পিতার বংশের সর্ব-
নাশ করিয়াছেন তাহা চন্দ্ররাওয়ের আচ-
রণে ও কখন কখন দুই একটি কথা হইতে
বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন,
তবে সে বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক-
রিতেন না।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইলেন
যে তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্ররাওয়ের অধীনে
হাবেলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করি-
য়াছে। কথাটি সাজ হইলে চন্দ্র ঈষৎ
হাসিলেন; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন,
সে হাসি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শুষ্ক হ-
ইয়া গেল।

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতে-
ছেন, ইত্যাদি নানা ভাবনা সর্বদাই ল-
ক্ষ্মীর মনে জাগরিত হইত, কিন্তু স্বামীকে
ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না,
স্বামী বাটি আসিলে তাঁহার অধীনস্থ
পদাতিক বা ভূতাদিগকে অর্থে বশ ক-
রিয়া গোপনে সংবাদ জানিতেন। তাঁ-
হার মনে সর্বদাই ভয় হইত পাছে
স্বামী ভ্রাতার অনিষ্টসাধন করেন।
কি জন্য এরূপ ভয় হইত তিনি জানি-
তেন না।

একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্টবাক্যে
প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদবু-
গলের নিকট বসিয়া বলিলেন—, দা-
সীর একটি নিবেদন আছে কিন্তু বলিতে
ভয় করে।’

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাবুল চর্ষণ

করিতেছিলেন, সম্মুখে বলিলেন—‘কি
বল না।’

লক্ষ্মী বলিলেন ‘আমার ভ্রাতা বা-
লক অজ্ঞান।’

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গভীর হইল।

লক্ষ্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি
তাবিলেন কপালে যাহা থাকে আজ ব-
লিব। প্রকাশ্যে বলিলেন—

‘সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অ-
ধীন।’ চন্দ্ররাও ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

‘না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী
বলিয়া পরিচিত।’

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি
যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে,
—চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি
ক্রুদ্ধ। ‘ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন—

‘বালক যদি দোষ করে, আপনি
না মার্জনা করিলে কে করিবে?’

চন্দ্ররাও পক্ষস্বরে বলিলেন, ‘নি-
র্কোষ আলোকের নিকট চন্দ্ররাও পরামর্শ
লন না, বিরক্ত করিও না।’

লক্ষ্মী বুঝিলেন চন্দ্ররাওয়ের শরীরে
ক্রোধের উজ্জেক হইতেছে; অন্য বিষয়
হইলে আর একটি কথা কহিতেও সাহস
করিতেন না, কিন্তু ভ্রাতার জন্য স্নেহ-
ময়ী ভগ্নী কি না করিতে পারে? চন্দ্র-
রাওয়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন ক-
রিয়া বলিলেন ‘দাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা
করন রঘুনাথের আপনি কোন অনিষ্ট
করিবেন না।’

চন্দ্রাণ্ডয়ের ময়ন আরক্ত হইল, তিনি লক্ষ্মীকে সঙ্গেরে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে নিস্তান্ত হইলেন ।

তাঁহার পর চন্দ্রাণ্ড অদ্যই প্রথম বাটি আসিয়াছেন, রঘুনাথের বাচা ঘটয়াছে লক্ষ্মী তাঁহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে কৃতাদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেম মনে স্থির করিয়াছিলেন ।

চন্দ্রাণ্ডয়ের আহার সমাপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাঁহুল হস্তে তথায় যাইলেন । চন্দ্রাণ্ড তাঁহুল লইয়া বলিলেন—

‘এখন যাও, আমার বিশেষ কার্য আছে, যখন ডাকিব, তখন আসিও ।’ লক্ষ্মীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সস্তাষণ । লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্রাণ্ড সতর্ক ভাবে দ্বাররুদ্ধ করিলেন ।

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে একটি বাস্তব বাহির করিলেন, সেটি খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন । দেখিতে হিমাবের পুস্তক । প্রায় দশ বৎসর পূর্বে গজপতি কর্তৃক যে দিন

সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটি ঋণের কথা লিখিয়া-ছিলেন, সেই পাত খুলিলেন, স্বন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে:—

‘মহাজন . . . গজপতি ;

ঋণ অবমাননা ;

পরিশোধ হইবে তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে
তাঁহার সম্পত্তি নাশে, তাঁ-
হার বংশের অবমাননায় ।

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন ; ঈষৎহাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থাশ্বে লিখিলেন ।

‘অদ্য পরিশোধ হইল ।’

তারিখ দিয়া পুস্তক বদ্ধ করিলেন ।

দ্বার উন্মোচন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, ‘লক্ষ্মী ভক্তি ভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন ; চন্দ্রাণ্ড লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “অনেক দিনের একটি ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি ।”

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন ।

চন্দ্রাণ্ডয়ের স্বন্দর অনিমদনীয় হিমাবে অদ্য একটি ভুল হইল । এ ঋণ পরিশোধকার্য অদ্য সমাপ্ত হয় নাই,—অ’র এক দিন হইবে ।

শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্তন ।

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ । কৃষকসন্তানে এবং বিজ্ঞানবিৎ তনয়ে এমন কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহাকে আমরা স্বভাবজাত পার্থক্য বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি । যখন উভয়েই পঞ্চমবর্ষীয় বালক মাত্র, তখন উভয়েরই স্বভাব প্রায় একরূপ । একই ধূলখেলনা, প্রায় এক প্রকার ত্র্যেবোই অভিকৃচি, ঈপ্সিত ত্রব্য না পাইলে উভয়েরই ক্রন্দন ইত্যাদি নানা প্রকার একতা লক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হইবা মাত্রই একজন গরু লইয়া মাঠে লাঞ্ছল দিতে চলিল, আর অপর বিদ্যালয়ে ঢুকিয়া লেখা পড়া শিখিয়া নিউটন ও হুকের আবিষ্কার সকল পরীক্ষা করিতে লাগিল । এই সন্ধিস্থান হইতেই তাহাদিগের বিভিন্নতার সূত্রপাত । ত্রিশ বৎসর পরে দেখ একজন আকাশস্থ জ্যোতির্মণ্ডলীর নিয়মানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল, আর অপরের সেই মাঠে সেই গরু লইয়া জ্বালাতন । স্মরণ্য ইহাদিগের স্বভাবজাত বৈলক্ষণ্য যে কিছু ছিল, ইহা কোন অংশে সপ্রমাণিত হইতেছে না । কৃষককেও যদি পণ্ডিত সন্তানের

সহিত একত্রে লেখা পড়া শিখান যাইত, হয়ত তাহা হইলে সেও তাহার মত বিজ্ঞ হইতে পারিত । প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, কারণ কৃষককে ছাড়িয়া দিয়া সভ্যসমাজ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, এক পণ্ডিতের দুই পুত্র সমান সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না । ত ইহা স্থির হইবে যে সকল অসভ্যজাতেরা মূর্থ হইয়া থাকিব বলিয়া জন্মিয়াছে, এটি ঠিক কথা নহে । সভ্যজাতিদের সহিত যদি তাহারাও লেখা পড়া শিখিতে পায়, সম্ভবতঃ তাহারাও সভ্যদের সহিত সমান আসন অধিকার করিতে পারে । এই জন্যই উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ । এই মতাবলম্বীরা আরও বলিয়া থাকেন যে বিধাতার পক্ষপাতিত্ব আমরা দেখিতে চাহি না ; এবং যাঁহাতে তাঁহাকে পক্ষপাতী প্রমাণ করে, তাহা বিশ্বাস করিতে ও চাহি না । মূল কথা, শিক্ষাই আমাদিগের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্যের কারণ ।

এই মতটি ঠিক সত্য নহে ইহা আমরা দেখাইব । প্রথমতঃ এতৎসম্বন্ধে দুই একটি আনুষঙ্গিক কথার অবতারণা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে ।

সকলেই জানেন যে, আমাদের মানসিক ভাবের সহিত কতকগুলি শারীরিক অঙ্গতন্ত্রের সম্বন্ধ আছে। দুঃখ হইলে আমরা ক্রন্দন করি। ক্রন্দন না করিলেও মুখের অনেকটা বিকৃতি হয়—চক্ষু ছোট হইয়া যায়; চক্ষের তারা প্রায় অদৃশ্য হয়; নিশ্বাস প্রাশ্বাস প্রবলবেগে বহিতে থাকে; কপোল কুঞ্চিত হয়; মস্তকে ভার বোধ হয় এবং সাধারণতঃ হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া থাকি। আহ্লাদ হইলে চক্ষু দীর্ঘ হয়; হৃদয় উচ্চ হইয়া উঠে এবং অঙ্গ অঙ্গ দন্ত বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাবের সহিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রক্রিয়ার সম্বন্ধ। * অভ্যাসবশে এই সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। কখন কখন আবার কোন কোন অঙ্গচালনা কোন কোন ভাবের সহিত আমরা ইচ্ছা পূর্বক সংলগ্ন করিয়া থাকি। এবং এই অঙ্গচালনাগুলি তাহাদিগের নির্দিষ্ট মানসিক ভাবের সহিত সময়ে এরূপ জড়িত হইয়া যায় যে, যখন মনে কোন ভাব উদয় হয়, তখন যেন তদানুযায়িক অঙ্গচালনাটি আপনি আসিয়া পড়ে। পূর্বে যেটি চেষ্টাসাধ্য ছিল এখন সেটি স্বভা-

* স্যার হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার কৃত “Expressions of the Emotions” নামক পুস্তকে মানসিক ভাবের সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বজাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের অঙ্গতন্ত্রী সম্বন্ধে কতকগুলি হু অভ্যাস আছে, সেগুলি এরূপ স্বাভাবিকমত বোধ হয়, যে কর্তার অজ্ঞাতে এবং কখন কখন অনিচ্ছায় তাহারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা বোধ করি সকলেই দেখিয়াছেন।

আর এক কথা। পাঠক মাত্রেই জানেন, যে আমাদের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমরা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। তাহার উপায় এইরূপ। মস্তিষ্ক হইতে আমাদের শরীরের চারিদিকে ধমনী লকল (Nerves) প্রবাহিত হইয়াছে। মস্তকটি যেন কেন্দ্র স্বরূপ। পৃষ্ঠ দণ্ড হইতে কতকগুলি ধমনী বাহির হইয়াছে, সে গুলিরও কার্য প্রায় মস্তিষ্ক নিঃসারিত ধমনীর মত। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বহির্জগতের সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়। এবং মস্তিষ্ক হইতে সংবাদ লইয়া আসিতে হইলে অপর গুলির প্রয়োজন। হস্তে কোন আঘাত লাগিলে প্রথম শ্রেণীর ধমনী মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া গেল যে, কষ্ট হইতেছে; মন বলিল হস্তকে সরাইয়া লও, এই আজ্ঞা দ্বিতীয় শ্রেণীর ধমনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পেশী সকলকে কুঞ্চিত করিল—ফল হস্ত নড়িল।

আমরা ধমনী বা অন্য কোন শারীর-যন্ত্রের কার্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান

করিতে আয়োজন করিয়া বসি নাই। * আমাদিগের মোট কথা এই যে আমাদিগের প্রত্যেক কার্যে ধমনী, পেশী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সহায়তা আবশ্যক করে। এক্ষণে হস্ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, মনে কোন ভাব উদয় হইলে আমাদিগের শরীরের যে বিকৃতি জন্মে, তাহার কারণ এই যে, শরীরাত্মন্তরে পেশীর কৃৎসন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য হইতে থাকে।

সেই কৃৎসন প্রভৃতি কার্যগুলি সময়ে একরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যতে সেই পূর্বের ভাব উদয় হইতে না হইতেই সেই কার্যগুলি দেখা দেয়। পূর্বে যেখানে চেড়ার প্রয়োজন হইত, এখন তাহা স্বতঃই হইয়া পড়ে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে শারীরিক যন্ত্র সকল এক কর্ম করিতে করিতে কালক্রমে কিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। বহু বহু বৎসরের পরে এই পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

পেশী, ধমনী প্রভৃতি হইতে মস্তিষ্কের পরিবর্তন হইলেই প্রকৃত মানসিক পরিবর্তন হইল। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন, যে আমরা মন এক মস্তিষ্ক এক পদার্থ বলিতেছি। হইতে পারে, মন মস্তিষ্কের বিকার বা কার্যকারিতা মাত্র, কিন্তু সে মত সমর্থন করা আমাদিগের

* বহির্জগতের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য-বিষয় সকল শীঘ্রই স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রকাশ করা যাইবে।

উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা এই যে, মস্তিষ্কের পরিবর্তন হইলে আমরা অনুমান ও চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা স্থির করিতে পারি যে পরিবর্তনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, একরূপ পরিবর্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবিদ্যাসা। মহত্ব বৎসর পূর্বে আমরা যে রূপ ছিলাম, এখনও তাহাই আছি—পরিবর্তিত দেখি না। রক্ত লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এখম যে রূপ দেখিতেছি মহত্ব বৎসর পূর্বেও তাহারা সেইরূপ ছিল, তাহার কি সম্ভেদ আছে? আমরা এই আপত্তি নিরাকরণের জন্য দুই একটি কথা বলিব; এবং তরসা করি তাহাতেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। রক্ত লতার পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া প্রস্তাবটিকে পল্লবিত করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ ইহাদিগকে সজীব বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত। এবং সজীবের পরিবর্তন প্রমাণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ইহাদের অভিকচি হয়, তাহারা পণ্ডিতদের ডার্বিন সাহেবরূত এতৎসম্বন্ধীয় পুস্তক * পাঠ করিবেন। পশুদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। পৃথিবীর গভীরতম গহবরে একরূপ অনেক অস্থি

*The Variation of Animals and Plants under Domestication.

পাওয়া গিয়াছে, বাহা আধুনিক কোন প্রাণীর অস্থি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হইতে কি এই অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে, কতকগুলি প্রাণী কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে? অনেকে জানেন বন্যপশুকে গৃহপালিত করিতে পারিলে তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ‘কোন ব্যক্তি একটা ব্যা-জ্রশাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যাজ্রের জীবাংশ প্রকৃতি প্রকার দমন হইল যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, সে গৃহের পাশে’ ইত্যন্তঃ গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য দ্রব্য দিলে আহাৰ করিত, তাহাতে কাহারও হিংসা করিত না।†’ এইরূপ ব্যাজ্রের বংশাবলী লক্ষ বৎসরের পরে যে বন্য ব্যাজ্র হইতে ভিন্ন মূর্তিধারণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মনুষ্য সম্বন্ধেই যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? অনেকেই জানেন উত্তাপের আদান প্রদানেই এই সংসার চলিতেছে। একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহ কিয়ৎক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলেই উহা শীতল হইয়া যায়। বায়ু লৌহকে উত্তাপ দিতেছে, লৌহ ও বায়ুকে উত্তাপ দিতেছে। কিন্তু লৌহ

যে পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে সে পরিমাণে পাইতেছে না—এই জন্যই উহা শীতল হইয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই নিয়ম—উত্তাপের আদান প্রদান। সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তাপ দিতেছে, পৃথিবীও সূর্য্যকে উত্তাপ দিতেছে। সূত্রাং ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে এমন সময় আসিবে যখন সূর্য্য অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইবে। সূর্য্যের ও পৃথিবীর তখন সমান উত্তাপ হইবে। তখন আর উত্তাপের আদান প্রদানে পৃথিবী চলিবে না। সূত্রাং তখন আমাদের মত প্রাণী আর এ পৃথিবীতে লীলা খেলা করিবে না। এই সংসার তখন কোন নূতনজীবের ক্রীড়ামূল হইবে। আমরা তাহাদিগের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, যে জীব ভবিষ্যতে আমাদের স্থানাদিকার করিবে, তাহারা যদি আমাদের হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের ভবিষ্যত, তাহাদিগের হইতে আমরা কেন ভিন্ন না হইব? বিজ্ঞানবিৎ টিন্ডল্ সাহেব বলিয়াছেন, যে যখন দেখা যাইতেছে মনুষ্যের আকার কমিতেছে, পরমাণু কমিতেছে, কিন্তু বৃদ্ধি বাড়িতেছে, ইহাতে কি অনুমান হয় না, যে ভবিষ্যতে শরীর শূন্য জ্ঞানময় জীব সকল (Intellectual beings) এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে?*

† বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার’, প্রথমভাগ—আমিষ ভক্ষণ।

* টিন্ডল্ সাহেবের অনুমানের স-

এক্ষণে হয় ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ পরিবর্তন অসম্ভব নহে। আমরা আর একটি আপত্তির উল্লেখ করিব। সেটি এই,—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পরিশ্রমে, শিক্ষায়, বা অন্য কোন উপায়ে যেন একজনের মানসিক পরিবর্তন সম্ভব-
 তিত হয়, কিন্তু কোন্ হিসাবে সম্ভাবনের মানসিক গঠন পিতার মত হয়? ব্যাভ্রকে শস্য খাওয়াইয়া, গৃহপালিত করিয়া তাহার জিহাংসা প্রকৃতিকে বলহীন করিলাম যেন, কিন্তু কোন হিসাবে তাহার সম্ভান, স্বজাতীয় স্বাভাবিক হিংসাপ্রকৃতিকে লাভ না করিয়া জন্মদাতার কোমল মনরত্ননিচয়কে অনুকরণ করিবে? বিবেচ্যাসভ্যতা সম্বন্ধে পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন। মনুষ্যের আকার ও পরমাণু সম্বন্ধে আমাদিগের দেশীয় দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। সভ্যগণে “মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ ইচ্ছামৃত্যুঃ একবিংশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ লক্ষবর্ষং পরমাণুঃ।” ত্রেতাযুগে “অস্থিগতাঃ প্রাণাঃ চতুর্দশহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ। দশম সহস্রাবর্ষং পরমাণুঃ” বাপরে রক্তগতাপ্রাণাঃ সপ্তহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ সহস্রাব্দ পরমাণু।” কলিযুগে “অন্নগতাঃ প্রাণাঃ সার্কজিহ্বাপরিমিতো মানবদেহঃ বিংশতাদিকশতবর্ষ পরমাণুঃ।” ভাগবতে লিখিত আছে, কলিতে “ধর্ম একপাদঃ। অধর্মশচতুষ্পাদঃ। আয়ুঃ শতবর্ষাণি। রাজানশ্চ প্রজাত-
 ক্যঃ।” শেষ কথাটি বড় মিথ্যা নয়।

চনা করিলে পাঠক দেখিবেন, এই আপত্তিতে কিছুমাত্র সার নাই। সম্ভান পিতার মানসিক রত্ননিচয়ের উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। সম্ভানের আন্তরিক গঠন জন্মদাতার আন্তরিক গঠনের মতই হইয়া থাকে, ইহাই সংসারের নিয়ম। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন ভদ্রলোকের এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, যখন সে গভীর নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে উঠিত। এবং অত্যন্ত উচ্চ হইলে প্রবলবেগে তাঁহার নাসিকার উপরে পড়িত। মাকে মাঝে এইরূপ ঘটিত, এমন কি, ইহাতে প্রায়ই নাসিকাতে আঘাতজনিত বেদনা হইত এবং বেদনা রুদ্ধির ভয়ে সময়ে সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হস্ত বাধিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। এই ভদ্রলোকের একপুত্র কলির শেষে মনুষ্য “ব্রহ্মকায়” হইবে ইহাও লিখিত আছে। পুনশ্চ “ত্রিংশ-
 দ্বিশতবর্ষাণি পরমাণুঃ কলৌ যুগাং।” আমাদিগের দেশে “এর পরে বেগুন গাছে আঁকশী (কোটা) দিতে হবে” বলিয়া একটি পৌরাণিকী কথা (কাহার কাহার মতে প্রবাস) যে প্রচলিত আছে, তাহা বোধ করি নিতান্ত অশ্রদ্ধের নহে। টিনডল সাহেবের মত তাঁহার উদ্ভাপ সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যাহার ইচ্ছা হয় খুলিয়া দেখিবেন।

শিশুর এই কুঅভ্যাসের উত্তরাধিকারী হয়। এই পুঞ্জের আবার এক কন্যা জন্মে, সেও গভীর নিদ্রাকালে ঐরূপ অভ্যাসের বশবর্তী হইত (১)। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয় আপত্তির মূলচ্ছেদ হইল। •

অতএব ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, সময়ে মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন একবারে বা একপুরুষে ঘটিতে পারে না। একজন সভ্য, ব্যক্তির পরিবর্তন তাঁহার পূর্বতন শত শত পুরুষ কর্তৃক সমগ্রমানুষের সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে; আর আমেরিকার একজন অসভ্যের এরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই, কারণ তাহার পূর্বতন শত শত পুরুষ লেখা পড়া করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টা করে নাই। সুতরাং এক্ষণে সেই সভ্য ও সেই অসভ্য মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা কোনরূপেই একপুরুষে লোপ পাইবার নহে। অসভ্য যতই কেন চেষ্টা করুক না, সভ্যের মত তাহার মানসিক পরিবর্তন কখনই হইবে না। কারণ তাহার জন্য কত শত বংশের প্রয়োজন, তাহা

(১) এই গল্পটি ডারউইন র্ত্ত “Expressions of the Emotions” নামক পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। গল্পটিও তাহার নিজের নহে। পুস্তকখানি আমাদিগের নিকট এক্ষণে নাই; থাকিলে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতাম।

কি একজনের চেটায় ঘটা সম্ভবপর? সুতরাং সভ্য ও অসভ্য যে প্রভেদ, সে প্রভেদ আমরা দেখিলাম শিক্ষাজনিত প্রভেদ। কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, পুরুষগত।

এই জন্যই আমরা পূর্বে যে পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়াছি, সেটিকে ঠিক সভ্য নহে বলিয়াছি। সে মতটিকে আমরা মিথ্যা বলি নাই; কারণ আমাদিগেরও বিশ্বাস সমাজের বৈলক্ষণ্য শিক্ষাপ্রসাদাৎ—কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, বংশগত।

আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব।

(১) সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লেপ্টেনান্ট ওয়ালপোল সাহেব লিখিয়াছেন যে, স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপবাসী ছাত্রদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের শিক্ষকেরা এইরূপ বলেন;—প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। যতদিন সাধারণ এবং সহজ বিষয় সকল শিক্ষিত হইতে থাকে, ততদিন সকল কথাই তাহাদিগের কণ্ঠস্থ হয়। কিন্তু যেমন শিক্ষিত বিষয়গুলি গভীরতর হইতে থাকে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বুদ্ধির এবং চিন্তার লঘুতা সপ্রমাণিত হয় *।

* সকল দৃষ্টান্তগুলি স্পেন্সার র্ত্ত “Principles of Psychology” দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, প্রথমখণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধেও এই বিষয় লিখিত আছে !

(২) আমেরিকায় নিগ্রোবালক এবং ইংরাজসন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় নির্দিষ্ট আছে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রথম প্রথম নিগ্রোরা ইংরাজতনয়ের সঙ্গে শিক্ষাসম্বন্ধে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেও ক্রিয়দূর গিয়া তাহাদের বুদ্ধির আর বিকাশ পায় না। এমন স্থলে আ-

সিয়া দাঁড়ায় যে, সেই স্থল হইতে ইংরাজ-সন্তানের সহিত একত্রে আর পদক্ষেপ তাহাদের পক্ষে সূকঠিন হয়।

আণ্ডামান ও নবজিলাও সম্বন্ধেও এই রূপ কথিত আছে।

অস্বদেশীয় হিন্দুদিগের বিদ্যালয় সম্বন্ধেও এইরূপ একটি অপবাদ আছে।

জি:—

বিষকন্যা ও বিধবা রমণী ।

আমরা ‘মুদ্রারাক্ষস’ পড়িবার সময় একটি আশ্চর্য্য কথা পাঠিয়াছিলাম।

‘রাক্ষসমন্ত্রী, চন্দ্রগুপ্তের বধার্থ একটি পরম সুন্দরী কন্যা প্রেরণ করিলেন, চাগকা তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। রাক্ষসের অভিসন্ধি যে, রাজা সেই কন্যার রূপ লাভে মোহিত হইয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্রই তাঁহার দেহ জীর্ণশীর্ণ হইয়া হস্ত হইবে। এদিকে চাগকা পণ্ডিতও ভেমনি ;—সেই সুবতি-শরীরের স্বর্গ পান করিয়া একটি শ্বেদভুক মক্ষিকা প্রাণত্যাগ করিল, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাকে ‘বিষকন্যা’ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিয়া দিলেন।’

এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভবপ্রায় অংশটুকু পাঠ করিয়া মন চমকিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, এ কি অসম্ভব

কথা!—নাটকের মধ্যেও এত অসম্ভব বস্তু রিন্যাস!—অপার ভাবনা-সমুদ্র গ-জ্জন করিয়া উঠিল, অনবরত চিন্তা-স্রোত বহিতে লাগিল, আর কত রকমের কল্পনা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কতক পরি-ভাগ করিলাম, কতক সঞ্চয় করিলাম, কতক আরও বা ধরিতে পারিলামনা, ভাসিয়া গেল। যেগুলি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, কোন আত্মীরের অনুরোধে আজ তাহা প্রকাশ করিলাম। ‘বিষকন্যা ও বিধবা রমণী’ এই মুকুট পরাইয়া বাহির করিলাম। ইহাতে যদি কাহারও অজ্ঞে আঘাত লাগে, কি করিম? উদ্ভূত যৌবন-রস সাহাদের শরীরে ধরিতেছে না; যেন ওষ্ঠ, গণ্ড ফাটিয়া বাহির হইতে আসি-তেছে, তাঁহাদের কিছুতেই বেদনা লাগে না। সুতরাং আমার এই প্রলাপভূল্য প্র-

বন্ধুটি তাঁহাদিগের নিকট নিরপরাধী।

১ম।—যখন ধমনীতে যৌবনরসের স্রোত বহিতে থাকে, তখন নহে; এক-টুকু বেগ হ্রাস হইয়া আসিলে অনেকেরই অনুভব হয় যে শরীরটা কেবল মলময়। কতকটা খাওয়া দ্রব্যের বিকার মাত্র; শ্বেদ, ক্লেশ, দৌর্গন্ধা, শিঙ্খাণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত মলে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ইহাকে ‘পুদগল’ সংজ্ঞা দিয়াছেন। কখন পুড়িতেছে কখন বা গলিতেছে।

২য়।—শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে মনুষ্যের সর্বপ্রকার মলেই ক্ষতিকারক পদার্থ আছে। অভ্যন্তরের দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ সকল ঘর্ম দ্বারা, নিশ্বাস দ্বারা ও বিষ্ঠা মূত্রের দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। দৈহিক উষ্ণতাও অন্যের শরীরে ক্ষতিকারক বা ধাতু দূষক হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবেশ করিলে তাহাও ক্রমে ক্রমে শরীরের হানি আনয়ন করে। অধিক কি—‘দেহাচ্চৈব চুতা মলাঃ’ যাহা যাহা দেহ হইতে প্রচুত হয়, তাহা তাহাই মল এবং তাহা তাহাই ক্ষতিকারক। তবে যে আপনার মল আপনার অনিষ্টকারক হয় না, আত্মদেহের পুত্ত্ব আত্মার হানি আনয়ন করেনা তাহার কারণ আছে। কি কারণ? স্বাস্থ্য প্রাপ্তি। বৈদ্যাশাস্ত্রে লিখিত আছে, ‘বিষমপি স্বাস্থ্যাগতং হস্তাৎ’ বিষও স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলে নাশক

হয় না। স্বাস্থ্য শব্দের অর্থ কি? দৃঢ় অভ্যাস। যাহাকে ভাষায় সহ্য হওয়া বলে তাহারই সংস্কৃত নাম স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যের মহিমা বুঝা ভার।

স্বাবর বিষে (কাঠ বিষে) কীট জন্মে। কিন্তু সে বিষ তাহার হানি করেনা। কেননা তাহা তাহার স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বিষ যদি অন্য কীটের শরীর স্পর্শ করিতে পায় তবে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আত্ম প্রভাব দেখাইবে মন্দেই নাই। অতএব বিষ যখন স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষতিকারক হয় না, তখন আর স্বাস্থ্য প্রাপ্ত শ্বেদ, দৌর্গন্ধা, উষ্ণনিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষতিকারক হইবে কেন? অনোরই বা না হইবে কেন?

৩য়।—পলাতুতুকদিগের শরীরে এক প্রকার গন্ধ, মাংসাদি মনুষ্যদিগের গাত্রে এক প্রকার গন্ধ, উদ্ভিজ্জভোজীদিগের শরীরে আর এক প্রকার গন্ধ, তাহা শ্বেদজ গন্ধ—সকলকারই স্ব স্ব শ্বেদ গন্ধাদি সহ্য হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহা তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। বিষুত্তের গন্ধ মৈত্রহর (মেথর) দিগের স্বাস্থ্য হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে উহা তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না। কিন্তু যাহা যাহার স্বাস্থ্যাগত হয় নাই, অবশ্যই তাহা তাহার হানিকারক হইবে।

৪র্থ।—মনুষ্যদেহের রস রক্তাদি ও অন্ন মলাদির পরিণামে দোষ জন্মে। তাহা ঘর্মাদি দ্বারা বাহির হইয়া যায়,

ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু মনু ও শ্রুত বলেন যে, কোন কোন মনুষ্যের মূলে অর্থাৎ শুক্র শোণিতের সংযোগ কালে এমন কোন দোষ ঘটনা হইতে পারে যে তাহার প্রভাবে মনুষ্যের আমরণ দেহের বিষাক্ততা থাকিতে পারে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ মাত্র ভোজন করে, অমূলেপন সেবা করে, তথাপি তাহার দেহের বিকট গন্ধ দূর হয় না। কাহার কাহার গাত্র হইতে ক্ষার গন্ধ বহির্গত হয়। কাহার গাত্রে পাখীর গন্ধ, কাতার ও বা মুখে, নিশ্বাসে, কক্ষ প্রভৃতি ঘর্ষণাব অঙ্গে পুতি গন্ধ থাকে। তাহা কিছুতেই যায় না। কেন? তাহা তাহাদের বর্তমান অন্ন-পানাদি পরিণামের ফল নহে। বৈজিক, গর্ভিক পরিণামের ফল। এইরূপ দোষ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে হিন্দুদিগের মধ্যে শরীরের উপর দশবিধ সংস্কার করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

৫ম।—শ্বেদ, ক্লেদ, তাপ, নিশ্বাস, জ্বলন, নেত্রভেজ * প্রভৃতিতে যদি শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থ থাকিল—তবেইত

* নেত্র ভেজ ও প্রাণনাশক আছে। আশীবিধ আর দৃষ্টিবিধ এই দ্বিবিধ জীব তীর্থ্যক-বোনি মধ্যেই দৃষ্ট হয়। দৃষ্টিবিধ জীবের নেত্রভেজ অসহ্য। ইহার সংযোগ-মাত্র ভয়, কণ্ঠ, জড়তা প্রভৃতি সমস্তই ঘটিয়া থাকে।

সর্বনাশ! কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা যায়।

৬ষ্ঠ।—‘ একজন্মের গাত্রে আর একজন্মে নিশ্বাস ফেলিলে দোষ হয়।’ ‘হাঁই তুলিয়া দিলে দোষ হয়।’ ‘নিজিত ব্যক্তি-গাত্রে অগ্নিষ্ট হইয়া পড়িলে দোষ হয়।’ ‘অন্যের গাত্রে ঘাম পু ছিঁয়া দিলে তাহার পীড়া হয়’ এই সকল জনপ্রবাদ কি সত্য? হইতে পারে।

৭ম।—এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একজনের গাত্রমার্জ্জনী ব্যবহার করিয়া অন্য জনের কণ্ঠ দক্ষ বা বিচর্চিকা রোগ জন্মিয়াছে। একজনের সহিত নিত্য সহবাস করিয়া অন্যজন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একজনের সহিত সর্বদা চোকো চোকি থাকিয়া আর একজন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রেও দেখা যায় ‘যানবস্ত্র মলকারং জায়াইপত্যং কমণ্ডলুং। আ-শ্রয়ঃ শুচিরে তানি ন পরেয়াং কদাচন।’ ‘দর্শনান্নিত্যাসংবাসাকোষমাক্রম্য ক্লিষ্টতি’ ‘সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি’ ‘শরীর-ত্জঃকর্মদোষৈরণ্যোহপি ক্লিশাতে কচিং’ ইত্যাদি।

৮ম। এক শরীরের সহিত অন্য শরীরের এরূপ কঠোর সম্বন্ধ যদি সত্য সত্যি হয়, তবে ত অন্ত্যের শরীর লইয়া আশ্রয় ক্রীড়া করা বড় সাবধানের কার্য। আমরা যে নারী দেখ লইয়া, পুত্র দেখ লইয়া সর্বদাই আশ্রয় ক্রীড়া করি, তাহাতে কি আমাদের কোন ক্ষতি হইতেছে

না? জগদীশ্বর কি রোগ, তাপ, জ্বর, জীর্ণতা প্রবেশ করাইবার জন্যই নারীদেহ-সমালোচনরূপ অলম্ব্য দ্বার প্রস্তুত রাখিয়াছেন? এসকল যদি অংশতঃও সত্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রারাক্ষসের বিষকন্যাও সত্য হইতে পারে। মুদ্রারাক্ষসের কথা সত্য হইলেই বিভ্রাট!

৯ম। আমি বাল্যকালে বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যবিবাহের একদিকে দোষ একদিকে গুণ। দোষ এই যে,—

‘উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদাধতে পুমান্গর্ভং কৃষ্ণিষ্ঠঃ স বিপত্ন্যতে॥
জাতো বা ন চিরজীবৎ জীয়েদ্বা দুর্ল-
লেদ্রিয়ঃ।
তস্মাদতাত্ত্ববালয়াং গর্ভাধানং ন কার-
য়েৎ ॥’

ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা নারীর অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষের বিজে গর্ভ হইলে সে সন্তান বাঁচে না। যদি বাঁচে দীর্ঘজীবী হয় না। যদিও দীর্ঘজীবী হয়, তথাপি তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি দুর্লব অবস্থার হইবে। এই ত বাল্যবিবাহের দোষ। কিন্তু গুণ কি? না স্বাস্থ্য-লাভ। আমি ১৬ বৎসর বয়সে অষ্টম বর্ষীয়া কুমারী বিবাহ করিয়াছিলাম। তাহার বস্ত্র, শয্যা, নিখাস, গাত্রতাপ, নেত্রতেজ, শর্য প্রভৃতি আমার ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য হইয়া গিয়াছিল। আমার শরীরের দোষগুণও তাহার স্বাস্থ্য হইয়াছিল।

তাঁহার দোষ তীব্র হইলে হয়ত তাহা আমার সহ্য হইত না এবং আমার দোষ তীব্র হইলেও হয়ত তাঁহার সহ্য হইত না। একপা পরস্পর সামঞ্জস্য না হইলে হয়ত তাঁহাকে পতিষাতিনী বিধবা হইতে হইত, নতুবা আমাকে ‘মাগ খেকো দোজোবর’ বলিয়া গালি খাইতে হইত। অন্ততঃ মলিন, ক্লেশ, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া থাকিতে হইত। এমন দেখা গিয়াছে, পূর্বে ভাল ছিল, পরে দোষবল্ল নারীর নিখাসে শুকাইয়া গিয়াছে। না হয়, বিবর্ণ, বিশীর্ণ, ক্লম্ভস্তাব, মতিচ্ছন্ন, হইয়া গিয়াছে। আবার ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, পূর্বে ক্লম্ভ ভূম্ব ছিল, বিবাহের পরে সে দিব্য নৈকজা লাভ করিয়াছে এবং বুদ্ধিমানও হইয়াছে। শরীরের দোষের ন্যায় গুণও আছে। বিষকন্যা এবং অমৃতকন্যাও আছে। বিষপুরুষ ও অমৃতপুরুষও আছে। যাহা হউক, আমাদিগের এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা বিধবা বিবাহ করিবেক, তাহাদের কি এই বিষয় একটুকু সাবধান হওয়া উচিত নয়? স্বামী, নীজের দোষেও মরিতে পারে, ভাৰ্য্যার দোষেও মরিতে পারে। যদি কোন জীলোকের স্বামী তাহার ভাৰ্য্যার বিষাক্ততায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবেই ত শঙ্কার বিষয়। অতএব বিবাহের পূর্বে অন্ততঃ ইহা দেখা উচিত যে বিধবার স্বামী কিরূপ অবস্থায় কত দিন ভোগ করিয়া মরিয়াছে। অনুপভুক্তা যুবতী বিধ-

বাক্যে বিবাহ করিতে ভয় হয়, যেহেতু তাদৃশ দম্পতির দোষ গুণের স্বাস্থ্যসম্পাদন করিবার সময় নাই । নিশ্চিতিবন্ধক বিশেষতঃ সে অবস্থাটি অর্ধেকের অবস্থা । যদি কাহারও তীব্রদোষ থাকে, তাহা হইলে হয় ত Honeymoon এর মধ্যেই অন্যতরের অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে ।

১০ম । যদি বিধবা বিবাহ করিতে হয়, একটুকু সাবধান হইয়া করাই উচিত । বিধবা রমণী দেখিতে অঙ্গার মত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার গুণে হয় ত বিষ মিশ্রিত থাকিতে পারে । শাস্ত্রকারেরা বলেন, ‘তাসামমৃতভোজিত্বাৎ শ্বেদ-ক্লেদ-সৌন্দর্য্য-বিষ-স্বাসাদিরাহিত্যম্ ।’ অঙ্গারারা অমৃতভোজিনী বলিয়া তাঁহাদের শ্বেদ ক্লেদাদি নাই, তাঁহাদের নিশ্বাসেও বিষ নাই । কিন্তু মনুষ্যরমণীদিগের তাহা আছে । অতএব সাবধান—যেন বিধবাজমে পতিষাতিনী বিবাহ না কর । পতিপুত্রষাতিনীকে শাস্ত্রকারেরা ‘অবীরা’ সংজ্ঞায় আহ্বান করিয়া থাকেন ।

যে রমণীর বাতাসে স্বামী শুকাইয়া যায়, জীর্ণশীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করে, যাহার ক্রোড়ের শিশু মূর্দ্ধশূন্য হইয়া জীবন বিসর্জন করে, ভূবনমোহিনী হইলেও তিনি

অবীরা, পতিষাতিনী, পুত্রষাতিনী । শাস্ত্রকারেরা ইহার হস্তের অন্ন খাইতেও নিষেধ করিয়াছেন ।

যে নারীর দেহে বিযাক্ততাদোষের অস্পতা আছে, অথবা কিঞ্চিৎ অমৃত্ত্ব আছে, শাস্ত্রকারেরা অমুমান করিয়া তাহার কতকগুলি লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন । বিষ থাকিলেও তাহা কেমন পুরুষে সহ্য করিতে পারিবে তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন ।

“নোদ্বহেৎ কপিলাং কনাং

নাধিকাজীং ন লোমিনীম্ । ইত্যাদি ।

বড় দুঃখিত হইলাম যে, শ্লোকগুলি সংগ্রহ করি নাই । যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, আবার সংগ্রহ করিয়া উপহার দিব । এক্ষণে নিবেদন এই যে, যদি কেহ গর্ষিতা অবীরা পাঠিকা থাকেন, তাঁহারা যেন প্রবন্ধলেখকের উপর ক্রোধ না করেন । দুঃখিনী পাঠিকা থাকেন, আমি তাঁহাকে বেদনা দিলাম এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি । সকলই স্বভাবের কার্য । পতিপ্রণয়িনী পাঠিকাদিগকেও বলিতেছি, বিষ নাই বলিয়া অহঙ্কারে ঠুংকারে মটমটে হইবেন না !

শ্রীকা—

হিন্দুভূগোল।

প্রথম প্রস্তাব—পৌরাণিক।

বকল বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, অর্থাৎ জল বায়ুর উষ্ণ ও শীতলত্ব, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, প্রভৃতির দ্বারা দেশস্থ লোকের চরিত্র গঠিত হয়। ভারতে সর্বকালে প্রকৃতি অতি উদার—প্রকৃতি যেন কম্পতত্ত্ব হইয়া শত হস্তে ভারতকে স্বীয় সম্পত্তি বিতরণ করিয়াছেন। এদেশস্থ ভূমি এত উর্বরা যে অল্পমাত্র পরিশ্রমেই প্রত্যেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে। এইক্ষণ নানা কারণে এদেশ নিরন্ন ও দরিদ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বে এদেশ প্রভূত ধনের আধার ছিল; এমনকি ঐশ্বর্য্য প্রভাবে এদেশ ‘স্বর্গভূমি’ ও ‘রত্ন গর্ভা’ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছিল।

যখন দেশে প্রভূত ধন সঞ্চিত হয়, তখন সর্ব শ্রেণীস্থ সকল লোকের পরিশ্রম করিবার আবশ্যতা থাকেনা। তখন স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর লোক হন, তাঁহারা জীবনের অধিকতর সময়ই আমোদ আনন্দে অতিবাহিত করেন; উদ্বোধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন

ঋষিগণ এই শ্রেণীকৃত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া, বাহাজগত পরিতাগ পূর্বক অন্তর্জগতেই মানসিক শক্তির পরিচালনা করিতেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ যেনে দেশে অল্প পরিশ্রম বা বিনা পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, সেদেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্পাদনে লোকের তত প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলেই বৈজ্ঞানিক সম্বলের প্রয়োজন, যেনে দেশে প্রকৃতি বিনা যুদ্ধে পরাজিতা দাসীর ন্যায় আজীবন, সেদেশে তদ্রূপ সম্বলের আবশ্যকতা কি? আর একটি কারণ আছে। বকল স্পেন দেশের অবস্থা বিচার করিতে যাইয়া তথায় ধর্ম্মভাবের এত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের এত আধিপত্যের কারণ এই নির্দেশ করিয়াছেন যে, সেখানে প্রকৃতির মূর্ত্তি এত ভয়াবহ যে লোকে স্বভাবতঃই ভীত হয়, এবং সেই সকল মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি বলিয়া নির্দেশ করে। যে কারণে স্পেনে অবৈধ ধর্ম্ম বিশ্বাসের এত প্রাবল্য, তাদৃশ কারণ এখানে বহুল পরিমাণেই পূর্বাবধি বর্তমান,

মৃতরাং প্রাচীন মহর্ষিগণ বিজ্ঞানের চর্চা না করিয়া ধর্মশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বেরই উন্নতি সাধনে জীবন যাপন করিয়াছেন । শুদ্ধ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞানের সহিত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির প্রতিও তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই । পুরাণাদিতে এই দুই বিষয়ের যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা দেখা যায়, তাহা এত কুসংস্কার ও কল্পিতভাবে পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে সত্য উপলব্ধি করা যায় না ।

এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন । আজি কালি এদেশে অনেক স্বদেশহিতৈষী জন্মিয়াছেন, যাঁহারা ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক, সঙ্গত হোক, বা অসঙ্গত হোক, সর্ববিষয়ে এদেশের গৌরব বাড়াইতে ক্রটি করেন না । যে কোন নূতন তত্ত্বের কথা হোক না কেন, তাঁহারা অমানবদনে কহিবেন, ইহা ভারতে অনেক পূর্বে প্রচলিত ছিল । অধিক কি ভারতে মুদ্রাযন্ত্র ও কামানের ব্যবহার পূর্বাশ্রয় প্রমাণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না । তাঁহাদিগের চেষ্টা মহতী, মনের ভাব উৎকৃষ্ট, তজ্জন্য তাহাদিগকে নমস্কার করি । কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়াতে তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণে সাহসী হইতে পারি না । আমরা অদ্য যে প্রস্তাবটির অবতারণা করিতেছি, অনেক দিন তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আধুনিক বাস্তব-বৃত্তান্তের সহিত এগুলির সামঞ্জস্য প্রদ-

র্শনে এতদিন রূপা চেষ্টা করিয়াছি । যাহা হোক, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ভৌগোলিক মতের সারাংশ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে ; যদি ভারতহিতৈষীগণ আধুনিক ভূগোলের সহিত ইহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন, পরম আপ্যায়িত হইব ।

পুরাণে সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনের * বর্ণনা আছে । তন্মধ্যে সর্বলোকের অধিষ্ঠানভূতা এইষে পৃথিবী, ইহাই ভুলোক নামে খ্যাত । বিষ্ণুপুরাণে ভুলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে ;—

‘পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা মেঘমূর্ধ্ব মহামুনে ।
সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি বিজোচ্ছ্রায়োপি ক-
থাতে ॥’

অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, এবং ইহার উচ্ছ্রায় (উচ্চতা) সপ্ততি সহস্র যোজন । পরন্তু লিঙ্গপুরাণে—
‘পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণা সমুদ্রাধরা স্মৃতা ।
দ্বীপৈশ্চ সপ্তভিযুক্তা লোকালোকায়তা
শুভা ।’

অর্থাৎ এই পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের †

* ভুলোকোথ ভুবলোকঃ স্বর্লোকশ্চ
প্রকীৰ্ত্তিতঃ । মহর্জনস্তপশ্চৈব সতালো-
কশ্চ সপ্তমঃ । ইতি শিব পুরাণে ॥ অতলং
বিতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পা-
তালমিতি ॥ ইতি জৈমিন্যগবতে ।

† চতুর্ভূতীধনুস্তস্য সহস্রং কোশ উ-
চ্চাতে । কোশধরস্ত গব্যুতিদ্বয়ং যো-
জনং বিদুঃ ॥ ইতি যোগিনীতন্ত্রে ।

মধ্যেই সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র আছে। পু-
নশ্চ নৈমগ্নব পুরাণে—

‘পাদগমাস্ত যৎকিঞ্চিদ্বস্তু ধরণীময়ং।
সভূলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোসা ম-
য়োদিতঃ ॥’

অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়তনের মধ্যে যে যে
বস্তু পদচালনের যোগ্য ও পৃথিবীময়
আছে, তাহারই নাম ভূলোক। অতঃপর
পৌরাণিকেরা প্রাকৃত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বী-
পের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিবরণ
করা যাইতেছে। তৎপূর্বে একটি কথা
বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। পৌরা-
ণিক ভূরভাস্ত্রের সহিত আধুনিক ভূরভা-
স্ত্রের তুলনা করা যে বিড়ম্বনা মাত্র, একটি
মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাই পাঠক তাহা বু-
ঝিতে পারিবেন। আধুনিক গণনানু-
সারে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১২ মাইল, বা
৩৯৫৬ কোশ, সূত্রায়ং উহার বিস্তার প্রায়
১১৭১৯ কোশ, কিন্তু পৌরাণিক গণনা-
নুসারে ২,০০০,০০০,০০০ কোশ। এরূপ
স্থলে তুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলতা
মাত্র।

কম্পনা-নিমগ্ন ধ্যানরত মহর্ষিগণ নয়ন
মুদ্রিত করিয়া, নিবিড় নিভৃত বনমধ্যে উ-
পবেশন পূর্বক, পৃথিবীর জল ও স্থলভা-
গের যে বিবরণ প্রকটন করিয়াছেন, তাহা
ড্রেক কুক, প্রভৃতির জানিবার সম্ভাবনা কি?
কলকথা, তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক
পদার্থ, যথার্থ ভূগোলের সহিত তাহার
কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি কেহ বলিতে

চাহেন যে এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা,
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া ও
ওসনিকা, এই সপ্তভূভাগের সহিত পৌ-
রাণিকদিগের সপ্তদ্বীপের মিল আছে;
তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া আ-
মরা অন্যস্থানে চলিয়া যাইব। কারণ
উন্মাদের নিকটস্থ হওয়া অবিধেয়। আ-
মরা কেন যে এরূপ কথা বলিতেছি, পা-
ঠক একবার সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের বিব-
রণ পাঠ করুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন।

সপ্তদ্বীপের নাম যথা,—জম্বু, প্লক্ষ,
শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।
আর লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও
জল এই সপ্তসমুদ্র।*

‘জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেবাং মধ্যসংস্থিতঃ।’

জম্বুদ্বীপ সপ্তসমুদ্র ও ছয় দ্বীপের ম-
ধ্যভাগে সংস্থাপিত। এই দ্বীপে একটি
জম্বুরক্ষ আছে, তাহার ফলের নামানু-
সারে এই দ্বীপের নাম হইয়াছে—

‘জম্বুদ্বীপস্য সাজম্বুর্নামহেতুর্মহামুনে।’
অপর ছয়টি দ্বীপের নামও তত্তৎদ্বীপস্থিত
রক্ষবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
শৈবপুরাণে যথা—

* জম্বুপ্লক্ষস্বর্যো দ্বীপো শাল্মলি-
শচাপরোহিজ। কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ
পুষ্কঃশৈচব সপ্তমঃ ॥ এতেদ্বীপাঃ সমুদ্রৈশ্চ
সপ্ত সপ্তভিরাহতাঃ। লবণেক্ষু সুরাসর্পি-
দধ্যোদানাম নামতঃ। দুগ্ধাদশচ এসং-
খ্যাত স্ততঃ স্বাদুদ উত্তরঃ ॥

↑ ইতি বৈষ্ণবে।

‘প্লক্ষদ্বীপে প্লক্ষরক্ষঃ শাল্মলী শাল্মলিঃ
স্মৃতঃ ।

কুশদ্বীপে কুশস্তম্ভঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহা-
গিরিঃ ॥

শাকদ্বীপে শাকরক্ষঃ পুষ্করে পুষ্করঃ
স্মৃতঃ ॥’

অতঃপর বিষ্ণুপুরাণে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমু-
দ্রের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ।

‘জম্বুদ্বীপঃ সমাহতঃ লক্ষযোজনবিস্তরঃ ।
মৈত্রেয়ঃ বলয়াকারঃ স্থিতঃ কারোদধি-
বহিঃ ॥’

লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র বল-
য়াকারে জম্বুদ্বীপের বহির্ভাগ বেষ্টিত ক-
রিয়া আছে । মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত
আছে যে, জম্বুদ্বীপ রত্নাকার ও তাহার
বাস লক্ষযোজন * । লবণসমুদ্রের পর
পারে ত্রিলক্ষ যোজন প্লক্ষদ্বীপ, তাহা ল-
বণ সমুদ্রকে বেষ্টিত করিয়া আছে ।

‘কারদেন যথা দ্বীপো জম্বু সংজ্ঞোক্তি-
বেষ্টিতঃ । সংবেষ্টা কারমুদধিঃ প্লক্ষদ্বী-
পস্তথা স্থিতঃ ॥ জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শত
সাহস্রসম্মিতঃ । সএব দ্বিগুণো ব্রহ্মণ
প্লক্ষদ্বীপেহ পাদাহতঃ ॥’

প্লক্ষদ্বীপের তুল্যায়তন অর্থাৎ ত্রিলক্ষ
যোজন ইক্ষুসমুদ্র উক্ত দ্বীপকে বেষ্টিত ক-
রিয়া আছে । আবার চতুর্লক্ষ যোজন
বিস্তৃত শাল্মলি দ্বীপ এই ইক্ষু সমুদ্রকে বে-
ষ্টিত করিয়াছে ।

* লক্ষমেকং যোজনানাং রত্নোবিস্তার-
দৈর্ঘ্যম্ ॥

‘প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাহতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারণা ॥
শাল্মলেন সমুদ্রোঃসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসো-
দকঃ ।
বিস্তার দ্বিগুণেনায়ং সর্বতঃ সংহতঃ
স্থিতঃ ॥’

এইরূপে শাল্মলি দ্বীপ চতুর্লক্ষযোজন
বিস্তৃত সুরা সমুদ্রের দ্বারা ; সুরা সমুদ্র
অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা ;
কুশদ্বীপ অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত সর্পি-
সমুদ্রের দ্বারা ; স্তম্ভসমুদ্র বোললক্ষ যোজন
বিস্তৃত ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা ; ক্রৌঞ্চদ্বীপ
বোললক্ষ যোজন বিস্তৃত দধিসমুদ্রের
দ্বারা ; দধিসমুদ্র বত্রিশলক্ষ যোজন বি-
স্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা ; শাকদ্বীপ বত্রিশ
লক্ষ যোজন বিস্তৃত ক্ষীরসমুদ্র দ্বারা ,
ক্ষীরসমুদ্র চৌবটিলক্ষ যোজন বিস্তৃত
পুষ্কর দ্বীপ দ্বারা ; পরিশেষে পুষ্করদ্বীপ
স্বাহ জলসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া
আছে । এই জলসমুদ্রের বিস্তারও চৌ-
বটিলক্ষ যোজন । *

* সুরোদকঃ পরিহৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ॥
তৎপ্রমাণেন সদ্বীপো মৃতোদেন সমাহতঃ ।
মৃতোদচ্চসমুদ্রোঃসৌক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংহতঃ ॥
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণেণায়াবিস্তরঃ ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপসমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন চ ॥
আহতঃ সর্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপ তুল্যেন মানতঃ
দধিমণ্ডোদক শচাপি শাকদ্বীপেন সংহতঃ ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ।

এস্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ঋষিগণ শুধু যে ভৌগোলিক বিবরণেই কল্পনার ছড়াছড়ি করিয়াছেন, তাহা নহে। সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্রের যেরূপ আয়তন ও সংস্থিতির বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আরব্য উপাশ বলিয়া বোধ হয়। বিতীয়তঃ গণিতেও ইহাদের অগাধ বিদ্যা ছিল। কৃত্তিবাস পণ্ডিত যেমন রামের সৈন্যসংখ্যার গণনা করিতে যাইয়া, উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম চারিদিকের সৈন্যসংখ্যার সমষ্টির বেলা ‘বায়ান্নহাজার’ বলিয়া, শুভক্লবের পিতৃশ্রদ্ধা করিয়াছেন, প্রাচীন মহর্ষিগণও তদ্রূপ, প্রথমে পৃথিবীর পরিমাণ পঞ্চাশকোটি যোজন নির্দেশ করিয়া, পরে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণে এত গোল করিয়াছেন যে, একটির সহিত অপরের কোনও মিল নাই। আমরা ঠিক দিয়া দেখিতেছি যে, সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণ সমষ্টি প্রায় ষোলকোটি যোজনের অধিক হয় না। যদি বল, স্বাদু জলসমুদ্রের পরে একটি দ্বিখণ্ড

শাকদ্বীপস্থ মৈত্রেয় ক্ষীরদেন সমন্ততঃ।
শাকদ্বীপ প্রমাণেন বলয়েনৈব বেষ্কিতঃ ॥
ক্ষীরাক্ষিঃ সর্বতোব্রহ্মণ পুষ্করাখ্যেণ বেষ্কিতঃ।
দ্বীপেন শাকদ্বীপান্ত দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥
স্বাদুদকে নোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্কিতঃ।
সমেন পুষ্করসৌব বিস্তারাগুলান্তথা ॥

বিশিষ্ট দেবতার আলয়স্বরূপ স্বর্ণভূমির ও তৎপর লোকালোক পার্বত্যের উল্লেখ আছে, তাহা লইয়া ভূমণ্ডলের পরিমাণ সম্পূর্ণ; কিন্তু সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রের আয়তন ১৬কোটি আর একটি ভূমি ও একটি পার্বত্যের আয়তন ৩৪ কোটি হইবে, একথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। অথবা একথা বলাই বাহুল্য, কেন না যাহার আমূল অবিশ্বাসনীয়, তাহাতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কি? মহর্ষিগণ কেবল সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের আয়তন ও স্থিতি নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই সকল দ্বীপের অধিবাসী, এবং তাহাদের অবস্থা ও ধর্ম প্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুবৃক্ষ হইতে যে ফল পতিত হয়, তাহার রস একত্রীভূত হইয়া সেখানে জম্বুনদী নামে এক মহতী নদী হইয়াছে; সেই নদীর জল ‘অমৃতস্বাদু’রূপে* অমৃতের ন্যায় মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট। জম্বুদ্বীপনিবাসীরা ঐ নদীর জলস্বরূপ জলপান করে। তাহাতে—
‘নখেদো নচ দৌর্গন্ধাং ন জরা নস্ত্রিয়ক্ষয়ঃ।

তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে ॥’ ইতি বৈষ্ণবে।

তত্তীরবাসিদিগের মন সর্বদা সুস্থ থাকে, কখনও অন্তঃকরণে খেদের উদ্বেগ হয় না, শরীরে দুর্গন্ধ হয় না, পুংশক্তির হ্রাস হয় না ও জরা হয় না। সুমেক পার্বত্যপ্রভাব
* শৈবপুরাণে

এইস্থল সাধারণ লোকদিগের অনধিগমা,
কেবল

‘ তত্র্যাপ্তি জিতক্রোধা জিতলোভা জি-
তেন্দ্রিয়াঃ । ’ ইতি শৈবে ।

জিতক্রোধ, জিতলোভ এবং জিতেন্দ্রিয়
লোকদিগেরই ইচ্ছা অধিগম্য ।

প্লক্ষদ্বীপে চারি বর্ণ বাস করে । যথা
বৈষ্ণবে—

‘ আৰ্য্যকাঃ কুরবান্ধব বিবিংশা ভা বি-
নশ্চয়ে ।

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ মুনি-
শ্চ ।

ইজাতে তত্র ভগবান্ধবৈশ্বৰ্ণৈর্য্যাকা-
দি-
ভিঃ ।

সোমরূপী জগৎশ্রুতী সৰ্বঃ সৰ্বৈশ্বরো-
হরিঃ ॥’

অর্থাৎ আৰ্য্যক, কুরব, বিবিংশ ও ভাবি ;
ইহারা প্লক্ষদ্বীপে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্র নামে প্রসিদ্ধ । এই সকল
জাতি চন্দ্রকে অস্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্তা
সৰ্বৈশ্বররূপে পূজা করে ।

‘ শাল্যালে যেতু বর্ণাশ্চ বসন্তোতে মহা-
মুনে ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজ-
ন্তিতং ॥

বায়ুভূতং মুখশ্চৈষ্ঠৈৰ্ভজিনোযজ্ঞসংজিতং ।’

শাল্যালি দ্বীপেও ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণ
অবস্থিতি করেন, তাহারা বায়ুকে ঈশ্বর ব-
লিয়া মানেন, এবং তাহাকেই যজ্ঞেশ্বর ব-
লিয়া তদুদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করেন ।

এইরূপে প্লক্ষদ্বীপে ও চারিবর্ণ আছে,
তাহারা নিজামুষ্ঠানতৎপর ।

“তত্রৈতৎ প্লক্ষদ্বীপে ব্রাহ্মরূপং জনার্দনং ।
যজন্তঃ ক্ষয়তুয়া মধিকার ফলপ্রদং ॥”

ইহারা ব্রাহ্মরূপি পরমেশ্বরকে হোমাদি
দ্বারা যজ্ঞ করিয়া স্ব স্ব অধিকারানুরূপ
কর্মফল সম্ভোগপূর্বক কর্ম ক্ষয় করেন ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপবাসিগণ ‘ যাগৈকত্ব স্বরূ-
পস্থ ইজাতে যজ্ঞ সন্নিধৌ ।’ ব্রহ্মরূপি
ঈশ্বরকে হোমদ্বারা অর্চনা করে ।

‘ শাকদ্বীপেতু তৈবিশুঃ সূর্য্যরূপ ধরো-
মুনে ।

যথোক্তৈরর্চাতে সম্যক্ কর্মভিনিয়তা-
স্বভিঃ ॥’

‘ শাকদ্বীপস্থ অধিবাসিগণ কর্ম দ্বারা
সূর্য্যরূপি ভগবানকে অর্চনা করে ।

“দশবর্ষ সহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ।
নিরাময় বিশোকাস্চ রাগদ্বেষবিবর্জিতাঃ ॥
তুল্যরূপাস্ত মনুজা দেবৈশ্চৈকৈকরূপিণঃ ।
বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণ বর্জিতং ।

* * * *

ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্রশ্রয়মুপস্থিতং ॥”

পুষ্করদ্বীপে অধিবাসীদের আশ্রয়সংখ্যা
দশদশ বৎসর ; তাহারা নিরাময়, অ-
শোক ও রাগদ্বেষহীন । তাহারা সকলেই
তুল্যরূপ এবং দেবতাদিগের সদৃশ । সে-
খানে বর্ণভেদ নাই, আশ্রমভেদ নাই,
আচার নাই, বা কোনও ধর্ম্ম নাই । সে-
খানে আহারের জন্য চিন্তিত হইতে হয়
না, কারণ আহার স্বয়ং উপস্থিত ।

অতঃপর কোন কোন পার্বত ও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।

“সর্কেষাষ্টকৈব দ্বীপানাং সপ্ত সপ্তৈব প-
র্ক্বতাঃ।

সপ্তৈব নদ্যন্তেষাস্ত বর্ষানি সপ্ত সপ্তৈব ॥
নতু রোগা ন জরা ন শৌকা ন পরিশ্রমঃ।
মান্যাং স্ত্রিয়ং বিজানন্তি চক্রবাক সদর্শিণাঃ।
ত্রেতাযুগে সমঃকালঃ সর্কদৈব মহামতে।
প্লক্ষদ্বীপাদিস্থ ব্রহ্মন্ শাকদ্বীপান্তকেয়ুর্নৈব ॥
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি জনাজীবন্ত্য নাময়াঃ ॥”

প্লক্ষদ্বীপ অবদি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত প-
ঞ্চদ্বীপে সপ্তসপ্ত পার্বত, সপ্তসপ্ত নদী ও
সপ্তসপ্ত বর্ষ আছে। ঐ সমস্ত বর্ষবাণিগণ
অরোগ, অশোক, অজর ও অপরিশ্রম।
ইহারা অনাক্রীসঙ্গ করে না, স্বামী স্ত্রী চ-
ক্রবাক মিথুনের ন্যায়। ত্রেতাযুগে লো-
কদিগের যেরূপ আয়ুসকাল ছিল, ইহাদে-
রও তদ্রূপ পঞ্চসহস্রবর্ষ পরমায়ু।

“একস্তত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ক্বতঃ।
মানসোত্তর সংজ্ঞাসৌ মধ্যাতো বলয়া-
কৃতিঃ ॥

* * * * *

বর্ষদ্বয়ন্ত মৈত্রেয় ভৌমঃ স্বর্গোহয়মুত্তমঃ।”

শাক দ্বীপের মধ্যভাগে বলয়াকারে
মানসোত্তর নামে এক বর্ষ পার্বত আছে।
উহাতে দ্বীপটিকে বর্ষদ্বয়ে বিভক্ত করি-
য়াছে, এবং ঐ বর্ষদ্বয় এত সুন্দর যে তাহা-
দিগকে ভূস্বর্গ বলি যাইতে পারে।

পূর্বে যে স্বাহ জল সমুদ্রের উল্লেখ
করা গিয়াছে, তাহার পর পারে, “সর্ক-
জন্ত বিবর্জিতা” দ্বিখণ্ড এক “কাঞ্চনী-
ভূমিঃ” আছে। তাহার পর পৃথিবীর
সীমারূপে এক বৃহৎ ঠৈল আছে—

“অর্কচীনেতু তস্যাক্ষৌ চরন্তিরবিরশ্ময়ঃ।
পরাক্ষেতু তমোনিত্যং লোকালোকস্ততঃ-
স্মৃতঃ ॥” ইতিলৈঙ্গে।

উহার এক পার্শ্বে রবি রশ্মির গমন, অপর
পার্শ্বে সূর্য্য কিরণের গমনাভাব। তৎ-
প্রযুক্ত ঐ ঠৈলের নাম লোকালোক
পার্বত।

অনেকে অনুমান করেন যে, আধুনিক
এসিয়াখণ্ডকেই প্রাচীন আর্য্যেরা জম্বু-
দ্বীপ কহিতেন; অপর ছয় দ্বীপের বিব-
রণ কল্পিত হইলেও জম্বুদ্বীপের বিবরণ
তাহারা সমাক্ষ প্রকারে অবগত ছিলেন,
এবং জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত প্রকটন
ও করিয়া গিয়াছেন। এই অনুমান নির-
বচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ অ-
ভ্রান্ত নহে। কারণ জম্বুদ্বীপের বিষয়ে
আর্য্যেরা অনেক কথা কহিয়াছেন বটে,
কিন্তু তাহার অধিকাংশেরই আধুনিক তত্ত্বের
সহিত ঐক্য নাই। বাহাউক সে সকল
বিচারে প্ররত্ত না হইয়া পুরাণে যেরূপ
বর্ণন আছে, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করি-
তেছি। জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত-বিষ্ণু-
পুরাণে যথা—

“ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিস্পুকম্বৎ-
স্মৃতং।

হরিশ্চর্য তথৈবান্যথেরোদক্ষিণতোদ্বিজ ॥
 রম্যকণ্ঠোত্তরং বর্ষং তথৈবানুহিরম্ময়ং ।
 উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথাবৈভারতং তথা ॥
 ইলান্নতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণোমেককচ্ছিতঃ ।
 মেরোঃপূর্বেণভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ প-
 শ্চিমে ।

নবসাহস্র মেকৈকমেতেবাং দ্বিজসত্তম ॥”
 জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশে হিমালয় প-
 র্বত পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষ, তদন্তরে কিম্বু-
 কম্ব, তদন্তরে হরিশ্চর্য, তদন্তরে স্রমেকর চ-
 তুঃপার্শ্বে ইলান্নতবর্ষ, ইলান্নতের পূর্বে
 ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, এই
 তিনবর্ষের উত্তরে রম্যকবর্ষ, তদন্তরে হির-
 ম্ময়বর্ষ, এবং তদন্তরে কুরবর্ষ । এই নয়
 বর্ষের প্রত্যেকের পরিমাণ নয় সহস্র যো-
 জন !

উপরে যে হিমালয় ও স্রমেক পর্ব-
 তের উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে হিমালয়ের বর্ণনা
 স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে ; স্রমেকর বিবরণ
 বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ আছে—

“তস্যাপি মেকমৈত্রেয় মধ্যে কনক প-
 র্বতঃ ।

চতুরশীতি সহস্রো যোজনৈস্তস্যোচোচ্ছ্রয়ঃ ॥
 প্রবিষ্টঃষোড়শাধস্তা দ্বাদ্বিংশানুঙ্কি বিস্তৃতঃ ।
 মূলে ষোড়শসহস্রো বিস্তরাস্তস্য ভূভূতঃ ॥”

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে স্রমেক
 নামে এক কাঞ্চনময় পর্বত আছে । তা-
 হার উচ্চতা চৌরশি সহস্র যোজন, এবং
 পৃথিবীর অভ্যন্তরে বোল সহস্র যোজন
 প্রোথিত ; ইহার শিরোভাগের বিস্তার ব-

ত্রিশ সহস্র যোজন ; এবং মূলের বিস্তার
 বোলসহস্র যোজন । লিঙ্গপুরাণে আছে—
 “নতত্র সূর্য্যস্তপতি নচজীর্ঘ্যস্তিমানবাঃ ।
 চন্দ্রসূর্য্যো সনক্ষত্রৌ প্রকাশেতেনতত্রবৈ ॥”
 শৈবেচঃ—

‘নচবর্ষতি পর্জন্যোগিরেস্তস্য প্রভাবতঃ ।’

এই পর্বতে সূর্য্য প্রথর রশ্মিদ্বারা
 তাপদানে অসমর্থ ; এবং ইহার অধিবা-
 সীরা জরাজীর্ণ নহে । চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র
 প্রভৃতি তথা প্রকাশ হইতে পারে না ;
 এবং মেঘ পর্য্যন্ত সেখানে বারি বর্ষণ
 করে না ।

পুনশ্চ বৈষ্ণবে—

‘মেরোশ্চতুর্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতং ।
 ইলান্নতং মহাভাগ চত্বরশ্চত্রে পর্বতঃ ॥
 বিষ্ণুস্তারচিতামেরোষোজনাযুত মুচ্ছিতাঃ ।
 কদম্বশ্চৈব জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এবচ ।
 একাদশ শতায়ামাঃ পাদপাগিরিকেতবঃ ॥’

স্রমেকর চতুর্দিকে নয় সহস্র যোজন
 বিস্তৃত ইলান্নতবর্ষ । ঐ বর্ষের চতুঃপার্শ্বে
 চারিটি পর্বত । সেই প্রাচীর স্বরূপ শৈল
 চতুষ্কয়ের উপরিভাগে ক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ,
 পশ্চিম এবং উত্তরদিকে কদম্ব, জম্বু, অশ্বখ,
 ও বট বৃক্ষ আছে । উহার এক এক বৃ-
 ক্ষের উচ্চতা একাদশ সহস্র যোজন ।

মহর্বিগণ তৎপরে নববর্ষের সীমাপ-
 র্বতগুলির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে,
 হিমালয়, হেমকুট, নিম্ব, নীল, শ্বেত,
 শৃঙ্গবান, মালাবান ও গন্ধমাদন, ঐ অষ্ট
 মহাহ্রলংঘ্য পর্বতের দ্বারা নববর্ষ বিভক্ত

হওয়াতে, একবর্ষের লোক অপর বর্ষে বাইতে পারে না। ভারতবর্ষ, কম্পু-কম্ববর্ষও হরিভর্ষের উত্তর সীমায় ক্রমে হিমালয়, হেমকূট, এবং নিম্ন নামক অস্ত্রিত্রয় অবস্থিত, ইহাদের দৈর্ঘ্য ক্রমে, ৮০, ৯০, ও ১০০ সহস্র যোজন। কেতুমাল, ইলারত, ও ভদ্রাশ্ব এই বর্ষত্রয়ের উত্তর সীমা নীল পর্বতের দৈর্ঘ্য ও নিম্নের ন্যায় লক্ষ যোজন। রম্যবর্ষের উত্তর সীমা শ্বেত পর্বত নবতি সহস্র যোজন দীর্ঘ ও হিরণ্য বর্ষের উত্তর সীমা শৃঙ্গবান্ অশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। এই ছয় পর্বতের প্রত্যেকটি দ্বিসহস্র যোজন উচ্চ ও দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত। এবং দৈর্ঘ্যে ইহার পূর্ব পশ্চিম সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু জম্বুদ্বীপের গোলতা নিবন্ধন কোথাও দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অধিক, কোথাও কিছু হ্রাস। *

* জীমস্তাথতে। যন্মিহব বর্ষাণি নব-যোজন সহস্রায়ামান্যচ্চৈর্মধ্যাদা গি-রিভিঃ সবিভক্তানি ভবন্তি ॥ বৈকবেচ। হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিম্নাশ্চ স্য দক্ষিণে। নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গীচ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ। লক্ষ প্রমাণে হোমধ্যে দশদ্বীনাস্থথা পরে। সহস্রদিত্যোক্ত্রায়াস্ত্রাবদিত্তারিণ শ্চতে ॥ বারাহে। জম্বুদ্বীপ প্রমাণেন নি-ম্নাঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ তস্মাচ্চ দশভাগেন হেম-কূটঃ প্রদীয়তে। হিমবান্ বিংশভাগেন তস্মাদেব প্রদীয়তে। অশীতি হিমবান্ শৈল আয়াতঃ পূর্বপশ্চিমে। নীলঃ শ্বেতশ্চ

বিষ্ণুপুরাণের জ্বলান্তরে লেখা আছে যে, মাল্যবাণ ও গন্ধ মাদন পর্বত, উত্তরে নীল পর্বত ও দক্ষিণে নিম্ন পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং প্রত্যেকে চল্লিশ সহস্র যো-জন উচ্চ।

‘আনৌল নিম্নায়ানৌ মাল্যবদ্ গন্ধমা-দনৌ।

চত্বারিংশং সহস্রাণি পরিব্রজৌ মহীতলাং’

তদন্তর লিঙ্গপুরাণে এই সকল পর্ব-তের শোভা ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি এইরূপে বর্ণিত আছে:—

‘হিমবৎপ্রমুখাশ্চাক্ষৌ মধ্যাদাপর্বতাইমে।
নানাদাতু পিন্ধাশ্চ নানারত্নাকরা শ্চবৈ ॥
নানাপুষ্প ফলোপেতা নানারক্ষগণারতাঃ।
ভূম্বর্গা দেবভোগাশ্চ দ্ব্যুতাপ্যা মানবৈ-
ভূবি।

হেমকূটেতু গন্ধর্বা বিজেরা শ্চাপ্সরো-
গণাঃ ॥

সর্বৈনাগাস্ত্র নিম্নে শেষ বাস্তুকি তক্ষকাঃ ॥
নীলেশু বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষয়ো মলাঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেত পর্বত উচ্চতে ॥
শৃঙ্গবৎ পর্বতে চৈব পিতৃণাং নিলয়াঃ
শুভাঃ।

হিমবান্ দক্ষ মুখ্যানাং ভূতানামীশ্বর স্যচ।
সর্বাশ্রিয়ু মহাদেবো হরিণা ব্রহ্মণা সুরৈঃ ॥’

গন্ধমাদন পর্বত সম্বন্ধে স্বন্দ পুরাণে লিখিত আছে—

শৃঙ্গীচ ক্রমেনৈবং প্রমাণকাঃ। অবগাঢ়াত্য়া-
ভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব পশ্চিমৌ। দ্বীপস্য
মণ্ডলীভাবাদহাস বুদ্ধি প্রকীৰ্ত্তিতে ॥

‘সন্তি বিদ্যাধরাণাঞ্চ পৰ্বতে গঙ্গমাননে ।
উদ্যানানি বিচিত্রাণি ভবনানি বহুনিচ ॥
তেষু বিদ্যাধর বরা বিদ্যাধর্যাশ্চ কৌতু-
কাৎ ।

বিহরন্তি স্রুথং যত্রবায়ুৰ্বহতি গঙ্গবান ॥
স্রুগঙ্গি পুষ্প সমুতান্ গঙ্গানাদায় সৰ্বতঃ ।
দেবাদৈত্যা দানবাশ্চ কদাচিদ্ যান্তিত-
র্জবে ॥’

উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃত পদগুলি এত
সরল যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক হৃদয়ের ও
সহজে মৰ্ম্ম গ্রাহ হইবে, এই বিশ্বাসে আ-
মরা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলাম না । এবং
বর্তমান শ্রেণীর প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে অনেক
পাঠকের নিকটই নীরস বোধ হয় । অত-
এব এখানেই প্রথম প্রস্তাবের উপসংহার
করিলাম ।

শ্রীঃ—

সংক্ষিপ্তসমালোচন ।

১। “মনোরঞ্জন-স্বপ্ন । জীযোগেন্দ্রনাথ
ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত ।” গ্রন্থ-
কার এই মনোরঞ্জন-স্বপ্নে বেদ বেদাঙ্গ
প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের মূল সত্য এবং সমাজ-
রহস্য ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বহুবিষয়ের মূল
তত্ত্ব দিব্যচক্ষে দর্শন করিতে চেষ্টা পাই-
য়াছেন,—কিন্তু তিনি যেসকল দেখিতে
পাইয়াছেন, সেইসকল দেখাইতে পারেন
নাই । তিনি শেষ দেখিয়াছেন এই,—
“নিরাকার নির্বিকার পদার্থ ভাবিতে
চেষ্টা করিয়া তাহাতে অপারগ হইলে
মন যেমন নীচকার্য্যে রত হয়, দেবদেবীর
চিন্তা করিলে মন তেমন হয় না । ***
অতএব ভক্তির উদয় হইলে যে সাকার
মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার আর স-
ন্দেহ নাই । ভক্তিসেবক ধর্ম্মপরায়ণ ম-
হাত্মারা অনাদি, অনন্ত ও অসীম পদার্থকে
কল্পনাবাহিত্তি বিদ্যাভিত্তিতে সীমাবিশিষ্ট

মনে ও পরিমিতবুদ্ধিতে ধ্যান বা ধারণা
করা অসম্ভব বিধায় সৃষ্টি স্থিতি লয় দর্শন
দ্বারা ঈশ্বরের তিন গুণের উদ্বেক করতঃ
তাহার প্রতিকৃতিস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-
শ্বর ও তাঁহাদিগ হইতে অপর দেবদেবী
কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে
দৃঢ়ভক্তি করিবার সূক্ষ্ম ও সুচারুপথ প্রদ-
র্শন করিয়াছেন । ”

এই উদ্ধৃত অংশের শেষভাগটি পড়ি-
বার সময় ইহাকে আদালতের রোবকারি
কিংবা পুলিশের রিপোর্ট বলিয়া ভ্রম জ-
ন্মিতে পারে । কারণ প্রচলিত বাঙ্গলায়
একই বাক্যে করিয়া করতঃ, হইয়া হওতঃ
ইত্যাদিরূপ অনন্তকোটি অসমাপিকা ক্রিয়া
এইক্ষণ আর স্থান পায় না, এবং বিধায়
প্রভৃতি অর্থগূঢ় শব্দও ব্যবহৃত হয় না ।
রিপোর্ট ও রোবকারিতেই এইরূপ ক্রিয়া-
পদবৈচিত্র্য ও বিধায় প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইয়া

থাকে। উদ্ধৃত অংশে কল্পনাবাহিত পদটি কি অর্থে কাহার বিশেষণ তাহা আমাদের বুঝিগম্য হইল না। আমরা অবশ্য এজন্ত হুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। কেন না, যাহা বুঝি না, তাহার সমালোচনা করা অনুচিত।

২। “শূরবাল।—সুরবাল। স্বর্গীয়া স্বর্ণলতা বিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।” গ্রন্থকর্ত্রী যখন জীবিত নাই, তখন আমরা নিন্দা করিলেও তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, প্রশংসা করিলেও সে প্রশংসায় তিনি পুলকিত হইবেন না। সুতরাং আমরা কাহাকে আর কি বলিব? তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে এইমাত্র বলিতাম যে, নাটক কাহাকে বলে তাঁহা না বুঝিয়া থাকিলেও তিনি সুললিত পদ্য রচনায় নিপুণ। অর্দ্ধশিক্ষিত বালিকার পক্ষে ইহাই বিস্তর প্রশংসা।

৩। “আর্য্য-সংগীত।” এখানি কে আমাদের উপহার দিলেন, তাহা জানি না। কারণ গ্রন্থকার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কবিতাটি পড়িয়া বোধ হইল, হেমবাবুর কবিতাবলী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। তবে কথা এই, অন্যদীয় কবিতার পদ্যাবলী যে রূপে কণ্ঠস্থ হয়, রস ও মাধুর্য্য সেইরূপ সহজে হৃদয় হয় না।

৪। “নিষ্কলতরু। কোরগর নিবাসিনী জীমতী তরঙ্গিনী দাসী বিরচিত।

জীভুবনমোহন ঘোষকর্তৃক প্রকাশিত।”—পূর্নিম্ন শশী, প্রিয়তমের প্রভি, বিধবার স্বপ্ন এবং বসন্তসমাগম প্রভৃতি কতিপয় গদ্য ও পদ্য রচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গ্রথিত, গ্রন্থকর্ত্রী বর্তমান কালের নভেল নাটকীয় বাঙ্গালায় যন্ম শিক্ষিত নহেন। তিনি শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিবার কৌশল যে রূপে শিখিয়াছেন, যদি সেইরূপ গাঁথনি শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখা এইরূপ এলান এলান এবং অনেক স্থলেই অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্য শূন্য না হইয়া,—যে সকল কথা ইদানীং সকলেই সকল পুস্তকে পড়িতে পায়, শুধু তাহাতেই পরিপূর্ণ না রহিয়া, অধিকতর পাঠযোগ্য হইত। তিনি পিঞ্জর বন্ধ সারিকার কায় পরের কথা না কহিয়া নিজের কথা কহিলে, শুনিবার জন্ত লোকের অধিকতর আগ্রহ জন্মিত, এবং লোকে বঙ্গীয় কুল-বালাদিগের শিক্ষার পরিমাণ বুঝিতে পারিত। এই পুস্তক সেই সকল আশার সাফল্য বিষয়ে,—“নিষ্কল তরু।”

৫। “প্রণয়পাগল, প্রথমখণ্ড। জীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।”—রচনার নমুনা,—

“কামিনি!

পাগল করিলি আমারে

এমন সৌরভ মধু কে দিল তোমায়ে?

একটু নয়নাস্তর হইলে অমনি

কেন পাগলিনী তুমি হয়ে সুবদনি!

মধুগন্ধ আবাহনে ডাক বারে বারে

পাগল করিলি আমারে।”

পূৰ্ব বাঙ্গালার কতিপয় ভূস্বামী এই
গ্রন্থের মুদ্রণ সাহায্য করিয়াছেন, এবং
বাঙ্গালী সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া
পরিচিত এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহা উপহার
লইয়াছেন । সকলেরই কচি পরিমার্জিত ॥

৬ । “মেয়েলী অর্থাৎ বঙ্গীয় কামিনী-দি-
গের ব্যবহৃত গাঁহন্য শ্লোক ও পদাবলী ।
প্রথম ভাগ । শ্রীললিতমোহন রায় কর্তৃক
সংকলিত ।” এই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি
মেয়েলী কথা পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে উ-
দ্ধৃত হইল ।

“কড়ি দিয়া কিন্ব দই ।

গোয়ালিনী আমার কিসের সই ॥”

“জামাইর বড় কোচার ফের ।

ছয়বুড়ি কড়ি সূতার সের ॥”

“মাসিমার আদরে ।

পরান আমার বিদরে ॥ ,

“যদি থাকে নছিবে ।

আপনে আপনে আসিবে ॥”

ইহার মধ্যে কতকগুলি উক্তি নিতান্ত
অশ্লীল, ও অশ্রাব্য । নিতান্ত জঘন্য জা-
তীয় স্ত্রীলোক কি পুরুষের মুখে ভিন্ন এ-
রূপ কথা প্রায় কোথাও শুনা যায় না ।
সংগ্রহকার তাঁহার ২৩৮, ২৩৯ প্রভৃতি
নম্বরের উক্তি কোন্‌ শ্রেণি মেয়েদের মুখে
শুনিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন ।
অন্য কতকগুলি নিতান্ত প্রামাণ্য ও বীভৎস,
যথা ৮৮নম্বর । আর এক কথা এই, যে

কথায় যোটক অথবা মেল অ'ছে, তা-
হাই যে মেয়েলী ইহা তাঁহাকে কে ব-
লিয়াছে । এই গ্রন্থ ময়মনসিংহের এক
অতি প্রধান ভূম্যধিকারীকে উৎসর্গ
দেওয়া হইয়াছে । এরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ
দেওয়া বঙ্গদেশে ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কু-
ত্রাপি প্রচলিত আছে কি না, তাহা আ-
মরা জানি না । উৎসর্গ পত্রের প্রথমেই
লেখা আছে,—“আর্ধ্য ! মেয়েলী চি-
রদিনই আপনার নিকট আদরের জি-
নিস ।” বাঙ্গালি গ্রন্থকার বঙ্গীয় ভূস্বা-
মীকে ইহা না কহিয়া আর কি কহিবে ?
কিন্তু যাহাকে এই গ্রন্থ উপহার দেওয়া
হইয়াছে, তিনি উচ্চতর বিবয়ে অমুরাগী
বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত ।

৭ । “বিজ্ঞানসংগীত । কাব্য, জীমুদ্রনাথ
পালিত কর্তৃক প্রণীত ।” এখানি সম্প্রতি
মুদ্রিত না হইলেই ভাল ছিল । বঙ্গদেশের
অনেক বুদ্ধিমান যুবা—জানিনা কি এক
প্রলোভনে পড়িয়া, শিক্ষার সময়কে গ্রন্থ
রচনায় ব্যয়িত করিতেছেন । সময়ের এই-
রূপ অপব্যবহার সমাজের অনিষ্টকর ।
যশঃস্পৃহার অকুশতাড়না অবশ্যই অনে-
কের পক্ষে অসহ্য, কিন্তু যাহাদিগের স-
হিষ্ণুতা নাই, তাঁহারা জগতে প্রায়শঃই য-
শস্বী হন না । বিজ্ঞানসংগীত রচয়িতাও যদি
আর দশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতেন,
তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত উপকার হইত ।

জীবনপ্রভাত।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈশানী-মন্দির।

“.....হেবিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।”
মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কএক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতিদূর একটি পার্বত্য-শৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটি পার্বত্যতরঙ্গিণী কূল কূল শয়ন করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল অবধি অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-নদীতে স্নান করিয়া সোপান অ'রোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা দিত, অন্য পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পার্বত্যের পৃষ্ঠদেশে বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিব্যযোগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী দ্বয় অন্ধকার করিত, সেই সুস্বিক্ষ

ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য সুস্বিক্ষ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্ভেদ হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপ-বৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুগ, অসংখ্য হত্যাকাণ্ডে মহা-রাষ্ট্রদেশ ব্যভিমান্ত ও বিপর্য্যন্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র শান্ত পার্বত্যমন্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুবিত করেন নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ। প্রাশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিক কণেক ক্রতবেগে এদিক ওদিক পদচারণ করিতেছিলেন, কণেক বা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিবাদে, অন্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না ; আশ্রিবশতঃ কখন পাদপে ভর দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় হৃতন চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া আশ্রি বিস্মৃত হইলেন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচারণ করেন । রঘুনাথ উদ্ভতপ্রায় ! এ ভীষণ চিন্তার আশ্রু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে ! প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক ! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক যোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে । উদ্ভততাই কত শত হতভাগীর আরোগ্য ! কত সহস্র হতভাগী এই আরোগ্য দিবানিশি আর্গন করি, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না !

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটি পাদপতলে উপবেশন করিলেন,— নিশ্চেষ্টভাবে রুদ্ধ ভর দিয়া উপবেশন করিলেন ।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন । আহা ! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শাস্ত্র নিশীথে শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগন-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উদ্ভিত হইতেছিল । এখনও কাশী বা মথুরার পুরাতন মন্দিরে সূর্যো-

দয়ে বা সূর্য্যস্ত সায়াংকালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অনন্ত পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র পাঠ করেন ; যখন সেই পুণ্যধামে বজ্রদেশের বজ্রযাত্রীর সমাগম দেখি, সনাতন মন্দিরে সনাতন-ধর্ম্মের গৌরব দেখি, সায়াংকালের আরতিশব্দ বা শত মন্দিরের ঘণ্টা ও শঙ্খ-ধব গগনে যুগপৎ উদ্ভিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গম্ভীরস্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি নৈশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্পন্দের উদয় হয়, বেগ হয়, যেন সেই প্রাচীন অর্থাবর্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরাকালের শান্তি ও সুরক্ষিতা ।

সেই সমস্ত মহৎ কথা,—পুণ্যকথা ; শাস্ত্রব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়া সেই শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতুহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় কখন বা প্রফুল্লিত, কখন বা উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল ।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে । সূর্য্যর বজ্রদেশে, তুষারপূর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কাশ্মীরে, বীরপ্রস্থ রাজ-

স্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে। সাগরপ্রক্ষালিত
কর্ণাট ও জাবিড়ে, সহস্র বৎসর অবধি
এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চিরকা-
লই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ
শিক্ষা কখন বিস্মৃত না হই। গৌরবের
দিনে এই অনন্ত গীতে আমাদের পূর্ব-
পুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল,
ও অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জ-
য়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে
প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দিনে এই গীত
গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ-
সিংহ, হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই
মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরা-
কালের গৌরব সাধনে যত্নান হইয়াছি-
লেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্বল হিন্দুদিগের আ-
ত্মাসের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পূর্ব গীত
মাত্র, যেন বিপদে, নিষাদে, দুর্বলতায়
আমরা পূর্বকথা না বিস্মৃত হই, যতদিন
জীবন থাকে যেন হৃদয় যত্ন এই গীতের
সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ পাঠ ক-
রিয়াছ, দাস্তে, সেক্সপীয়র, মিণ্টন পাঠ
করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ,
কিন্তু হৃদয় অঙ্গেরণ কর, হৃদয়ের অন্তরে
কোন কথাগুলি সরসত্ত্ববপূর্ণ বোধ হয়?
হৃদয় কোন কথায় অধিকতম আলোড়িত,
প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্ম চার্ষ্যের
অপূর্ব বীরত্ব-কথা! দুঃখিনী সীতার অ-
পূর্ব পতি-ভক্তিকথা! এই কথা হিন্দুমা-
ত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহি-

য়াছে,—এ কথা যেন হিন্দুধর্ম কখন
বিস্মৃত না হয়!

পাঠক! একত্র বসিয়া এক এক বার
প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক
সময়ের রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের
কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই
অকিঞ্চিৎকর উপাত্তাস আরম্ভ করিয়াছি।
যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম
হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে,—
নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক
তাঁহাতে ক্ষুব্ধ হইবে না।

শাস্ত্র কাননে পবিত্র পুরাণকথা ও মজ্জীত
রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে
লাগিল। উদ্বিগ্নহৃদয় শান্তি সেনচন করিতে
লাগিল। হতভাগার উন্নততা ক্রমে হ্রাস
পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার
শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল!
আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র
বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনা-
থকে অগ্রেগ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের আন্ত
অবসন্ন শরীর সেই মুহূর্ত্তে শরিত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।
আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌর-
বের স্বপ্ন দেখিতেছেন, দিন দিন পদো-
ন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের
স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের
জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা
শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের
সে একটি মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখি-

তেছেন ? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন, দুৰ্গ জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন ? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে ।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাদীপ নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূৰ্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে ; শোক-ভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, স্বপ্ন, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীৰ্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর মাড়গুয়ারে ক্রীড়া করিতেন, হাস্যধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল । সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর, প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল ; আহা সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইবেন ? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রকুস্ম আশালহরী কোথায়, এই শোকের দিনে, সম্ভাপের দিনে, যাহার সাস্থনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে, এরূপ হৃদয়ের সহোদরী কোথায় ? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল ।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখ

খানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন । কি দেখিলেন ? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং জাতার শিরোদেশে আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত জাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উত্তেজ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহ-পূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন । আহা ! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায়, লক্ষ্মীর প্রকুস্ম মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটি সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, শ্লিষ্ট, কিন্তু শোকের আবাসস্থান !

রঘুনাথ নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুসংসর্গ করিলেন,—বলিলেন ‘ভগবন্ অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন রূপা আশায় হৃদয় বাধিত করিতেছ ?’—

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল ! রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,—তাহার প্রাণের সহোদরী তঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন !

ওঃ ! রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল ; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন ;—তাহার বাক্স্ফুটি হইল না, নয়ন হইতে দয়বিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া চোৎকার শব্দ করিয়া

রোদন করিয়া উঠিলেন । বলিলেন, 'লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম ? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এজীবনে আর কিছু চাহে না।' লক্ষ্মী ও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিলেন । আহ ! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুলুজ্ঞান না করে ?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পূর-স্পরে অনেকক্ষণ বাকশূন্য হইয়া রহিলেন । বহুদিনের কথা, বালাকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লছরীর সহিত শোকের লছরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয় উছলিতে লাগিল ; থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল ।

ভগিনীর ত্রায় এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ত্রায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে ? আমরা সে ভাল-বাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, সহৃদয় পাঠক রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন ।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল ; তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলি-

লেন, 'দৈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম সুখ ; দুঃখিনীর কপ'লে কি এত সুখ ছিল !' ক্ষণেক পর আপন অশ্রু বিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, 'ভাই, এই শীতল বা-তাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর যাই ; আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।' উভয়ে গাত্ৰোত্থান করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটি স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব কথা কহিতে লাগিলেন । ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন । দম্বা-হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথা বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন । কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গো বৎস বা ঘেষপাল রক্ষা করিতেন, ঘেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন বা নির্জনে বসিয়া চরণদিগের গীত গাইতেন । কখন সায়াংকালে নদীকূলে এ-

কাকী বলিয়া উঠেঃ স্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রভুষে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্বকথা শ্রবণে উঠেঃ স্বরে রোদন করিয়াছেন । পার্বতসঙ্কুল কর্ণ-প্রদেশে কএক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, একজন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন । বয়োবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ-ব্যবসায়ে উৎসাহ রুদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন । আজি তিনি বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদিশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ক্রটি করেন নাই, কিন্তু সেই চন্দ্ররাওয়ের বড়বন্ধে অল্প অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়-রূপে ভ্রমণ করিতেছেন । এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন ।

ভাতার দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অব্যাহত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন ; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন । যখন সে কথা শেষ হইল কথঞ্চিৎ শোক সঞ্চার করিয়া আপনায় কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । চন্দ্ররাওয়ের উপর ভাতার যে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা তিনি বুঝিলেন, চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচয়

দিলে ভাতার হৃদয়ে কি কষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিলেন । ধীরে ধীরে অশ্রুঙ্গল মোচন করিয়া বলিলেন ;—

‘মহারাজ্যেই দেশে আশ্রয় অনতিপরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন । নারী স্বামীর নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও যৌবনকোটি চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে । তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী স্নেহে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী স্নেহে আছেন । এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাতাকে ঘেঁষে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয় ।

বধূনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্ত কত চেষ্টা করিয়াছেন । অন্য সেই কামনার মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দির পাশ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভাতাকে পুনরায় পাইলেন ।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভাতার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের বাধা জানিতেন । লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন । সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা ও সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধর্ম্ম ।

অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দিয়া ভা-

তার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন আমাদের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকেনা। ভগবান যেরূপ দেন তাই আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানব জন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দিন সকলেরই আছে,—দুর্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম লইয়া নিঃশব্দ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন।

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

‘ভাই! এ নৈরাশ দূর কর; একপ অশ্রুত্যাগ থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহার নিত্রা ভাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?’

রঘুনাথ। ‘থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?’

লক্ষ্মী। ‘তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎ সংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা তুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ

হইলেন?’ লক্ষ্মীর নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুনাথ ক্ষুব্ধ হইয়া সম্মুখে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিলেন, ‘লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভাল বাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই,—তুমি জ্বলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কি রূপে, জীবন অপেক্ষা আমাদের মৃত্যু প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহ-অশ্রুণে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলুষিত হইয়াছে।’

লক্ষ্মী। ‘তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকটে যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।’

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুঞ্জ বর্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে অনায়াসেই নিকট আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া সেইরূপ প্রত্যাবর্তন করিলেন। বলিলেন, ‘মার্জনা কর, আমি জ্বলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অস্বীকার কর, কার্যদ্বারা কেন আপন বশ রক্ষা কর না?’

পিতা বলিতেন সেনার সাহস ও প্রভু-
ভক্তি সমস্ত কার্যো প্রকাশ হয়, যদি বি-
জ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ ক-
রিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ
ধণ্ডন কর না ? ’

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন ধক্ ধক্ ক-
রিতে লাগিল, তিনি দ্বিজ্ঞাসা করিলেন,
‘কিরূপে ? ’

লক্ষ্মী। ‘শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী
যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে
পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয়
দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে।
আমি জ্বীলোক, আমি কি জানিব, বল ?
কিন্তু তোমার পিতার নায় সাহস, তাঁহা-
রই নায় বীরত্ব-প্রতিজ্ঞা করিলে তো-
মার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে
পারে ? ’

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-
হৃদয়-শাস্ত্রে নিত্য অনভিজ্ঞ নহেন ; যে
ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া-
ছিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মদ্যে শোকস-
স্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ
উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেককণ নিষ্পন্দে চিন্তা
করিলেন, তাঁহার নয়ন উন্মাসোৎকুল, মুখ-
মণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল।
অনেককণ পরে বলিলেন—

‘লক্ষ্মী ! তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার
কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে হুতন

ভাবের উদয় হইল। আমার জীবন আর
নিকদ্দেশ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য
নহে। ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথজী
বিজ্রোহী নহে, ভীক নহে, একথা জগতে
এখন প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা,
তোমার নিকট এসমস্ত কহি কেন, তুমি
আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে ? ’

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন
‘রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধি দি-
লাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না ? ’
প্রকাশো বলিলেন, ‘ভাই ! তোমার উৎ-
সাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তো-
মার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব ?
কিন্তু যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী
যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও,
ভগদীপ্তের নিকট ইহাই প্রার্থনাকরিবে।’

রঘুনাথ। ‘আর লক্ষ্মী ! আমি যত
দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভাল-
বাসা কখন বিস্মৃত হইব না। ’

অনেককণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে
দীর্ঘে দীর্ঘে কহিলেন,—

‘আমার আর একটি কথা আছে,
কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।’

রঘু। ‘লক্ষ্মী ! আমার নিকট তোমার
কি কথা বলিতে ভয় হয় ? আমি তোমার
সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয় ? ’

লক্ষ্মী। ‘চন্দ্ররাও নামে একজন জু-
মলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করি-
য়াছেন।’

রঘুনাথের হস্ত দূর হইল, রোষে জি-

ঘাংসায় ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন। বাক্ক্ষুর্তি হইল না।

কম্পিতস্বরে দুঃখিনী লক্ষ্মী বলিলেন, ‘জিহ্বাংসা মহম্মোকের অনুচিত। ভাই, অ-জীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।’

রঘুনাথ কর্কশ ভাবে বলিলেন—

‘তিনি যদি আমার সহোদর ভ্রাতা হইতেন তথাপি কপটাচারীকে মার্জনা করিতাম না,—এই অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। সে পামরের নাম করিয়া কেন তোমার পবিত্র মুখ কলুষিত করিতেছ?’

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ স্থিরপ্রকৃতি, শাস্তা, ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু স্বামীনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেননা। সজল নয়নে সরোষে বলিলেন।

‘ভ্রাতার নিকট পূর্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটি কথা বলিলাম তাহা রাখিলে না; আমি পাপী-য়সী, আমরা সকলে পামর; বিদায় দাও, আর জন্মের মত ভগিনীকে দেখিতে পারিবে না।’

সম্মুখে, সজলনয়নে রঘুনাথ বলিলেন,

‘লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কবে আমি মন্দ কথা বলিয়াছি? চন্দ্রাণ্ডকে আমি মার্জনা করিতে পারি না, কেন সে ভিক্ষা করিতেছ?’

লক্ষ্মী ঝরু ঝরু করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—‘অনাথা ভগিনীর প্রতি কত ভালবাসা আছে তাহাই জানিবার জন্য। ভাই! তাহা জানিলাম।

একণে বিদায় দাও, দুঃখিনীর অন্য ভিক্ষা নাই।’

রঘুনাথ সজলনয়নে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, ‘লক্ষ্মী! চন্দ্রাণ্ডের জন্য তুমি কেন বাচ্ঞা করিতেছ জানি না, তাহাকে কখনও মার্জনা করিব মনে করি নাই; কিন্তু তোমার নিকট অদেয় আমার কিছু নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্রাণ্ডের অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জনা করিলাম—জগদীশ্বর তাহাকে মার্জনা করুন।’

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন ‘জগদীশ্বর তাহাকে মার্জনা করুন।’

পূর্বদিকে প্রভাতের আলোকছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রু-বর্ষণ করিয়া সম্মুখে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—‘আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণেই আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।’

‘পরমেশ্বর তোমাকে স্তখে রাখুন’ এই বলিয়া সম্মুখে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল আমরা হতভাগিনী সরসুর নিকট বিদায় লইয়া আইসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

“যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,

* * * *

“যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার

“এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কল্পমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের দিন রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইয়াছিল পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সে যুদ্ধ, সে আক্রমণ, অতিশয় সঙ্কটাপন্ন, রঘুনাথ জানিতেন। সঙ্কটের সময় পশ্চাতে থাকা রঘুনাথের অভ্যাস ছিল না, স্মরণে সে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবেন কি না, সন্দেহ। যুদ্ধে যাইবার পূর্বে একবার প্রাণভরে হৃদয়ের সরস্রকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন,—জীবনের মত একবার সরস্রর নিকট বিদায় লইবেন।

সন্ধ্যার সময় ছাদে সরস্র বালা ভ্রমণ করিতেছিলেন,—ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া রঘুনাথ ডাকিলেন “সরস্র।” সে শোকপূর্ণ স্বর শুনিয়া সরস্র শিহরিয়া উঠিলেন, রঘুনাথের অশ্রু-আধৃত চক্ষু দুটি দেখিয়া ভীত হইলেন। উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথের নিকটে আসিয়া দুই হস্তে রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—

‘ছি রঘুনাথ! তোমার চক্ষুতে জল কেন? তোমার কোন কষ্ট হইয়াছে? আমার মাথা ঝাণ্ড, বল না, চক্ষের জল কে-

লিতেছ কেন?’ নিজের অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন,—কিন্তু অগত্যা আপনার চক্ষুতে জল আসিল।

রঘুনাথ যখন আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—“না সরস্র, কিছু নহে। তোমাকে যখন দেখি তখনই আমার হৃদয় পূর্ণ হয়, আমি কথা কহিতে পারি না। যে দিন প্রথমবার তোমাকে তোরণ-দুর্গে দেখিয়াছিলাম, সে দিন যে রূপ আমার শরীর হইতে প্রাণ তোমার দিকে ধাবিত হইয়াছিল,—এখন শতবার তোমাকে দেখিয়াছি, দিবা নিশি তোমার মুখখানি মনে মনে দেখি,—এখনও প্রাণ সেইরূপ তোমার দিকে ধায় এখনও শরীর সেইরূপ অবসন্ন হয়। জগদীশ্বর! এমন পুণ্য কি করিয়াছি যে এ আনন্দময়ী পুষ্পকে হৃদয়ে ধারণ করিব!”

সরস্র কথা কহিতে পারিলেন না,—রঘুনাথের হস্তে, তাঁহার হস্ত সন্নিবেশিত ছিল, কেবল সেই হস্ত ধর্ম্মাক্ত ও কল্পিত হইল, দেহযন্টি বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, কমলীয় লজ্জায় রঞ্জিত মুখমণ্ডল হেঁট করিলেন, মুখে চক্ষু দুটি জলে প্লাবিত হইল। উঃ! রঘুনাথের কথায় সরস্র হৃদয়ে যে আনন্দলহরী বহিতোছিল কে বর্ণনা করিতে পারে? জগতে কি আনন্দ আছে, স্বর্গে কি স্বর্থ আছে, যে জন্য সরস্র সে মুহূর্তের আনন্দ বিনিময় করিতে চাহেন?

দুই জনে কণেক পরস্পরের হস্তধারণ

করিয়া শুদ্ধ হইয়া রহিলেন; শেষে রঘুনাথ বলিলেন—

‘সরযু! এখন বিদায় দাও।’

সহস্র স্নেহে এই কথাগুলি কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল,—সরযু পুনরায় রঘুনাথের হৃদয়ের উদ্বেগ বৃদ্ধিতে পারিলেন। বলিলেন—

‘রঘুনাথ, তোমার মনে কি কথা আছে আমাকে বলিতেছ না; তাহা না হইলে সঙ্ক্কার সময় হঠাৎ আমাকে দেখিয়া চক্ষুর জল ফেলিলে কেন,—তাহা না হইলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই বিদায় চাহিতেছ কেন? ছি ছি তুমি আমার নিকট মনের কথা লুকাইতেছ, রঘুনাথ! সরযুর মনে এমন কথা কি আছে যে তুমি না জান?’

রঘুনাথ অদ্য নিশীথের যুদ্ধকথা গোপন করিবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, বলিলেন—

‘না সরযু, তোমার নিকট লুকাইবার রঘুনাথের কি আছে,—আজ,—আজ, আজ রাত্রিতে একটি সামান্য যুদ্ধে যাইতেছি সেই জন্য বিদায় লইতে আসিলাম, চিন্তা করিও না, পুনরায় কাল দেখা হইবে!’

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইতে না পারিয়া রঘুনাথের শরীরের উপর হেলিয়া পড়িলেন এবং তাঁহারস্কন্ধে আপন মস্তক স্থাপন করিলেন; কথা কহিতে পারিলেন না; রঘুনাথ দেখিলেন সরযু নিরব,

অজ্ঞ অশ্রুতে তাঁহার স্কন্ধ, বাহ ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে!

রঘুনাথ অনেক কথা বলিয়া সাবুনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—ছি সরযু, তুমি কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ; আমি কত যুদ্ধে গিয়াছি, পুনরায় ত তোমার পার্শ্বে আসিয়াছি, অদ্য এটি অতি সামান্য যুদ্ধ মাত্র। আর দেখ, আমরা পরাধীন, স্তমিত, অপদার্থ, মুসলমানেরা আমাদের রাজা, আমরা দাস; একথা স্বরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ না বিদীর্ণ হয়, কে না নীরবে রোদন করে? পুনরায় হিম্মুরাজ্যের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, তিনি আমাদের সহায় হইবেন, আর যদিই এ যুদ্ধে হত হই, মনুষ্যভাণ্ডে ইহা অপেক্ষা কি মূল্য হইতে পারে? তুমি রাজপুত কন্যা, রাজপুতের ন্যায় অদ্য আমাকে বিদায় দাও।’

ক্ষণেক রোদনে সরযুর হৃদয়ের উদ্বেগ শান্ত হইল, তিনি মস্তক তুলিয়া শান্ত নিঃশ্বাস পবিত্র নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—‘রঘুনাথ তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানি, যে দিন অবধি তুমি সেই উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বলিয়াছ, সেই দিন অবধি কখনও তোমাকে যুদ্ধে যাইতে বিরত করি নাই। অদ্যও করিব না, কিন্তু নারীর প্রাণ, কখন কি ভাব উদয় হয় কে বলিবে, সহসা আমার মনে কেন ব্যথা পাইলাম, সহসা কেন চক্ষুতে

জল আশিল জানি না। বাও রঘুনাথ বিলম্ব করিওনা; তোমার হৃদয় সাহসী, আশয় মহৎ ও উন্নত, যুদ্ধে চিরজয়ী হও, দেশ দেশান্তরে তোমার যশ, তোমার নাম প্রচারিত হউক, সরযু ও একাকিনী বসিয়া সেই যশোগীত গাইবে! জগদীশ্বর তোমাকে জয়ী করুন! তিনি জগতের রাজা, যিনি যোদ্ধার চিরবন্ধু, তাঁহাকে প্রণাম করি।’

‘তিনি তোমাকে নিরাপদে রাখুন এই বলিয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। ছাদে সরযু একাকিনী দণ্ডায়মানা, রাজপুত্রবালা সাহস বাক্যে হৃদয়বলভকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শান্ত হইতেছে না, ঝর্ ঝর্ করিয়া নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুবিন্দু পড়িতেছে।

কতক্ষণ পর অন্ধকার প্রান্তরে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; দূরে নিবিড় অন্ধকারে একজন অস্বারোহীর উন্নত আকৃতি বিলুপ্ত হইল। সরযু চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, সমস্ত নিস্তব্ধ ও অন্ধকার; তাঁহার হৃদয় শূন্য ও অন্ধকার! ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিলেন।

সেদিন অন্ধকারে সরযু নয়নের মণি হারাইলেন, সেই দিন জীবনের জীবন হারাইলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে

লাগিল—‘রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজসম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী শীত্র উল্লাসিত হৃদয়ে সরযু পার্শ্বে আসিবেন, পরম কুতূহলে সরযুর হস্ত ধরিয়া যুদ্ধের গম্প বলিবেন।’ অশ্বের ক্ষুরশব্দ হইলেই সরযুর হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইত, তিনি গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিতেন, পুনরায় ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিতেন। গৃহে দ্রুত প্রদবিক্ষেপ শুনিলে সরযু চমকিয়া উঠিতেন, পুনরায় নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

দিন গেল রজনী আসিল, পুনরায় দিবস আসিল, এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, গেল, রঘুনাথ আর আসিলেন না। সরযু সেই পথ চাহিয়া চাহিয়া আস্ত হইলেন, আশা চিন্তায় পরিণত হইল, বালিকার গণ্ডস্থল ক্রমে শুষ্ক হইল, চক্ষুদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে জলপূর্ণ হইতে লাগিল; রঘুনাথ আসিলেন না।

সে চিন্তার অব্যক্তব্য যাতনা প্রকাশ করা যায় না; বালিকা কাহাকে সেকথা বলিবেন? নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নীরবে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, অথবা সায়াংকালে সেই ছাদে উঠিয়া সেই অন্ধকার পরিপূর্ণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্ত হইতেন। সেই উন্নত দেহ কি দূরে দেখা যাইতেছে? সরযুর যোদ্ধা কি যুদ্ধ-উল্লাসে সরযুকে বিস্মৃত হইলেন? যুদ্ধে কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? সহসা অশ্রুজলে সর-

যূর নয়ন আগ্রত হইল, শুক্ল গণ্ডস্থল দিয়া
ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা বজ্রের ন্যায় সংবাদ আসিল রঘুনাথ
বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণের জ্ঞাত অবমানিত
হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন! প্রথম মুহূর্তে
সব্ব চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ
তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ল-
লাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে
মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে
লাগিল, নয়ন হইতে অশ্রুকণা বহির্গত হ-
ইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন “কি
বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী? রঘুনাথ মু-
সলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন?
কিন্তু তুই নিরক্ষা, তাকে কি বলিব,
সম্মুখ হইতে দূর হ!” শাস্ত্র ধীর-স্বভাব
সরযূকে এবিধ ক্রুদ্ধ দেখিয়া দাসী বি-
স্মিত হইল, শশবাস্তে সরিয়া গেল।

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক
সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে
লাগিল ‘রঘুনাথ বিদ্রোহী!’ বার বার
সরযূ এই কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার
সখীগণ সরযূকে এই কথা বলিলেন; রুদ্ধ
জনার্দন সাক্ষ্যলোচনে বলিতে লাগিলেন
যে, কে জানে সেই সুন্দর উদারমূর্তি বাল-
কের মনে এরূপ ক্রুরতা ছিল? সরযূ
সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না,
রঘুনাথের বীরত্ব ও সত্যব্রততায় সরযূর
যে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, মুহূ-
র্তের জন্য তাহা বিলুপ্ত হইল না। তিনি
কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না, তাঁ-

হার মুখমণ্ডল অজ্ঞ আরক্ত, নয়ন জল-
শূন্য।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হ-
ইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযূ
সরোবরতীরে যাইলেন; হস্ত পদ প্রক্ষা-
লন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তিত ভাবে গৃ-
হাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চিমধ্যে সেই নৈশ অন্ধকারে
জটাজুটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বা-
মীকে দেখিতে পাইলেন, ঈষৎ বিস্মিত
হইয়া দাঁড়াইলেন। যত গোস্বামীর দিকে
দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃ
পূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযূর হৃদয়ে ভক্তির
আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘প্রভু! একজন অসহায় নারী আ-
পনার আশ্রয় য'চ্ছা করিতে আসিয়াছে,
তাহাকে ক্ষমা করুন।’

গোস্বামী সরযূর দিকে চাহিলেন,
ক্ষণেক স্থির ভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে
বলিলেন।

‘রমণি, আপনার উদ্দেশ্য আমি
অবগত আছি, কোন যুবক যোদ্ধার কথা
জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন।’

সরযূ অধিকতর ভক্তি সহকারে ব-
লিলেন,—

‘ভগবন্ আপনার গণনাশক্তি অসা-
ধারণ,—যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু
বলেন তবে বাধিত হই।’

গোশ্বা। ‘জগতে সকলে তাঁহাকে
বিত্রোহী বলিয়া জানে।’

সরযু। ‘প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই।
প্রকৃত অবস্থা কি?’

গোশ্বা। ‘মহরাজ শিবজী তাঁ-
হাকে বিত্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া
দিয়াছেন।’

সরযুর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, আ-
রক্ত নয়নে কহিলেন, ‘তপস্যা প্রবন্ধনা
বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথকে বিত্রোহী
বিশ্বাস করিব না! গোশ্বামিন্ আমি বি-
দায় হই।’

গোশ্বামীর নয়ন সহসা জলপূর্ণ হইল;
—ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘আরও কিছু
আমার বক্তব্য আছে।’

সরযু। ‘নিবেদন ককন।’

গোশ্বা। ‘মনুষ্য হৃদয় অবগত হ-
ওয়া মনুষ্যাগমনার অসাধ্য, যোদ্ধার হৃদয়ে
কি ছিল জানিবার এক মাত্র উপায়
আছে।’

‘শাস্ত্রে লিখে প্রাণিগণীর হৃদয় প্রাণ-
বীর হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ; যদি রঘুনাথের
যথার্থ প্রাণিগণী কেহ থাকে, তাঁহার নি-
কট গমন ককন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি
জিজ্ঞাসা ককন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা
মিথ্যাবাদিনী নহে।’ গোশ্বামী তীব্রদৃ-
ষ্টিতে সরযুর দিকে চাহিতে ছিলেন।

সরযু। আকাশের দিকে চাহিয়া
বলিলেন, ‘জগদীশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ
করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তি

দান করিলে। সেই উন্নত চরিত্র যোদ্ধার
প্রাণিগণী হইবার যে আশা করে, জীবন
থাকিতে রঘুনাথের সত্যত্বে তাহার
স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না। হৃদ-
য়েশ! জগতে তোমার অন্যায় নিন্দা ক-
কক, কিন্তু একজন দুঃখিনী বিপদে সম্পাদে
চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে।’
সরযুর নয়ন যুগল এতক্ষণে জলপূর্ণ হইল,
গোশ্বামী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছি-
লেন,—তাঁহার দুই নয়ন শুষ্ক ছিলনা,
তাপসের শান্ত হৃদয় উৎকণ্ঠ হইতে-
ছিল।

ক্ষণেক পর কষ্টে আত্মসংযম করিয়া
গোশ্বামী বলিলেন,—

‘ভদ্রে! আপনার কথা শুনিয়া
বোধ হইতেছে, যে আপনিই সেই যো-
দ্ধার প্রকৃত প্রাণিগণী। আমি দেশে দেশে
পর্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সঙ্গে
সাক্ষাৎ হইতে পারে;—আপনার তাঁ-
হাকে কিছু বক্তব্য আছে?’

গোশ্বামীর সম্মুখে রঘুনাথকে হৃদ-
য়েশ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, স্বরণ
করিয়া সরযু ঈষৎ লজ্জিত হইলেন; কিন্তু
সে ভাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলি-
লেন,—

‘প্রভুর সহিত তাঁহার সম্মতি সা-
ক্ষাৎ হইয়াছিল?’

গোশ্বা। ‘কল্য রজনীতে ঈশানী-
মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।’

সরযু। ‘রঘুনাথ আপাততঃ কি

করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রভু কি অবগত আছেন ?

গোশ্বা । ‘ নিজ বাস্তবলে নিজকার্য্য-
গুণে অন্যায় অপযশ তিরোহিত করিবেন
অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন ।’

সরযু । ‘ ধনা বীরপ্রতিজ্ঞা ! প্রভু !
যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়,
বলিবেন, সরযু রাজপুত্রবালা, জীবন অ-
পেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে ! বলিবেন,
সরযু যতদিন জীবিত থাকিবে রঘুনাথ কে
কলঙ্ক শূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই চিন্তা
করিবে, তাঁহারই যশোগীত গাইবে, ।
ভগবান অবশ্য রঘুনাথের যত্ন সফল করি-
বেন ।’

গোশ্বা । ‘ ভগবান তাহাই কখন !
কিন্তু ভদ্রে ! মতোর সর্বদা জয় হয় না,—
বিশেষ রঘুনাথ যে দুর্ভাগ্য উদ্যমে প্ররক্ত হই-
তেছে, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় ও
আছে ।’

সরযুর নয়নধর্য্য সহসা জলপূর্ণ হইল,
কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদর্পে সে জল মোচন
করিয়া বলিলেন,—

‘ রাজপুত্রের সেই ধর্ম্ম ! আপনি তাঁ-
হাকে জানাইবেন যদি কর্তব্য সাধনে
হৃদয়শের প্রাণ বিয়োগ হয়,—তাঁহার
দাসী তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে
উল্লাসে নিজপ্রাণ বিসর্জন দিবে !’

উভয়ে কণেক নিমন্ত্র হইয়া রহিলেন ;
গোশ্বামীর বাক্যশক্তি ছিল না । অনেক-
কণ পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন,

‘ রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলি-
য়াছিলেন ?’

গোশ্বামী কণেক চিন্তা করিয়া উত্তরে
কম্পিতস্বরে বলিলেন—“ আপনাকে জি-
জ্ঞাসা করিয়াছেন, বিজ্ঞোহী বলিয়া জ-
গৎ যাহাকে ঘৃণা করিবে আপনি কি তা-
হাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন ? জগতে যা-
হার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি
কি মনে মনে তাহার নাম স্মরণ করিবেন ?
জগতে কি একজনমাত্র বিজ্ঞোহী রঘুনাথকে
নির্দোষী বলিয়া জানিবেন ;—ঘৃণিত, অ-
বমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে ঐ শীতল
হৃদয়ে স্থান দিবেন ?’ সন্ধ্যাসীর কঠরোধ
হইল ।

সরযু বলিলেন ‘ প্রভু ! সে বিষয় কি
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সরযু রাজপুত-
বালা, অবিশ্বাসিনী নহে ।’

গোশ্বা । ‘ জগদীশ্বর ! তবে আর
তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই, লোকে যদি নন্দ
বলে তিনি জানিবেন একজন এখনও রঘু-
নাথকে বিশ্বাস করে !’

একণে বিদায় দিন ; আমি এই কথা-
গুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন
হইবে !’

সজল নয়নে সরযু বলিলেন, ‘ আরও
বলিবেন তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য আমি প্র-
তিরোধ করিব না, অসিহস্তে যশের পথ
পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদি পু-
রুষ তিনি তাঁহার সহায় হইবেন ! আর যদি
এই উদ্যমে তাঁহার কোন অসম্মল ঘটে,

জানিবেন, তাঁহার চিরবিখ্যাসিনী সরযু ও
এ অকিঞ্চৎকর জীবন বিসর্জন করিবে।’

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযু বলিলেন ‘প্রভু! আমার
হৃদয় শাস্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জি-
জ্ঞাসা করিতে পারি?’

গোস্বামী চিন্তা করিয়া বলিলেন,
‘সীতাপতি গোস্বামী।’

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার
ঢালিতে লাগিল! সেই অন্ধকারে একজন
গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে
গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড় দুর্গ।

“ধিক্ দেব যুগাশ্রনা, অক্ষুণ্ণ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অক্ষতমপুরে,
দেবড, বিভব, বীৰ্য্য, সর্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি?”

ভ্রমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর,
শিবজীর তদানিন্তন রাজধানী রায়গড়ে
রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি সভা সমি-
বেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান
সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্মচারী ও দূরদর্শী বি-
চক্ষণ পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায়
উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা,
যৌশক্তি সম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতর শুল্ককেশ

বহুদর্শী নায়শাস্ত্রী, সভাতল শ্রুশোভিত
করিয়াছেন; যুদ্ধব্যবসায়ে, বুদ্ধিসঞ্চালনে
বা বিদ্যাবলে ইছারাই শিবজীর চিরসহা-
য়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইহাদের
ও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ, হিন্দুদিগের
গৌরবসাধন জন্য ইছারা দিনে দিনে মাসে
মাসে বৎসরে বৎসরে অনিরন্তর হইয়া চেষ্টা
করিয়াছেন। কিন্তু অদ্য সে চেষ্টা কো-
থায়, সেই উৎসাহ কোথায়? সভাস্থল
নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ
অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বি-
দায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে স-
ম্বোধন করিয়া বলিলেন—

‘পেসওয়ারী! আপনি তবে এই
পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা
স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গী-
রদার হইয়া থাকিব? মহারাষ্ট্রীয় গৌরব-
রবি চিরাক্রমকারে মগ্ন হইবে?’

মুরেশ্বর। ‘মনুষ্যের ফালা সাধা
আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নিষেধ
কে লঙ্ঘন করিতে পারে?’

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব।

পুনরায় শিবজী বলিলেন—

‘স্বর্গদেব! যখন আপনি আমার
আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ
নির্মান করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজ্যের
রাজধানী স্বরূপ নির্মান করেন, না সা-
মান্য জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া
নির্মান করেন?’

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর করিলেন—

‘কত্রিরাজ ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্ঠা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। যখন রায়গড় নির্মাণ করিয়াছিলাম তখন কে জানিত হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন ? দৈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।’

অন্নজী দত্ত কহিলেন, ‘মহারাজ ! পূর্বেই আমরা দিল্লীস্থরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছি, সে বিষয় অদা পুনঃস্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিলে ফল কি ? যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্তব্যাকর্তব্যতা বিবেচনা করুন।’

শিবজী কহিলেন, ‘অন্নজী ! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ, যে চেষ্ঠা হৃদয়ে বলকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না ;’ ক্রমে চিন্তার পর বলিলেন, ‘ঐ যে উন্নত পার্বত্যশ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বালা-সুহৃদ অন্নজী মালজী ! ঐ পার্বত্য শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিয়া হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত তাহা কি স্মরণ হয় ? পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হ-

ইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, যুদ্ধির বা রামচন্দ্রের ন্যায় সমাগরা ধরার অধিপতি, হিমালয় হইতে সাগর কূল পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ শাসন করিবেন ! দৈশানী ! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্ন কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে ?’

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল ; সকলে নীরব, সভায় শব্দ মাত্র নাই,—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটি গম্ভীর-স্বর প্রসৃত হইল, ‘দৈশানী প্রবঞ্চনা করেন না ; রাজন ! তিস্ত হস্তে অসি ধারণ করুন, অধ্যবসায় সহিত এই উন্নত পথ অনুসরণ করুন,—স্বপ্ন এখনও সফল হইবে।’

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, জটাজুটধারী, বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ, নবীন গোশ্বামী সীতাপতি !

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, ‘গৌমাত্রিজী ! তুমি বালা-উৎসাহ আমার হৃদয়ে পুনঃক্রেক করিতেছ,—বালা-কথা পুনরায় স্মরণ হইতেছে ! তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ‘বৎস ! তুমি যে চেষ্ঠা করিতেছ তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্ঠা নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, দৈশানী

যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুগ্ৰহণ কর।’ বিংশতি বৎসর পরে অদ্যাপি দাদাজীর গম্ভীরস্বর আমার কর্ণ-কুহরে শব্দিত হইতেছে,—দাদাজী কি প্রবঞ্চনা বাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন ?’

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—‘কানাইদেব প্রবঞ্চনা বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে,—পথমধ্যে যদি আমরা ভ্রমোৎসাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া নিরস্ত হই, সে কি তাহ, দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা না আমাদের ভীকতা ?’

‘ভীকতা’ শব্দ উচ্চারণ মাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্ঝন্ঝ শব্দ করিল,—ক্রোদী চন্দ্রাও জুমলাদার গোস্বামীর গলদেশে সজোরে ধারণ করিলেন। মীতাপতি ধীর, ভয়শূন্য,—ধীরে ধীরে আপন বজ্রহস্তে চন্দ্রাওয়ের হস্ত ছাড়াইয়া যেন পতঙ্গবৎ সেই জুমলাদারকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে বুঝিলেন গোস্বামীর চিরজীবন কেবল যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হয় নাই।

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

‘রাজন্ ! ব্রাহ্মণের বাচলতা ক্ষমা করুন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন ! কিন্তু মদীয় উপদেশ

সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ ! আপন বীর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন ! যিনি জায়গীর্দাদের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে বহু বিপদ, বহু সঙ্কট হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পার্শ্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে, বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন ? বালসূর্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের তেজ চারিদিকে অক্ষরকার বিদীর্ণ করিয়া উদয় হইতেছে,—সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে ? রাজন্, হিন্দু-গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন ? আমি ধর্ম্মাবসারী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।’

সভাস্থ সকলে নীরব,—শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নগ্নন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল !

অনেক ক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

‘স্বামিন্ ! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে,—আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না কিন্তু দৈববাণী হইতে আপনার কথা অধিক মিষ্ট, হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে ! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি ;—হিন্দু সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণকৌশল, অসংখ্য

রাজপুতসেনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে—
এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায়?’

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্ৰ-
গণ্য, কিন্তু মহারাজীয়াগণ ও দুর্বল হস্তে
অসি ধারণ করেন না, জয়সিংহ রণপণ্ডিত,
কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক-
রিয়ান। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই
পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ-
করিয়া, দৈব সংহনন করিয়া, কার্যসাধন
করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে
আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে
এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনার মহা-
য়তা না করিবেন! সভাবল পুনঃসুস্থিত।

শিবজী। ‘মানিলাম, কিন্তু হি-
ন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া কথিরন্ত্রিতে
দেশ প্লাবিত করিবে, সেকি মঙ্গল, সে
পুণ্যকর্ম?’

সীতাপতি—‘না—কিন্তু সে পাপে
কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধ-
র্মের জন্য যুদ্ধ করেন, না যিনি মুসলমান
অর্থতুচ্ছ হইয়া স্বজাতির বৈরতাচরণ করেন,
তিনি?’

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন,
প্রায় এক দণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে
লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভী-
ষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতে ছিল,
কে বলিবে? এক দণ্ড কাল পর ধীরে
মন্তক উঠাইয়া গভীর স্বরে বলিলেন,—

‘সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহা-
রাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এ-

খনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ
হইবে,—সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা
বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি
আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন
এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয়
আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম-নাশ আ-
শঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটি কারণে
আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ
করুন।

‘যে মহৎব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা
সাধনার্থ কত যত্নসম্পন্ন, কত গুপ্ত উপায়
অবলম্বন করিয়াছি, আপনার নিকট অ-
গোচর নাই। কত হত্যা করিয়াছি, কত
সন্ধিবাক্য বিস্মরণ হইয়াছি, কত গর্হিত
কার্যে শিবজীর নাম কলুষিত রহিয়াছে!
দেব দেব মহাদেব জানেন আপনার লা-
ভের জন্য এ সমস্ত করিনাই,—হিন্দু-গৌ-
রব পুনরুদ্ভূত হইবে, শিবজীর কেবল এই
এক মাত্র উদ্দেশ্য।

‘অদ্য হিন্দুধর্মের অবলম্বনস্বরূপ,
হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্তিস্বরূপ মহারাজ
জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি,—শি-
বজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারগ!
বিধর্মীর সহিত কপটাচরণ করিয়াছি,—
ভগবান্ সে পাপ ক্ষমা করুন,—মহানু-
ভব রাজপুতের সহিত কপটাচরণ শিবজী
জীবন থাকিতে করিবে না।

‘ধর্মাত্মা এক দিন আমাকে বলিয়া
ছিলেন, সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধ-
র্মের রক্ষা না হয় সত্য লঙ্ঘনে হইবে!’

সেকথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হইনাই,
—সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

‘সীতাপতি! আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্বল হন্তে থড়া ধরিতে না। কিন্তু জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।’

সভাসদ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন—

‘মহারাজ! আর একটি কথা আছে—আপনি কি দিল্লি যাওয়া স্থির করিয়াছেন?’

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্য দান করিয়াছি।’

অন্নজী। ‘মহারাজ! আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আত্মন করিয়াছেন তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?’

শিবজী। অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং বাক্য দান করিয়াছেন যে দিল্লি গমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।’

অন্নজী। ‘কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?’

শিবজী। সন্ধি লঙ্ঘনের ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাজ্জিভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ

আচরণ করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে।’

শিবজীকে স্থির প্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন—

‘আর একটি কথা আছে, পেশওয়ারাজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব! অন্নজী দত্ত! আপনাদিগের নায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল,—আপনাদিগের নায় কার্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্র দেশে বিরল। আমার অবর্তমানে মহারাষ্ট্র দেশ আপনারা তিন জনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের নায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।’

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অন্নজী মালতী তখন বলিলেন, ‘ক্ষত্রিয় রাজ! আমার একটি আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লি যাত্রা করি।’

সদ্রল নয়নে শিবজী বলিলেন, মালতী! তোমার নিকট আমার আদেশ কিছুই নাই,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।’

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন ‘রাজন্! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমার ব্রত সাধনার্থ বহুতীর্থে যাইতে হ-

ইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

শিবজী। ‘নবীন গোস্বামিন! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন! যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত যোদ্ধা আমি দেখিতে আকাজক্ষা করি না। আপনার মত অশ্রু বরষেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।’

পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অপরিষ্কৃষ্টস্বরে বলিলেন—‘কেবল আর এক জনকে জানিতাম!’

সভা ভঙ্গ হইল। শিবজী শয়নাগারে যাইয়া বহুকণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, নবীন গোস্বামীর উৎসাহবাক্য বার বার মনে উজ্জেক হইতে লাগিল। অনেককণ পর নিদ্রিত হইলেন, নিদ্রাগণ্ড যেন সেই উৎসাহবাক্য শুনিতে লাগিলেন, সেই বীরত্বজী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বপ্নে সকল ঠিক দেখা যায় না, অবস্থা ও রূপের পরিবর্তন হয়। শিবজী স্বপ্নে সেই উত্তেজনা বাক্য শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু বক্তা যেন সে নবীন গোস্বামী নহে, বক্তা রঘুনাথজী হাবেলদার।

অব্যায়ুর্বেদ ।

অভাব ও প্রয়োজনীয়তাই বাবতীর বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের জনক জননী। অন্যথা নদীমাতৃক মিসর দেশে জ্যামিতির বহুল প্রচার ও রূপণ-প্রকৃতি শীতকটীবন্ধে কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পযন্ত্রাদির আদি উদ্ভাবন দৃষ্ট হইত না। জগতে যখনই যে জাতি পরিতস্থ অপরাপর জাতি অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, তখনই সেই জাতি, দেশ কাল ও জলবায়ুর প্রক্রিয়াভেদে, স্বীয় বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনার্থ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির শিক্ষক হইয়াছে। উপরে যে শাস্ত্রের নামাঙ্কিত হইল, তাহা যে কোন জাতি বিশেষের প্রয়োজনীয় মাত্র এমন নহে;

উহা শরীরমাত্রের সাধারণ প্রয়োজনভূত। প্রাচীনকালেও, যে সকল জাতি অতীব অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহাদেরও তৎকালে এইশাস্ত্র কিয়ৎপরিমাণে বিদিত ছিল। যাহার শরীর আছে, তিনিই ইহার জন্য কখনও না কখন ব্যাকুল হইয়াছেন। আয়ুর্বিদ্যা ও তৎক্রিয়াধিকরণভূত মানবশরীর এইরূপ অখণ্ডা নিয়মে সংবদ্ধ যে, একের অস্তিত্ব অপরের পরিচায়ক। কিন্তু তাদৃশ আবহমান অকিঞ্চিৎকর অসংবদ্ধ ভেষজ-তত্ত্ব একটি বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

ইতিহাসালোকবর্তী হস্তে করিয়া কালের অন্ধকার পথে যে পর্য্যন্ত গমন করা

যায়, তন্মধ্যে ভারতের বেদ ও পরম্পরানো-
দীচা প্রদেশের নিম্নরূপই প্রাচীনতম । এত-
দূরপেছা দূরগতকালে কি ছিল, ভাষা ভা-
ষার কিছু পরিচয় দেয় না । আমরা
আদৌ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের কয়েকটি প্রা-
র্থনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে পৃথিবীর
প্রাচীনতম জাতি অর্য্যগণ তখনই প্রায়
শাস্ত্রনামোচিত আয়ুর্বিজ্ঞান উদ্ভাবন ক-
রিয়াছিলেন ।

উপাসনারূপিত যেমন মনুষ্যের প্রকৃতি-
গত, মনুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে
নাই, বোধ হয় পারিবেও না, রোগোৎ-
পত্তিও তজ্জন মানবপ্রকৃতির আদিবিকার-
জনিত; এজন্যই বেদকবি বলিয়াছেন, বে-
দ নিত্য ও আদিপুরুষ ব্রহ্মার কীর্ত্তি । আ-
বার তাদৃশ হেতু নিম্নকনই অর্য্যগণ ব্রহ্মা-
কেই আয়ুর্বেদের আদিবক্তা বলিয়া বি-
শ্বাস করেন ।

পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে একরূপ প্রথিত
আছে যে, সত্যযুগে লোকসকল নিরোগী
ছিল । হ্রেতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষ-
ভাগে রোগ সঞ্চারিত হয় । অনেক নব্য-
শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাবিমানী, হয়ত,
প্রোক্ত পৌরাণিক বাক্য শুদ্ধ কম্পনাস-
ম্মত ও একেবারে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া
উপহাস করিবেন ; কিন্তু একটুকু প্রীতির
সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চ-
য়ই উহার সারবত্তা অনুভব করিতে পা-
রিবেন । আমরা ভ্রমেও একথা বলিব না
যে, সেইকালে সমস্ত মনুষ্য একেবারে

সুস্থ ছিল ; কদাপি কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ-
জনিত ক্লেশ পাইতে হয় নাই ; বরং ইহাই
দেখাইব যে অতীব প্রাচীন ভারতসমাজেও
রোগ শোক বর্তমান ছিল ; কিন্তু, কথা
এই যে, সত্যে নিরাময়ত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক
বাক্য একেবারে তাৎপর্য্যবিহীন নহে ।
যখন মানবসমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে
প্রতি বর্গক্রোশে দ্বিসহস্র লোকও থাকে
নাই ; যখন মানবজাতি প্রাচীনা বলিয়া
জগতে পরিচিত হয় নাই ; বালাবিবাহ,
মদ্যপান ও অপরাপর সভ্যতাসূচক বি-
লাসসামগ্রী যখন ভারতক্ষেত্রে দূরতর
বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার অতি
সূক্ষ্ম কার্পাসযন্ত্র বিনিময়ে দৃঢ়তর বস্কল,
বাস্তুশৌভন ছত্রবিনিময়ে বুদ্ধশ্রমের সেবন
করিয়া আর্য্যগণ বিক্রান্ত হইয়াছেন, সেই
সময়ে নিশ্চয়ই বর্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির
বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব ছিল না, অতি
সাধারণ রকমের কোন কোন পীড়া বা-
তীত প্রায়ই রোগ প্রাচুর্য্য ছিল না । এ-
স্থলে 'নিরোগী' এই পদটি রোগহীনত্ব-
সূচক নহে ; নঞের অপ্পত্তি অর্থই এস্থলে
প্রযোজ্য ।

মানব সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে অ-
নেক সুখ ও আসিয়াছে, অনেক দুঃখ ও
আসিয়াছে । যে দেশ যত জনাকীর্ণ হই-
য়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার
জ্বালায় জ্বলিয়াছে ।

ঋগ্বেদের পূর্বে ও তৎসম কালে যে
অপ্পে ২ আয়ুর্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে-

ছিল বেদের বহুবিধ প্রার্থনা তাহার পরিচয় দিতেছে। এই কালে আয়ুর্বেদ একটি শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। যাহা হউক ইহাই আয়ুর্বেদের ভিত্তি ভূমি। আমরা এই কালকে বেদায়ুর্বেদ বা দেবায়ুর্বেদ নামে অভিহিত করিলাম। এই কালের আদি গুরু ব্রহ্মা শেষ গুরু ইন্দ্র। ইন্দ্র হইতে ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ লাভ করেন; ইহারাই দ্বিতীয় কালের প্রবর্তক; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রমাণতঃ চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া, ইহার নাম ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্বেদ বা মিশ্রায়ুর্বেদ। মিশ্রায়ুর্বেদই কাল ক্রমে বৈদ্যায়ুর্বেদ রূপে পরিণত হয়। শেষ কাল বা সর্বাযুর্বেদ মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়; এবং আজ পর্য্যন্ত উন্নতি বা অবনতির সোপানে বিচরণ করিতেছে।

আমরা পরবর্ত্তি কয়েক পৃষ্ঠায় এই চারিটি বিভাগের যথা প্রাপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিব। সত্য বটে স্থানে বর্তমান কালের বিশ্বাসাতীত দুই একটি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইবেক; কিন্তু কি করিব, ভারতের কোন ও ঐতিহাসিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে জানিয়া শুনিয়া ও এই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পাঠক এতাদৃশ স্থলে, অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া ইহার প্রতি অক্ষর গ্রহণ করিতে যাইয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

দেবায়ুর্বেদ ।

বা

বেদায়ুর্বেদ ।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আয়ুর্বেদ-বিৎ পণ্ডিত ব্রহ্মাকে আয়ুর্বেদের আদি গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এরূপ বিবৃত আছে যে তিনি লক্ষ লোককে সমস্ত আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করেন, ও সহস্র অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া ইহাকে অথর্ক বেদের উপাঙ্গ রূপে নিবেশিত করেন। কালান্তরে, যখন মানব গণ অপ্পায়ুর্ক ও অপ্পমেদস্ত নিবন্ধন, তদদ্বারা অক্ষম হইয়া উঠিল, পরঃখকাতর পিতামহ অমনি অতি সংক্ষেপে সমস্ত আয়ুর্বেদতত্ত্ব আট ভাগে প্রণয়ন করে*। ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ হইতে অশ্বিন দ্বয়, অশ্বিন হইতে

* ইহ খল্লায়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গ মথর্কবেদম্যানুপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোক শত সহস্রমধ্যাসহস্রঞ্চ ক্লুতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোহপ্পায়ুর্কম্পমেদস্তঞ্চাবলোক্য নরানাং ভূয়োক্ষধা প্রণীতবান্। সুশ্রুতঃ ১৯ সূত্রস্থান।

ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরথিজগে। তস্মাদশ্বিনাবশ্বিতামিন্দ্রঃ ইন্দ্রাদহং, মর্যাদ্বিহপ্রদেয়মর্থিভাঃ প্রজাহিতহেতোঃ। ব্রহ্মণাহি যদা প্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজাপতিঃ জগ্ৰাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌতু পুনস্ততঃ অশ্বিত্যাহ ভগবান্ শক্ৰঃ প্রতিপেদেহ কেবলম্। চরকসংহিতায়ঃ।

ইতে ইন্দ্র আয়ুর্বেদ লাভ করেন। আশ্বিন দিগের অপর নাম সনত্‌কুমার। প্রথিত আছে ইহারাই স্বর্গবৈদ্য ছিলেন। ধনুস্তরি ও ভরদ্বাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে শারীর বিজ্ঞানের আদি প্রচারক হয়েন। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে পঁচ জন গুরু পরম্পরা পর্যান্ত, স্বর্গে আয়ুর্বেদ প্রচারিত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে দৃষ্ট হইবে যে ঋগ্বেদ কালে ইহারাই বৈদ্য বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। সূতরাং স্বর্গায়ুর্বেদ কালকে বৈদিক কাল বলাতে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, দীর্ঘ বৈদিক কালে যে সকল ভেষজতত্ত্ব বেদকবিদের বহু গবেষণাতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাই অস্পষ্ট ধনুস্তরি ও ভরদ্বাজ কর্তৃক এক অত্যাৎকৃষ্ট শাস্ত্র রূপে পরিণত হয়। বেদকবি মেধাতিথি বলিয়াছেন “ জলেতেই অমৃত, জলেতেই সমস্ত রোগনাশক ওষধি বর্তমান।” * “ হে সোম তুমি আমাদের প্রশংসার পাত্র, তুমিই ওষধি তত্ত্বর প্রভু।” এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জলের অসাধারণ রোগনিবারণী শক্তি অতি প্রাচীন কালেই ভারত সমাজে বিদিত ছিল।

পুনশ্চ, ষাদশ ও ত্রয়োদশ স্তোত্রে সোমকন্দে নিকট রোগদূতকরণার্থ প্রার্থনা বিদ্যমান দেখা যায়। সোমকন্দ যে শুদ্ধ

* অপ্‌সস্তরমৃতমপ্সুভেষজমপায়ুত প্রশস্তয়ে। ঋগ্বেদসংহিতায়।

বলকর ও মাদক এমত নহে, ইহা যে বহুবিধ জরাজীর্ণাপহারক তাহাও সেই পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, এই প্রার্থনা সোমদেবের নিকট, কারণ পরবর্ত্তিস্তোত্রেই ‘ হে সোম তুমি অমৃততত্ত্ব সহিত বহু আবর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হও’ এরূপ বাক্যে সোমপদ কদাপি চন্দ্র নামান্তর নহে। সোমকে আয়ুর্বেদবিদ পণ্ডিতগণ স্থানক্রিয়াভেদে চতুर्वিংশতিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন *। তাহারও ইহার অসাধারণ জরাপহারণী শক্তি দেখিয়া ইহাকে ওষধিপতি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন †। পুনরপি ২০ শ সূক্তে “ সোম আমাকে বলিয়াছেন যে জলেতেই সমস্ত ওষধি * ***। হে জল তুমি আমাদের শরীরের নির্মিত রোগ নিবারক ভেষজ স্বকিকর। ২১ সূক্ত। ‡ এতদ্বারা অনুমিত হয় যে তৎকালে অধিকাংশ ভেষজই জলজ ছিল; জল যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত

* এক এব ভগবান্ সোমঃ স্থানক্রিয়াভেদেন চতুर्वিংশতিধাভিদ্যতে যথা অংশমান্ ভুঞ্জবাংশৈশ্চ ব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ।**

† ওষধীনাং পতিং সোমমুপভূজ্য বিচ-

ক্ষণঃ। সূক্তত

দশবর্ষ সহস্রাণিনবান্ ধরয়তি তনুম্ ॥ ঐ

‡ অপমুমে সোমোহিব্রবীদন্তুর্বিষ্মানি ভেষজাঃ। অগ্নিকৃ বিশ্বশস্ত্রবমাপশ্চ বিশ্ব ভেষজীঃ। আপপৃণীত ভেষজং বরুথং তম্বেমম। ***

হইত তাহারত সন্দেহই নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বেদ কবিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবের ও কল্পনা করিয়াছেন ; কারণ অনেক স্থলে সোমদেবের প্রার্থনা ও বিদ্যমান আছে * আর্য্যবুর্বেদবিদ পণ্ডিতগণ অশ্বিন্ কুম্ভাদির ন্যায় সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই ; শুদ্ধ ওষধিপতি বলিয়াই পরিচূপ্ত হইয়াছেন। ঋকে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য ও বললাভের নিমিত্ত কৃত্তদেবের প্রার্থনা বর্তমান দেখা যায় ; পরবর্ত্তিগ্রন্থাদিতে “স্বয়ং কৃত্তেণ ভাষিতম্” বলিয়া অনেক ঠৈলবটিকার প্রশংসাদ্বনিও বিদ্যমান আছে। অন্যতর বেদ কবি গৃৎসমদ বলিয়াছেন ‘হে কৃত্ত ! তৎপ্রদত্ত স্বাস্থ্যরক্ষক ওষধি দ্বারা যেন আমরা শত শত শীত বাঁচিবা থাকি। ওষধিতক দ্বারা তুমি আমাদের সম্ভানগণকে বলাবিত্ত কর। কারণ শুনিতে পাই তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’। এস্থলে স্মরণ্য এই যে আত্রেয় ধনুস্তরি, সূক্তত এমন কি বাতটগুপ্ত পঞ্চান্তু ইহাকে অশ্বিন্ ইন্দ্রাদির ন্যায় বৈদ্যশ্রেণীভুক্ত করেন নাই। কিন্তু রসেন্দ্র সারসংগ্রহাদি

* মানঃ শংসো অবরুযো ধৃষ্টি প্রণ্ডমুর্ভস্য রক্ষণো ব্রহ্মগম্পতে। সধাবীরো ন বিধতি যমিক্তো ব্রহ্মগম্পতিঃ সোমো হিনোতি মর্ত্যং যো রেবানো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্জনঃ মনঃসিষক্তু যন্তরঃ। স্বযেদ সংহিতায়াং।

অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূরি ধনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ অনুমিত হয় যে কৃত্তকারগণ পূর্বাচার্য্যদের এই ভ্রমানুসন্ধান পাইয়া বেদোল্লিখিত কৃত্তদেবকে আর্য্যবুর্বেদ ব্যবসায়ী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্যদেবমহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

সূপতিগণ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এতদ্ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতেন ঋকেই তাহার আভাস পাওয়া যায় * বাস্তব, যে প্রণালীতে ভারতীয় আর্য্যবিজ্ঞান পদপল্লব ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড ব্লক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূল সূত্র—আধার উর্বরতা বিধায়ক সার বীজাদি ঋকের সময়েই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বাভিপ্সিত গণনানুসারে ঋকের কাল ঋঃ জম্মের পূর্ব ২০০০ বৎসরের অত্যান বলেন। সূতরাং যে আর্য্যবুর্বেদের দুই একটি গলিত পত্র আজও প্রাপ্ত হইতেছি, অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্বে তাহার বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল। রোগ মাত্র সাধারণতঃ জলের উপাদেয়তা, বহুবিধ জলজ পদার্থের রোগাপহারিনী শক্তি, উর্দ্ধদ্রব্যগত রোগচিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষুরোগাপনয়ন, ও রাজ্যার আর্য্যবুর্বেদ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধানের আবশ্য-

* শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুখী গতীরা স্মৃতিষ্ঠে অন্ত * * * যক্টোমু-বাকঃ।

কতা, সেই পুরাকালেই আৰ্য্যমনষিদের নিখুঁত জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তখন জাতিভেদও হয় নাই, ব্যবসায় ভেদও হয় নাই। একই ব্যক্তির সন্তান অথবা কচি অনুসারে উপজীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেন। জন্মক বেদ কবি এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, ‘আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা তুলু প্রস্তুতকারিণী এবং আমি কবি।’ ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল যাজ্ঞান্যায়নাদি ব্যতীত ব্যবসায়সম্বন্ধ অবলম্বন করিতে পারিতেন না, তৎকালে এমন কোনও সামাজিক অনুশাসন ছিল না। কে কি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিল, সমাজ তদনুসন্ধানে কাছাকাছি প্রশংসা বা নিন্দা করিবার জন্য আবুলিত হইত না।

ব্রাহ্মণ বৈদ্যাধিকার

বা

মিত্রাধিকার

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষভাগে ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, যে সত্যের অনারম্ভ, রোগহীনত্ব বোধক নহে, রোগের বিরলত্ব ব্যঞ্জক; এস্থলেও রোগোৎপত্তি রোগবাহুল্য বোধক জ্ঞান করিতে হইবেক। এই সময়েই ভগবান্ ধনুস্তর জগৎপ্রদান করেন। ধনুস্তরির জগৎ বিবরণ পৌরাণিক কল্পনা মিশ্রিত হইলেও উহার কাপ্পনিকাংশে কবি প্রতিভা (Poetical genius) ও সমুদায়ে ঐতিহাসিক সারবত্তা বিলক্ষণ

বিদ্যমান আছে। আৰ্য্যভূমিতে ধনুস্তরির আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে যে কালে সমস্ত গ্রাম, নগর, উপনগর, নানাবিধ মহামারিতে ব্যতিব্যস্ত, নিকপায়, আতুর অসহ্য ব্যাধিযুক্ত হইতে মুক্ত হইবার, কোনও পক্ষা না দেখিয়া একেবারে হতাশ, সেই সময়েই অতি কুশল করুণাপরায়ণ বৈদ্যলাভ, সমস্ত প্রাণীর ভয়ানক পীড়া নিবারণের অমোঘপ্রায় উপায় লাভ, ভারতক্ষেত্রের ধর্মশীল মনুষ্য হৃদয়ে দয়ানিধান নন্দনময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বলিয়া প্রতীত হওয়া বিশ্বাসের বিষয় নহে। ভারতবাসী এই জন্যই ধনুস্তরিকে অযোনিমুগ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ধনুস্তরির অমামুখী প্রতিভাই তাঁহাকে নারায়ণরূপী বলিয়া ভারতের পূজোপহার প্রদান করিয়াছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থানকাপক মারী নিবারণ অসম্ভব; মৃতরাং বাধ্য হইয়াই শীত্ৰ শীত্ৰ অনেক আৰ্য্যমনি অশ্বর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদ্ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বহু লোকের বিপদশান্তি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কত্রিয় দ্বিজ মাত্রই আশ্বর্বেদ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন; কিন্তু কালাহরে ধনুস্তরির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য হওয়াতে ও ব্যবহারজীবীদের অনুশাসন ভয়ে ব্রাহ্মণ কত্রিয়াদি তদব্যবসায় পরিভাগ করেন। বাহা হউক এই সময়ের প্রথমভাগ ব্রাহ্ম

গাদি বিজ্ঞগণ ও পরভাগে বৈদ্যগণ তদ্ব্য-
বসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে মিশ্রকাল
নামে অভিহিত করা গেল ।

ধন্বন্তরি অমৃত্যুচার্য্য ।

স্বন্দ, গাঁকর ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনু-
সারে ভগবান্ ধন্বন্তরি ত্রেতাযুগের প্রা-
রম্ভে সমুদ্ভূত হয়েন । এইরূপ প্রথিত আছে
যে, একদা মহর্ষি গালব * সমিংকুশাহ-

* যদিষ্ঠির উবাচ ।

ধন্বন্তরির্মহাভাগ অমরেশঃ কথং পুরা ।

অভবচ্ছবর্তো বিজ্ঞস্তথৈ বদ মহামুনে ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভোরাজেন্দ্র যথা জাতো ধন্বন্তরিঃ হৈব কুত ।

মহর্ষিগালবো নাম কাষ্ঠদণ্ডাহরো বনম্ ॥

জগাম তত্র ভ্রমণাদতিশ্রান্তো বভূব সঃ ।

ততো নিরীক্ষ্যামাস তৃষ্ণাতুর কলেবরঃ ॥

বনস্য চ বহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ ।

জলপূর্ণ ঘটং নোদ্রা গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরং ॥

তাং দৃষ্টা হৃষ্টচিত্তো হসৌ বভাসে মুনিপুঙ্গবঃ ।

হে কন্যে ত্বং জলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুরু-

স্বমে ।

ততঃ সা কলশং ভূমৌ নিধার্য্য তিষ্ঠন্তু মা ।

গালবশ্চাক্ষতো যেন স্নাত্বা ভোয়ং পপৌ-

চতৎ ।

প্রোবাচ চাপি হে কন্যে ত্বং সংপুত্রবতী-

ভব ॥

ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণিগ্রহোহ-

ভবৎ ।

ততো মুনিবরশ্চাহ কাং ত্বং কিং নাম তে বদ ।

রণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বনো-

পান্তে উপস্থিত হইলেন । অধ্বশান্ত মুনি

তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্কোপ করিয়া

দেখিলেন যে, বনবহির্ভাগে একটি কন্যা

জলপূর্ণকুম্ভ কক্ষে করিয়া থিহে বাইতেছে ।

মুনিবর তদদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন

হে কন্যে ! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর,

জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর ।

ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণা জলকুম্ভ প্রদান ক-

রিলে মহর্ষি গালব স্নান করিয়া যথেষ্ট

উবাচ পুনরনোষ্য বৈশ্যকন্যা হ্যহং বিভো ।

বীরভদ্রাভিধানাচ জ্ঞানীহি মুনিপুঙ্গবঃ ॥

ততো বিচিন্ত্য স মুনি স্তামাদায় জগাম হ ।

ঋষীগমপ্রতো নীত্বা ব্রতান্ত মবদত্ত দা

আকর্ণ তে মহারাজ উচুর্হর্ষিত মানসঃ

ভদ্রং কৃতং মনে নৃনমানীতে ত্বং যতন্তুয়া ।

বৈশ্যায়্যং বীরভদ্রায়্যং ধন্বন্তরির্ভবিষ্যতি

ইতুক্ত্বা তেহপি মনুষ্যঃ কুসপ্তলিকাহ ততঃ

কুত্বা ক্রোড়ে দহন্তু স্যাৎ বেদমুখ্যার্থতৎকুশে

প্রাণপ্রতিষ্ঠা মপ্যাসাচকুঃ পুরুষকাকুতিম্ ।

ততোহভবৎ কাঞ্চনরাশি গৌরং

বালোতি সৌম্যাকৃতিরেব তস্যাঃ

ক্রোড়ে বিলোক্যৈব স্মৃতং মুনীন্দ্রাঃ

প্রাপ্তমুদং বেদতঃ এষ জাতঃ ।

বৈদ্য স্ততোহয়ং জননী কুলেচ

স্থিত স্ততোহবর্ষষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ

এবমুক্ত্বা ততঃ সর্বৈর্মুনয়ো দেবরূপিণঃ

অমৃত্যুচার্য্যমস্যাখ্যং চক্রুঃ বৈশ্যভিধানকম্ ॥

* * * অমৃত্যুচার্য্যকোক্ত

পুরাণ বচনানি ।

জল পান করিলেন। এবং অতি পৱিত্র-
তোষ লাভ করিয়া বলিলেন হে কন্যে
আমার পৱিতোষ হেতু তোমার সংপূত্র
লাভ হউক। কন্যা বিস্মিত হইয়া বলি-
লেন, ভগবান্ আমার যে বিবাহ হয় নাই।
গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্য-
কন্যা বলিলেন, আমার নাম বীরভদ্রা,
আমি বৈশ্যকন্যা। ঋষিবর তাঁহাকে সঙ্গে
নিয়া মুনিসমাজে সমস্ত রত্নান্ত বর্নন করি-
লেন, সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, মুনি-
বর, আপনি বড় মজল করিয়াছেন এই
বীরভদ্রার গর্ভে ধনুস্তরি জন্মগ্রহণ করি-
বেন এই বলিয়া সকলে কুশপুত্রনিকা
নির্ঘাণকরতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ
করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া ইহার
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমনি অতি
সৌম্যরূপিত কাঞ্চনরাশি গৌর বীর-
বালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশ আলোকিত
করিল। মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে বেদ হইতে
জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন,
এবং জননীক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অ-
ষষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

সহস্রদয় সন্ধিবেচক পাঠক সহজেই বু-
ঝিতে পারিবেন যে অষষ্ঠ বংশ প্রবর্তক
ভগবান্ ধনুস্তরির জন্মবিবরণ কেন পুরাণ
কবি এবম্বিধ অলৌকিক উপাখ্যাস ও অ-
লঙ্কারমিশ্রিত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন।
যিনি অসাধারণ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন,
সকলেই তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অলৌ-

কিক বলিয়া মনে করে। পুরাণ কবি
এজন্যই ধনুস্তরিকে অযোনিমন্তব ও না-
রায়ণাংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন*।
যাহা-হউক এবম্বিধ পুরাণ ইতিহাস হ-
ইতে সার গ্রহণ করিলে সংক্ষেপতঃ এই
মাত্র জানা যায় যে তৃষ্ণাতুর মহর্ষি গা-
লবের পিপাসা শান্তি করিয়া সুশীলা বৈ-
শ্যকন্যা গালব দত্ত পুত্রলাভরূপ বর প্রাপ্ত
হয়েন†। কিন্তু স্বয়ং অবিবাহিত এবং
মহর্ষি বাক্যও মিথ্যা হইবার নহে, সু-
তরাং সমাজ কলঙ্ক অবশ্যস্বাভাবী; ইত্যা-
কার চিন্তা করিয়া সবিনয়ে সমস্ত মনঃ-
শক্তি গালবকে নিবেদন করিলেন। গা-
লব, অপরাপর মহর্ষিদিগের পরামর্শানু-
সারে বীর ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন।
বলা বাহুল্য যে তৎকালে ব্রাহ্মণাদির অ-
ন্তরজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্র
সঙ্গত ছিল। ধনুস্তরি এই বীর ভদ্রার
গর্ভে ও গালব ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন।
ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ একত্র হইয়া
ইহাকে আত্মবেদ ব্যবসায় দান করেন।
মহোজ্ঞা অমৃতচার্য্য এইরূপ ইন্দ্র হইতে
আত্মবেদ শিক্ষা করিয়া বৈদ্য বংশের মূল
সংস্থাপক হয়েন।

* ঐবধং জ্ঞানবীতোয়ং বৈদোনা-
রায়ণঃস্বয়ম্।

† পাঠক মনে রাখিবেন যে সেই-
কালে কন্যাগণ সর্বদাই অল্প বয়সে বি-
বাহিত হইতেন না।

বয়ঃসন্ধি।

So our lines glide on : the river ends we don't
know where, and the sea begins, and then there is
nomore jumping ashore.

George Eliot.

একাকী বসিয়া সাঙ্গাগগণের মধুর
শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সুবর্ণ
রঞ্জিত সহস্র মেঘখণ্ড আকাশে ইতস্ততঃ
বিক্ষিপ্ত ছিল। নীলাকাশে দুষ্কফেণ শুভ্র
বলাকাপংক্তি কালিন্দীর নির্ঝাঁপ বক্ষে
শ্বেতকুসুমদামবৎ ভাসিয়া যাইতেছিল।
মৃদু পবনসঞ্চারে মেঘখণ্ড বিশেষ ঈষৎ
অপসারিত হইল। পাঠক, স্বর্ণ-সীপি
বিভূষিত কোন প্রিয় শ্যামাঙ্গীর মুখ-কান্তি
অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছ? নি-
টোল ললাট প্রদেশে, যেখানে উজ্জ্বল স্ব-
র্ণকান্তি শ্যাম মাধুরীতে মিশিয়া যায়,
সেই স্থানের সেই শোভা কি কখনও
দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে
আমি সেই আসন্ন প্রদোষ সময়ে গঙ্গা
পুলীনে বসিয়া মেঘপ্রান্তে নীলাকাশের
যে প্রশস্ত শোভা দেখিতেছিলাম তাহার
আভাস পাইবে।

আরও তো অনেকবার সাঙ্গাকা-
শের এই পরম রমণীয় শোভা দর্শন করি-
য়াছি; তবে আজি এ বিস্ময়তা কেন?
চিত্তের এ মৃদু চাঞ্চল্য, চক্ষুর এ অপূর্ণ

রাগব্যক্তি কেন? বহুদিন গত হইল
আর একবার এই শোভার নবীনত্রে মো-
হিত হইয়াছিলাম। সে দিবস আমার
জীবনে এক চিরস্মরণীয় পরিবর্তন সংঘ-
টিত হয়। গভীর নিশিথে তমসারত ক-
ক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিলে যেমন ক্ষু-
রংচন্দ্রিকারাশি অকস্মাৎ কক্ষ আলো-
কিত করে;—অদূরবিকশিত কুসুমসৌরভ-
বাহী মৃদুবায়ুশ্রোত কক্ষ আমোদিত করে;
সে দিবস আমার হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে
সেইরূপ শারদচন্দ্রমাসিক্ত, ফুল-কুসুম-সুর-
ভিত, অব্যক্তপ্রকৃতি এক নূতন ভাবের
সঞ্চার হয়। সে দিবস আমি কৈশোর-
সীমা অতিক্রম করিয়া, যৌবরাজ্যে প্রথম
পদক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে দিবস আ-
মার জীবনে নির্যাসনদীসঙ্গমবৎ অপূর্ণ
ঘটনা সংঘটিত হয়। নীলাকাশে বিভ্রাৎ-
রেখাবৎ আজি তাহার মধুর স্মৃতি ক্ষণকা-
লের জন্য হৃদয় আলোকিত করিয়াছে।

এখন আমি কৈশোরসীমা অতিক্রম
করিয়া যৌবরাজ্যের অনেক দূর অগ্রসর
হইয়াছি। আমার জীবনের এক অঙ্ক

অভিনীত হইয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্ক এখনও শেষ হয় নাই । উচ্ছলরক্তি ভাবরাগ লইয়া এখনও রক্তভূমিতে বিচরণ করিতেছি । সাধু প্রকৃতির মুদ্রাসনে স্ব-কার্য্য করিয়া কখনও নরজীবনে দৈব-সুখমা প্রদর্শন করিতেছি ; এবং গাভীর রক্তনীতে হৃদয়ের নিগুঢ়প্রদেশে আত্মপ্রসাদের বিমলক্ষ্যোতি অতৃভব করিয়া একাকী আনন্দোৎসব করিতেছি ; কখনও বা কুট প্রকৃতির দুর্ব্বার প্রেরণনায় ক্ষুণ্ণ পরিচালিত হইয়া মানবচরিত্রে নরক-মূলভ কলঙ্কক্ষেপ করিতেছি, এবং অনু-তাপের মুখ্যবদাহে বিদগ্ধ হইতেছি, এই ভাবে জীবন যাইতেছে । কিন্তু হৃদয় অগ্নি কিছু বিচলিত হইয়াছে ; ভূতকা-লের এক মধুর দৃশ্য আজি অকস্মাৎ উ-ছাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ।

কোটি কোটি লোকেরতো কিশোর বয়স চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু কেহ কি বিরলে নীরবে মনোসংযোগে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, কোন অলক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যৌবনভাব তোমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে? তোমার অজ্ঞা-তসারে কোন সময়ে তোমার হৃদয় কুণ্ঠ-লভাব পরিহার করিয়া যৌবন কুসুমের নববিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? আজি তো-মার হৃদয় যৌবনগর্ব্বোদ্ভাসিতা ভাঙ্গ গ-জার তরঙ্গভঙ্গে বিহ্বল; কিন্তু তুমি কি ব-লিতে পার, কোন সময়ে নবপ্রায়টের প্রথম ধারা তোমার চিত্তভূমি সিক্তিত ক-

রিয়া প্রথমে ক্ষীণ প্রবাহিত হইয়াছিল? অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া কি জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা স্বরূপ এই সরিৎসাগরসঙ্গম কখন সংঘটিত হইয়া-ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিবে না?

মানব জীবনে বয়ঃসন্ধি নিরূপিত ক-রিবার কি কোন নির্দিষ্ট রেখা আছে? এমন কি কোন নির্দিষ্ট কাল, চিহ্ন কিম্বা কার্য্য আছে যে, যাহা লক্ষ্য করিয়া প্র-ত্যেক জীবনের এই অভূতপূর্ব্ব, অপুনঃ-সম্ভাবী সন্ধিস্থল নির্দেশ করা যাইতে পারে? বয়োধিকাতা প্রকৃত যৌবনের প-রিচায়ক নহে; তুমি বিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি যৌবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ এমত নহে । সংসারে নির্জীব, ক্ষীণায়তন, এবং আজন্মরোগাক্রি-কত লোক আছে, কিন্তু কেহই তাহাদি-গকে যৌবনশালী বলিয়া উপহাস ক-রিবে না । শরীরপুষ্টি যৌবনসূচক নহে । কেহবা পঞ্চবিংশতবর্ষ বয়সে নৈসর্গিক কা-রণে পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের ন্যায় ক্ষী-ণাঙ্গ; কেহবা পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই সর্ব্বপ্র-কার শারীরিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে । তবে কি বিদ্যা এবং বুদ্ধিকেই যৌবনের আনন্দা বলিব? তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না । একবিংশতি বর্ষে কেহ বা বিশ্ববি-দ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হই-তেছেন; কেহবা আবাক্কা নিবিশ্রম্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াও অভিলষিত সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না । তখন কি বলিব যে

পশ্চাদ্ভুক্ত হতভাগা আমরণ যৌবরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই? কেহ কেহ বলিবেন যে, জীবনে ধর্মভাবের গভীরতা লাভই যৌবনপ্রাপ্তিসূচক, এ নির্দেশও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। তাহা হইলে ধ্রুব এবং প্রজ্ঞাদ অপগণ্ড বয়সেই প্রাপ্ত যৌবন হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। আর উদ্ভাগত ঋশ্য, উদ্ধতবিক্রম রত্নাকরকে বালক বলিতে হয়! তবে দেখা যাইতেছে যে, বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি কিংবা ধর্মভাব প্রভৃতি মানবজীবনে যৌবনভাব আনয়ন করে না।

তবে সর্বজন স্পৃহণীয় এই কমনীয় সময়ের আনন্দতা কে? কোন্ ঘটনা, কোন্ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আমরা এই মধুর রসসঞ্চার গণনা করিব।

আমি নরনারীর জীবনে যৌবনভাব সঞ্চারের এক মাত্র কারণ ও সময় অবধারণ করিয়াছি; তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। স্ত্রী কিংবা পুরুষ বিশেষের প্রতি অকপট দৃষ্টিতে চর্চাৎ যখন একের হৃদয়ে অন্যতরের প্রতি কোন অভূতপূর্ব, অজ্ঞাত প্রকৃতি নবভাবের সঞ্চায় হয়, তখন হইতেই যৌবন প্রারম্ভ গণনা করিতে হইবে। সে ভাব, না প্রীতি সজ্জত, না প্রেম প্রণোদিত; তাহা স্নেহ-রহিতে স্বতঃনির্গত নহে, কিন্তু ভক্তিগ্রহৃত অথবা ভীতিদীপ্ত নহে, অথচ তাহাতে পরম্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট এই সকল বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। তাবুক সেই নবোদিত ভাবের প্রকৃতি বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অত্রে এই ভাবের কি সংজ্ঞা প্রদান করিবে, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি ইহাকে পূর্বরাগ বলিয়া থাকি। পূর্বরাগ বলিলে আধুনিক সংস্কৃত সমাজে অনেকের নিকট কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর মধ্যে অন্যান্যের প্রতি প্রেমাবিলাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমি পূর্বরাগের এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহি। পূর্বরাগ প্রণয়ে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু পূর্বরাগ প্রণয় নহে। প্রীতি সঙ্কোচভাব পরিশূন্য। কিন্তু পূর্বরাগ অন্যান্যের মধ্যে লজ্জার মৃদু প্রভাব অনুভূত করাইবে। যে কখনও পূর্বরাগের আভাস অনুভব করে নাই, সে ভাবি প্রণয়পাত্রের নিকট গমন করিতে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আত্মীয়স্বজন জ্ঞানে নিয়মিত এবং সরল অচরণে সে কখন লজ্জার অনুপ্রভাবেও আকৃষ্ট হইবে না। কিন্তু যখনই কৌমারমূলভ স্বচ্ছহৃদয়ে পূর্বরাগের আভাস আদিয়া পতিত হইবে, তখনই তাহার মুখলাবণ্য অন্তঃস্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিবে। অনির্দিষ্টকালে মৃদু লজ্জার কম আবরণে অকৃত্রিম নয়নবিভ্রম লুকায়িত হইবে। এবং হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রশান্ত প্রদেশে এই আকস্মিক আবেগের সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করিতে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইবে। প্রকৃত প্রণয়ে লজ্জার আধিপত্য নাই। প্রণয়ী অস্ফীর্ণচিত্তে, স্মিতমুখে প্রণয়-ভাজনের সম্মুখীন হইবে এবং অন্যান্যের

প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। সংসারের বাধা, গুণগঞ্জনা, সমাজের লাঞ্ছনা তাহাকে বিরত করিতে পারিবে না। স্রোতস্বতী পূর্বত প্রাপ্ত হইতে যদি একবার বেগে প্রধাবিতা হয়, তুঙ্গশৈল সংবাধা প্রাপ্ত হইলেও দুর্বার বেগ জলপ্রপাতরূপে তাহা অতিক্রম করিয়া সহস্রোত্তর বিক্রমে পুনর্বার নিজ পন্থার অনুসরণ করে। আমি এমত বলিতেছি না যে, সকল প্রণয়ীই কুল, মান আত্মীয় কুটুম্ব, গৃহ সংসার পরিভাগ করিয়া অভিলষিত পাত্রের অনুসরণ করিবে। কিন্তু হৃদয় আত্মবশ নহে, প্রণয়ের অধীন। প্রণয় যেখানে, হৃদয় সেখানে স্বতঃ প্রধাবিত হইবে। শরীর পিঞ্জরবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের স্বচ্ছন্দবিহার নরশাসনবহির্ভূত। তবে এমন মহাপ্রণয়ী থাকিতে পারেন, যিনি প্রণয়োৎসবে আত্মরখোৎসর্গ করিয়াও চিত্তের ঠৈর্য্য এবং শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যিনি পূর্বরাগ অনুভব করিয়াছেন। তিনি রাগ ভাজনকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানে মনে মনে তাঁহার আরাধনা করিবেন; আর যিনি প্রণয়ী হইয়াছেন, তিনি প্রণয় পাত্রের সমকক্ষ, অথবা তাঁহাকে সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। পূর্বরাগ যেরূপ প্রীতি কিম্বা প্রেম নহে, তেমনি উহা সুধু ভক্তি, ভীতি কিংবা স্নেহসম্ভূতও নহে।

নর নারীর জীবনে কখন যে এই মাহেন্দ্রমূহর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার

কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। কেহবা লৌকিক যৌবন অনেক দিন লাভ করিয়াও এই অপূর্বভাবের অধিকারী হয় না। আবার কেহবা অতি অল্প বয়সেই উহার মোহন প্রভাবে উদ্ভীষ্টহৃদয় হইয়া উঠে। কিন্তু যে বয়সেই হউক না কেন, মানব যে মুহূর্তে ইহার আভাস অনুভূত করে, সেই মুহূর্তেই তাহার স্বপ্নপ্রসব জীবন-স্রোত মুহুসংলাপী নির্বাকপ্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উত্তালতরঙ্গক্ষুদ্রা পূর্ণ গঙ্গার কল-প্রবাহে উল্ললিত হয়। কৈশোর মূলত মুগ্ধভাব, অক্ষুটপ্রকৃতির পরামুর্ভব, যৌবনোন্মাদে সংসারপর্য্যবেক্ষণে এবং স্বাবলম্বনে পরিণত হয়। আশু সন্তুষ্ক কোমারভাব নীরবে অশ্রুবিমর্জ্জন করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভূতকালে বিলীন হইয়া যায়; এবং সংসারভার মস্তকে ধারণ করিয়া হাস্যামুখে নবযৌবন মানবহৃদয় অধিকার করে। কল্য বালক ছিলে, আজি যুবা হইলে! আজি হইতে শারদচন্দ্রমায় কলঙ্ক থাকিবে না; এবং শিতরশ্মী শীতলতর অনুভূত হইবে। আজি হইতে ক্ষুটকুমুমে নবরাগব্যাক্তি ও গভীরতর সুরতি নিঃসৃত হইবে; এবং বনবিহঙ্গ দিনাদে নূতন-তন্ত্রী মধুরালাপ ক্রত হইবে।

যদি পুঙ্খ হও, তাহা হইলে কামিনীর মুখমণ্ডলে নূতন শোভা দেখিতে পাইবে। এত দিন যেখানে সাধারণ সৌন্দর্য দেখিতে, আজি প্রকৃতির শিরোভূষণ ক-

পিনী সেই স্ত্রীমূর্তিতে স্বর্গীয় মহিমা, দৈববৈভব. লোকোত্তর মাধুর্য্য, অলৌকিক লাবণ্যলীলা প্রথম দেখিতে পাইবে। সেই সর্বলোকসম্পূজনীয়া মোহিনীমূর্তির সম্মুখে তোমার গুরুবসুলভ ওদ্ধতা, অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় চলিয়া যাইবে; তোমার উন্নত মস্তক তোমার অজ্ঞাতসারে স্বতঃ অবনত হইবে। আর যদি স্ত্রী হও, গুরুবর সৌভাগ্যগন্তীর মুখচ্ছবি দেখিয়া তোমার অক্ষুটহৃদয় প্রমোদোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে; প্রেমপ্রীতি, স্বর্ণশান্তি, ভূত এবং ভবিষ্যৎ একত্রে মিশিয়া তোমার নয়নসম্মুখে আশার সমোজ্জ্বল স্নিগ্ধকিরণরঞ্জিত স্নন্দর ইন্দ্রচাপ রচনা করিবে।:

আজি এই শুভদিবসে ভাবিকীবনের মধুর প্রারম্ভই তোমার নয়ন সম্মুখে

নাস্ত করিলাম। ভবিষ্যৎগর্ভে পরিতোকারে তোমার জন্য যে কত পরীক্ষা—দুঃখ দারিদ্র্য, ভীতি আশঙ্কা, কত প্রলোভন—রূপগুণ, ধন সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোমার উৎসাহপূর্ণ, আবেগশালী হৃদয় অবসন্ন করিতে চাই না। বীচিবিকিণ্ডা কমলিনীর ভীষণ মূর্তি দেখিয়া যে নাবিক বহির্ পরিভাগ করিয়া, অদৃষ্টে নির্ভর করে, সে কাপুরুষ। অনিশ্চিতপ্রকৃতি ভাবি বিপদ স্মরণ করিয়া স্রুত্থের সময় অবসাদতমসারত করি ও না। অথচ যে স্বচ্ছ প্রসন্ন হৃদয় লইয়া আজি এ নূতন জীবনে প্রবেশ করিলে, সংসারের ঘূর্ণাবাতে পড়িয়া তাহা আবিলময় করিও না।

সোমরস ও তাহার সেবনবিধি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে, “সোমরস” নামে এক প্রকার পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে, আর আধুনিক তন্ত্র ও পুরাণ পর্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে, “সোমরস” শব্দের ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। এই সোমরস প্রাচীন ভারতে এরূপ আদৃত ও প্রচলিত ছিল যে, উপন্যাস লেখক, নাটককার, কবি এমন কি ইতি-

হাসবেত্তা ও আলঙ্কারিকেরা পর্যন্ত ইহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সোমরস কি, এবং কোথায় পাওয়া যায় এ বিষয় লইয়া বহু দিন পর্যন্ত প্রস্তুতবুদ্ধ সমাজে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড, জার্মানি, এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা এবিষয়ে ৫। ৭ বৎসর কাল ক্রমিক তর্কবিতর্ক করেন, এবং এই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বহুস্থান পর্যটন করেন।

সম্প্রতি কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যেরা সোমরস সম্বন্ধে পুনরায় বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা উক্ত সোসাইটির সাময়িক পত্রিকার * প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং বর্তমান আন্দোলনে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইবেন, তাহা ভবিষ্যতের তমসাময়ী গুহায় নিহিত। সে যাছা হউক, আমরা বহু দিন হইতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা স্থান পর্যাটন করিয়া, সোমরস সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই সুযোগে, বর্তমান প্রস্তাবে, তাহা বিশেষ করিয়া প্রতিপাদ্য করিতে প্ররম্ভ হইলাম। বহুদিনের অগ্রতিহিত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পর, সোমরস সম্বন্ধে আমরা যাছা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা বাক্যবের পাঠকগণ এবং আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকট উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই ভরসায় আমরা এ গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

সোমরস, আৰ্য্যঋষিদিগের একপ্রকার পানীয় দ্রব্য। ইহা সকল শ্রেণীর লোকদিগেরই সেব্য ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই ইহা পান করিত। সংসারত্যাগী, যোগী, সন্ন্যাসী-

* Journal of the Asiatic Society, Bengal.

দিগেরও ইহা পান করিতে নিষেধ ছিল না, বরং যোগসাধনে ইহার ব্যবহার ছিল। কথা—

“যুগে যুগেইপি কর্তব্যে যোগিনো যোগসাধনে। পিয়েৎ সোমরসং ভাস্ত্রে আয়ুর্মেধাবলপ্রদং॥” (শিবসংহিতা)

পূর্বকালে সোমরস যজ্ঞস্থলে ব্যবহৃত হইত। সোমরস কাহারও গৃহে পান করিবার নিয়ম ছিল না। দেবতা মন্দিরে, কোন পীঠ স্থানে, না হয় যজ্ঞস্থলে ইহা পান করিতে হইত, তদ্বিন্ন অন্যত্র পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল। যদি কেহ কোন স্থলে, সোমরস পান করিবার জন্য অর্কিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই স্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত। অথবা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইতে হইত। যজ্ঞ যে সকল দ্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রধান। অত্র সোমরস প্রদান না করিলে যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত না। সকল যজ্ঞেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমত নহে। কোন্ কোন্ যজ্ঞে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা হইতেছে।

আৰ্য্যদিগের মধ্যে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার যজ্ঞ ছিল। সেই সকল যজ্ঞ আবার ১০৩ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম ‘ব্রত’। এই ৬৭ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের

জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বেদী ছিল। সেই সকল বেদীর আকার মোটে ৬ প্রকার, যথা, এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্তা এবং দণ্ডী। বেদীর আকার এই ছয় প্রকার। ইহার মধ্যে এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী ও দণ্ডী এই ৪ প্রকার বেদী যে যে যজ্ঞে নির্মিত হইত, তাহাতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থাকে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সর্বপ্রথমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তদনন্তর সোমরসের পূজা ও সোমদেবতার আরাধনা করিবার অন্যান্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইলে, আর্গিগণ সকলে মিলিয়া * সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া, তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ ভস্মাবশেষ মিশ্রিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

যজ্ঞের পুরোহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিয়া সোমদেবতার আরাধনা করিতেন, এবং অপরাপর দেবতার নামোন্মেষ করিতেন। কোন দেবতার উদ্দেশে যে উপাসনা করা হইত; তাহার অর্থ এইরূপ ‘হে সোম! তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি যজ্ঞস্থলে দিব্য রথসহ উপস্থিত হও।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আমরা সোমরস গ্রহণ করি।’ ইত্যাদি। এই সকল ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বা উপাসনার শ্লোক তন্ত্রিসমর্পিত উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপনীতমান স্বরগ্রামের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অতি শুদ্ধ স্বরসংযোগে উচ্চারণবৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যাশ্রয়িত ও প্রনয়িত-শক্তি মনে করিতেন এবং তজ্জন্তু সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। * এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন প্রকার বৈদিক মুর ব্যবহার করিতেন। তাহা এই—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এখনকার উদাত্ত, মূদাত্ত ও তারাকে ইহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাত্ত—নিগুণ, অনুদাত্ত—শ্লগুণ এবং স্বরিত—সা ও ম, এই গুলির সহিত ঐক্য হয়। স্বরিত কখন কখন ষড়্জ ও পঞ্চমের সহিত ঐক্য হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (।) বেদের মন্ত্রের উপরে থাকিলে উদাত্ত সঙ্কেত বুঝিতে হইবে। এইরূপ একটি চিহ্ন (—) যদি বৈদিক মন্ত্রের উপরে থাকে তাহা হইলে স্বরিত এবং যদি নিম্নে থাকে তাহা হইলে অনুদাত্ত বুঝিতে হইবে। আবার এই গান করিবার সময় বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিশুদ্ধ বাদ্যের স্রষ্টি হয় নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় তৎকালীন মর্হিরী সোমরস আরাধনাকালীন এবং

* Muir's Sanskrit Text.

সোমরস পানকালীন পুলোকিত চিত্তে
গীত বাদ্য করিতেন। বৈদিক বাদ্যের
তালের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি।—
যথা হা, হী হী হা ; হা হী হী হী হী হা ;
হাং হীং বুহা ! পম্ পশো পং পং ; হাং
উং হুং, ইত্যাদি। এই প্রকার গীত বাদ্য
করিতে করিতে আত্মোদে সোমরস পান
করা হইত।

বাহা হউক, এক্ষণে, সোমরস জি-
নিষ্টা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়,
দেখা আবশ্যিক। এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর
মধ্যে নানা প্রকার মত ভেদ হইয়াছে।
কহ কেহ ইউরোপীয় কুলও স্বভাবের
শব্দার্থী হইয়া গতানুগতিক পাণ্ডিত্য
প্রকাশ করিতে ও ছাড়েন নাই। আবার
কহ কেহ বা একেবারে হাস্যাকর মতা-
লীর স্বষ্টি করিয়া ভ্রান্ত্যাপদ হইয়াছেন।
বাহা হউক, সোমরসসম্বন্ধে কতিপয়
সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের
মত এ স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা
করিলে বোধ হয় অযুক্তিসম্মত হইবে না।

পণ্ডিতবর সারউইলিয়ম জোন্স ও
হোরেশ উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস
এক প্রকার রন্ধের পাতার রস। সুপ্রসিদ্ধ
রাজস্থানইতিহাসলেখক টড সাহেব নি-
র্দেশ করেন যে, ইহা এক প্রকার রন্ধের
মূলের রস *। মাদ্রাজবাসী জনৈক
তৈলঙ্গী পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘ওড়ুচী’

* ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড।

১৮ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন কালে সোমরস বলিয়া অভিহিত
হইত। আয়ুর্বেদীয় জ্ঞান্যভিধানে, বা-
মুনহাটী অথবা ত্রস্তীশাক সোমলতা ব-
লিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও মতে
সোমরস ফলবিশেষের রস মাত্র। স্ম-
যোগা ইংলিশম্যান সম্পাদক বলেন, রক্ত-
বর্ণের এক প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া
উল্লিখিত হয়। ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, স্ন-
গন্ধ, এবং অল্পমধুর * অধ্যাপক গ্নন সা-
হেব গ্রীসদেশীয় সূর্যালতার (Sunplant)
সহিত এই সোমলতা ও সোমরসের
তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা
শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং
প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) নায়
কার্য্য করে। † একজন অধ্যাপক ব-
লিয়াছেন, সোমরস কম্পিত জ্ঞান মাত্র।
আর একজন মহাত্মা বলেন, সোমরস—
চন্দ্র কিরণ!! বেদে লিখিত আছে, সোমল-
তার রস তৃপ্তিকর, মাদক, হর্ষজনক পুষ্টিকা-
রক, রোগ নাশক এবং স্নমিষ্ট। যথা—

* “The ‘some’ plant of the Vedas
was the *Asclepias Acida* of Roxburgh,
now known as the twining plant with
few leaves; and with clusters of small
and fragrant flowers. It yields a
mild, acid, milky juice, and grows
in various parts of India.” The Eng-
lishman, 23rd July, 1873. And also
Vide “Lecture on the Religious sects
of India” P 32. by R. N. Datta.

† Green’s Vedic literature. V, I P 2.

(ক) প্রবোমিয়ন্তু ইদং বোমংসরা মা-
দয়িকবঃ। ত্রপ্সা মধ্বশ্চ যুসদঃ।

(খ) গয়স্কানো অমিহা বসুবিং পু-
ষ্টিবর্জনঃ।

পণ্ডিত কালীকমল সাক্ষরভৌম ব-
লেন, “সোমলতা নামক লতা বিশে-
ষের মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা
দুগ্ধের ন্যায় স্বেত ও তরল। * * * ইহা
রীতিমত সেবন করিলে, মনুষ্য লাভাণ্যুক্ত
ও দীর্ঘজীবী হয়। এবং প্রতুল ক্ষমতা
শালী ও পুষ্টিকার হয়।” অধ্যাপক ও-
য়েবর কহেন, “রীতিমত ঔষধের ন্যায়
সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের
ন্যায় কান্তি ধারণ করে এবং শরীরে প্র-
ভূত বল হয়। একবার সোমরস সেবন
করিয়া এক দমে ৫।৬ ক্রোশ যাওয়া
যায়।” * বেদ পাঠে জা যায,
সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় রল এবং
দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়। বেদের “সন্তে প-
রাংসি সমুচ্ছ রাজা।” এবং “রাজো-
নুতে বকগম্য ত্রতানি বৃহস্পাতেবং তব
সোমধাম”—প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইহার
দুগ্ধের ন্যায় গাঢ় এবং জলের ন্যায় তর-
ল প্রতাপন্ন হইতেছে।

সোমরস যে সোমুনামধেয় এক প্র-
কার লতার রস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকি-
তেছে না। এই লতা পার্শ্বতা প্রদেশে
জন্মিয়া থাকে। বেদে ও ইহা পার্শ্বতীর
বলিয়া কথিত আছে যথা;—“যংসানোঃ

মানুমানহং ভূর্য্য স্পষ্টে কর্তৃং। তদি-
স্তোর্থং চেততি যুথেন বৃষ্টি রেজতি।”
এই সোমরস উজ্জ্বল (Sparkling) এবং
দেখিতে সুন্দর। মহর্ষি বাম্বিকি, রাম
চন্দ্রের রূপ বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন,
“সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।” অর্থাৎ সো-
মের ন্যায় দেখিতে সুন্দর। এতদ্বারা
সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর প্রীতি প্রতি
পাদ্য হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত
প্রভৃতি গ্রন্থে ও এইরূপ উল্লেখ আছে।
অথর্ববেদে লিখিত আছে, স্বর্গে যেরূপ
অমৃত, মর্ত্তে সেইরূপ সোমরস। যোগ
শাস্ত্রে আছে, “পবনাভাসযোগ সা-
ধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার
সোমরস সেবন করিলে তদ্রূপ ফল পা-
ওয়া যায়।”

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সোমলতা
বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া
যায় না। সোমভাবে পার্থিবামৃতকে
তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে
হয়। এই পার্থিবামৃত কি দেখ উচিত।
পার্থিবামৃত শব্দে পৃথিবীর অমৃত শাস্ত্রে,
পার্থিবামৃত শব্দে জল বলিয়া লিখিত
আছে। অমরকোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার
প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—(ক) “পঃ
কিলালমমৃত মিতামরকোষঃ। (খ) অপ্-
স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপ্সু তেজঃপ্রশস্ত-
গেদেবা ভগতবাজিনঃ। ঋগ্বেদ। ১।২৩।
১৯ (গ) অপ্সুমে সোমো অত্রবীদন্ত
বিধ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বজন্তবং আ-

পশ্চ বিশ্বভেষজঃ। ১। ২৩। ২০ঋগ্বেদ”
তবে, এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর
সোমরস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ?
ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়,
হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত
অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু সো-
মরস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত
হয় নাই। সোমাতাবে জলের ব্যবহারের
কথাও কোথাও দেখি নাই। অতএব এ
মতটি বিশ্বাস বা সংযুক্তিসঙ্গত নহে।

জর্জর্গ দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Ascijda
Acidia কেই সোমলতা বলিয়া উল্লেখ ক-
রেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে
পারি না। অপর কেহ কেহ সোমলতাকে
পুঁইশাক বলিয়া নির্দেশ করেন। সাম-
বেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়ি-
কায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথি-
বীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য
ত্র্যাকে ইহার প্রতিনিধি করিয়া যজ্ঞস্থলে
আনয়ন করিতে হয়। ত্রুতি গ্রন্থে সো-
মাতাবে পুস্তিকা (পুঁই) শাকের বিধি
আছে। যথা—“সোমাতাবে পুস্তিকা-
মভিস্মুগাৎ।” ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি
প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে সোমাতাবে পুস্তিকা-
বিধানের অনেক শ্লোক আছে। অথর্ব-
বেদের একস্থলে ‘পুস্তিকরঞ্জলতা’ সো-
মলতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে
সোমলতার আকার যেরূপ বর্ণিত হই-
য়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আপাততঃ
বিশ্বাস জন্মে। পুস্তিকা শাকের যেরূপ

তন্তু (আঁশ) থাকে সোমলতার তাহাই
ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে। যথা—
‘অপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরং-
শতিঃ। ভবানঃ সূশ্রবন্তনঃসদাক্ষষে।’
(১৩অধ্যায়। ১০ সূক্তঃ।) অধ্যাপক
হাগ সাহেব পুনা ইহাতে যে সোমলতা
আনিয়া ছিলেন, তাহার আকার পুস্তিকা
শাকের সহিত অনেকটা ঐক্য হইয়াছিল।
কিন্তু তাহার আশ্বাদ অতীব তিক্ত এবং
দুর্গন্ধ যুক্ত। * অনেকে বলিয়াছেন
ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা
নহে। †।

সে বাহাইউক, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই
যে, সোমলতার আকার বন-পুঁই শাকের
ন্যায়। কিছুদিন পূর্বে আমি কতিপয়
পণ্ডিতের সহিত বেলগাছিয়ায় গিয়াছি-
লাম; স্থানীয় সোমরসের উল্লেখ হওয়াতে,
বানিয়ালগ। বাজি নামধের্যে জনৈক পা-
র্বত্য দেশীয় মোহান্ত আমাদিগকে এক
লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে
কোমল পুস্তিকা শাকের মত। আমরা
৪। ৫ জনে উহা আশ্বাদন করিয়া ছিলাম,
তাহার স্বাদ ইষৎ অল্প মধুর বলিয়া বোধ
হইল। উহার পত্র পুস্তিকা শাকের পা-
তার মত; কিন্তু তত রুহৎ নহে। আমি,
ভ্রম বশতঃ, উহাকে প্রথমে পুঁইশাক বলিয়া
বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক
তাহা নহে। উহা পুঁইজাতীয় বটে, ‡

* Aid. Br, Vol II P 439.

† Edinburgh Review Vol LX, No IV

বন-পুঁ ইয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। (*) ঐ মোহাস্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় একছটাক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে তাঁহার নেশা হয়। তিনি পূর্বে গাঁজা, চরস, এবং অহিফেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় না। মোহাস্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আমি তাহা ভারতবর্ষীয় স্মৃশিক্ষোন্নতি সভার (†) বিলাতস্থ পৃষ্ঠপোষক জীযুক্ত মেম্বরশর্ষ জইট্‌নি বড্‌ এবং কোম্পানীকে লগুনে পাঠাইয়া ছিলাম। তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা বটে। (‡.) সম্ভ্রতি পাণ্ডুরা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী এদিনা মস্‌জিদের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লতা তীক্ষ্ণত দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত মিলে যায়। তীক্ষ্ণত দেশীয় লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করে। তীক্ষ্ণত দেশে ঐ লতার নাম “মা-

* History of Thibet, by Colonel Rayne P 86, and Buddha in Thibet, P 17

† সোমপ্রকাশ। ৯ই আশ্বিন ১২৮৪।

‡ ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা এবং Proceedings of the preliminary meeting of the I. E. Improvement Society, P 7

নীর’। * তত্ৰতা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা মানিরের যেরূপ রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডুরা প্রাণ্য লতা অনেকাংশে তদ্রূপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জর্নেল গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া বদীর রস আশ্বাদন করিয়াছিলেন। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রভূত হয়। ইহার স্বাদ অল্পমধুর। ইহা মাদক, ক্ষুৎপিপাসোদ্দীপক, উদরের পীড়ানাশক, বিষয় এবং তৃপ্তিজনক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে *Semita genia* কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতিমত আশ্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে *Genus moimtee* বলিয়া প্রতাপন করিয়া ছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই, বানিয়া লাল বাড়ির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, সোমলতার আকার অনেকটা যে বনপুঁ ই শাকের মত সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।

পূর্বকালে নানা প্রকার সোমলতা ছিল। এক্ষণে যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি, এখনও ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায়। অব্বেষণ করিলে ইহা মিলিতে পারে। এই ২৪ প্রকারের নাম এই,—অংশুমান, ভৃগুমান, চন্দ্রমা, রাজতপ্রভা, দুর্ধাসীম, কনয়ান, খেতাক, কণকপ্রভা, প্রতানবান,

* History of Thibet, by Colonel Rayne, P 93.

তালবৃক্ষ, করবীর, অংশবান, সরঞ্জুভ, মহাসোম, গাৰুড়াকৃত, গায়ত্রাইষ্টেটভ, পাণ্ডুল, জাগত, শঙ্কর, অগ্নিস্টোম, রৈবত, ত্রিপদীযুক্তা, গায়ত্রী, উড়ুপতি । এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টির অধিক পত্র হয় না । লতা ও আকাশে বড় দীর্ঘ নহে কিন্তু বড় স্থূল ও সরস । “মহাসোম” নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে । এই সকল লতার পাতা শুক্ল পক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয় । অমাবস্যাতে সমুদায় পত্র নষ্ট হইয়া কেবল মাত্র লতাবশিষ্ট থাকে । এই সকল লতার তেজ শরৎকালে কিছু প্রখর হয় ।

শাস্ত্রে আছে, হিমালয়, সহ, মা-
হেন্দ্র, মলয়, জ্রী, দেবগিরি, পারিপাত্র, লাম;
বিষ্ণু এবং বিত্তস্তা নাম্নী নদীর উত্তরে

সকল পার্বত আছে, তথায় সোমলতা
পাওয়া যায় । সিদ্ধু নামক মহানদে,
কাশ্মীরের মানসসরোবর, দেবপুন্দ্র না-
মক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইবার কথা
অথবা বেদে দেখা যায় । তন্মতে আছে,
দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পার্বত্য প্র-
দেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে,
বিশেষ মহাবনে কিম্বা কোন বনময় প্র-
দেশে ইহা পাওয়া যায় । আয়ুর্বেদে আছে,
ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরি-
মাণে সোমলতা জন্মায় । পশ্চিম ভা-
রতে সোমতীর্থ নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ
আছে । কিন্তু তথায় অনুসন্ধান করিয়া
সোমলতা পাওয়া যায় নাই । ফলতঃ
যুতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়,
সোমলতা জল এবং স্থূল উভয় স্থানেই
বানিয়ান্ন । (ক্রমশঃ)

কর্তা দেশ

সো-

লতা দেখাই

ভারতে আৰ্য্যজাতি ।

যে আৰ্য্যজাতির গৌরব-প্রভাৱ অদ্যাপি
ভারত গৌরবান্বিত, যে আৰ্য্যজাতির বিদ্যা
এ নীতিজ্ঞান জগৎপ্রথিত, যে আৰ্য্যজাতির
বিস্ময়কর বিবরণ অদ্যাপি অনুসন্ধিৎসু
বিজ্ঞের হৃদয়ে কৌতূহল-শিখা প্রদীপ্ত করে,
যে আৰ্য্যজাতির তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের ক-
লিকামাত্র উদ্ধারার্থ কত কত মহামনীষী
জীবনের সার সময় অকাতরে ব্যয় করি-
তেছেন, এবং যে আৰ্য্যজাতির সন্তান ব-

লিয়া আমরা সংসারে চিরদিন সমাদৃত
রহিয়াছি, সেই আৰ্য্যজাতি কোথা হইতে
কিভাবে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলেন
তাহা জানিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে ?
সেই প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে
চেষ্টা করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বহুতর গ্রন্থে
আৰ্য্য শব্দের উল্লেখ আছে । তৎসমস্তে
ব্রাহ্মণ, কত্বিয় ও বৈশ্য আৰ্য্য এবং শূ-

ত্রেয়া আৰ্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।
যথা, কাভ্যায়ন-কৃত স্ত্রের ভাষা—

“শূদ্রশচতুর্থোবর্ণঃ আৰ্য্যৈশ্চবর্ণিকঃ।”

এবম্বিধ বর্ণ-বিভাগ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, আৰ্য্যদিগের আগমনের পূর্বে ভারতে যে সমস্ত জাতি বাস করিত, তন্মধ্যে শূদ্রেয়ই প্রধান। আৰ্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিজিত ও বিদূরিত করেন; সম্ভবতঃ শূদ্র-দিগের নিরীহতা বা অনাগুণে বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে গ্রহণ করেন। সে যাহাইউক হিন্দুশা-স্ত্রের নায় অন্যান্য অনেক জাতির গ্রন্থা-দিতে আৰ্য্যানামের উল্লেখ দেখা যায়, এবং ঐসমস্ত জাতিরাও আপনাদিগকে আৰ্য্যনামে পরিচিত করেন। হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক, জৰ্ম্মণ, কেল্ট প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে আৰ্য্য-বংশোদ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা পর্য্য-লোচনা করিলে তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তদ্ব্যতীত এইরূপ অনুমান সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ভাষাতত্ত্ব পণ্ডিত গণের গবেষণা দ্বারা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সংস্কৃত, আবস্তীক, গ্রীক, ল্যাটিন, জৰ্ম্মণ প্রভৃতি কতিপয় ভাষা এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। যদিও ঐ মূল ভাষা অ-ত্ৰাপি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না, ত-থাপি ঐ কয় ভাষার সাদৃশ্যদর্শনে উহাদি-গকে একবীজোৎপন্ন বলিয়া কল্পয়ঙ্গম হয়। অনেকে এরূপ কহিতে পারেন যে, সংস্কৃত

হইতেই ঐ ভাষা সমস্তের উৎপত্তি হই-
য়াছে; তাহাই হইলে অবশ্যই সকলে আপন
আপন ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্ববান
হইবে এবং পরিশেষে উদ্দেশ্যবিষয়ের সি-
দ্ধান্ত করা দুৰূহ হইয়া উঠিবে। পূর্বোক্ত
ভাষাগুলির পরস্পরের সৌসাদৃশ্য দর্শনে
এক হইতে অন্যের উৎপত্তি প্রতীয়মান হয়
না। যাহারা ঐ ভাষাগুলির সমাক্ অনু-
শীলন করিয়াছেন, তাহারা ইহা নিঃ-
সংশয় বুঝিতে পারেন যে, উহারা একই
ভাষা, কেবল স্থানভেদে উচ্চারণের
বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। এসম্বন্ধে অধিক
স্থানব্যয় বা অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়ো-
জন নাই সুতরাং আমরা এবম্বিধ দুইটিমাত্র
শব্দ উল্লেখ করিব।

সম্পর্কবাচক	সংখ্যাবাচক
সংস্কৃত—	পিতৃ
লাটিন—	পাট্র
গ্রীক—	পাট্র
জৰ্ম্মণ—	ফাতের
আবস্তীক *	পৌতর
	হপ্তন

আৰ্য্যদিগের যে সময়ের কথা হই-
তেছে তখন তাহারা উক্ত সভ্যতার আদর্শ
জিলেন না; কিন্তু মানব সমাজ যতই কেন

* পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের
নাম অবস্তা। কেহ কেহ উহাকে জেন্দা-
বেস্তা বলেন। উহা যেরূপ ভাষায় লি-
খিত তাহা পারসীক ভাষা হইতে বহুল বি-
ভিন্ন। অবস্তার ভাষা আবস্তীক বলিয়া
উল্লিখিত হইল।

অসভ্য হউক না, ভাষা-সৃষ্টির প্রথমেই তা-
হাদের সম্পর্কসূচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের
প্রয়োজন হইবে। এই কারণে আমরা স-
ম্পর্ক ও সংখ্যা প্রতিপাদক দুইটি মাত্র শ-
ব্দের উল্লেখ করিলাম।

এতদ্রূপে ভাষার প্রকৃতি আলোচনা
করিলে উপলব্ধি হয় যে, যুলে উক্ত জাতি-
সমূহ একস্থানে থাকিয়া এক ভাষায় ক-
থোপকথন করিতেন। ক্রমশঃ জনসংখ্যা
বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানের অসংকুলান জন্য তাঁ-
হারা নানা দিগদেশে প্রস্থান করেন।
স্থান পরিবর্তন সহ, ঘটনাপ্রসঙ্গা যাঁহা-
দের প্রতি যাদৃশ অনুকূল হয়, তাঁহারা তা-
দৃশ জাতীয়োন্নতি সাধনে সমর্থ হন। জা-
তীয় উন্নতি সহ জাতীয় ভাষাও বিস্তর রূপা-
স্তরিত হইয়া থাকে। অধুনা এই সমস্ত
ভাষার যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, উহাই
তাঁহার হেতু। যৎকালে প্রাচীন জাতি
একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় একস্থানে
বাস করিতেন, সে সময় তাঁহাদের ভাষার
যে সকল শব্দের বহুল প্রয়োজন ছিল, অ-
ধুনা দেখা যায় তদ্রূপ শব্দ নিশ্চয়ই দূর-
দেশগত আর্য্যগণের ভাষাসমূহে সমভা-
বেই রহিয়াছে। সুতরাং শব্দবিদ্যার
অপার মহিমাবলে * ইহা স্থির হইয়াছে
যে, প্রাচীন কালে আর্য্যজাতি একস্থানেই
বাস করিতেন। এক্ষণে দেখা আবশ্যিক
সেই স্থান কোথায় সন্নিবিষ্ট ছিল।

* শব্দ-বিদ্যা বা ভাষাতত্ত্বের অসাধা-
রণ চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইবার নি-

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, আসিয়াখ-
ণ্ডই মনুষ্যজাতির আদিম নিবাস স্থল। এ-
স্থান হইতেই অন্যান্য খণ্ডে মনুষ্য অবতার
হইয়াছে। যদি এক জাতি মনুষ্যই ইউ-
রোপখণ্ডে গ্রীস, ইটালী, জার্মানি প্রভৃতি
দেশে এবং আসিয়াখণ্ডের পারস্য ও ভা-
রতবর্ষে অত্যাৱিত হইয়া থাকেন, তাঁহা
হইলে অবশ্যই তাঁহারা এই সমস্ত বিভিন্ন
দেশের মধ্যবর্তী কোন স্থানে বাস করি-
তেন। সে স্থান কোথায়? আর্য্যগণ আ-
সিয়াখণ্ডের অন্তর্ভূত কোন শীতপ্রধান
দেশে বাস করিতেন, তাঁহার সন্দেহ
নাই। এখনও দূরদেশবাসী আর্য্যগ-
ণের ভাষায় শীতবাচক শব্দের সমদিক
বাহুল্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঐ স্থান
ভারতবর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত। কারণ,
ভারতীয় বহুগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ভারতের
পশ্চিমোত্তরদিক দিয়াই আর্য্যেরা এখানে
আসিয়াছিলেন। ইহা প্রতিপাদিত হই-
য়াছে যে গ্রীক ও রোমকেরা উত্তরপূর্ব
দেশ হইতে গমন করিয়া গ্রীস ও ইটালী
দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন * সু-
তরাং আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান নির্ণয়
করিতে হইলে, আসিয়া মহাদেশে ভার-
মিত্ত আমরা পাঠকগণকে Maxmuller's
Lectures on the Science of Languages
নামক ২খণ্ড মনোহর পুস্তক অধ্যয়ন ক-
রিতে অনুরোধ করি।

* Prichard's Physical History of
mankind Vols III & VI দেখা।

তের উত্তর পশ্চিমস্থ এবং গ্রীস ইটালীর পূর্বোত্তরস্থ কোন শীতপ্রধান স্থান নির্বাচন করা আবশ্যিক। সম্ভবতঃ বেলুটান পর্বতের পশ্চিমে ও অসু নদীর প্রভবণের সন্নিধানে যে শীতপ্রধান ও উন্নত ভূভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাই আৰ্য্যগণের আদিম নিবাসভূমি। প্রাণিধানসহ ভূচিত্র দর্শন করিলেও একথা মনে উদয় হয়। সেই হিমালীপরিবৃত্ত মানবকুলের আদিম বাসস্থান হইতে আৰ্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ দেশ দেশান্তরে অবস্থান করেন।

কোন পথ দিয়া আৰ্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহাই এক্ষণে নির্ণয় করা বিধেয়। পারসীক ধর্মগ্রন্থে আইর্মণ-বত্রজো নামে একস্থান সৃষ্টির প্রথম দেশ বলিয়া কীর্তিত আছে। ঐস্থান আমু ও সাইহুন নদী সন্নিহিত। আৰ্য্যেরা প্রথমে যে দেশে বাস করেন তাহাই সৃষ্ট স্থান মধ্যে প্রথম বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আৰ্য্যেরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানোদ্দেশে প্রস্থান করেন। উক্ত গ্রন্থে সেরূপ অনেক স্থানের নামোল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থেই ভারতীয় অন্যান্য স্থানের প্রসঙ্গ করিবার পূর্বে, হপ্তহিন্দু ও হরখইতি নামক দুইটি ভারতবর্ষীয় স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তসিন্ধু ও মরশ্বতী আধুনিক হপ্তহিন্দু ও হরখইতি নামব্রয়ের রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং পঞ্জাব প্রদেশেই যে আৰ্য্য-

গণ প্রথম পদার্পণ করেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বেদে অন্যান্য স্থানের নামোল্লেখের পূর্বে সপ্তসিন্ধু নাম পাওয়া যায় * পঞ্চাবের পশ্চিমে গান্ধার † ও উত্তরে বাহ্লীক ‡ দেশে প্রাচীন কালে হিন্দু সমাগম ছিল তাহার নিদর্শন আছে। অদ্যাপি হিন্দুকুশ পর্বতে সিয়াপোশ নামে এক হিন্দুজাতি দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা আৰ্য্যগণের ভারতের উত্তরপশ্চিমদিক দিয়া প্রথমে পঞ্জাবে অধিবাস স্থাপন ঘটনা সূচাক্রমে সমর্থিত হইতেছে।

পঞ্জাবে আৰ্য্যসম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে দাক্ষণ কলহ ও বিচ্ছেদের আবির্ভাব হয়। পুরাণে ও কয়েকখানি বৈদিক ব্রাহ্মণে যে দেবানুরের যুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহা আৰ্য্যগণের এই গৃহকলহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কলহ

* সিন্ধু, তাহার পঞ্চ শাখা এবং মরশ্বতী এই সপ্ত নদীর বিদ্যমানতা হেতু পঞ্চাবের সপ্তসিন্ধু বা হপ্তহিন্দু নাম হইয়াছে।

† গান্ধার অধুনা কাণ্ডাহার। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজ তনয়া গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

‡ বাহ্লীক অধুনাতন বাস্ক। এই দেশে শাস্ত্রু রাজার ভ্রাতা রাজহু করিয়াছিলেন।

জন্ম কতকগুলি মতান্তরিত আৰ্য্য, ভারত-
ভাগ করিয়া, পারস্য দেশে গমন করেন;
তঁাহারা পারসীক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট
আৰ্য্যেরা ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বসতি বিস্তার
করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম ও বিদ্যার আলোচনার
ধন-ধান্যে পরিবৃত্ত হইয়া মুখসমুদ্র কাল
যাপন করেন।

কালের কি অপরিমিত ক্ষমতা! প্রকৃ-
তির কি বিস্ময়াবহ আবর্তন! পরিবর্তনের
কি অমোঘ গতি! কোথায় গঙ্গা-যমুনা
ভগ্নীদ্বয়ের লীলাভূমি আৰ্য্যাবর্ত, কোথায়
টাইবার-সলিলবিধৌত রোম রাজ্য! কোথায়
চির-তুষারাবৃত অভ্রক্লশ হিমা-
ব্র্মির মালভূমি, কোথায় গিরিবর আশ্বিন-
বিশোধিত জ্যর্ধ্বনি দেশ! কোথায় পুণ্য
সলিল-সম্বেষ্টিত, জ্ঞানধর্মনিকেতন প-
বিত্র বারাগসী ক্ষেত্র, কোথায় বিলাস-আ-
বাস-ভূমি প্রকৃতির প্রিয় বঙ্গমূল সিরাজ
নগর! কি আশ্চর্য্য! কি বিস্ময়জনক!
সুবিস্তীর্ণ বীচিমালা বিকোভিত অনন্ত সা-
গর, সমুদ্রত মুদূর বিস্তৃত ভূধর, দূরব্যাপী
দূরন্ত মরুভূমি, ডগাল জল সমাকুল গহন
কানন, কলনাদিনী স্রোতস্বতী, প্রকৃতির
পরম রমণীয়তার ভাণ্ডার স্বরূপ মনোহর
ব্রহ্ম সমূহ আৰ্য্যজাতির অধুনাতন নিবাস-
ভূমি সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখি-
য়াছে। ফলতঃ তৎসমস্তই একজাতীয়
লোকের নিবাসস্থল। তত্রত্য অধিকাংশ
মানবের শিরাস একই শোণিত প্রবাহিত।
একই স্থান হইতে সেই মানববৃন্দ সঞ্চারিত।

তঁাহারা একই ভাষায় কথোপক-
থন করিতেন, একই সামাজিক নিয়মে
সঞ্চারিত হইতেন, একই রাজ-শাসনের
অধীন ছিলেন, একইরূপ কার্য্য সকলের
আসক্তি ছিল। কিন্তু কি ভয়ানক প-
রিবর্তন! অদ্য আর সে মানবগণ মধো
কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্য ভিন্ন আর কিছু-
রই সাম্য নাই। আজ আমরা কেহ কা-
হাকে আপনার বলিয়া চিনি না। আজ
আমরা পরস্পর পরস্পরকে পর হইতেও
পর বলিয়া মনে করি। আজ আমাদের
ধর্ম, সমাজনিয়ম, রীতি, নীতি, সম-
স্তই বিজাতীয় পরিবর্তন পরিগ্রহ করি-
য়াছে। এখন তঁাহাদের ভাষা শুনিলে
আমরা পক্ষীর ভাষা মনে করিয়া স্থির ন-
য়নে চাহিয়া থাকি, তঁাহাদের উন্নতি ভা-
বিলে স্তম্ভিত হই। আমাদের অধোগতি
স্মরণ করিলে ব্যথিত হই। আজ পরস্পর
আৰ্য্য-শোণিত-সমুৎপন্ন জাতি সমূহ সম্পূর্ণ
বিভিন্ন। আজ তঁাহাদের মধ্যো সহানুভূতি
নাই, ভ্রাতৃত্বাব নাই। অধিক কথা কি,
আমাদের বোম্বাই ও মাদ্রাজস্থ পারসীক
ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তঁাহারা তাহাই জানেন
কই? আমরাই বা তাহা জানি কই?
কিন্তু এ সকল জাতিতে স্থানের বিভিন্নতা
ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই, থাকেও
উচিত নহে। হিন্দু, জর্ধ্বণ, গ্রীক, পার-
সীক প্রভৃতি জাতি সমূহ একই জাতি।
আমাদের সকলের পরস্পর চির কালের

নিমিত্ত ভ্রাতৃত্বাবে বন্ধ থাকিবার সম্পর্ক। আমাদের সম্পর্ক উচ্ছেদ করিবার নছে, অস্বীকার করিবার নছে, বিলুপ্ত হইবার নছে। তবে এ ভিন্নভাব কেন? আইস স্বদেশীয়গণ আমরা আমাদের বিদেশস্থ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের সহিত মমতা সংস্থাপনে প্রযত্ন করি, তাঁহাদের সহিত মিশিয়া

যাই, তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত মিশাইয়া লই, আমাদের সহিত তাঁহাদিগকে হাসাই, তাঁহাদিগের বিপদে আমরা কাঁদি। আইস সকলে মিলিয়া আর্ধ্য নামে পুনঃসংগঠিত মাতাইয়া তুলি,—বন্দুখা আমাদের সহিত থাকিবার করিয়া লাবা মনে করুন।

ক্রীদা:—

জয়পুর।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুত্বদিগের শাসনসময়াবধি একটি কুপ্রথার প্রচলন হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে রাজধানী কি প্রধান নগরের নামেই রাজ্য বা প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকে। করদ বা মিত্ররাজ্যগুলি ইংরেজশাসনের সম্পূর্ণ অধীন না হইয়াও তাহাদের সংগ্রহে ঐ কুপ্রথার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। রাজপুতানা প্রদেশে মাড়বার ও মিরার রাজ্য যথাক্রমে তত্তৎ প্রদেশের রাজধানী যোধপুর ও উদয়পুর নামে সর্বসাধারণ সমীপে পরিচিত। জয়পুর নগরের নাম হইতে যে রাজ্যটিকে জয়পুর রাজ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন, তাহার প্রকৃত নাম চুণ্ডার। অশ্বকেশ্বর মহাদেবের নাম হইতে উহার আর একটি নাম অশ্বর হইয়াছে। ফলতঃ রাজপুতগণের মধ্যে চুণ্ডার ও অশ্বর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

চুণ্ডার বা জয়পুর মিরাররাজ্য সমৃদ্ধ প্রাচীন নহে সত্য, কিন্তু মানসম্মত সম্বন্ধে তদপেক্ষা কোন অংশেই নূন নহে। উভয় রাজ্যের অধিনায়কই সূর্য্যবংশাবতংশ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের বংশজাত। লববংশীয় নরপতিবর্গ মিরার রাজ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দিকে অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করেন এবং কুশবংশীয় নৃপতি বিশেষদ্বারা চুণ্ডার রাজ্য সংস্থাপিত হইয়া অতীত কালের উপর রাজত্ব করিতেছে।

রাজপুতকুলাচার্য্যদিগের আশ্বিনুসারে নিরূপিত হইতেছে যে কুশবংশীয় নৃপতিবিশেষ পৈতৃক রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোননদীর তটে রোটন নামে এক দুর্গ সংস্থাপন করিয়া বাস করেন। কিন্তু কোন সময়ে ঐ দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঐ দুর্গে কতিপয়

পুরুষ পরম্পরা বাসের পর ৩৫১ সম্বৎ-
সরে (খৃঃ ২৯৫) কুশসন্তানগণের মধ্যে
নল * নামে জনৈক প্রসিদ্ধ নাম। ভূপতি
নিষধ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন,
অধুনা ঐ নগর নরবার নামে প্রসিদ্ধ।
ঐ প্রদেশে এরূপ কিস্বদন্তীও প্রচলিত
আছে যে, কুশসন্তানগণ কর্তৃক রোটস্
দুর্গ এবং নিষধ নগর সংস্থাপনের যথাবর্তী
কালে তাহারা আর দুইটি নগর সংস্থাপন
করিয়াছিলেন। প্রথমটির নাম লাহার
এবং দ্বিতীয়টির নাম গোয়ালিয়র। এই
কিস্বদন্তী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এক
জনের বহু পরিবার কখনই চিরদিন এক-
স্থানে একত্রে বাস করিতে পারে না।
তদ্বোধো কাহারও স্বতন্ত্র বাসের ইচ্ছা হই-
লেই তিনি স্থানান্তর অনুসন্ধান করিবেন
ইহাতে বিচির কি ? সে যাহা হউক,
কোন্ ব্যক্তি দ্বারা লাহার ও গোয়ালিয়র
সংস্থাপিত হয়, তাহার কোন সংবাদ পা-
ওয়া যায় না। নিষধ নগরে নলরাজ হ-

* সংস্কৃত ভাষায় নলরাজ ও তদীয়
মহিষী দময়ন্তীর যে অপূর্ব উপাখ্যান প্র-
চারিত আছে, আকবর বাদসাহের আ-
জ্ঞানুসারে আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজি
ঐ উপাখ্যান পারসী ভাষায় অনুবাদ ক-
রেন। বার্লিন নিবাসী পণ্ডিতাশ্রয়ণা
বল্ ঐ অনুবাদ দৃষ্টে ঐ অপূর্ব উপাখ্যান
ইউরোপে প্রথম প্রচার করেন। সংস্ক-
ভাষার ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাহার
পর মূলগ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

ইতে ত্রয়োত্রিংশ পুরুষ পাল উপাধি ধারণ
পূর্বক মৃত্যু বাস করেন। কোন্ নরপতি
এই নূতন উপাধি স্বীয় নামে সংযোজিত
করেন, তাহা কোন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া
যায় না। * কিন্তু কুশসন্তানগণ কচুবহ †
বংশ নামে বিখ্যাত। কচুবহেরা প্রতি
বৎসর মহাসমারোহে সূর্য্যের আরাধনা
করিয়া থাকে। নিয়মিত দিবসে তাহারা
অষ্ট-অষ্ট-সংযোজিত রথে সূর্য্যমুর্তি আ-
রোহণ করাইয়া নগর মধ্যে অতি সমা-
রোহ পূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

নলরাজ হইতে ত্রয়োত্রিংশ পুরুষ নর-
পতি সোরা সিংহ একটি অপগণ্ড পুত্র
সন্তান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ ক-
রিলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই শিশুকে
বধনা করিয়া নরবার রাজসিংহাসন অ-
ধরণ করিলেন। সোরা সিংহের মহিষী পু-
ত্রের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহাকে
মস্তকে লইয়া অতি দীনবেশে নগর হইতে

* লেপ্টেনেন্ট কর্নেল টড বলেন, অতি
প্রাচীন রাজপুত জাতিয়ের পাল উপাধি
দ্বারা অভিহিত হইতেন।

† কচুবহ হইতে 'কচুবহ' নামের
উৎপত্তি হইয়াছে। কুশসন্তান দিগের
মধ্যে কোন্ প্রাচীন পুরুষ কচুবহের সং-
জ্ঞাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা আমরা অব-
গত নহি। টড কহেন অজমীরের রাজ-
পুত্রেরা ঐ নামে বিশেষ বিখ্যাত। বোধ
হয় বিবাহ সূত্রে ঐ নাম অন্ধকেশ্বরে সং-
লগ্ন হইয়া থাকিবে।

বহির্গত হইলেন। রাজমহিষী এইরূপ দীনভাবে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় খোগং নগরের নিকট পথপ্রান্তে শিশু সম্ভ্রান রক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাভক্ষ্য দ্বিবারণমানসে ফলমূল আহরণে চেষ্টিত হইলেন। ইত্যন্বরে এক কাল সর্প আসিয়া বালকের শিরে ফণা বিস্তরণ পূর্বক ছত্রবৎ আচ্ছাদন করিয়াছে। রাজমহিষী ঠাণ্ডে আসিয়া এই ভীষণ অবস্থা দর্শনে ভীতিসংবলিত চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার এক ব্রাহ্মণেরও নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। তিনি ইহাকে কোনমতে তুল্লক্ষণ মনে করিলেন না। তিনি ভয়ানক শিশু-জন্মনীকে সম্বোধন করিয়া করিলেন “কল্যাণি! এই ব্যাপারকে তুর্নিমিত্ত মনে করিয়া ভীত হইও না। এ সুলক্ষণ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহাকে সম্পূর্ণ সুলক্ষণ মনে করিয়া পুলকিত হওয়া উচিত। এই লক্ষণ দর্শনে প্রতীতি হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই বালক রাজা ও তুমি রাজমাতা হইবে। *” মহিষী ক-

* বাহার মস্তকে সপে ছত্রধারণ করে সে রাজা হয়, অনেকেই এইরূপ একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে। এই শুভলক্ষণের কিছুই মূল পাওয়া যায় না। অনুমান হয় যখন বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিতে বাইতেছিলেন সেই সময় যে পাতাল হইতে অনন্ত দেব আসিয়া তাঁহার মস্তকে ফণা বিস্তরণ পূর্বক ছত্রধারণ করি-

ছিলেন “উপস্থিত বিপদে আমি যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় মুগ্ধ প্রায় হইয়াছি, ভবিষ্যতের ভাবনায় আয়ার কি হইবে। আপাততঃ প্রাণ রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না।” দয়াজ্জিৎ ব্রাহ্মণ, মহিষীর এবিধ কাতর বচন শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে খোগং নগরের পথ দেখাইয়া দিলেন। রাজমহিলা পুত্রসহ খোগং নগরে উপনীত হইয়া পথিমধ্যে তত্রত্য রাজমহিষীর পরিচারিকার সাহায্য পাইয়া তৎসঙ্গে রাজবাটীতে উপনীত হইলেন এবং আপনার অত্যন্ত হীমাবস্থা জ্ঞাত করিয়া তথায় দাসী রাখিলেন, সেই অবধি এই লক্ষণের স্মৃতি হইয়া থাকিবে। বনবিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধেও এইরূপ একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশের অনেক জীমুস্ত লোক সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে। নাটোরের রাজা ও নড়াইলের রতন বাবুদের সম্বন্ধেও অনেক অসম্ভব কথা শুনা গিয়াছে। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও নিতান্ত অবিদ্বন্দ্বীয় ব্যাপারঘটিত পরিণাম শুভ ঘটনা সম্বন্ধেও এইরূপ গল্পের স্মৃতি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। নন্দপাত দর্শনে অশুভ, ভেঁকে সর্পগ্রাস করিতেছে তদর্শনে শুভ প্রভৃতি ব্যাপার সমূহে যে শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, সর্পের ছত্র ধারণে রাজসিংহাসন লাভ সেই শাস্ত্রেরই পত্রান্তরে অঙ্কিত বলিয়া বিবেচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

হুজি অবলম্বনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রলুঙ্গি নামক অসভ্য মীনা জাতীয় এক রাজা খোগংএর রাজসিংহাসনের শোভা সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই অসভ্য মীনারাজার গৃহে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

একদা মীনারাজের পাঁচক অমুপস্থিত থাকায় ঐ রাজপুত্রমহিলা পাঁচক কর্ত্তে নিযুক্ত হন এবং মীনারাজ সেই সুপক জ্বাদি আহার করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া পাঁচিকাকে নিজ সমীপে আহ্বান করত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রাজমহিষী মীনারাজ সমীপে কিছুই গোপন করিলেন না। তিনি তাঁহার দ্রবদ্বার সকল কথাই প্রকাশ করিয়া কহিলেন। মীনারাজ সেই পরিচয়ে সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং তদবধি নরবার রাজমহিষীও তৎপুত্রকে ভগিনী ও ভাগিনেয়রূপে সম্বন্ধে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই বালকের নাম চোল রায়। বালক বয়োবৃদ্ধিসহকারে নিজ সম্ভাবহার দ্বারা মীনারাজ ও অপরাপর পৌরজনের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে তুয়ারবংশীয় স্থপতিবিশেষ উপবিষ্ট ছিলেন। তারতবর্ষীয় অনান্য রাজবর্গ ঐ তুয়ারবংশীয় দিল্লীধরকে রাজাধিরাজ বলিয়া

পূজা করিতেন, এবং তাঁহার ভুক্তির জন্য অনেকে কর প্রদানও করিতেন। মীনারাজও যথাযোগ্য কর প্রদানপূর্ব্বক স্ত্রে রাজ্য ভোগ করিতেন। একদা মীনারাজ স্বয়ং দিল্লী গমনে অসমর্থ হওয়ায় রাজকর প্রদানের জন্য প্রিয়তম চোল রায়কে প্রেরণ করিলেন।

মীনারাজ কি অশুভক্ষণেই কচবহুবক চোল রায়কে দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন! নিমেষের জন্যও তাঁহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই যে, কিছু দিন পরে ঐ যুবককর্ত্তৃক তাঁহার সর্শনাশ সাধিত হইবে। তিনি হৃদয় দিয়া কাল সর্প পোষণ করিয়াছিলেন! তিনি অমৃতক্রমে কালকূট পান করিয়াছিলেন!

কচবহু যুবক একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীনগরে মীনারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ বাস করেন। এই সময়ে তিনি খোগংএর সিংহাসনের প্রতি লোলুপ হন। মীনারাজ যে তাঁহাকে অপতানির্কিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন তাহা একবারে বিস্মৃত হইয়া, তিনি তাঁহার দ্রবভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি স্বজাতীয় উদ্ধতস্বভাব সহচর সংগ্রহ করেন। এই পররাজ্যাপহারক দস্যু চোল রায় সেই সকল অনুচর সমভিব্যাহারে খোগং নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। চোল রায়ের দলবল দেখিয়াও মীনারাজের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। সংকল্পের সহচর সচরাচর মিলিয়া উঠে

না, কিন্তু দুর্ভিক্ষে প্রবর্তিত করিতে লোকের অভাব নাই। মীনরাজের কুলাচার্য্য আসিয়া অক্লান্ত চোল রায়ের মন্ত্রী হইল। তাহারই—সেই মহাপাষণ্ডেরই—মন্ত্রণায় দিবালীর দিন সেই দুর্ভিক্ষি সিদ্ধ করিবার সংকল্প স্থির হইল। প্রাচীন প্রথা-মুসারে বল্লভসিঁরাজ দিবালীপর্ব্বোপলক্ষে স্বগণসমভিব্যাহারে এক সরোবরে জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি ভ্রমেও জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার জন্মের মত জলক্রীড়া শেষ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অক্লান্ত কচুবহু যুবক স্বগণ-সমভিব্যাহারে ঐ সরোবরে সমুপস্থিত হইলেন এবং হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক মীনরাজকে সুবংশে নির্বংশ করিয়া খোগং নগর অধিকার করিলেন। বিশ্বাসঘাতক কুলাচার্য্যও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। “যে ব্যক্তি একজন উপকারকের প্রতি অবিশ্বাসী হইতে পারে, সে অপরের নিকট কোন অংশেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।” এই কথা বলিয়া চোল রায় স্বহস্তে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। আমরা বলি কুলাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছিল। তিনি যেমন নরাধম, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে পরিণামে বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সহস্র সংকর্ষেও এ কলঙ্কটাকা অপনীত হইবার নহে। চোলরায় এবস্ত্রাকারে কলঙ্ক-ডালি শিরে ধারণ করিয়া চুণ্ডার রাজ্যের স্বত্বপাত করিলেন।

চুণ্ডারের অধিকাংশ স্বল্প প্রধান মীনাজাতীয় অধ্যাকের অধীন ছিল, খোগং পতনে সমগ্র রাজ্যের মূলভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল।

বর্তমান জয়পুর নগরের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বানগঙ্গা নদীতে দেওসা নগরে একজন ব্রহ্মজর বংশীয় রাজপুত্র রাজা রাজ্য করিতেন। তাঁহার একমাত্র দুহিতা ছিল, চোলরায় তাঁহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনায় তথায় উপস্থিত হইলেন। দেওসারাজ এই বলিয়া চোল রায়ের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, ‘আমরা উভয়েই সূর্য্যবংশীয়, এবং অদ্যাপি একশত পুরুষ অতিক্রান্ত হয় নাই। অতএব এবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমি এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য অনুমোদন করিতে পারি না।’ * পরিশেষে বিচার দ্বারা শাস্ত্র বি-

* ব্রহ্মজর বংশীয়েরা রামচন্দ্রের ক্ষেষ্ঠাপুত্র বলবের বংশ বলিয়া পরিচর দেয়। ব্রহ্মজর কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে রাম হইতে বিক্রম পর্য্যন্ত ছাপ্পান্ন পুরুষ এবং নল হইতে চোল রায় পর্য্যন্ত তেত্রিশ পুরুষ বলিয়া লিখিত আছে। পূর্ব্বের লিখিত হইয়াছে, ৩৫১ সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমের ৩৫১ বৎসর পরে নলরাজ নিষধ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে দেখা উচিত যে বিক্রম হইতে নল পর্য্যন্ত কয় পুরুষ হইতে পারে। যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কালের গড়পড়তা বাইশ বৎসর ধরা যায় (এই রূপই প্রায় সমস্ত রাজ্যে ধরা হইয়া থাকে)

রোধিতার অপনয়ন হইলে দেওসাদিপতি চোল রায়ের সহিত আপনাদের রূপলাবণ্য-বতী কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং পুত্র সন্তানের অভাবগ্রস্ত জামাতাকে রাজ্য পর্যন্ত সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে চোল রায় খোংগ ও দেওসা উভয় সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। সূত্রাৎ তাঁহার দল-বলও অত্যন্ত প্রবল হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলাভ লালসা রুজি হইতে লাগিল। এই সময়ে মীনাজাতীয় মেরো সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নাথুরাও মোঁচ নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া নুখে রাজ্য করিতেন। তৎপ্রতি চোল রায়ের লোভ পড়িল। দলবলসহ মোঁচ নগর আক্রমণ করিয়া জয়ী হইলেন, এবং খোংগ অপেক্ষা মোঁচ নগরের সমদিক শোভা দর্শনে তথায় রাজপাট সংস্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব-পুঙ্খ পুঙ্খ-প্রদান রামচন্দ্রের নামে ঐ নগরের নাম রামগড় রাখিলেন। এক্ষণে চোল রায় চুণ্ডার রাজ্যের মধ্যে খোংগ, দেওসা ও মোঁচপ্রদেশের অধিকারী হইলেন।

ইহার পর চোলরায় আজমীরাদিপ-তির রূপলাবণ্যবতী হুহিতা মেরোগীর পা-নিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব পুত্রী তাহাহইলে বোড়শ পুঙ্খ মাত্র ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব $৫৬+১৬+৩৩=১০৫$ পুঙ্খ হইল। রাম হইতে চোল রায় পর্যন্ত একশত পাঁচ পুঙ্খ ব্রহ্মের বংশে বিবাহ শাস্ত্র বিকল্প হইতে পারে না।

এ সময়ে জীবিতা ছিলেন কিনা তাহার কোন মিশ্রণ পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহার গর্ভস্থ কোন সন্তানের ও পরিচয় পাই নাই। একদা চোল রায় মেরোগী মহিলাসহ জম্বাহী-মার্তী দেবীর পূজাবন্দ-নাদি করিতে গমন করিয়া ছিলেন। মীনা-জাতিদিগের তাঁহার উপর জাতক্রোধ ছিল তাহারা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া একাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত করিয়াছিল। তাহারা সকলে প্রত্যাগমন কালে চোল রায়কে আক্রমণ করিল। তাঁহার সহিত অধিক সৈন্যসামন্ত ছিলনা, তথাপি প-লায়নপরায়ুখ হইয়া রাজপুতবীর্ষ্য শত্রু-দলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। শত্রুশোণিতে সমরাজ্ঞন প্লা-বিত করিয়া অবশেষে তাহাদের হস্তেই জীবনলীলা সমাপন করিলেন। মেরোগী স্বামীশোক নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অব-শিষ্ট সহচরগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে পলায়ন করিলেন। তৎকালে তিনি অ-নুর্ভুত ছিলেন। কনথল নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চুণ্ডারদেশের অনেক অংশ মীনাদিগের হস্ত হইতে অপহরণ করেন। তাঁহার পুত্র মৈদল রাও পিতৃদুর্ভাগ্যবশত চুণ্ডারের অনেক অংশ হস্তান্তর করেন। মীনাজা-তীয় প্রদান সম্প্রদায়ের নাম সুসাবত। ঐ সুসাবতসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ভেটরাও অথরে বাস করিতেন, তিনিই মীনাজাতীয় মর্যাদায় কর্তা ছিলেন। মৈদলরাও তাঁ-

হাকে পরাজিত করিয়া অধর অধিকার করেন এবং মীনাজাতীর নন্দল সম্প্রদায়কে পরাভূত করিয়া গাটুরবাটী প্রদেশ নিজ অধিকারে সংযোজিত করিলেন।

মৈদনরাও পরলোক গমন করিলে পর তদীয়পুত্র হনুদেব সিংহাসনে আরোহন করিলেন। তিনিও পিতৃপুরুষদিগের দৃষ্টান্তানুসারে অনেক মীনাসম্প্রদায়ের সর্বনাশ করিলেন। তদীয় পুত্র কুন্তলদেব রাজধানীর চতুর্পার্শ্ববর্তী পার্বত্য প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি ভট্টবর প্রদেশের চোহান বংশীয় নরপ-

তির কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে তথায় গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহার মীনা প্রজারা একবাক্যে কহিল যে অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে নহ-বৎ প্রভৃতি রাজচিহ্ন তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। কুন্তলদেব এতদ্বাক্যে অস্বীকৃত হইলে একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে মীনা জাতীর সমগ্র ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সময় হইতে সমগ্র চুণ্ডার রাজ্য মণো চোলরায়ের বংশীয়দিগের আর দ্বিতীয় প্রতিবন্দী রহিল না। (ক্রমশঃ।)

অমৃত গরল ।

জগতের নিয়ম অতি অদ্ভুত। যাঁহা যত আবশ্যাকীয় সংসারে তাহার তত অনাদর, আর যাঁহা যত অপ্রয়োজনীয় তাহার মূল্য ও আদর তত অধিক। মৃত্তিকা তৃণ লোহ এবং হীরক, কাচ ও মূল্যগান প্রস্তর তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা মুহূর্ত্ত জন্য মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিতে পারি না, ভূমি আমাদের আধার, অবলম্বন ও চিবসঙ্গী। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব গণ আজীবন ভূমিতেই বিচরণ করে, গৃহ নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আহাৰ্য্য বস্তুর উৎপাদনাদি জীবন ধারনোপযোগী সমস্তই মৃত্তিকার সম্পন্ন হয়, অথচ মৃত্তিকার কত অনাদর। স্বর্ণনিয়

বস্ত্র সকলের উপমের 'মাটি বা কাদা' অনাদৃত পদার্থ 'লৌহ'। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্তিকাকে পদ মর্দিত ও অনাদৃত হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌহ আর একটি উপকারী বস্তু। যে গৃহে বসিয়া আছি তাহা প্রস্তুত করিতে, যে অগ্নে শরীর রক্ষা করিতেছি তাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিতে, বাহাতে আত্মরক্ষা হয় এমন অস্ত্র গঠনে, এমন কি যে লেখনীটি হস্তে লইয়া লিখিতেছি, যে বাক্যটির উপর কাগজ রাখিয়াছি, যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছি এ সমস্ত বস্তু প্রয়োজনোপযোগী করিতে লৌহই প্রধান সাধন। অথচ লৌহের মূল্য অল্প, লৌহ

অপরিস্কৃত ও অনাদৃত । কুরূপ পুরুষ 'লো-
হায়: কার্তিক !' কঠিন হৃদয় 'লৌহ হৃ-
দয় !' এইরূপ তৃণ ও আশাদের প্রত্যেক
মুহুর্তের অবলম্বন হইয়া ও অনাদৃত ও অব-
মানিত হইয়া আছে । তৃণ এত সামান্য
যে বাহা আমরা সামান্য বোধ করি তা-
হাই তৃণ । আবার অন্যদিকে হীরকা-
দির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখ ।
হীরক দুস্ত্রাপা ও বহু মূল্য । বাহ্যিক
সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাহার গুণ নাই, কাচ কাটা
ক্রিয় কার্য্য নাই ; অথচ সত্রাটীগণ পরম
যত্নে তাহা মস্তকে ধারণ করেন । কাচ
এবং মরকতাদি প্রস্তরের ও সেই অবস্থা ।

অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অনাদর দে-
খিয়া চিন্তাশীল চিত্ত ব্যথিত হয়, এইমাত্র ।
তাহাতে সমস্ত জগতের ক্লেশ হয় না ।
কিন্তু অমৃত গরল উৎপাদন হইলে তা-
হাতে পৃথিবীর সকলেরই ক্ষোভ ও পরি-
ত্রাপের কারণ হয় । কবিগণ প্রস্ফুটিত
গৌলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে
মোহিত হইয়া সরল হৃদয়া গুণরতী ললনার
হাসিত মুখজীর সহিত তুলনা করেন, আ-
বার রক্তে ও রক্তে কটক নিরীক্ষণ করিয়া
তাহার হৃদয় পরিভ্রষ্ট হয় । সোদামিনীর
ভুবনমোহিনী রূপরাশি মেঘ মধ্যে লীন
হইলে, পূর্ণচন্দ্র রাজশ্রেষ্ঠ দেখিলে, অথবা
সবুজ শোভিত ক্ষেত্র সকল নৈদম্য তাপে
দগ্ধ ও শুষ্ক হইয়া গেলে তাহার হৃদয়
নিভাস্ত ব্যথিত হয় । প্রান্তরের পূর্ণ স-
রোবর হইতে জন কমিয়া গেলে তিনি

মনে কষ্ট অনুভব করেন, শিশিরে কৃষ্ণ-
সকল পত্রহীন হইলে তাহার মন ক্রিষ্ট
হয় । গাঢ় অন্ধকার রজনীর অথবা গভীর
গিরিগহ্বরের গভীর ভাব যখন তাহার
হৃদয়কে উন্নত চিন্তায় নিমগ্ন করে, তখন তিনি
দূর নিকৃঞ্জের কোকিল কুঞ্জে নর্দপাত
করিতে অনিচ্ছুক হন, এবং প্রকৃতির অ-
তন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থায় নূতন নূতন মুখ ও
বিবিধ প্রকার ক্লেশ অনুভব করেন । তিনি
কবি, বাহু জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়ই তা-
হার ক্রীড়ার নিকেতন । তাহার চিন্তা
ও ভাব সকল সামান্য বুদ্ধির অগম্য ।
কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দে-
খিলে, কাবোর সাহায্য না লইয়া কবির
প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া, এই
গদাময় পৃথিবীর কার্য্যকলাপের প্রত্যেক
অধ্যায়ে পদ্যময় মহাকাব্য অপেক্ষা অনেক
শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ, অনেক আশোদজনক ও
দুঃখ জনক বিষয় ইত্যন্ত বিকল্প রহি-
য়াছে একথা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে ।
এই সুখাগার সংসারামৃতে কত গরল
আছে তাহার পরিমাণ করিয়া উঠা ক-
ঠিন । কিন্তু ভ্রান্ত মানব আজীবন সে
গরলই অমৃত বলিয়া সেবন করে ।

দাম্পত্য অপূর্ণা লালসার সর্বদা স্বেচ্ছ-
রের উপাসনা করিতেছেন । দরাময় প-
রমেধর সবয় হইয়া একটি পুজ সন্তান
প্রদান করিলেন । বালকটি এক দুই তিন
দিন করিয়া বাড়িতে লাগিল । তাহার
শারীরিক রূপরাশি, সুখানন্দী মুষ্টি এবং

বিশ্ববিমোহন মহাশয় বদন জন্মক জন্ম-
নীকে প্রফুল্ল করিতে লাগিল। প্রস্ফুটো-
মুখ পাঞ্জের মনোহারিণী শোভার ন্যায়
শোভমান বদনকমলে, সুরোমল পলাস-
পুষ্পের পলাসবৎ রক্তিমাত অধরে যখন
মৃদু মধুর আধ আধামা, বা প্রভৃতি সুধা-
কণা প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন তাঁহার
তাগাবতী জন্মী ও মোতাগাশালী জ-
ন্মক যে কি অনির্বচনীয় সুখ সন্তোষ ক-
রিতে লাগিলেন তাহা অভিনব কুমারলা-
ভকারী ব্যক্তিমাতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারেন; আর ঈশ্বর বাহাদিগকে সেই
অপার্থিব রত্নে বঞ্চিত করিয়াছেন কপ্পনার
অতুল্য তুলীতে সেই চিত্র চিত্রিত করিয়া
তাঁহার আরও অধিক সুখিতে পারেন।
সেই পার্থিব স্বর্গ, সেই নন্দন কানন,
সেই জীবন-পারিজাত তাঁহাদের জীবনের
অসিসিকু,—অনন্ত, স্রোতময় এবং নিত্য।
কিন্তু হায়! সেই অমৃতসমুদ্র মথিত হইয়া
যে গরল উঠিতে পারে সংসারসার মান-
বাণের তাহা কি মনে হয়? নির্দয় কাল-
কীট তাঁহাদের হৃদয়নিহিত ঐ কুমুমটির
রক্ত ছিন্ন করিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা
হইবে তাহা কি তাঁহারা স্বপ্ন করেন?
লোকে মজিকার রূপা দেখে দেয়, মজিকা
অমৃতভাণ্ডে অঞ্জের ন্যায় প্রবেশ করিয়া
লোভজন্য আত্মজীবন বিনাশ করে, মা-
নকণ কি তাহা করে না? সংসার-সেই
অমৃতভাণ্ড, ইহাতে যে প্রবেশ করিয়াছে
তাঁহারই জীবন যোহে পর্যবসিত হইবে।

আঁধার দেখে, সেই ভয়ট বড় হইতে
লাগিল। জ্ঞান ও ধর্ম্যে তাহার আত্মা
উন্নত হইল। সন্তোষ হৃদয়ে আপন জন্মক
জন্মীর সেবা করিতে লাগিল। 'তীক্ষ্ণ-
দেহ হৃদয়ে কেমন সুখ! 'বালভাবিত'
ও 'পুত্রপণ্ডিত' উভয়ই অমৃত। কিন্তু
অমৃতের গরল আছে। চীৎকার তাহার
হৃদয়ে হুস্প্রবৃত্তি ও হুস্প্রাণের সঞ্চার হইল।
পিতৃতকি হৃদয়ে আর স্থান পায়না, কৃত-
জ্ঞতার ভাব আর মনে হয় না। এই রূপে,
পাপাত্মা আরংজিব যখন নিশীথ সময়ে
প্রজাবৎসল শান্ত স্বভাব ধার্মিক সত্ৰাট
আপন জন্মক রক্ত সাজেহানকে তাঁহার
অবশিষ্ট জীবনের জন্য কারাকঙ্ক করিয়া
ছিল তখন কি পিতৃহৃদয়ের অমৃতসমুদ্রে
গরল উদ্ভিত হয় নাই? যখন ত্রাত্তবুদ্ধি
উদ্ধতস্বভাব পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পা-
লন জন্য, দয়া, ধর্ম্য, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, মমতা
বিসর্জন দিয়া আপন জন্মীর শিরে কুঠা-
রাঘাত করিয়াছিল; যখন পাপপরাগণ
রোমসত্ৰাট অজ্ঞাতশ্রম অনাগতবুদ্ধি বা-
লক রাজ্যলালসায় আপন জন্মীর শির-
চ্ছেদ করিয়াছিল তখন কি অমৃতের গরল
প্রকাশ পায় নাই? যেমন প্রদীপের এক
পিঠ আলো, তেমনই জগতের একদিকে
অমৃত অন্য দিকে গরল। এই কষ্ট হইতে
অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। বালক বা-
লিকাগণ পিতৃ-মাতার স্নেহসাগরে ভাস-
মান হইয়া যে অপারিসীম আনন্দ অনুভব
করে তাহাও সর্বদা অধিকৃত নয়। জগ-

ভের এই অখণ্ডনীয় নিয়মের সভ্যতাপক্ষে প্রমাণ অরূপ কতন্ত বালক বালিকা যে অসময়ে সংসারামলের অসহ্য তাপ ভাপিত হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বিমাতার বিপরীত মন্ত্রণায় ভক্তিকভাজন জনকের আজ্ঞাক্রমে সব যৌবনের প্রথম সময়, স্নেহের প্রভাবকাল, অগ্রিমচন্দ্র অনুন্ন লক্ষণ ও ভাৰ্য্যা জ্ঞানকীর সহিত মহারণো যাপন করিলেন। যে পিতা জ্ঞানোপদেশ প্রদান পূর্বক ভ্রমের হৃদয় কন্দর আলোকিত করিবেন, ধর্মবিষয় শিক্ষাদান করিয়া পার্শ্ব অমৃত পান করাইবেন তিনি কত সময়ে আপন সন্তানদিগকে দুরাশামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং অসংবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সুখামৃতে গরল উৎপাদন করিয়াছেন। কুকক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্বোধনাতির পতন এবং হস্তীনার রাজবংশ বিনাশ এ সমস্তই ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণায় বিষয় কল। সংসার এমনই আশ্চর্যস্থান যে ইহাতে জননী কর্তৃক পুত্রহত্যাও অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয়।

বাল্যকাল অজ্ঞানাবস্থায় অতিবাহিত হয়। যদি বল “বালক স্নেহ দুঃখ কিছুই বুঝিতে পারে না, ক্রোধপাইলে ক্রন্দন করে, নতুবা অন্যের দুঃখের সময় ও হাসিতে থাকে। সেই সর্বাপেক্ষা সুখী” তাহা হইলে যমুযো ও পশুতে প্রভেদ থাকে না। অন্তঃসমনোমুখ দিবাকরের ন্যায় বুদ্ধের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত স্থির, শান্ত

এবং স্নেহের হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া এবং রক্তিমাত মেঘমিশ্র কিরণ মালারন্যায় সেই অভিজ্ঞতা চিন্তামিশ্র বলিয়া মুখকর নহে। মানব জীবনে যদি স্নেহের সময় থাকে তবে সে যৌবককাল। যৌবনই মানব জীবনের অমৃত। যখন জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল থাকে, মনোহ্রিত গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যথার্থের প্রকৃতির ন্যায় জীবনের চতুর্দিক উজ্জ্বল বোধ হয় সেই সময়ই সর্বাপেক্ষা স্নেহের সময়। শরীর বলিষ্ঠ ও কার্যক্ষম, মন সতেজ ও প্রকল্প, আশা অনন্ত, সকলই মনোহর, সুতরাং মানব জীবনে যৌবন স্নেহের কাল। যুবক যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে, অসাধ্য সাধন করিতে পারে সুতরাং সে সুখী, তাহার জীবন অমৃতময়।

কিন্তু যে কবি প্রমিথিয়সের ও ইপি-মিথিয়সের সহিত মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় করিয়াছেন, যিনি আদমের স্ত্রী ইভের প্রলোভনে আদমের সহিত পৃথিবীস্থ সকলের জীবনের পাপ ও দুঃখ আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানিতেন যৌবনামৃতেও গরল আছে। যেখানে যত সুখ সেখানে তত দুঃখ, যত হাসি তত কান্না, অমৃত যত গরলও তত। যৌবনে সংপ্রকৃতি সতেজ হয় সত্য, কিন্তু কুপ্রকৃতি মিত্রিত থাকে না। পাপপথ-সহজ, সেদিকের আকর্ষণও অধিক। এই জন্য যৌবনে অধিকাংশ লোকের চিত্ত কলুবিত হয়। গ্রিসের রাজনীতিবিদগণ পণ্ডিত

পেরিক্লিড এলিসিবাইডেস নামক একটি রূপবান ও বুদ্ধিমান বালককে প্রতিপালন করেন। তাঁহাকে শিক্ষিত করিতে সফ্রেটিশের বিজ্ঞান বুদ্ধি ও তাঁহার রাজনীতি শাস্ত্র উভয় মিলিত হইয়াছিল। এলিসিবাইডেসের নায়ে বীর সমৃদ্ধতা, নৃত্য, শূচত্ব পুরুষ গ্রীসে আর ছিল না। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই দেবোপম পূজালাভ করিতেন। তাহার সুখ সরোবর পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। দেশশুদ্ধ সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সুখের মাগরে তরঙ্গ-বাঁধিল, সে চন্দ্র রাতগ্রস্ত হইল, সে সুখ-তরঙ্গী ডুবিয়া গেল। যে বুদ্ধি স্বর্পণে ছিল তাহা কুপথে ধাবিত হইল; তিনি আপন দেশের হিতব্রত পরিতাগ করিয়া স্বজাতীয় সকলের বিকল্পে অস্বাধারণ করিলেন। পরিশেষে সেই গৌরবও পাপ-ময় জীবন, কলঙ্কিত পূর্ণচন্দ্র কি জিয়ার ক্ষুদ্র পল্লিতে ক্ষয়বিদারিণী অবস্থায় পর্যাবসিত হইল। আগেলবাসী টাইমেন যে ভাবে মনুষ্যাগণের বন্ধু হইয়াও পরিশেষে তাহাদের শত্রু হইয়াছিলেন, তাহাও তাহারও অবিদিত নাই। বাইরের জীবন আর একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপে মানবজীবনের বসন্ত কালেও হুৎখলিলির সম্প্রাপ্ত সম্ভবপর। সেই পবিত্র অমৃতের গরল উঠে।

বুদ্ধ পুত্র কন্যাদি পরিবারবর্গে বে-
কিত হইয়া গৃহস্থান্তরে যে কিছু সুখ ক-

পনা করা যায় সকলই সম্ভোগ করিলেন। সমুখে যোগ্য পুত্র তাহার জীবনের অ-
অস্বরূপ, তাহার সমস্ত আশার সজীব
প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। কিন্তু সহসা সেই সু-
খের আকাশে কাল মেঘ উঠিয়া চতু-
র্দিক আচ্ছন্ন করিয়া, যত্না ভীষণবেশে
শয্যাপার্থে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডচালনা
করিতে লাগিল। পূর্ব স্মৃতি অত্রান্ত
দর্পণের নায়ে জীবনের অনুষ্ঠিত পাপকার্য
গুলি একটি একটি করিয়া নরনের সমুখে
উপস্থিত করিতে লাগিল। ওঃ! কি শো-
চনীর অবস্থা! জীবনের সহায়, চিরবিশ্বাসী
স্মৃতিশক্তির কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা,
কি ভয়ঙ্কর কার্য। যে জীবন এককাল
শারদীয় রজনীর নায়ে শরৎসখীর কো-
মলী সম্ভোগ করিতেছিল, নিদাঘের পবন-
মাধুর্য্যে, বসন্তের কুসুমবন্যায় প্রীত হ-
ইতেছিল তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্তন উপ-
স্থিত হইল। তাহার জীবনামৃত গরলময়
হইল। ‘উল্লসি’ ‘ক্রমোয়েল’ ‘ধৃতরাষ্ট্র’
প্রভৃতির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল।

সমুদ্র মধ্যদিয়া অর্ণবারোহণে গমন
সময়ে অনুকূল বায়ুতে যেরূপ সহায়তা
করে এই সংসার সমুদ্রে প্রগল্ভী সহধর্ম্মি-
ণীর পক্ষে অনুকূল হিরণ্যাদ স্বামী ও
তজপ। প্রাণেশ্বর সরল ও সদয় হইলে
জীব যে কত সুখ তাহা প্রতিকূল স্বামির
সতী জ্ঞী ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিগত হইবার
নয়। বাহার বর্ষাফলে উদভাবজনিত ক্লেশ
অনুকৃত হইয়াছে সে ভিন্ন অন্য কেমন

করিয়া বুঝিবে? যে চিরকাল অনুকূল
স্বামীর স্নেহ-সুখ অনুভব করে, স্বামী প্র-
তিকূল হইলে যে তাহার কত ক্রেশ হইত
সে তাহা বুঝিতে পারে না। সুখীর সুখ
বুঝিতে দুঃখীর কল্পনাই উপযুক্ত মধ্যস্থ।

যে পুণাশীল মহাত্মা স্মদরী সতী স-
হস্মিণীর সারলাশোভিত হৃদয়বাজ্যের
অস্থিতীয় অদীশ্বর, যিনি প্রিয়বাদিনী ও
প্রিয়কারিণী প্রণয়িণীর শরীরের ও মনের
সৌন্দর্য্যে বিমোহিত থাকেন, তাঁহার সুখ
বিশুদ্ধ ও হৃদয় পবিত্র, তাঁহার কি দেব-
জনকমনীর অবস্থা। প্রসন্নসলিলা জা-
হ্নবীর অবিরামবাহিনী ধারাসকল তমাল-
তালীবিরাজিত লবঙ্গলতাপরিবেষ্টিত মি-
ড়ত নিকুঞ্জ প্রফুল্ল করিয়া যেমন তরতর
নাদে প্রবাহিত হয়, সেই ললনার প্রণয়দারা
প্রবলকাস্তের শাস্তি নিকেতন হৃদয় ভেমনই
স্নিগ্ধ ও উৎফুল্ল করিয়া অবিরামধারায়
বহিতে থাকে। প্রকৃত লাম্পাতাপ্রণয় অপা-
ৰ্ণিব মহারত্ন। সেইরত্ন রাজার গৃহেও দু-
র্লভ, অগচ্ছ তাহাতে সময়ে সময়ে অতি সা-
মান্য পর্ণকুটীরও আলোকিত হয়। জায়া
পতি উভয়ে উভয়ের সর্বস্ব, উভয়ে উভ-
য়ের শিরোরত্ন। “তত্ত্বস্য কিমপি ত্রব্যং
বোহিহি যস্য প্রয়োজনঃ।” যখন ন-
বীৰ প্রণয়ের প্রথম করমাদুর্বা মনপরি-
ণীত সম্পত্তিকে পৃথিবীতে অর্গসুখ প্রদান
করে, যখন স্নাতনকরের বারিবিন্দুবৎ
সামান্য কণা গুলিও পরস্পরের নিকট
প্রত্যেক শব্দ সুস্বরায় করিয়া তুলে, তখন

কি অনির্বচনীয় সুখ। প্রিয়তমার শরীর
স্পর্শে প্রেমনিহ্বল রামচন্দ্র যেমন বলি-
য়াছিলেন—

“বিনিশ্চেতুং শক্যম সখ্যমিতিবা দুঃখমি-
তিবা

প্রবোধং নিদ্রায়া কিমু বিববিসপৎ কিমু-
মদং।

তবস্পর্শে স্পর্শে মমহি পারিমুচ্যেদ্রিয়-
গণো

নিকার্ষ্টেচতনাং ভ্রমরতি সমুদ্রীলয়তি চ।”
পবিত্র প্রণয়ী অর্দ্ধনির্মলিত নয়নে সেই
রূপ ভাব সর্ব্বনাই অনুভব করেন।

“অদৈত্যং সখ্যদুঃখয়োঃ নুগুণং সর্ব্বাস্ব-
বস্তাসু য
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরস্য বশিরহা-
যোরসঃ।

কালেনাবরণতয়া পরিণতে যৎস্নেহসার-
স্থিতং
ভদ্রং প্রেম স্নানাসুখস্য কথমপোকং হি-
তংপ্রাপাতে।”

এই দেবদুর্লভ প্রণয় কি অনির্বচনীয় পা-
দার্থ। প্রণয়ীযুগলের শরীর ভিন্ন হইয়া
ও মনের মিলনে দুইকে কেমন এক করিয়া
ফেলে। পরস্পরের অস্তিত্ব কেমন পর-
স্পরে লীন। যেমন তারসংযুক্ত বালা
যন্ত্রের একটি তার করম্পৃষ্ট হইলে সমী-
পস্থ অপরাণ্ডিও ধনিত হইয়া উঠে, শোক,
দুঃখ, সুখ, সন্তোষ, হর্ষ, বিষাদ, আশোদ,
প্রমোদ প্রভৃতি সেইরূপ উভয়ের হৃদয়
এক ভাবে যুগপৎ ব্যাণ্ড করে। বিকল-

ডের গতি, চকুর নিমেষ, কপন্যার রথ
কিছুই তত ক্রত নয়। এরূপ সুখের অ-
বস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহার স্বর্ণ লাভের
বাসনা হয়? পার্থিবসুখের চরমোৎকর্ষ
লাভ করিয়া কে আর অন্য বিষয় মনে
করে? যখন প্রণয়ের গভীর নদী প্রশান্ত-
ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সৈকতস্থ চিত্রা-
কণা সকল কেন না বিধৌত ও বিদূরিত
হইবে? সেই আতটপূর্ণা কম্বোলিনীর সৌ-
ম্যমুষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া কে তাহার উটা-
তিধাতিনী মনে করে?

কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে সে নদীতেও
তরঙ্গ আছে, সে আকাশেও বজ্র আছে,
সে অমৃতেও গরল আছে।

মহারাজ রামচন্দ্র পার্থিব সমস্ত সু-
খের অধিকারী হইয়াও আপন প্রাণাধিকা
প্রিয়তমা পত্নীর বিরহযজ্ঞগার কত দগ্ধবিন্দু
হইয়াছিলেন, রোমানরাজ টাইটস্‌ও লো-
করঞ্জনানুরোধে প্রিয়া ইভুদিনন্যাকে জ-
খের মত পরিভাগ করিয়া অপরিসীম কষ্ট
পাইয়াছিলেন।

প্রণয়ের রম্যকামনের পবিত্রপুষ্প সু-
ন্দর হইলেও অনিত্য; সুগন্ধি হইলেও ক-
টকযুক্ত, মধুময় হইলেও বিষমিশ্র। সম্মেহ
ও জর্বার বাক্সেতে অনবরতঃ আন্দোলিত এবং
বিরহাদি নির্ঘম কীট সকলের ভীষণ দংশ-
নে জর্জরিত হয়। সেই সুসুন্দর অকালে
শূন্য হইয়া যায়। অত্যাশ্রিতের কষ্ট সমস্ত
সুখ উৎসর্গ করিয়া ইলাইজার কি অবস্থা
হইয়াছিল। অথেলোর হৃদয়শলী ডেকি-

ডিমোনা কিরণে অন্তর্মিত হইয়াছিল, এবং
রোমিও ও জুলিয়েট কিরণে অবস্থার জীব-
নের অবসান করেন পাঠক মনে করিয়া
দেখুন। অমৃতের প্রতিবিম্বই গরলমিশ্র।

মৈসরললনা ক্রিয়োপেট্রার পঞ্চলজী-
বনসরোবরের অচিরস্থায়ী সুখকমল শীতল
পর্যাসিত হইয়াছিল; রাজা যেরিও আ-
পাতমধুর পরিণামবিষে জীবন উৎসর্গ
করিয়া পৃথিবীর নিকট অকালে বিদায়
লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একদিকে প-
বিত্র আদর্শ পাণ্ডিত্য পাবিনী প্রজ্জ্বলিত
অগ্নিশিখায় জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন,
অন্যদিকে সের্গা আকগানের সুন্দরী ল-
লনা স্বামীবধের কারণ হইয়া বিলাসবা-
সনা চরিতার্থ করিলেন। কিন্তু যে যেরূপ
ভাবেই অমৃতপান কখন না কেন পরি-
ণামবিষ সকলের ভাগ্যেই হটিল।

দৃষ্টান্তবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যে
সকল শোচনীয় অবস্থা প্রতিদিন আমাদের
নয়নগোচর হইতেছে, তাহাতে অমৃতে গ-
রল কেনা দেখিতে পান? বালবিধবার
বারিশূনা মকমরজীবনে সুখবারির অভাবে
হৃদয়ভেদী জাহি জাহি শব্দে কাহার না
চিত্ত ব্যথিত হয়। সেই অতুলা বেলপুষ্প
নিদাঘবির প্রচণ্ডকিরণে শুষ্ক দেখিয়া কে
না ক্রোশ অনুভব করে। জীবনের সুখ-
প্রতিমা বিসর্জন দিয়া যে সমস্ত হতভাগা
যুবক উদ্ধতবৎ দেশে দেশে বিচরণ করে,
তাহাদের সুখময় অতীতজীবনের তুলনায়
সেই ভয়াবহ সময় কি গরলময় নয়?

অস্তরের জ্বালা নিবারণ করিতে সং-
বন্ধুর আশ্রয় লইলাম। ঝটিকার সময়
মৌকা যেমন ‘কোল’ প্রাপ্তে নিরাপদ
হয়, প্রেরল বাতায় আন্দোলিত সংসার
মাগরে বন্ধুর আশ্রয়ও তেমনই নিরাপদ
স্থান। যখন হৃদয় নানা কারণে উত্তাক্ত
ও উত্তপ্ত, তখন মৃদুমন্দসদীরগবাহি ঋষি
সৌরভের মধুরতায় এবং মলয়ানিলের
শৈত্যে বন্ধুর বচনপরম্পরা হৃদয় স্নিগ্ধ
করিল। মাতা যাহা পারেন নাই, পিতা
যাহা করেন নাই, নিরুপম ভ্রাতৃস্নেহের
মধুময় ভাবেও যাহা সাধিত হয় নাই,
প্রণয়িনীর প্রণয়োপহারেও যাহা লাভ
করা যায় নাই, বন্ধুর মধুময় বচন মাধুর্য্যে
তাহাই সম্পাদিত হইল। সে সুকোমল বহি
যুগলের উজ্জ্বলতার মতো আলিঙ্গনে
শরীর শীতল হইয়া গেল। “দগ্ধিতাস্থন-
বস্থিতং মৃগং, নখলু প্রেমচলং সুহৃজ্জনে।”
হৃদয় সখার প্রেমালিঙ্গন জগতে অতুল্য
পদার্থ। সুহৃদের তুলনা নাই। চক্ষু যা-
হাকে সুন্দর দেখে, যাহাকে প্রিয়ভাষী
জ্ঞানে কর্ণ সেই বচন সুখ সত্যভাবে
পান করে, হৃদয় যাহার হৃদয়ের অনুপ-
মেয় মধুর চিত্র আগ্রহের সহিত ধারণ
করে, সে কতদূর রমণীয় পদার্থ। বন্ধুর
অনাদরও মধুময়।

“সুহৃদুকে অনাদর, দেখায় না মনোহর

অনাদর যদিও কর্কশ

প্রেমমাখা অনাদর বড়ই মধুর।”

যে একপট প্রকৃত বন্ধু আশ্রয় প্রদায়

ক্ষণেকের জন্যও হৃদয়ে ধারণ না করিয়া
সুহৃদকে অভিন্ন পরমাত্মবৎ মনে করেন
এই পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি
স্বর্গবাসী। মর্ত্য লোকে ভাগ্যস্বীকার ক-
দাচিত্বে সম্ভবে। যে সৌভাগ্যশীল পুরুষ
সেই সুখ লাভ করেন, তিনিও দেব।

মনুষ্যের কপালদোষে সে মধুও বিষ-
মিশ্র। বীরকুলাগ্রগণ্য জুলিয়স সিজারের
পবিত্র বক্ষঃস্থল তাঁহার আশ্রিত এবং তাঁ-
হার অনুগ্রহে প্রতিপালিত ক্রেটুস যখন
শাগিত শস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়াছিল; নিশীথ
সময়ে আপন গৃহে অতিথি ভাবে উপস্থিত
নিদ্রিত স্বীয় প্রভু ডনকানকে যখন দ্রা-
চার মাকবেথ অতি নৃশংসের ন্যায় হত্যা
করিয়াছিল; যখন যুনানীর বীরকুঞ্জর কে-
শরী নিতান্ত নিকপায় হইয়া আত্ম সমর্পণ
করিলে সেই কর্মনিপতিত কেশরীকে
চিরদিনের জন্য কোন দ্রাচার স্বাধীন-
তায় বঞ্চিত করিয়াছিল, তখন কি সে অ-
মৃতে গরল উঠে নাই? মির জাফরের
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায় অদূরদর্শী সি-
রাজের পতন হইল; আরংজিবের প্রতি
সরুখা সন্দেহশূন্য সুরতায় অসতর্ক থা-
কায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ অকালে কাল স-
দনে গমন করিলেন।

ভ্রাতৃ স্নেহ ও ভ্রাতৃবৎসলতা অমৃতের
সরোবর হইলেও তাহা হইতেও গরল
উদ্ভিত হয়। জীৱামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের
প্রতি অপরিমিত বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াও
যখন লঙ্কাসমরারবসানে গৃহে গমন করিয়া-

মস্ত অশ্রুধ নিশ্বৃত হইয়া সেই অবিরামবাহি
 স্রুত্রেতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অনন্ত অভি-
 মুখে গমগ করিতেছে, অপর পার্শ্বে তেম-
 নই আবার ভীষণ ও ভীষণতর শ্মশান স-
 মুহ জগৎ আঁদার আঁদার আঁদার করিয়া
 মৃতের হৃদয়ে ও যেন ভীতি উৎপাদন করি-
 তেছে। একস্থানে নবপ্রসূত বালকের কল্যা-
 গার্থ মাজলা বাদ্য বাজিতেছে, নবদম্পতীর
 পরিণয় জনা আয়োদে, আনন্দমিশ্র কো-
 নাহলে দশদিক উল্লসিত ও ধ্বনিত করিয়া
 তুলিতেছে; আবার অন্যস্থানে পুত্রশো-
 কাঁতুরা জননীর হৃদয়বিদারক শোকসূচক
 ক্রন্দনধ্বনিতে অথবা নববৈধবাবিদম্বালি-
 কার ছাছকার শব্দে সংসার উদাস ক-
 রিয়া উঠাইতেছে। কোন স্থলে প্রণয়ের
 সুখমরমিলনপ্রতীকার সুখের নির্বাস্ত্রপ্রে
 দিনসামিনীতে ইতর বিশেষ না করিয়া
 প্রণয়ীগণ সময় উদ্বাপন করিতেছে, অ-
 ন্যত্র নিরাশ প্রণয়ের হতাশ শব্দে অথবা
 অনাদৃত অবমানিত ও কলঙ্কিত প্রণয়ের
 পঙ্কিল পরিণামে কাহারও জীবন হুগার
 অবসাদিত হইতেছে। একদিকে আশা
 মূহমল পাদক্ষেপে স্বর্গীয় বিদ্যাদ্রবীর ন্যায়
 মধুর হাসি হাসিয়া তালে তালে মৃত্যু
 করিতেছেন, পুলকবিদ্ধারিত নয়নের মো-
 হিনী ভলিতে সকলের মন মোহন করি-
 তেছেন, অন্যদিকে কদমল দেশে হতা-
 পণ করিয়া অশ্রুস্রবস্রবকে নিরাশার
 দীর্ঘ বিশেষ হুগারিত কপেবর সকলের মনে
 ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একদিকে

প্রকৃতির প্রিয়তম প্রদেশ সকল জাতি,
 জুতি, বকুল, মালতী, গোলাপ, পদ্মজ
 প্রভৃতি মনোমদ কুসুম শয্যায় নশোভিত
 আছে, পুংকোকিলের মধুর কুজনে শাশা
 বুলবুলের মোহন ধ্বনিতে চতুর্দিক উৎফুল্ল
 করিতেছে, অন্যদিকে সাহারার ভীষণ
 মকছুমিতে জল পিপাসায় ত্রাহি ত্রাহি
 শব্দে হত ভাগ্য পথিক আর্তনাদ করি-
 তেছে। নিদাঘের নির্মল দিবা ঝটিকায়
 বিকী করিতেছে, পরতের স্রুদার কৌমুদী
 কানমেঘে ঢাকিয়া কেনিতেছে। রজনী
 প্রভাত হইতেছে দিবাভাগ আবার তম-
 সীরজনীতে লীন হইতেছে। সংসারে চ-
 তুর্দিকে ইত্যন্তঃ বিকিণ্ড অমৃত কণারও
 অভাব নাই, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে
 হলহলও প্রচুর রহিয়াছে। ছায়া যেমন
 বস্তুর অনুগামী দ্রুৎও তেমনই সুখের অ-
 নুগামী। যে অর্ধাচীন ব্যক্তি এই প-
 রীকা ভূমি সংসার ক্ষেত্রে অবিরত ভাবে
 বিশুদ্ধ সুখ সন্তোগের বাসনা করে তাহার
 চিত্ত কখনও সুখী হইতে পারে না। বাহ্য
 কখনও হইবার নয় এরূপ বিষয়ে আশা
 করিয়া জীবন শান্তিহীন করিলে পাপ
 ব্যতীত পুণ্য লাভ হয় না, তৃষ্ণা বৃদ্ধি ব্য-
 তীত তাহার সমতা হয় না। যদি সুখা-
 পান করিতে বাসনা থাকে তবে সুদর্শন
 চক্র দেখিয়া ভীত হইওনা, তাহা হইলে

“সুখ-সুরগণ ভোগ্য

অমৃতের পরিভ্রম সাধ

বিকসিত ভায়রনে অসিগণ উড়ে বসে

ডেক ভাগো কেবল চীৎকার । ”

এই কবিতাটি সার্থক হইবে,—চীৎকার করিয়া জীবন ভেদবৎ অতিবাহিত করিতে হইবে। যদি অমৃতপান করিতে

অভিলাষ থাকে তবে গরলপানে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হও। এই সংসারে সুখাপানী দৈর্ঘ্যশীল মহাপুরুষ মাত্রই নীলকণ্ঠ ।

শ্রী—

জীবনপ্রভাত ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পুথুরায়ের দুর্গ ।

চলেছে চাষিয়া দেখ,

যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক

কাল পরাজয় করি দেবমুক্তি ধরিয়া ।

* * * *

জন্মিবে পুরুষগণ,

বীর যোদ্ধা অগণন,

রাখিবে ভারত নাম ক্ষতিপূষ্ঠে আঁকিয়া । ”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত

অখারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় কোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে শিবজী চিন্তিত মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন ? মুসলমানেরা অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য হইয়াছে ? এখনও কি প্রত্যাবর্তনের

উপায় নাই ? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মনঃ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডলও গম্ভীর ললাট চিন্তারোখায় অন্ধিত,—বিপদকালে, যুদ্ধকালেও কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাক্রান্ত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলেরদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন।

রঘুনাথপুত্র ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

দুইজনে অনেককণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবজীর হৃদয় ভীষণ চিন্তার ব্যতিব্যস্ত ও উৎক্লিষ্ট। অনেককণ পূর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ন্যায়শাস্ত্রী আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।’

রঘুনাথ । ‘বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম ।’

শিব । ‘তবে সম্মুখে ঐ বহু বি-
ভীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে
বলিতে পারেন ? আপনি অনন্যমনা হইয়া
ঐদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য ?’

রঘুনাথ । ‘মহারাজ ! ভারতবর্ষের
শেষ হিন্দুরাজ্য পৃথুরায়ের দুর্গ প্রাচীর
দেখা যাইতেছে ।’

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ‘হায় !
এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ ! এই স্থানে তাঁহার
রাজধানী ছিল ! এই স্থানে তিনি একবার
ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । হা !
ন্যায়শাস্ত্রী !

‘সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ভ
হইতে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল ঐ
মৰ্কটমিহলে প্রশস্তনগর বিজয়বাদ্য শব্দিত
হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কো-
লাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল । সে
দিন, হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হি-
ন্দুবীরগণ সবল হস্তে স্বাধীনতা রক্ষা ক-
রিত,—হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা
গান গাইত ! কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সেদিন
গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট
পৃথুরায় অনায়াস সমরে হত হইলেন, পুণ্য
ভারতস্থান অন্ধকারে আবৃত হইল ! দিব-
সের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস
আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম ব-
সন্তে আবার দেখা যায়, ভারতের গৌরব
দিন কি আর দেখা দিবে না ? একদিন

ভরসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন
আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী
হইবে ?’

শিবজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহি-
লেন ; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় আলোড়িত
হইতেছিল । অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস
তাগ করিয়া বলিলেন, ‘দেবদেব মহা-
দেব ! যে দিন যবনগণ জয়লাভ করিল,
সে দিন তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল মি-
শ্লেষ্ট বা নিমিত্ত ছিল ? সংহারক ! কেন
ধর্মবিশ্বাসিদিগকে সংহার করিলে না ?’

রঘুনাথ । ‘কে বলিবে, কেন ? যা-
হারা হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিলেন, তাঁহারা
হিন্দু-দেবমণ্ডলীর ও অবমাননা করিতে
ক্রটি করেন নাই ;—সেই ভীষণপাতকের
প্রমাণ অক্ষর প্রস্তরে খোদিত আছে, সে
পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই ।’

কল্পিতস্বরে শিবজী জিজ্ঞাসা করি-
লেন, ‘ন্যায়শাস্ত্রী ! আপনার কথা আমি
বুঝিতে পারিতেছি না, কোথায় সে প্র-
মাণ খোদিত আছে ?’

রঘুনাথ, ‘সন্নিকটে’ এই বলিয়া অ-
নতিদূরে একটি পুরাতন প্রস্তরনির্মিত দেব-
মন্দিরে শিবজীকে লইয়া গেলেন, বলি-
লেন, চারিদিক অবলোকন করুন ।’

শিবজী । ‘দেখিতেছি মধ্যে প্রাঙ্গন,
চারিদিকে সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভসার ! একটি
সুন্দর দেবমন্দির ছিল,—কালে ভগ্ন হই-
য়াছে । দেবের অবমাননা-চিহ্ন কোথায়
খোদিত আছে ?’

রত্ননাথ । ‘উদ্ধৃতি কখন, এই স্মৃ-
 ত্তর স্তম্ভসারের একটি স্তম্ভ ভগ্ন হয় নাই,
 —তাহার উপর অঙ্কিত দেবমূর্তিগুলিও
 ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু নিরীক্ষণ কখন,
 একটি মূর্তির ও মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইবে
 না। কালে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিত,
 ধর্ম-বিষেবা যবনেরা স্তম্ভগুলি রাখিয়াছে
 কিন্তু সত্ত্ব দেবমূর্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্তির
 মুখমণ্ডল মাত্র অবশেষে ভগ্ন করিয়াছে !
 বাসনা, যে দেশ বিদেশ হইতে লোক
 আসিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যখন-
 গণ হিন্দুদেবের অবমাননা করিয়াছে,—
 যত দিন এই অক্ষয় স্তম্ভসার থাকিবে, তত
 দিন জগতে হিন্দুধর্মের অবমাননা ঘোষণা
 করিবে !

“অত্ৰাপি সেই পুরাতন মন্দিরের
 স্মৃতির স্তম্ভসার বিন্যাস রহিয়াছে, অ-
 ন্যাপি প্রতিস্তম্বে বহু দেবমূর্তি অঙ্কিত রহি-
 য়াছে,—প্রত্যেক মূর্তির মুখমণ্ডল বিকৃত
 বা ভগ্ন, প্রথম মুসলমান আক্রমণকাণ্ড-
 দিগের ভীষণ ধর্ম-বিষেবের পরিচয় দি-
 তেছে।”

শিবজীর স্বভাবতঃই হিংস্র অতিশয়
 ভক্তি ছিল, এই স্তম্ভসার দেখিতে দেখিতে
 তাহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর
 কাঁপিতে লাগিল। রত্ননাথ ন্যাগশাস্ত্রী
 আরও বলিতে লাগিলেন,—

“এ দিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্য
 দিকে যবনের গৌরব ! এই যে সম্মুখে উ-
 ন্নত স্তম্ভ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে.

এটি কুতবমিনার, কুতবদ্বারের বিজয় হিন্দু-
 নিগের পরাজয় জগৎমণ্ডলে ঘোষণা ক-
 রিতেছে ! এই দেখুন আল্টমশ্ প্রভৃতি
 যবন রাজাদিগের গৌরবের উপর কি
 রূপ উন্নত স্মৃতির প্রস্তর ইত্যাদি নির্মিত
 হইয়াছে ; এই একটি মসজিদ প্রস্তর হই-
 তেছিল, ঐ পুরাতন হিন্দু-দেবালয় ভগ্ন
 হইয়া উহারই প্রস্তর দ্বারা মসজিদ উঠিত-
 ছিল ! সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ ! সকল
 স্থানে পরাভূত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন
 একে একে বিলীন হইতেছে, তাহার উ-
 পর বিজয়ী যবনের গৌরবস্তম্ভ উদ্ভিত হই
 তেছে। এই কুতবমিনারের উপর আ-
 রোহণ কখন, মসজিদ, গৌরবস্থানের পরে
 গৌরবান,—দূরে দিল্লির অপূর্ণ অত্যা-
 শচ্য প্রাসাদ ও ইম্মাবলী লকিত হইবে
 কিন্তু পুর্বকালের হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপুরী-
 তুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে,—তাহার
 একটি স্তম্ভ বা একটি মন্দিরও নয়নগোচর
 হইবে না।”

নিঃশব্দে শিবজী ও শম্ভুজী ও রত্ননা-
 থপুত্র কুতবমিনারের উপর উঠিলেন,—
 সেরূপ উন্নত স্তম্ভ বোধ হয় জগতে আর
 নাই। নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারি
 দিকে চাহিতে লাগিলেন ;—এই স্থানে
 কি জগৎবিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ
 ছিল, এখানে কি প্রাতঃস্মরণীয় সুদৃষ্টি
 দ্রাক্ষসহ বাস করিয়াছিলেন,—এখানে
 কি সেই পুণ্যকালে সেই পুণ্যলোক রাজার
 করিলা মসাগরা দ্বারা আর্জা-গৌরব বি-

স্তায় করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কি এই স্থানে অধিবাস করিতেন? ভীষ্মাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অর্জুন, ভারতের অতুল বীরস্বন্দ কি ইহারই নিকট আপন বীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া অকস্মৎ যশোলাভ করিয়াছেন,—কৃন্তী, দ্রোণদী, যাক্কাবী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন?—শিবজীর বাকুঞ্জি রোং হইল, দুই নগ্ন দিয়া জল বহিতে লাগিল,—গদগদস্বরে বলিলেন,—

‘দেবতুল্য পূর্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি! আমাদের বাহু বলশূন্য, আমাদের নগ্ন তিমিরারত, আমাদের হৃদয় ক্ষীণ। ঐ নীল নভোমণ্ডল হইতে প্রসন্ন হইয়া আলোক দান করুক,—যেন হিন্দু নাম পুনর্ব্বার উন্নত করিতে পারি,—নচেৎ সেই উদ্যমেই যেন মৃত্যু হয়! এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই!’

শম্ভুজীর হৃদয় ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও নগ্ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজ্য করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন যেন সেই স্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে! অসংখ্য মসজিদ, অসংখ্য মুসলমান সত্ৰাটের গোরস্থান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও চূর্ণ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কৃতবর্মানর হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত ছয় কোশ পথ ব্যাপিয়া

দেখা যাইতেছে। করাল কাল, হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিভিন্নতা জানে না,—শত শত বৎসরে সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত হত্যাাদি নির্য্যাতন করে, ছেলার ভূমিসাৎ করিয়া যায়।

সেদিক হইতে নগ্ন ফিরাইয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথুর দুর্গ প্রাচীরেরদিকে দেখিলেন, অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

‘ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কহণ প্রদেশের কথা শুনিলাম, পৃথুরায়ের বিষয় যে যে কথা শুনিলাম, অজ্ঞ যেন তাহা নয়নে দেখিতেছি! বোধ হইতেছে যেন ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ, বহুজনাকীর্ণ, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর! যেন রাজসভার পাঁত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন—বাহিরে যত দূর দেখা যায়,—পথে, বাটে, বাটীতে প্রাঙ্গণে, নদী-তীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! যেন বহুবিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে,—উজ্জ্বল লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সন্ধ্যাবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদ সমুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অশ্ব, হস্তী, রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপূর্ণ নৃশোণ উপর স্তম্ভের রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,—যেন এমত সময়ে মহামদঘোরির দৃত রাজসভায় প্রবেশ করিল।

‘অন্যানা কথার পর দূত বলিল,
‘মহারাজ ! মহম্মদ ঘোর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন তাহাতে আপনার কি মত ?’

‘মহামুভব চোহান উত্তর করিলেন—

‘যবে স্বর্গদেব আকাশে অন্য একটি স্বর্গকে স্থান দিবেন,—পৃথুরায় সেটি দিন যৌর রাজ্যে অন্য রাজ্যকে স্থান দিবেন !’
রাতবাকা শ্রবণে জয় জয় নামে সেই প্রশস্ত প্রাসাদ শব্দিত হইল,—জয় জয় নামে প্রশস্ত নগর পরিপূরিত হইল !

‘দূত পুনরায় বলিল ‘মহারাজ ! আপনার ঋণুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন,—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন !’

‘পৃথুরায় উত্তর করিলেন, ‘ঋণুর মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি,—অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব !’

‘অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দূর্গ হইতে নিজ্জাত হইল,—তেদৌদীর যুদ্ধে বন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখ, বহুভাঙিত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল,—আহত ঘোড়ী কঁকে গলারন করিয়া প্রাণরক্ষা করলেন !’

কণেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিয়া

বলিলেন—‘রঘুনাথ ! সে দিন আমাদের গিয়াছে ; কিন্তু তথাপি এখানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের অনিশ্চয় কীর্তি অরণ করিলে অপ্ৰেয়স্য নব নব আশা মনে উদয় হয় । এই বিশাল কীর্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরায়িত থাকিবে না ; ভারতের পূর্বদিন এখনও উদিত হইতে পারে । জগদীশ্বর কল্পকে আরোগ্য দান করেন, দুর্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারতমস্তানকে তিনিই উন্নীত করিতে পারেন ।’

নিঃশব্দে সকলে কূতবসিনীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; নিঃশব্দে শিবিরান্তিমুখে যাইলেন ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রামসিংহ ।

‘বাপের সদৃশ বীর, সমান সমান’

কাশীরাম দাস ।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে একজন প্রাহরী আসিয়া বলিলেন,—

‘মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন দৈনিক সহিত সম্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লিতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন । উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন ।

শিব । ‘সাদরে লইয়া আঁস ।’

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, ‘পিতা,

আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইরাছেন ? এ অবমাননা সহ্য করিবেন ?

শিবজীও আরংজীবরূত এই অবমাননা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। কণেক পরই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্রযুবক পিতার নায় ভেজ্জসী ও বীর, পিতার নায় ধর্মপরাগণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী প্রবেশে নিপদ আছে কি না, কথাগুলি জ্ঞানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীৰ্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছেন, মনিস্থর নরনে মহারাষ্ট্র বীর পুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুষ্পের অভ্যর্থনা করিলেন। কণেক পর রামসিংহ কহিলেন—

‘মহারাজকে পূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অতঃপর আপনার জ্ঞান অশেষপ্রিয় ধর্মপরাগণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।’

শিব। ‘আমার ও অতঃপরম সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ,

ধর্মপরাগণ, সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজধানীতে ও বিরল, দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ইহা মূলকণ সম্ভব নাই।’

রাম। ‘মহারাজ দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সত্ৰাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন নগর প্রবেশ করিতে অভিলষ করেন ?’

শিব। ‘প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন ?’ শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন।

অকপট স্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন—

‘আমার বিবেচনায় এইকণই প্রবেশ করা বিধেয়, বিশেষ হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্মঃসহনীয় হইবে।’

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

‘সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকটে কোন ও সংবাদ অবিনতি নাই, আমার পক্ষে দিল্লী প্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।’

উদ্যতচেতা রামসিংহ এতকণ পর শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

‘কহা কখন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থার হইলে চিরকাল পার্শ্বে

বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুলা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয় অজ্ঞমাত্র,—পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অবিভিন্ন পণ্ডিত তাঁহার পরামর্শ কখনও বার্থ হয় না।’

শিবজী বুঝিলেন দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন—

‘হাঁ আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্য দান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।’

রামসিংহ,—‘আছি। দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকে ও আদেশ করিয়াছেন।’

শিব। ‘তাহাতে আপনার কি মত?’

রাম। ‘পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুত্রের বাক্য লঙ্ঘন না হয়,—পিতার বাক্য বাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি মিরম্পদে আদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ক্রটি হইবে না।’

শিবজীর মন নিকটবেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া দৈব হাঙ্গিরায় বসিলেন—

‘তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব; বিলম্ব করিলে রাষ্ট্র উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণই দিল্লী প্রবেশ করি।’

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সত্ৰাটদিগের মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়। কালক্রমে নূতন নূতন সত্ৰাট আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ কত মসজিদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন, তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে অচিরে সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পশ্চিমধ্যে লোদীবংশীর সত্ৰাটদিগের

প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজ্যের কবরের উপর এক একটি গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। আকৃগাণদিগের গৌরব-স্বৰ্ঘ্য যখন অন্তিমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর জুমাউনের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। তাহার পরে “চৌবটখবা” অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্মিত চতুষ্কর্তী স্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসম্ভা গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত বুহিয়াছে। এক একটি প্রাসাদ বা প্যাটালিকা সেই ইতিহাসের এক একটি পত্র, এক একটি গোরস্থান এক একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক; নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আসিলে রামসিংহ সগর্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—

‘রাজন্, এই যে মন্দির দেখিতেছেন,—পিতা জ্যোতিষ গণনার্থ এই মান-মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন; বহুদেশের পাণ্ডিত্যের এই মন্দিরে আসিয়া রাজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।’

শিব। ‘আপনার পিতা যেরূপ

বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল; অনিয়াছি পুণ্য কাশীধামেও তিনি এরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।’

রাম। ‘যাহা আজ্ঞা করিলেন সত্য।’ অচিরে দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর সকলে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর স্বেচ্ছা হইল,—তিনি অশ্ব খামাইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তা উদয় হইল যে ‘এখনও স্বাধীন আজি, পরকণ্ঠেই বন্দী হইতে পারি!’ তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপারায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার-মুখমণ্ডল দেখিলেন,—ভবানীর নাম লইলেন ও নিজ কোষে ‘ভবানী’ নামক অসিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাজ্যীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

‘ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে স্রুতানে
গায়ক; নারকে লয়ে কেলিছে নারকী—
খল খল খল হাসি মধুরঅধরে।’

কেহ বা সুরতে রক্ত কেহ শীথুপানে ।
 ঘারে ঘারে কোলে মালা গাঁথা ফলফুলে
 গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতী ;
 জনশ্রোতঃ রাজপথে বহিছে কমলো ।”

মধুসূদন দত্ত ।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে । আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকর্ষা সামনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন । অদ্য শিবজী দরিত্র মহারাষ্ট্রদেশে হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আনিয়াছেন ; মোগলদিগের ক্ষমতা সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্য আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন । সন্ধ্যাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুল-ললনার ন্যায় অপূর্ব বেশ ধারণ করিয়াছে !

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । পথ দিয়া অসংখ্য অখারোহী ও পদাটিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে । বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যজ্ঞা রাখি করিয়া রাখিয়াছে ; উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব খাদ্য সামগ্রী, অপৰ্যাপ্ত গৃহানুকরণ প্রভা দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । কোথাও

গৃহের উপর দিয়া মিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপাচ্ছন্দে গৃহস্থেরা বারম্বার বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গণ্যক দিয়া কুল-কামিনীগণ প্রসিক মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে । পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা হস্তী ও অশ্ব ; রাজ্য মনসবদার, গৈখ, আমীর ও ওমরাহগণ গমনাগমন করিতেছেন ; অখারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে ; সূন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ প্রস্তর মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে ; হস্তকার শস্ত্র শিবিকাবাহকগণ যেন আরোহীর পদমর্যাদা চীৎকার শব্দের দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে, শিবজী একপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড় ! যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি খেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন—

‘ঐ দেখুন জুয়া মস্কীদ ! সন্ধ্যাট শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন—শুনরাছি ওরূপ মস্কীদ জগতে আর নাই ।’ শিবজী বিশ্বাসোৎকুল-লোচনে দেখিলেন রক্তবর্ণ প্রস্তরের নির্মিত বিশিষ্ট স্থান ব্যাপিতা মস্কীদেব প্রাচীর দেখা যাইতেছে, তাকার উপর সূন্দর খেত-প্রস্তর-বিনির্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই নিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে ।

এই অপূর্ণ মস্কীদেব সম্মুখেই রাজ-

প্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণপ্রস্তর-
 বিনির্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পা-
 শ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে দুর্গ ও মসজি-
 দের মধ্যে, বিস্তীর্ণ রাঙ্গাপাথ শব্দপূর্ণ ও
 লোকাংগণ্য। সেই স্থানের ন্যায় আর এ-
 কটি স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল
 কি না, সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর
 সহস্র নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন
 জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব
 প্রকাশ করিতেছে! দুর্গদ্বারে একজন প্র-
 ধান মনসবাদের প্রশস্ত শিবির; মনসব-
 দার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে
 সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে,
 বন্দুকের ক্রিচিৎশ্রবণী স্বর্ণাঙ্কে বক্রাকৃ-
 ত করিতেছে, প্রত্যেক ক্রিচিৎ হইতে রক্তব-
 ত্তের নিশান বায়ুমাংসে উড়িতেছে। দুর্গ
 সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য
 ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রা-
 চীর হইতে মসজিদপ্রাচীর পর্য্যন্ত ও উত্তর
 দক্ষিণে যতদূর পথ দেখা যায় সমস্ত শব্দ-
 পূর্ণ ও লোকাংগণ্য! অশ্বারোহী, গজা-
 রোহী বা শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্র-
 ধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষ বহুলোক-
 সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্বদাই দু-
 র্গদ্বার দিয়া ভিতর বা বাহিরে আসিতে
 ছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নগর
 আলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ
 বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন ক-
 রিয়া মধ্যে মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে কা-
 মানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও

রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের
 অধিপতির ক্ষমতাবর্ত্তী জগৎসংসারে প্র-
 চার করিতেছে।

বিস্ময়াৎকৃত্ত-লোচনে ক্ষণেক এই স-
 মস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিবজী রামসিংহের
 সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গ প্র-
 বেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী বাহ্য দেখি-
 লেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। চতুর্দিকে
 বিস্তীর্ণ “কাংখানার” অসংখ্য শিল্পকা-
 রগণ রাজ-বাবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত
 করিতেছে,—অপূর্ণ সুরবর্ণ ও হোপা খচিত
 বস্ত্র, মলমল মসলিন বা ছিট,—বহুমূল্য
 গালিচা, চম্প্রাতপা, তাম্বু বা পরদা, সুন্দর
 পরিধেয়, উফেষ, শাল, বা গাঁদাবরণ, অ-
 পরূপ সুরবর্ণ হোপা ও মণিমাণিক্যের বে-
 গম-পরিধেয় অলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর
 কাককাঁথা, সুন্দর কাঁঠ বা খেঁত প্রভৃতির
 গৃহানুকরণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীত,
 রক্তবর্ণ বা হরিদ্রবর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খে-
 লনা দ্রব্য, কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে
 যত অপূর্ণ শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আ-
 দেশে তাহারা মাসিক বেতন পাওয়া প্র-
 তিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। স-
 ম্রাট রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের
 জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করি-
 তেন, বিলাসিনী বেগমগণ যতরূপ অপূর্ণ
 ‘ফরমায়েশ’ করিতেন, প্রাসাদবাসিনদি-
 গের বাহ্য কিছু প্রয়োজন হইত, সমস্ত এই
 স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসুখী লোকের মধ্য দিয়া “দেওয়ান আম” নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সত্ৰাট সচরাচর এই স্থানেই সভা অধিবেশন করেন,—কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গোঁরব দেখাইবার জন্যই,—আরও ভিতরে সুন্দর ষ্ঠে-তপ্রস্তর-বিনির্মিত, নামাক্রূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত জগতে অতুল্য “দেওয়ান খাস” নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়া ছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইলেন, দেখিলেন প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিক্য-বিনির্মিত স্বর্গারাম্য প্রতিষেধী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সত্ৰাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সত্ৰাটের চারি দিকে রৌপ্যবিনির্মিত রেল, তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমরাহ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদমে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনাগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যিনি বিংশতি বৎসর তুঘল বুদ্ধ করিয়া আপনায় ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সত্যি সত্ৰাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া

যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি এতদূর স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সত্ৰাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সত্ৰাট তাঁহাকে এক্ষণে আহ্বান করিলেন? সামান্য সেনাপতি-কেও ইহা অপেক্ষা সম্মান করিতেন, শিবজী অত্র একজন সামান্য কর্মচারীর ন্যায় নতভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান। শিবজীর পক্ষীতে উচ্চ শোণিত বহিতে লাগিল,—কিন্তু এক্ষণে নিরুপায়! সামান্য রাজকর্মচারীর ন্যায় সত্ৰাটকে ‘ওসলীম’ করিয়া রীতিমত ‘মজর’ দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎ সংসার জািল, শিবজী জািল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নছেন, দাসের প্রভুব সহিত, ক্ষণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মুর্থতা।

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব ‘মজর’ গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর না, করিয়া শিবজীকে ‘পাঁচ হাজারী’ অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নরম তখন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি ওষ্ঠের উপর দস্তস্থাপন করিলেন, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন শিবজী পাঁচ হাজারী? সত্ৰাট স্বয়ং মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অদীনে কত পাঁচ হাজারী আছে। দেখিবেন, তাহারাই দুর্বল হস্তে অসিধারণ করে না। শিবজীর পাণ্ডব রাজকর্মচারিণ

এই কথা শুনিতে পাইল, সত্ৰাটের কাছে এ কথা উঠিল।

অন্ত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য সম্পাদন হইলে সভা ভঙ্গ হইল। সত্ৰাট গাত্রো-
স্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ খেত-প্রস্তরবি-
নির্মিত বেগম মহলে গেলেন, নদীর স্রো-
তের স্রায় দূর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত
নির্মিত হইতে লাগিল, যে যাহার আবাস
স্থানে যাইল, সাগরের স্রায় বিস্তীর্ণ দি-
প্লীনগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া
গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটি বাটি
নির্দিষ্ট হইয়াছিল; রোষে, অভিমানে স-
ন্ধার সময় শিবজী সেই বাটিতে আনি-
লেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লা-
গিলেন।

কণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ
আসিল যে অদ্য সত্ৰাটের সম্মুখে শিবজী
যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সত্ৰাট
তাঁহা শুনিয়াছেন। সত্ৰাট শিবজীকে
অন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভ-
বিষাতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন
না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘা-
চ্ছন্ন হইতেছে; ব্যাধে যেরূপ সংহকে ধরি-
বার জন্য জালপাতে, ক্রুর হৃদয়বদ্ধি আরং-
জীব সেইরূপ দীরে দীরে শিবজীকে বন্দী
করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন।
'এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বা-
ধীনতা লাভ করিব?' পুনরায় নীরবে

প্রায় এক দণ্ডকাল চিন্তা করিতে লাগি-
লেন।

শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহি-
লেন, 'হা সীতাপতি গোস্বামিন্! মিত্র-
প্রবর! চির যুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়া-
ছিলে,—তখন তোমার পরামর্শ গ্রাহ্য ক-
রিলাম না, তোমার গরীবসী কথা এখনও
আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে!—আরং-
জীব! সাবধান! শিবজী এ পর্যন্ত তো-
মার নিকট সত্য পালন করিয়াছে,—তাঁ-
হার সহিত অসত্য বা খল আচরণ করিও
না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু
নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন,
মহারাজ্যেদে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত ক-
রিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই
বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া যা-
ইবে।'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে আগন্তুক।

“কে তুমি—

বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ।”

মধুহৃদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরং-
জীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন;
শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন,
চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন,
মহারাজ্যের আর কখনও স্বাধীন না হয়,
এই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সত্ৰা-

টের এই কপটচিত্রণে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী ছইতে 'প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

শিবজীর চিরবিধ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পাত্ৰ ন্যায়শাস্ত্রী সর্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন, ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন ।

অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সত্ৰাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে ।

ন্যায়শাস্ত্রী পশ্চিৎপ্রবর, ও বাকুপ-টুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সম্মানে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন—

আবেদন পত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল । শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য সাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অস্বীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল । তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি যে কার্য সাধন করিতে অস্বীকার করিয়াছি তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সত্ৰাটের অধীনে আনিতে বতদূর সাধা সাহায্য করিব । অথবা যদি

সত্ৰাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জায়গীতে প্রত্যাবর্তন করি, কেন না হিন্দুস্থানের জল বায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গীর সেনার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে ।' রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদন পত্র সত্ৰাটসদনে উপস্থিত করিলেন, সত্ৰাট উত্তর পাঠাইলেন, উত্তরে নানা কথা লিখা আছে কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি নাই ! শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সত্ৰাটের একমাত্র উদ্দেশ্য । তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

ইপারি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সম্ভার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিহ্নিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন । সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত তখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে । কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে ! দিল্লী অসংখ্য সৈনিকের বাসস্থান, সর্বদাই প্রশস্ত পণ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে । কখন কখন দুই এক জন খেতাব মোগল সম্মানে যাইতেছেন, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুই এক জন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে । পারস্য-আ-

রব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা মসাহের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মনুষবদার বহুলোকসম্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তদপেক্ষা উচ্চরবে বিক্রেতাগণ আপন আপন পণ্য দ্রব্য মন্তকে লইয়া চীৎকার করিতেছে, এতদ্ভিন্ন সহস্র অন্যান্য লোক সহস্র কার্য্যে জলের জোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে !

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল । দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল । নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইল, দুই একটি বাটীর গবাক্ষ ভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, অনন্ত হর্ষাশ্রুণীর মধ্যে দূরস্থ অটালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল । আকাশে দুই একটি তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমচ্ছটা আর নাই, শিবজী পূর্বদিকে চাহিলেন ;—দিল্লীর উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শাস্ত্র বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনা নদী সায়ংকালের নিশুঙ্কতায় অনন্ত সাগরাত্তিমুখে বহিয়া যাইতেছে !

সেই নিশুঙ্কতায় মধ্যে জুম্মা মসজীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উদ্ভূত হইল, যেন সে গভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে

মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উদ্ভূত হইতে লাগিল ! শিবজী মুসলমান-ধর্ম-বিশেষ, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর উচ্চারিত গভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন । অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মসজীদের শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত গম্বুজ সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে পর্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে ! এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিশুঙ্কতায় স্তব্ধ !

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাহ্রদ এখনও ছিন্ন হইল না । অন্য পূর্ব কথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল । বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম ;—সাহসী উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী !—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবিষ্যদ্বাণি বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার ন্যায় বালককে বীরকার্য্যে ত্রুতী করিয়াছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন !

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, ভীষণ কার্য্য-পরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব জয়লাভ, দৌর্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দমনীয় উচ্চাভিলাষ ! বিংশ বৎসর পর্যালোচনা করিলেন, প্রতি বৎ-

সর অপূর্ণ বিজ্ঞে বা অসমসাহসী কার্যে
অকিত ও সমুচ্ছল !

সে কার্য-পারম্পরা কি বার্থ ? সে
আশা কি মায়াবিনী ?—না এখনও ভবি-
ষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহি-
য়াছে, এখনও ভারতবর্ষে যবন রাক্ষস
অবসান হইবে, হিন্দুরাজচক্রবর্তির মস্তকের
উপর রাজচ্ছত্র উন্নীলিত হইবে ?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এ-
রূপ সময়ে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল,
রাজপ্রাসাদের নাগর্যথানা হইতে সে শব্দ
উদ্ভিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত
হইল, নৈশ নিশ্চিন্ততার গভীর শব্দ বহুদূর
পর্যন্ত প্রসৃত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয়
নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্নীলিত গবা-
ক্ষধারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্তি দেখিতে
পাইলেন ; ক্লান্ত অঙ্গকার আকাশ-পটে
যেন দীর্ঘ-নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি !

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হই-
লেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করি-
লেন, কোষ হইতে অসি অর্ধেক বহির্গত
করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা
গ্রাস না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে
ধীরে গবাক্ষ ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ
করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও জুগলের
উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করি-
লেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ-নয়নে দেখিলেন, আগ-
ন্তকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি ;

হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোন
ও প্রকার অস্ত্র নাই ;—তবে আগন্তুক
শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সজ্জা-
প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে ?

তীক্ষ্ণনয়নে অঙ্গকার ঘরের ভিতরও
শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলি-
লেন, —

‘ মহারাজের জয় হউক ! ’

অঙ্গকারে আগন্তকের আকৃতি দে-
খিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন
নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চি-
নিতে পারিলেন। জ্ঞাতে প্রকৃত বন্ধু
অতি বিরল, বিপদের সময়, চিন্তার সময়
এরূপ বন্ধুকে পাইলে ক্ষমতা হুতা করিয়া
উঠে। শিবজী সীতাপতি গোলামীকে
প্রণাম ও সম্মুখে আলিঙ্গন করিয়া নি-
কটে বসাইলেন, একটি দীপ জ্বালিলেন,
পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা ক-
রিলেন।

‘ বন্ধুপ্রবর ! রায়গড়ের সংবাদ কি ?
আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসি-
লেন ? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আ-
সিলেন, ও অদা নিশীথে সহসা গবাক্ষধার
দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি ? ’

সীতাপতি উত্তর করিলেন, ‘ মহা-
রাজ ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত সুশল ;
আপনি যে সচিব প্রবরের হস্তে রাজ্য-
ভার ন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে অমঙ্গল
হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ বিষয় আমি
বিশেষ জানি না, কেন না আপনি রায়-

গড় পরিভাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কঠোর ব্রত সাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্যটন করিতে হয়—সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি ?

শিব। 'তথাপি কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গদাধর দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন ?'

সীতা। 'নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা করি প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন ?'

শিব। 'শারীরিক কুশলে আছি,—শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায় ?'

সীতা। 'প্রভুর সহিত ত সত্ৰাটের সন্ধিই আছে, আপনার শত্রু কোথায় ?'

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'সপের সহিত ভেকের সহিত সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? সীতাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রাগগড়ে আপনার বিরোপযোগী পরামর্শ শুনিতাম তাহা হইলে কঙ্কণদেশের ভীষণ পক্ষত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্মের জন্য অদ্যাপি ও যুদ্ধ করিতে পরিতাম, খল সত্ৰাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া আনার মধ্যে পড়িতাম না,—দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।'

সীতা। 'প্রভু আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্য-মাত্রই জ্ঞানির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষ মাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শন পূর্বক এ স্থানে আসিয়াছেন, তিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহার সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু ! শ্রুতের জয় নাই,—অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিবার আশা করিয়াছেন সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহরাজ ! আপনি রাগগড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিশ্বাস করি নাই;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধামল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।'

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—

'সীতাপতি ! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্রজীবন লোপ পায় নাই ! কিন্তু হায় ! যে সময়ে আমার বীরাত্রাংগণা নৈনোরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দী স্বরূপ থাকিব ?'

সীতা। 'যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালদ্বারা বদ্ধ করিতে পারি-

বেন, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্বের নহে ।’

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন ; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন ‘ তবে বোধ করি আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এত পণ্ডিতাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন ।’

সীতা । ‘ প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি এত পণ্ডিতাবনা নাই ।’

শিব । ‘ সে উপায় কি ? ’

সীতা । ‘ অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ ভেদে বাহির হইতে পারেন । দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে । অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে অষ্টজন বাহক আছে নিমেষ মধ্যে মথুরায় পহুঁছিবেন । তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাচ্ছাদিত আছে, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে অদ্যে যাইতে পারিবেন ।’

শিব । ‘ আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম । কিন্তু মনে কখন প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন পি-

লায়ম হুঃসাধ্য, — আরংজীব হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু ।’

সীতা । ‘ প্রাচীরের যে স্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন লোকহস্তে ছদ্মবেশে লুকায়িত আছে । যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় ।’

শিব । ‘ ভাল, নৌকায় গমন কালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে ? ’

সীতা । ‘ অষ্টজন নৌকাবাহক ছদ্মবেশী আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা । তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তুণ পরিপূর্ণ । সহস্রা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই ।’

শিব । ‘ মথুরায় পহুঁছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই ? ’

সীতা । ‘ আপনার পেশওয়ার ডি-গিনিপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনিই জানেন । আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন ।’

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন । শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

‘ আপনি পাঠ করিয়া শুনান ।’ সীতা পত্র লক্ষিত হইলেন, তাঁহার তখন অ-

রণ হইল যে শিবজী আপন নাম লিখিতও জামিনেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই।’

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। বাহা বাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম সমস্ত স্থির করিয়াছেন পত্রে বিস্তীর্ণ লিখা আছে। শুনিয়া শিবজী বলিলেন—

‘গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনার অপেক্ষা স্নহরূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না! কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পুত্র, প্রিয় সূর্য্যদ অরজী, মালজী,—আমার সেনাগণ কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিভ্রাণ পাইবে?’

সীতা। ‘আপনার পুত্র, প্রিয় সূর্য্যদ ও মন্ত্রীর আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে;—আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই,—আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।’

শিব। ‘সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি জাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।’

সীতা। ‘যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহা-

রাষ্ট্র এরূপ ভীক বে আপনার নিরাপদ বার্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জন না করিবে?’

শিবজী কণেক নীরবে চিন্তা করিলেন। পরে মহাভূতব ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাহিত হইলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না; এরূপ ভীকতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন!’

সীতা। ‘অন্য উপায় নাই!’

শিব। ‘তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাধুখ হয় নাই।’

সীতা। ‘সময় নাই! অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন; নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ!’

শিব। ‘আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থ ও হয় তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই;—শিবজী আগ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিভ্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! একত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।’

সীতা। ‘প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজী-

বকে শান্তি দান করুন,—সেইদূর মহারাষ্ট্র দেশে প্রত্যাবর্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সময়তরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের মুখস্বপ্ন ভগ্ন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে ।’

শিব । ‘সীতাপতি ! যিনি জগতের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাকার অধিক বিলম্ব নাই;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবেন না ।’

সীতা । ‘প্রভু ! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন ; কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কল্যা আপনি বন্দী !’

শিব । ‘তাহাই হউক ;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবেন না, শিবজীই প্রতিজ্ঞা অবিচলিত !’

সীতা । ‘তবে আদেশ দিন, আমি বিদায় হই ।’ অতিশয় ক্ষীণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন । শিবজী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার নয়নে জল-বিন্দু ।

তখন সম্মুখে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—‘গোস্বামিন্ ! দোষ গ্রহণ করিবেন না ; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না ; রাগগড়ে আপনার বীর পরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আ-

মার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে ! বিদায় কি জনা ? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন আমার এই অট্টালিকায় থাকুন, এখানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই ।’

সীতা । ‘প্রভু ! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম ; জগদীশ্বর জানেন আপনার সন্তে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই ; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রত সাধনের জন্য নানা স্থানে নানাকার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অস্থিতি অসম্ভব ।’

শিব । ‘এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না । কিন্তু দিবসে এক দিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না ; রজনীয়ে’গে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনারূত হইয়া জটাধারণ করিয়া এক এক বার দ্রোণা দেন, দুই একটি বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া যান আর দেখিতে পাই না ! সীতাপতি ! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন ?’

সীতা । ‘সমস্ত একগে করুণে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ !’

শিব । ‘ভাল এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন ?’

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—‘আমার ললাটে একটি অমঙ্গল দিখন আছে,—আমার ইচ্ছা দেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ

করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্বন্ধে তিনি আমার উপর অসম্ভব! সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।’

শিব। ‘এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেবা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল?’

সীতা। ‘কার্যাবশতঃ আমি স্মরণে প্রথমটি জানিতে পারিলাম; ঈশানী-মন্দিরে একজন সতী সাদ্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব; যদি কৃতার্থ না হই তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। ঐহ্যার সন্তোষার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি অসম্ভব থাকিলে এ জীবনে আবশ্যক কি?’

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামী নয়নে জলবিন্দু,—তঁাহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; বলিলেন—

‘সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি তঁাহার তিরস্কার, তঁাহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।’

সীতা। ‘প্রভু কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?’

শিব। ‘জগদীশ্বর আমাকে মার্জনা করুন, আমি একজন নির্দোষী বীর-

পুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি;—সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।’

প্রায় উদ্বিগ্ন-ক্লক্লক্ণে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তঁাহার নাম কি?’

শিবজী বলিলেন, ‘রঘুনাথজী হাবেলদার।’

শিবজী বলিলেন, ‘রঘুনাথজী হাবেলদার!’ ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উজোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অতি কফ্টোচ্চারিত স্বরে সীতাপতি বলিলেন, ‘দীপ আবশ্যক,—বলুন,—শ্রবণ করিতেছি!’

শিব। ‘আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে সেই বালকবেশী পুরুষ আমার নিকট আইসে ও মৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প; আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দমনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিত! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা তখনই হৃদয়ে জাগরিত হয়!’

‘তাহার পর?’

‘সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখি-

লাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম ; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম ;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই । বিপদের সময় সর্বদা আমার ছায়ার নাগ নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় হৃদমণীয় তেজে শত্রু-রেখা ভেদ করিয়া মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সিংহনাদে অগ্রসর হইত ! এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি সেই গুচ্ছ গুচ্ছ ক্লবকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন, আমি দেখিতে পাইতেছি ।

‘ তাহার পর । ’

‘ এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে হৃগ্ন জয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল ! ’

‘ তাহার পর ’

‘ আর জিজ্ঞাসা করেন কি জনা ; আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম ; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই ; যাইবার সময়ও আমারদিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল । ’ শিবজীর কণ্ঠকন্ড হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল ।

অনেকক্ষণ সেই কথা কহিতে পারি-

লেন না ; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

‘ আক্ষেপের কারণ কি ? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম । ’

‘ শিব । ‘ দোষী ! রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না । রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম । মহা-ভূতব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধ-পূর্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল । নির্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে । যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি । ’

শিবজীর কথা সাদ্র হইল ; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন ।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—‘ সীতাপতি ! ’ কোনও উত্তর পাইলেন না । কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই ! সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জনা ? সীতাপতি গোস্বামী কে ?

জীর্ণোদ্ধার।

অর্থাৎ।

প্রাচীন আর্থাজাতির জ্ঞান সমালোচনা।

সলিল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুরাতন আর্থাদিগের জ্ঞানানুসন্ধান মানসে আমরা 'জীর্ণোদ্ধার' ইত্যভিধেয় মুকুটার্ণ করিয়া একটি প্রস্তাব আরম্ভ করি। * নানা কারণে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। সম্ভ্রতি তাহার পুনরারম্ভ করিলাম।

তৎকালে উহা কি পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় প্রদান করিতেছি; ফল, প্রস্তাবপাঠের পূর্বে পাঠকবর্গ একবার সেই প্রস্তাবটি দেখিয়া লইবেন ইহা আমাদিগের অনুরোধ। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে এরূপ আকারের অর্থাৎ ঋণ প্রস্তাব বলিয়া অধৈর্য্য বা অবধীরগার বশ হইবেন না।

রুষ্টির কারণ, মেঘের স্তর ও স্তরীভূত মেঘের নাম ঐরাবত, এই সকল বিষয় পূর্বে প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'মেঘ-সোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচ্যতে' এই শাস্ত্র বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে

* ১২৮৩ শালের কত্তিক। অগ্রহায়ণ মাসের বাঙ্কব দেখ।—

ঐরাবত হস্তির জল বর্ষণ আর স্তরীভূত মেঘের জল বর্ষণ অভিন্ন কথা। হস্তি শব্দটি স্তরীভূত মেঘের রূপক মাত্র। জল-বর্ষণকারী তাদৃশ মেঘেরই রূপক নাম ঐরাবত, অপর নাম 'অজমাতঙ্গ।'

'জলানামাকরোণবঃ'—জল মাত্রেরই প্রধান আকর সমুদ্র। ভূ—বাস্প ও সামুদ্রিক জল সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাষ্পীভূত ও মেঘরূপে পরিণত হইয়া কালে রুষ্টিরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়, এই ব্যাপার তৎকালীন কোন আর্থোদই অজ্ঞাত ছিল না।

তরল পদার্থ মাত্রেরই নিম্নগামী; সুতরাং পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানের প্রবিষ্ট জল রাশি একত্রিত হইয়া নিম্নে প্রধাবিত হয় বলিয়া তাহাদিগের নাম 'নিম্নগা।' প্রবাহের অম্পদ ও শনদ্ব অনুসারে কেহ নদ কেহ নদী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা মনে করিবেন না যে রুষ্টির জলই নদ নদীর একমাত্র কারণ। কোন কোন নদী, উৎস-প্রবাহ দ্বারাও উৎপন্ন

হইয়া থাকে । যেসকল জল, পৃথিবীর অন্তরাকর্ষণ শক্তি দ্বারা অভ্যন্তর-প্রবিষ্ট না হইয়া ছিদ্রময় পথে সর্বদা প্রবিত হয়, তাহাই কোন বিশেষ ছিদ্র দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইলে উৎস নামে অভিহিত হয় । এই উৎস কোন স্থানে ফোয়ারার ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়া ভূমিতে পুনঃপতিত হইয়া নিম্নে গমন করে, কোথাও বা কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া তথা হইতে অধোগমন করে । পরন্তু যেস্থানে উৎস উৎপন্ন হয়, সেই স্থানটিই নদীর যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি ভূমি । নদীসকল যেস্থানে প্রথম উৎপন্ন হয়, সে স্থানে তাহার আয়তন অতি অল্প থাকে । ক্রমে অগ্রসারিণী হইয়া অন্যান্য প্রবাহের সংযোগ ও কোমল মৃত্তিকার ভেদ হেতু বিপুল বিস্তারতা লাভ করে ।

কোন কোন নদী পশ্চিমদ্যে অস্থিহিত হইয়া কিয়দূর গমনকরতঃ পুনরায় প্রকাশ্য প্রবাহে আত্মশরীর প্রকাশ করে । পুরাকালের আর্যেরা এইরূপ নদীকে ‘অ-ত্বর্বাহিনী’ এবং যেস্থান দিয়া-উহার প্রবাহিত হয় সেই স্থানগুলিকে ‘বিনশন’ আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন । ইন্দ্র-রোপীয় ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়া থাকেন, যে নদী পশ্চিমদ্যে নিম্নে কোমল মৃত্তিকা ও উপরে অতি দৃঢ় পর্বতখণ্ড প্রাপ্ত হয়, সেই সকল নদীই তৎস্থানে নিম্নস্থ কোমল মৃত্তিকা ধৌত করিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগ দিয়া প্রবাহিত হয় ।

পুরাতন আর্যেরা যখন বিশেষ বি-

শেষ প্রবাহের নামকরণে প্ররুত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রবাহের উপর মদী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । ‘যে জলপ্রবাহ উচ্চস্থান হইতে নির্গত হইয়া অষ্ট সহস্র ধনু অর্থাৎ অত্যান দূর ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হইতেছে তাহার নদী । এতদপেক্ষা নূন প্রবেশগামী প্রবাহ, নদী নামের যোগ্য নহে ।’

নদী সমূহের গতি সরল নহে । ভূমির দৃঢ়তা ও তরল পদার্থের স্বভাব অনুসারে নদী সকলের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল হইয়া থাকে । জীবন্ত সমূহের গতি যদি কুটিল না হইত, তাহা হইলে তাহাদের বেগের এরূপ প্রাখর্য্য জন্মিত যে তদ্বারা দেশের বহুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইত ।

বর্তমানকালীয় দ্বৈপায়ন পুস্তকেরা নদী সকলের বিশেষ বর্ণনার নিমিত্ত তদীয় প্রবাহের গতি বিশেষকৈ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন । এক পার্বত্যংশ—ইহা পার্বত্য তটে পরিবেষ্টিত ও সম-দিক বেগ বিশিষ্ট ; দ্বিতীয় মধ্যাংশ—ইহা সমভূমি স্থিত মধ্য বেগ বিশিষ্ট ও সর্পের ন্যায় কুটিলগামী । তৃতীয় সঙ্গমাংশ—ইহা লঘু বেগাধিত এবং গম্যস্থান সকল কোমল মৃত্তিকা বিশিষ্ট হওয়ায় তাহার সঙ্গম কালে প্রায় বহুধারা-বিভক্ত ও তথায় ত্রিকোণ ভূমির উৎপাদক ।

এতদ্দেশীয় পুরাতন পণ্ডিতেরা তিন ভাগ না করিয়া চারিভাগ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন । শীত্ৰবহা, তির্য্যাকপ্রোতা, মৃ-

দ্রুবাহিনী ও অন্তঃসলিলবাহিনী বা পিনশন। ভারতবর্ষে—যত নদ নদী আছে, পুরাতন পণ্ডিতেরা তত্তাবতের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। কোন নদী কিরূপ স্বভাব বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ গুণাক্রান্ত তাহা তাঁহারা পর্যবেক্ষণদ্বারা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়-প্রভব নদী সকলের জল অদ্রুত এবং বিষ্ণু ও সহ্য প্রভৃতি পর্বত-প্রভব নদীর জল বিশেষ রোগজনক, ইত্যাদি গুণাগুণবর্ণনা শুষ্কতন্ত্রের ৪৫ অধ্যায়ে বহুপরিমাণে আছে এবং কোন নদী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বর্ণিত আছে; বাস্তব্য ভয়ে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলাম না এবং সেরূপ সংগ্রহ এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে।

সলিলের সহিত চন্দ্রমণ্ডলের এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। এই আশ্চর্য্য সম্বন্ধের প্রকৃত রূপ ও কারণ কি? ইহা আমরা জানি না। তিথি-বিশেষে যেমন সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনি মনুষ্য শরীরের রস নামক জলও উচ্ছ্বসিত হয়। সুস্থ ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে পারেন বা না পারেন, জলীয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। চন্দ্র-কলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সাগর-জলের হ্রাস বৃদ্ধি (ক্ষী-তোপচয়তা) হয়, পুরাতন আর্যেরা যে দিন ইহা জানিতে পারিয়া ছিলেন, সেই দিনেই জলরাশি সাগরের “সমুদ্র” এই আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা ‘সমুদ্র’ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা অবগত হওয়া

যায়। পরন্তু চন্দ্রের সহিত সলিলের যে সম্বন্ধ আছে এবং কিরূপ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধানুসারে সিন্ধু সলিলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ইহার স্পষ্ট বিবরণ আমরা সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অলৌকিক কল্পনা বলিয়াই উপলব্ধি হইল। খেতদ্বীপের পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, চন্দ্রের আকর্ষণ দ্বারাই সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়। ইহারা আরও বলেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েরই আকর্ষণ শক্তি আছে; চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপন কক্ষায় পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পরন্তু চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীর মাত্র-লব্ধ সমুদ্রের-জল তরল পদার্থ বলিয়া উচ্ছ্বসিত হয়।

পৃথিবীর যে ভাগ যখন চন্দ্রের নিম্নে অবস্থিতি করে, তখন সেই ভাগস্থিত সমুদ্র-জল উচ্ছ্বসিত হয়। পরন্তু ঠিক এই রূপ না হইলে অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ উক্ত কালের মধ্যে দুইবার জোয়ার হওয়া সর্ব প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহার মধ্যে অপর একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা এই—

পৃথিবীর যেভাগ যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্নে থাকে, তখন তাহার সেইভাগ, অন্য ভাগ অপেক্ষা নিকট হয়; সুতরাং সেই ভাগস্থ জল চন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়

এবং তাহার নিম্নভাগস্থ জল আকর্ষণের অক্ষত প্রযুক্ত নত হয়। এই নিমিত্ত উভয় স্থানেই এক সময়ে জোয়ার উৎপন্ন হয় এবং উক্ত জোয়ারের পার্শ্বের জল সরিয়া গেলেই পার্শ্বদ্বয়ে ভাঁটা হইয়া থাকে। এই রূপেই দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার জোয়ার হয়। অপিচ, যে সময়ে জোয়ার হয়, সেই সময়ে উক্তরূপে পৃথিবীর উভয় ভাগের জল নত ও উন্নত হইলে পৃথিবী অশাক্তি ধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু চন্দ্রের নিয়ত গমন ও পৃথিবীর নিয়ত ঘূর্ণন হেতু সমুদ্রের এক স্থানের জল চন্দ্রমণ্ডলের আকর্ষণ দ্বারা স্ফীত হইতে হইতে চন্দ্র অন্য স্থানের উপর উদ্ভিত হয়; সুতরাং সমুদ্র জলের স্ফীততা ক্ষণকালের অধিক স্থিতিভূত হইতে পারেনা। এজন্যই তৎকালে পৃথিবী অশাক্তি ধারণ করিতে পারেনা।

দৈবপারন জাতির এবস্থিধ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা বোধ হয় কোন সঙ্কৃত গ্রন্থে নাই। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তদনুসারেই ইহা বলিতেছি। ফল, চন্দ্রমণ্ডল যে সমুদ্রজলস্ফীততার কারণ, তাহা ভাঁহার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জল ও চন্দ্রমণ্ডল ঘটিত অন্যান্য বিষয়গুলি ‘চন্দ্রমণ্ডল’ নামক প্রস্তাবে ব্যক্ত করিব। এক্ষণে চিকিৎসার উপযোগী কতিপয় জল গুণ বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

চিকিৎসা শাস্ত্র, জলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। আন্তরীক্ষ ও

ভৌম। আকাশাগত বৃষ্টি-জলের নাম ‘আন্তরীক্ষ’ আর তাহা পৃথিবীস্থ হইলে ‘ভৌম’ বলিয়া আখ্যাত হয়। আন্তরীক্ষ জলের কি রস আছে, তাহা নির্দেশ করিয়া বলা যায় না। ফল, এই আন্তরীক্ষ জল, অমৃততুল্য উপকারক।—আয়ুর্জ্বিকার, তৃপ্তিকর, ধাতুপোষক, মনঃশৈথিল্যকারক, অমনাশক, এবং ক্রান্তি ও পিপাসাহর—ইত্যাদি বহুগুণসমায়ুক্ত। ভৌমজল স্থানবিশেষে, বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে; তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিশ্চয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে যে, মৃত্তিকাসংস্কৃষ্ট হয় বলিয়া অনেক পরিমাণে মৃত্তিকার গুণ বর্তে; সুতরাং যে দেশের বা যে স্থানের মৃত্তিকার যে রূপ গুণ, তত্রস্থ জল ও কিন্নদংশে তজ্জল লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবেক। আন্তরীক্ষ জলই সর্বোত্তম হিতকারী, অভাবে আকাশ-গুণ-বহুল-স্থান জল সুপথ্য। আকাশ-গুণপ্রধান স্থানের জলে কোন বিশেষরূপ রসবত্তা অনুভব হয় না এবং তাহা লঘু হইয়া থাকে।

পূর্বোল্লিখিত ‘আন্তরীক্ষ’ জলের আবার চারি প্রকার প্রভেদ আছে। ‘ধার’ ‘কার’ ‘ভৌমার’ এবং ‘হৈম’।

ধার—ঝুড়িধারার জল। কার—কৃত্রিম জল। * ভৌমার—কুষ্টিকা। হৈম

* এস্থলে কৃত্রিম জল কি! তাহা বুঝি না। প্রাচীন কালেও কি বাষ্প জমাইয়া জল করিবার প্রথা ছিল?

বরফের জল । এই চতুর্বিধ জলের মধ্যে ‘ধার’ জলই পথা ও সেবনীয় । অনাগুলি অপথা ও প্রায়শঃই সেবার অযোগ্য ।

ধার জল দুই প্রকার । গাঙ্গ ও সামুদ্র । সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপিয়া যে রুষ্টি-ধারা পতিত হয়, মনে করিবেন না সকল সময়ের রুষ্টির জল সমান । মেঘেরাও ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জল বর্ষণ করিয়া থাকে । শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মেঘেরা ‘গাঙ্গজল’ প্রায় আশ্বীন মাসেই বর্ষণ করিয়া থাকে ; এবং অন্যান্য মাসে কখনও বর্ষণ করে ।

‘আশ্বিন মাসের রুষ্টির জল, গাঙ্গ-জল, আর ভাদ্র মাসের রুষ্টির জল সমুদ্রের জল, একথা কিরূপ বিশ্বাস হইবে । কিরূপেই বা জানা যাইবে ?

‘দ্বয়োৱপি পরীক্ষণং কুর্বীত’—দুই প্রকার জলেরই পরীক্ষা করিবে, পরীক্ষা করিলেই গাঙ্গজল কি সামুদ্রজল জানা যাইবে । রুষ্টিজলের গাঙ্গ ও সামুদ্র অবরোধের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত আছে । যথা—

শালি ধানের পরিষ্কার তণ্ডুল লইয়া তাহা না এঁবে যায় এরূপ করিয়া পাক কর । সেই অন্ন পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাহা চাঁদিক্রপার পাত্রে রাখ । টাটকা থাকিতে থাকিতে তাহা রুষ্টির সময় বাহিরে রাখিয়া দাও । এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ অমুন দুই দণ্ড রাখিলেও যদি সেই

অন্নপিণ্ডের রঙ ঠিক থাকে এবং অন্য কোন প্রকার ক্লেদ ভাব লক্ষ্য না হয়, তবেই সেই রুষ্টির জলকে “গাঙ্গ” বলিয়া গ্রহণ কর । আর যদি শীত্র শীত্রই বিবর্ণ হইয়া যায় সিকুথ (মোম) ও ক্লেদের মত কোন প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে রুষ্টির জল “সামুদ্র” জানিয়া পরিত্যাগ কর । গাঙ্গ বর্ষণের জল উপকারী আর সমুদ্র বর্ষণের জল অপকারী । কিন্তু অন্যান্য মাস অপেক্ষা আশ্বিন মাসের সমুদ্রজলবর্ষণ অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয় । এখন সকল মাসেই সমুদ্র জলবর্ষণ হয়, মেলেরাই এক্ষণে মলারিষ্ট বায়ু (ম্যালেরিয়া) হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

শীত, গ্রীষ্মাদি কালের নিমিত্ত ‘ধার’ জল ধরিয়া রাখা আবশ্যক । রাখিবার নিয়ম এইরূপ—রুষ্টির সময় উত্তম পরিষ্কার শুভ বস্ত্র টানাইয়া দাও । নীচে সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র কি মৃৎপাত্র অথবা কাঁচপাত্র রাখ । জলপূর্ণ হইলে তুলিয়া রাখ, কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইবে না । সুপরিষ্কৃত হৃদ্যপৃষ্ঠ হইতে ধুত করিলেও হইতে পারে ।

এরূপ জলের অভাবে কাষে কাষেই ‘ভৌম’ জল ব্যবহার করিতে হয় ; সুতরাং ভৌম জলের বিবরণও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতেছে । ভৌমজল প্রধানতঃ সপ্তপ্রকার । সপ্তবিধ ভৌমজলের দোষ গুণ ও জল পরিষ্কার নিয়মাদি আগামী প্রস্তাবে ব্যক্ত করা যাইবেক ।

প্রৈততত্ত্ব ।

(প্রথম প্রস্তাব)

আজি কালি সভাসমাজে প্রৈততত্ত্ব লইয়া মহা গোলযোগ বাঁধিয়াছে। একদিকে ইয়োরোপ ও অপরদিকে আমেরিকা এই ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন। যোগনিরত ঋষিগণও বড় সাধাণে লোক নহেন। তাঁহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও সভাসমাজের আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞানে সভাজগৎ মুগ্ধ। সুতরাং শীঘ্রই যে তাঁহারা তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যার ফল পাইবেন, এরূপ আশা বড় অসম্ভব নয়। তাঁহারা আশানুরূপ ফল পাইউন বা নাই পাইউন, কিন্তু যে টুকু পাইয়াছেন তাহাতেই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দেহশূন্য আত্মার সহিত তাঁহারা কথা কহিতে পারেন। এবং সেই আত্মার সহায়েই ভূত, ভবিষ্যৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারেন। ব্যাপারটি বড় সাধারণ নয়। মুনি ঋষিগণ যে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির করিয়া কখন বলিতে পারিলেন না যে, পরকাল আছে বা পরকাল নাই, সেই পরকালের নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত এই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অস্পন্দিত জানিতে পারিয়াছেন। কেবল তা-

হাই নহে; এই সকল আত্মারা উক্ত পণ্ডিতদিগের একান্ত বান্ধা। আহুত হইবা মাত্রই তাঁহারা পণ্ডিতদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হন। এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ প্রার্থের সন্তুস্তর দিয়া চলিয়া যান।

উপর্যুক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকেই যে সন্দিহান হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। অনেক ভাবিবেন, ঘটনা কিয়ৎ পরিমাণে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। হয় প্রস্তাবলেখক নয় প্রস্তাবের মূলপুস্তকলেখক, বাহা ইউক, একটা কারখানা করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বল্কা, যে তাঁহারা কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমাদের প্রস্তাবের সারার্থ ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিব, এবং প্রৈততত্ত্বীয় যে সকল দৃষ্টান্ত দিব, তাহাতেই তাহাদের এ ভ্রম দূর হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু একদিকে যেমন প্রৈতপক্ষসমর্থনার্থ আগ্রহ জন্মিয়াছে, অন্যদিকে আবার কতকগুলি ব্যক্তি এই মতের উল্লেদসামান জন্য ঋজাহস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কয়েকজন প্রৈততত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা অলীক বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উভয় পক্ষেরই কৃতি এবং

উভয় পক্ষেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ
আছেন। স্মৃতরাং তাঁহাদিগের কোন প-
ক্ষই অবলম্বন না করিয়া আমরা সাধারণতঃ
প্রৈতত্ত্ব সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রৈতের অ-
স্তিত্বে বিশ্বাস জনসমাজে চলিয়া আসি-
তেছে বলিয়া বুদ্ধ, পণ্ডিত, মুখ্য সকলেই
সকল সময়ে সকল প্রদেশে প্রৈতের প্রতি
যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন। বিশেষ
বাজালীর ঘরে ভূত, প্রৈত, পিশাচ প্রভৃ-
তির বড় অনুগ্রহ। অশ্বখ বৃক্ষ, বটবৃক্ষ
বা কোন নিম্ববৃক্ষ ইহাদিগের বাসস্থান।
এবং যে সকল বাটীতে এই প্রকারের বৃক্ষ
আছে সেবাটির স্ত্রীলোকদিগকে বড় সন্ম-
হিত থাকিতে হয়। কোনরূপে অপদস্থ
হইলে ইহারা গৃহস্থদিগের কাহারও না
কাহারও স্কন্ধে চাপিয়া এ অপমানের
প্রতিহিংসা লন। এইরূপ পিশাচা-
ক্রান্তদিগের রোজা নামধারী একপ্রকার
চিকিৎসকও আছেন। তাঁহারা মন্ত্রপ্র-
ভাবে গৃহের মঙ্গল স্থাপন করিতে পা-
রেন। এবং প্রৈতের চতুর্দশ পুরুষ যা-
হাতে গৃহের ত্রিসীমায় আর আসিতে না
পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

কিন্তু স্মৃতির বিষয় এই যে বঙ্গীয়ভূত এবং
রোজায় বিশ্বাস শিক্ষিতদিগের মধ্যে নাই
বলিলেই হয়। তাঁহাদিগের একাধিপত্য
স্ত্রীলোক এবং অশিক্ষিতের মধ্যে। অ-
শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে আবার ই-
হার মূলতত্ত্ব জানে। বঙ্গীয় ভূত যে বা-

স্তবিক দৃষ্ট মনুষ্য, এবং রোজামহাশয়েরা
বঞ্চকহরি, ইহা অনেক পূর্ব হইতে বঙ্গের
সাধারণ বিশ্বাস*। বাটীতে ভূতের উৎপাৎ
হয় বলিলেই অনেকে বদিয়া থাকেন, বা-
টির স্ত্রীলোকদিগকে সাবধান করিও।

কিন্তু কোন ব্যাপার যত কেন মিথ্যা
হউক না, তাহার অভ্যন্তরে কিছু না কিছু
সত্য থাকিবেই থাকিবে। সত্যশূন্য মিথ্যা
এজগতে সম্ভবে না। আমরা দেখিতেছি,
যেখানে একদল কোন মতকে কিন্তু মন্তি-
কের উদ্ভাবনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চা-
হেন, আর দল সেই মতেরই বিশেষ পক্ষ-
পাতি। স্মৃতরাং সেই মতের মধ্যে কিছু
না কিছু সত্য অবশ্য আছে, নহিলে এত
লোক তাহারতত্ত্ব হইত না।

এই জন্যই আমাদের জিজ্ঞাস্য যে,
বঙ্গীয় ভূতদিগের কোনরূপ অস্তিত্ব না থা-
কিলেও ইহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাসের
জন্ম কোথা হইতে থাকিল? এই বি-
শ্বাসের মূল আশ্রয় অমরত্ব। দেহমধ্যে

* কিছু দিবস পূর্বে কোন রোজা
এক গৃহে ভূত ছাড়াইতে গিয়া ভূতের আ-
হারের জন্য দধি প্রার্থনা করিয়াছিল। গৃহ
স্বামী ভূতকে বিশেষ জন্ম করিবার জন্য দ-
ধিতে পারা মিশাইয়া দিয়াছিল, পরদিবস
দেখিল যে রোজা মুখে লাল কাটিতেছে।
এই ঘটনাটি কোন সপ্তাহিক সংবাদ পত্রে
দৃষ্ট হয়। এরূপ ঘটনার অপ্রতুল নাই।

† “Falsity has a nucleus of real-
ity” —H. Spencer.

আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে কি না ? যদি থাকে সে কোথায় থাকে, কেন থাকে, কি উদ্দেশ্যে থাকে ? তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না ? এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদেরিগের সময় নাই, সাধ্যও নাই। যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার মীমাংসা কে করিবে ? এই কথা মীমাংসার জন্য কোন দুই পণ্ডিতের মত ঠিক মিলিল না। কথাই আছে ‘নাসৌ মুনির্বস্যা মতং ন ভিন্নং’। এই জন্য আত্মার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ আমরা দিব না। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস সাধারণ বিশ্বাস। সকল সমাজের অভ্যন্তরেই এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত দুই চারি জন এই বিশ্বাসের শত্রু, কিন্তু দুই চারি জনের মত ধর্তব্য নহে। তাহাদিগের মত সমাজের মত নহে। সমাজ তাহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। সাধারণের মতই সমাজের মত।

স্মৃতরাং মৃত্যুর পর যদি আত্মা থাকে, তবে সে কোন না কোন স্থানে থাকিবেই থাকিবে। যদি এতদূর হয়, তবে মানুষের সহিত সাক্ষাৎ কেন না করিবে ? যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যের সহিত আলাপ করিয়া এতদিন কাটাইল, সে কি একদিনে সব ভুলিয়া যাইবে। যেই ইহলোক ছাড়িল, অমনি কি সকলকে স্মৃতির অন্ধকারগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। মানুষ ডাকিলে সে কেন না আসিবে ? কিন্তু

যে সে ডাকিলে আসিবে না। সে যাহাকে ভাল বাসে সেই ডাকিলেই আসিবে। বাজালায় রোজা না ডাকিলে আসিবে না; বিলাতে ও ইউনাইটেডফেটে মধ্যস্থ (Medium) না ডাকিলে আসিবে না। আবার যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে আগিবেনা। আয়োজন করিয়া ডাকা চাই। এই কারণে প্রেতাহ্বানের জন্য নানা স্থলে নানারূপ আয়োজন হইয়া থাকে।

আমরা রোজাদিগকে পূর্বে যে পরিহাস করিয়াছি, ইহাতে হয়ত অনেকে মনে করিয়াছেন, রোজাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে বাজালায় জগিয়াছে। বিলাতে জন্মিলে তাহারাও ‘গণ্ডার’ ‘গু’ দিয়া চলিয়া যাইত। লেখকের বিশ্বাস আছে যে, বিলাতের সকলই ভাল, বাজালির কিছুই ভাল নহে ইত্যাদি। বাস্তবিক তাহা নহে। বাজালায়ও আমরা দুই চারি জন সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বস্তহৃদে শুনিয়াছি, এবং আরও অনেকের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। ইহারা পিশাচসিদ্ধ নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদিগের ঘটনাবলী দেখিলে শুনিলে আশ্চর্য্যাম্বিত হইতে হয়। আমরা যথাস্থানে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিব। অন্যদিকে আবার বিলাতের সকলই যে ভাল তাহা নহে। ইচ্ছা করিলে আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমরা একত্রীভূত রাজ্য (United States) হইতে একটীমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ফ্লিট নামক একজন

সাছেব উক্তস্থানে একজন মধ্যস্থ বলিয়া পরিচিত। প্রেতের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয়, এবং এই ব্যবসায়ে তিনি বিপুল অর্থোপার্জনও করিয়াছেন। তিনি পরলোক হইতে সঞ্চাদাদি আনিয়া দেন। জীবিত মনুষ্যেরা যদি তাহাদিগের মৃত বন্ধু, পিতা, মাতা, প্রণয়িনী প্রভৃতি স্বজনদিগের সহিত কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করেন, ফ্লিট সাছেব তাহার মধ্যস্থ হইয়া সহায়তা করিতে পারেন। তাঁহার সাহায্যের পদ্ধতিটা এইরূপ—যাহার কথা কহিবার প্রয়োজন, তিনি পরলোকস্থ আত্মীর নামে পত্র লিখিয়া উক্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফ্লিটের হস্তে দেন। পরদিন পত্র ফিরিয়া পান। পত্র বহির্দিকে পূর্বমত বন্ধ। কিন্তু পত্র খুলিয়া দেখেন যে, পত্রের সহিত মৃত আত্মীর উত্তর রহিয়াছে। কেহ প্রণয়িনীকে লিখিতেছেন, কেহ তোমার সঙ্গে দেখা হইবে; কেহ পিতাকে লিখিতেছেন, আমার জীবনপথ সুখপূর্ণ বা কষ্টকময় ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথাসম্ভব উত্তর পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এই ঘটনার একটি ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা প্রকাশের কারণ ফ্লিট সাছেবের সহিত তাঁহার বনিতার মনবিচ্ছেদ। বিশ্বাসঘাতিনী বনিতা এক্ষণে সাধারণ্যকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার স্বামী পত্র খুলিবার একটি অদ্ভুত যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। এবং তদ্বারা সকল পত্র খুলিয়া আপন

মনোমত উত্তর লিখিয়া পত্র পুনশ্চ পূর্বমত বন্ধ করিয়া পত্রপ্রেরককে ফিরিয়া দেন*। এইত গেল আধুনিক সভ্যতম জাতিদিগের প্রেততত্ত্ব। যদি এতদূর হয়, তবে হুতর্গা বঙ্গদেশে যে রোজাদিগের সময়ে সময়ে পশার হইবে তাহার আশ্চর্য্যতা কি? বিদেশীয়দিগের সকলই ভাল, এ কথা আমরা বলি না, বাঁহারা বলেন তাঁহাদিগেরই জন্য এই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইচ্ছা থাকিলে এই মত আরও কতশত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

প্রেততত্ত্ববাদীরা ক্ষমা করিবেন, সকলেই যে এইরূপ এ কথা আমরা বলিতেছি না। বিলাতে ও ইউনাইটেড-স্টেটেও এক সম্প্রদায় আছে, বাঁহাদিগের শিক্ষা ও অধ্যবসয়ে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ। পৃথিবীতে ভাল মন্দ উভয়ই একত্র মিলে। ভাল মন্দ না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যে হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ অক্ষয় যশঃ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্মের দোহাই দিয়া কতলোক পাপ সোপানে অবতরণ করিতেছে। যে তীর্থে ভক্ত পূজা করিতে যায়; সেই খানেই পাপের ছড়াছড়ি। দেবতা সান্নিধ্যে পাপ হয় না বলিয়া হুট ভক্তের নামে কালি দেয়। যেখানে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম, সেখানে এখন কি বলিতে লজ্জা করে।

* Indian Mirror—Saturday—2nd June. 1877—সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

কিন্তু যাহারা এই মন্দের জন্য ভালর নিন্দা করেন তাহারাও ভ্রান্ত । যাহারা তীর্থস্থানের পাপ দেখিয়া হিন্দুধর্মের নিন্দা করেন, বা আধুনিক গোঁড়া ব্রাহ্মদলের আচরণ দেখিয়া প্রকৃত ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে আমরা কি বলিয়া ডাকিব ? এই জন্যই প্রেততত্ত্ব-মধ্যে এত ভণ্ডামি দেখিয়াও সকলেই যে এইরূপ ভণ্ড তাহা আমরা বলিতেছি না । রবার্ট হেরার *, সারজর্জ. ফক্স, জে-ডেভিস প্রভৃতি মহাত্মারা যে সজ্ঞানে সাধারণকে বঞ্চনা করিবেন ইহা আমরা স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না ।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মূলমন্ত্র দেহশূন্য আত্মার সহিত কথোপকথন । এই তত্ত্ব-বিকারের প্রারম্ভেই ইউনাইটেডফোর্টে এক ভয়ানক আন্দোলন হয় । যখন মেসমার (Mesmer) সাহেব প্রথমতঃ ভৌতিক শক্তির দ্বারা মনুষ্যকে অজ্ঞান করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, সেই সময়ের আন্দোলনও প্রায় এইরূপ হইয়াছিল ; প্রথমে মেসমারকে কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল, কত পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু তাহার উদ্ভাবিত মত এখন পর্য্যন্তও সমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে † । প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন দেখ

আমাদিগের মত প্রথমে ইউনাইটেডফোর্টে উদ্ভাবিত হয় ; তখন লোকে শুনিতে হাসিত, পরিহাস করিত । এখন সেইমত বিলাতে ইন্ডেন্ট হইয়াছে । মাল সাতা না হইলে কি বিলাতে যায় * এক দিন মেসমেরিসমের মত আমাদিগের প্রেততত্ত্ব ও পুঞ্জিত হইবে ।

যখন কেহ কোন ঘটনা দেখিয়া তাহার ব্যাখ্যায় প্ররত হয়, তখন প্রধানতঃ দেখা উচিত ঘটনাটি সত্য কি না ? মৃত দার্শনিক হ্যামিলটন সাহেব † বলিয়াছেন যে, এক বার শিক্ষিতদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়াছিল । জীবিত মৎস্য অপেক্ষা মৃত মৎস্য ওজনে ভারী কেন ? এই প্রশ্ন লইয়া নানা মূর্খের নানা রূপ মত প্রকাশিত হইল । কিন্তু কোন উত্তরই সন্তোষজনক হইল না । শেষে একজন সাহেব ঘটনাটি সত্য কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন সর্বক্ষিণ্য । মেসমেরিসম যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন পণ্ডিত মণ্ডলী ঘটনা সত্য কিনা প্রথমতঃ পরীক্ষা সত্যর সভাপতি হইয়া মেসমেরিসম (Mesmerism) সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ দেন । বাস্তব ভয়ে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত হইল না । স্রষ্টব্য The Indian Daily News — 27th January-1877—Extracts.

* ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ইউনাইটেডফোর্টে হইতে প্রেততত্ত্ব বিলাতে যায় ।

† Lectures on metaphysics.

* Robert Hare M D. Professor of Chemistry in the University of Pennsylvania-

† সুবিখ্যাত ফক্স সাহেব একটি

আরম্ভ করেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ঘটনা সম্বন্ধে আর কোন সম্ভেদ হইতে পারে না; তখন নানা যুনির নানারূপ বাখ্যা প্রকাশ। পরিশেষে সুবিখ্যাত ব্রেড্ (Mr. Braid) সাহেবের বাখ্যাই ইহার মূলকারণ প্রকাশ করিয়া দেয়।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেকগুলি ঘটনা পরীক্ষিত হইয়াছে। কতকগুলি পরীক্ষার তীক্ষ্ণাত্মক সহ্য কবিত্তে পারে নাই। যেগুলি সহ্য করিয়াছে তাহার অনেকরূপ বাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেততত্ত্ববা-

দীদিগের বাখ্যা এই যে, সে সকল প্রেতের কার্য। আমরা অন্যান্য বাখ্যাগুলির সারবত্তা ভবিষ্যতে বিবেচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে ঘটনাগুলি পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। তাঁহারা দেখুন ঘটনাগুলি বাখ্যা করিবার উপযুক্ত, না কিপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা যাত্র। আমরা এপ্রবন্ধ শেষ করিলাম। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিব, তাহা এই উত্তম সম্প্রদায়কেই বুঝাইবে। প্রবন্ধকদিগের সহিত আমাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই।

জীম, লা, শেঠ।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। “ভারত গান। ভারতের প্রাচীন এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধীয় এবং স্বদেশানুরাগোদ্দীপক একশত গীত। জীরাঙ্করায় বিরচিত।”—এই গীতমালা একটি উপাদেয় বস্তু। ইহাতে যে সকল গীত নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রশংসার্হ;—রচনা প্রাঞ্জল, শব্দবিন্যাস মধুর এবং সমস্তই অক্লেশ-রচিত। কিন্তু হৃৎখের বিষয় এই যে, এই গীতগুলি অন্যান্য অংশে এইরূপ প্রশংসনীয় হইয়াও, উদ্দীপনার অভাবে প্রাণশূন্য হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি কোন অপরিচিতনামা নৃতন ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে আমরা একথা বলিতাম না। তাদৃশ স্থলে শুধু প্রশংসা ঘাই আমরা গ্রন্থকারের অভিবাদন করিতাম। কিন্তু আমাদিগের বহুদিনের পরি-

চিত স্মৃদ্ধ বাবু রাজকৃষ্ণ রায় যখন এই গ্রন্থের রচয়িতা, তখন ন্যায়ের অনুরোধে এবং বোধ হয় প্রণয়েরও অনুরোধে, তাঁহাকে ইহা জানান আবশ্যক যে, ভারত-গানের কোথাও প্রকৃত উদ্দীপনাব স্ফূর্তি নাই, এবং উদ্দীপনার অভাবে ইহার মাধুর্য্যো মদিরা নাই, ইহার বিলাপে বেদনা নাই, এবং ইহার ললিতপদাবলীতে প্রায় অধিকাংশস্থলেই কবিতার প্রকৃত প্রাণনাই।

বাগ্মী সকল সময়েই উদ্দীপনার উপাসক। কারণ যে বক্তৃতায় উদ্দীপনা নাই, তাহা যার পর নাই অতিমধুর হইলেও প্রাণের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কবি সকল সময়ে উদ্দীপনার উপাসনা করেন না। সাধারণতঃ, সৌন্দর্য্যই তাঁহার আরাধ্য বস্তু, এবং স্বকীয় চিত্রতু-

লিকায় সৌন্দর্য ফলাইতে পারিলেই তিনি
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন । কিন্তু
যে সময়ে কবি, কোন বিষয়ের বর্ণনা ক-
রিতে না যাওয়া, জাতীয়জন্মের নিকরোণে-
মুখ বলিকে পুনঃপুনঃ করিতে অভিলাষী
হন, তখন উদ্দীপনাই তাঁহার উপাস্য দে-
বতা । রাজকুমার বাবুর ভারতগানে উদ্দী-
পনার মোহময়ী মদিরা আছে কি না,
তাহা পাঠকবর্গ নিম্নোক্ত গীতগুলি নি-
বিকটচিত্তে পাঠ করিলেই অনুভব করিতে
সমর্থ হইবেন ।

আড়ানা-বাহার—রূপক ।

এখনো কি হেতু, শশী ! মুখভরা মুহু হাসি
নিরখি তোমার, বল, কি এর কারণ ?
সপ্ত সত বর্ষ আগে তুমি যে উজ্জ্বল রাগে
রঞ্জিতে ভারত-কায় আচ্ছো কি তেমন ?
কথাখাখ, মাথাখাও, চিরতরে কিরেবাও,
কাঁদিবার দিনেহাস, ছি ছি একেমন ?
কুমারেরা কিছু নয়, কলঙ্কের পরিচয়
এহাসে প্রকাশ হ'ল;—হেসনা এমন। ৬

সারঙ্গ—একতাল ।

হে দিবাকর ! সর সর সর,
জলদে লুকাও নিজ কলেবর,
দিবা দ্বিপ্রহরে ভারত কাতর,
অধীর পরাণ, আকুল কায় ;
একে আঁখি-বারি ঝর ঝর করে,
তাঁহে দেহে স্বেদ ঝরে তব করে,
বল দেখি, রবি ! ক্ষীণ কলেবরে
কেমনে ভারত বাঁচিবে, হায় !

কঠ শুকা'য়েছে দাক্ষণ পিয়ারে,
দেহ শুকা'য়েছে চিত্তার হুতালে,
হৃদি শুকা'য়েছে শোকের নিশ্বাসে,
আশা শুকা'য়েছে নিরাশা-বায় ;
এ হেন বিপদে—এ হেন দশায়,
কেন তুমি, তানু ! আকাশের গায় ?
সর সর সর ;—মর-মর-প্রায়

ভারত জননী কাতরে চায় । ১৬

ভৈরব—আড়চৌতাল ।

যা উড়ে পাখি রে ! ডেক না, ডেক না
ও মধুর বোলে তমালে ;
জাগিবে ভারত, জাগিবে হুত শোক,
ভাসিবে আঁখি জলজালে ।
হৃৎকের প্রভাতে সুখের সঙ্গীত
কেন তোর গল, বল, চালে ;—
এবে রে তোমার সুধার সুধার
বিষদার ভারত-ভালে । ১৭

রামকেলী—স্বথত্রিতালী (টিম্বা তেতাল) ।

অগ্নি কুলকুলরাগি মধুমুখি কমলিনি !
ফুটিয়ে হেস না আর সরসে রে সুহাসিনি !
তুমি যে সরসী-জলে হাসি'ছ বদন তুলে,
ও যে ভারতের অশ্রু, উথলে দিন যামিনী ।
মম অনুরোধে আঁজুক, কুল ! এই কাজ,—
হাসির বদলে কঁাদ, মুদিয়া নয়ন ;—
ভারতাত্মসরসীতে, তোমার সুধাশ্রু তা'তে
কেবল মিশ্রিতে থাক ;—কঁাদ খালি, রে
নলিনি ! ৪
এই শেষোক্ত গীত দুটি সুন্দর ও মূল্যবান

কবিতা। প্রথমোক্ত দুইটিও কাব্যার্থে নিতান্ত নিম্নমানের নহে। কিন্তু ইহার একটিতেও কি উদ্দীপনার লেশমাত্র অনুভূত হয়? উদ্দীপনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উহা ফুলের মধু নহে;—উদ্দীপনা মুষ্টিমতী তাড়িত-শক্তি, উহা আবেশময়ী জ্যোৎস্না নহে। যদি ভারতসংগীতেও সেই উদ্দীপনা পরিষ্কৃত না হইল, তবে উহা আর কিসে স্ফূর্তি লাভ করিবে? ভারতমাতার দুঃখ সমুদ্রের ন্যায় গভীর। সে গভীর দুঃখগীতি সমুদ্রের শোকোন্মত্ত তরঙ্গমালার ন্যায় গভীর নিঃশ্বাসে বিলাপ করিবে;—সমুদ্রতটবাহি নৈশসমীরণের ন্যায় অলৌকিক নিঃশ্বাসে রোদন করিতে রহিবে। নহিলে, তাহা ভারতগান নহে।

জাতীয় উদ্দীপনার এইরূপ সংগীত কোন দেশেই সকল সময়ে ফোটে না; বিরহের গীত, মানের গীত অথবা তরল দুঃখের তরল গীতের ন্যায়, সেই সকল অন্তর্ভেদি অপূর্ব গীত যখন তখন এবং যেখানে সেখানেই বাহির হয় না। কিন্তু তাদৃশ জাতীয় গীত, ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের মার্শেলিস নামক গীতের ন্যায়, মনুষ্য কণ্ঠ হইতে যখনই নিঃসৃত হয়, তখনই তাহা হৃদয়ের পর হৃদয়ে আহত ও প্রতি-হত হইয়া, এমনকি বহির্লিখার ন্যায় সর্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার প্রতি-পক্ষে প্রতি-হত হয়, তাহাকেই উদ্দীপিত করিয়া তুলে।

২। “কৃষিতত্ত্ব। মাসিক পত্রিকা।

পাইক পাড়া নর্শারি হইতে প্রকাশিত।” আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পত্রিকা খানির প্রথম সংখ্যা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা মাত্র পড়িয়াই আমরা নিরতিশয় প্রীতলাভ করিলাম। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত হওয়া কর্তব্য, এবং বঙ্গদেশের সর্বত্রই এইরূপ প্রয়োজনোপযোগী সাময়িক পত্রিকার আদর হওয়া উচিত।

৩। “তত্ত্বকোমুদী, পাক্ষিক পত্রিকা। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।” আমরা এই পত্রের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইহার বা-জালা এমনই বিশুদ্ধ ও মধুর, প্রাজ্ঞ ও প্রীতিপ্রদ যে, আমরা সাধারণ সাহিত্য সমাজের নিকট ইহার যশোগান না করিয়া নিরন্তর থাকিতে পারিলাম না। শু-নিয়াছি, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রি প্রভৃতি কতিপয় সুনিপুণ লেখকের সহিত এই পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়, তাহা হইলে দিন দিন ইহার অধিকতর উন্নতি হইবে। তা-দৃশ সুকচিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ব্যক্তির ই-হার সম্পাদকতায় নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম-বিষয়ক সাম্প্রদায়িক পত্রিকাও সুপাঠ্য হইতে পারে।

৪। “দৈব-লতা। ঢাকা, বৃ্তনযন্ত্রে মুদ্রিত”। এই গ্রন্থে চরিত্র, কর্তব্য, রাজ-ভক্তি, ত্যাগস্বীকার ও সহানুভূতি প্রভৃতি

বিবিধ বিষয়ের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ
নিবেশিত হইয়াছে। রচনা এইরূপ,—

“স্বরের আ এবং ময়েতে হৃদয় ইকারে মি,
এই কি আমি”?—“বিশ্বাস-যানে, চিন্তার
অতীত, বুদ্ধিরঅগ্রাহ্য, কল্পনার অগোচর
ব্যাপার ইহলোকে পরলোকে আত্যাগত্যা
করিতে লাগিল।”—পুনশ্চ, “সহানুভূতি
বিশ্বাসের স্বল্পে চড়িয়া লোক হইতে লোকা-
ন্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বিশ্বাসের
যান না চলিলে সহানুভূতিও চলে না।”—

গ্রন্থকারের মত ও উপদেশ এইরূপ,—

“এই যে আমরা ইংরেজগণবর্ণমণ্ডলের
শাসনাধীনে অবস্থান করিতেছি, ইহাই আ-
মাদিগের সার্বভৌমিক উন্নতির প্রচুর নি-
দান। এতৎপ্রভাবে যদি আমাদের অ-
ন্তরে রাজভক্তির কুসুমনা ফুটে, তবে আ-
মাদিগের কোন্ নরকে যে বসতি হইবে,
তাঁহা নরকাধিপই অবগত রহিয়াছেন।
আমরা যে এখনও তাঁহা জানি না, ইহাই
আমাদিগের তৃপ্তির হেতু।”

এইরূপ গ্রন্থ, গ্রন্থের এইরূপ রচনা এবং
রচনার এইরূপ ভাবাদি সম্বন্ধে সমালোচ-
কের অনেক কথা বক্তব্য থাকিতে পারে।
বক্তব্য কিছু না থাকুক, অন্ততঃ ‘আত্যাগত্যা’
প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি,—এবং গ্রন্থকার
কাহাকে নরকাধিপ বলেন, আর সেই নর-
কাধিপই বা কিরূপে ‘অবগত রহিয়াছেন’
ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ

লইবারও প্রয়াস জন্মিতে পারে। কিন্তু
পরিণামদর্শী সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার তাহারও পথ
রাখেন নাই। তিনি বিজ্ঞাপনে প্রথমেই
লিখিয়া রাখিয়াছেন যে,

“যে সমুদয় রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে, তাঁহা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া
গ্রন্থকার অনুভব করেন নাই। তাঁহার
দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, ঐশ্বরিক প্রক্রিয়া ভিন্ন
এমন রচনার উৎপত্তি হইতে পারিত না।”

এই কথাই উপর আর কথা নাই। ম-
হম্মদ যেমন কোরাণকে ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ার
রচনা বলিয়াছেন, গ্রন্থকারও যখন তাঁহার
এই গ্রন্থখানিকে সেইরূপ বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তখন কে এমন সাহসী, কে
এমন উদ্ধত, কে এমন ধর্মভয়শূন্য,—এবং
হায় ! কেই বা চক্ষুঃস্বর্ভে এইরূপ অন্ধ যে,
এবজুত অলৌকিক বল্লর সমালোচনা ক-
রিতে গিয়া আপনা হইতে বিপদে পড়িবে?
কিন্তু তথাপি এই একটিমাত্র কথা আমা-
দিগের বক্তব্য যে, গ্রন্থের নামটি সর্ব্বাং-
শেই সাহিত্যবিষয়ক সূচকির বিরুদ্ধ হই-
য়াছে। যাহারা লৌকিক সাহিত্য পড়িয়া
ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের বিবেচ-
নায় দৈবলতার পরিবর্তে ইহার নাম দি-
বালতা হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যদিও
দৈবশব্দের এক অর্থ ‘দেবতাসম্বন্ধীয়’—
কিন্তু ইহার আর এক অর্থ উৎপাত, এবং
হুত্যাগবশতঃ সেই অর্থই অধিকতর প্রচলিত।

অগ্নি।

ক্ষিত্যপুতেজমুকদব্যোম—অর্থাৎ মৃত্তিকা জল তেজ অগ্নি এবং আকাশ, এই কএকটি মূল বা অমিশ্র পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির পূর্বে এ মহা ভ্রম কেবল যে হিন্দুদিগের ছিল তাহা নহে। হিন্দুরা ব্রহ্মার পূজা করেন, পারশিকেরা ও তাহারই উপাশক, গ্রিক বা রোমকেরাও অগ্নির পূজা করিতেন। পূর্বের লোকের বিশ্বাস ছিল এই ভ্রমাত্মক পঞ্চভূত, ঈশ্বরের অবতার, এবং মূর্ত্তিমান দেবতা। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস বা ইহাদিগের প্রবল স্বাভাবিক শক্তির উপর লক্ষ করিয়া আধুনিক মানবগণের পূর্ব পুরুষগণ ইহাদিগের প্রতি মহা আস্থা করিতেন। আমাদিগের কথা দূরে থাকুক, পেরিপেট্রমিয়ন* দিগের স্বক্ষম বুদ্ধিতেও ইহারা আদিম, অবিনশ্বর অমিশ্র এবং মূল পদার্থ বলিয়া গণনীয় হইয়াছিল। এমন কি মিলটন পর্য্যন্তও ইহাদিগের মৌলিকত্ব এবং অমিশ্রত্ব স্বীকার করিতেন। পাঠকগণ ‘প্যারাডাইসলস্টের’ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩৪ শ্লোকটি পাঠ করিয়া দেখিবেন। *মেল সাহেবের অনুবাদিত, কোরাণের ২য় খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায়

* অরিফোটেল এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ।

লিখিত আছে—“অবিশ্বাসীরা জানেনা, যে পৃথিবী কেবল একটি পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, কঠিন পদার্থ সর্ব্ব ব্যাপ্ত অনন্ত জলরাশীর এক পার্শ্বে পড়িয়া ছিল, এবং সেই জল দ্বারা স্বাক্ষাদি ও ভূচর ক্ষেচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মজ্জা আমি করিয়াছি”—ফলতঃ এ মহাভ্রমের হস্ত হইতে মুসলমান দেবতা মহম্মদের ও নিষ্কৃতি ছিলনা। কিন্তু কালের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে ক্রমেই এসকল কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। জল যে গর্ক করিতেন আমি আদি, আমি অমিশ্র, অমর, এবং স্বাধীন, হাইড্রম্যান, এবং অকুসিযান ইহার জন্মদাতা বলিয়া আবিস্কৃত হওয়াতে সে গর্ক চূর্ণ হইয়াছে। বাহাইউক জল, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি মিশ্র না হইলেও প্রকৃতিভূত পদার্থ। বুঝিলাম, জল তবে পদার্থ, স্বীকার করিলাম মৃত্তিকাও তবে পদার্থ, এবং বায়ুও বটে, কিন্তু অগ্নি কি? অগ্নির রহস্য তেদ বহুকাল পর্য্যন্ত হয় নাই, আজিও এসম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত, তাহাতেই আমরা বলি অগ্নি তবে কি? যে অগ্নি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেও জল মৃত্তিকাদির ন্যায় একটি পদার্থ ছিল,—এখন নাকি আর তাহা মূল পদার্থই নয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, যে কোন প্রকারের অগ্নিই হউক না কেন, (স্বাভাবিক

কৃত্রিম, ঘর্ষিত, বা উত্তাপজ) উহা নিরতি-
শয় সূক্ষ্ম তরল, বিক্রমশীল, সদা-গতিবান্
অত্যন্ত প্রসারণক্ষম, অতীব স্থিতিস্থাপক,
পদার্থ মাত্রকেই সংকোচন বা বিস্তার ক-
রিবার ক্ষমতায়ুক্ত, সর্বশরীরে প্রবেশক্ষম,
এবং তাহাদিগকে রূপান্তর করিবার গুণ-
যুক্ত, ও তাহাদিগের যোগবিধানক্ষম,
এবং তাহার পর প্রদর্শিত সমস্তগুণপরি-
হার ক্ষম। বাহ্য বস্তু সমূহের সহিত অ-
গ্নির এই স্বভাবের নাম (Stahl) থা
সাংহেব (Phlogiston) নিত্যগ্নি রাখি-
য়াছেন, অপর পণ্ডিতেরা (Fixed fire)
বন্ধ অগ্নি কহেন। থা সাংহেবের মত
এই, মনে কর একখানী চক্ৰমকী পাথর
আছে উহাতে লৌহঘারা আঘাত করিলে
অগ্নি নির্গত হয়, ঐ অগ্নি কোথা হইতে
আসিল, যদি বল, আঘাতে পরমাণুর সং-
ঘাত হইয়াছে তাহাতেই তেজকণার উৎ-
পত্তি হইয়াছে। থা সাংহেব বলিবেন তবে
স্বীকার করিতে হইবে চক্ৰমকী জ্বলনীয় প-
দার্থ, তবে যে উহা জ্বলিয়া উঠে না, ইহার
কারণ কি? সুতরাং উহা গোণ অগ্নি, অ-
র্থাৎ উহার পরমাণুসমূহ অগ্নিপূরিত।
থা সাংহেবের সমকালে এক দলে বলি-
ভেন, উহা অগ্নির পরমাণু এবং এক প্র-
কার কাঁচ জাতীয় মৃত্তিকায় সংগঠিত, অ-
পর দল বলিভেন উহা শুদ্ধ অগ্নির অণুতে
নির্মিত। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন যে
উহা অগ্নি উৎপাদন করিবার আপেক্ষিক
কারণ,—পরমাণুতে পরমাণুতে সংঘাত

লাগিয়া ভয়ানক বেগে যখন সেই সমস্ত
পরমাণুর গতি হয়, সেই গতিজনিত উত্তা-
পই অগ্নি। যতক্ষণ পরমাণুগণ স্থির না
হইবে ততক্ষণ তাহার কার্য প্রকাশ হইতে
থাকিবে, সুতরাং যে পরিমাণ আঘাতে
চক্ৰমকী হইতে অগ্নি নির্গত হয়, উহাতে
উহার সমস্ত পরমাণুর তুমুল গতি হয় না।
ঐ চক্ৰমকীর একদেশে কর্ম যতটুকু হয়,
ক্রিয়া ততটুকু প্রমাণে প্রকাশ পায়। অগ্নি
বা অধিক পরিমাণে সকল বস্তুতেই জ্বলন
কার্য প্রকাশমান হইয়া থাকে। উহা
তদ্ বস্তুর রাসায়নিক সংযোগের টেল-
ক্ষণ্য প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে।

. বাহা হউক, থা সাংহেবের (Phlogis-
tion) কি তাহাই আমরা বুঝাইবার চেষ্টা
করিব। সকল বস্তুরই অধিক কি অগ্নি প-
রিমাণ অগ্নি উৎপাদন বা অগ্নি ধারণ ক-
রিবার স্বভাব আছে বস্তুর যে গুণ থা-
কাতে ঐরূপ হয় তাহারই নাম (Phlogis-
tion) বাঙ্গলায় জ্বলনীয় কিম্বা রাসা-
য়নিক রস বলিলেও উহার প্রকৃত অর্থ বোধ
হয় না। বাহা হউক উহাকে আরো ভাল
করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তীক্ষ্ণ-
ধার তরল (Fluid) ব্যতীত কিছুই
গলিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে
অগ্নি অপেক্ষায় অবকারী আর কিছুই
নাই। অতএব অগ্নিই অব-বীজ, বা অব-
জীবন। জল যে অবগুণসম্পন্ন, এবং
অন্যকেও অব করিতে পারে তাহাও কে-
বল মাত্র অগ্নি হইতে। অগ্নি ক্রিয়ার ঐ

রূপ ফল যাহাতে স্থিতি করে তাহাই Phlogiston বস্তু অগ্নি। পারদ স্বর্ণের সহিত মিলিতে, জল লবণকে গুলিতে যাহা, অবশ্যে জ্বলনশীল করিবার জন্য তা সাহেবের Phlogiston ও তাহাই। ইহার কার্য গন্ধক, তৈল, এবং পাথরিয়। কয়লাতে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, নুতরাং উহারাই পঁ। সাহেবের মতে অগ্নি-ধারণক। তবেই তাহার মতে, অগ্নি স্থায়ী, নিত্য, এবং পদার্থহীনবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(Boerhave) বোয়েরহেভে সাহেব অগ্নির দুইপ্রকার প্রকার-ভেদ করেন। একটি মূল অগ্নি, অর্থাৎ শুদ্ধ অগ্নি, এবং অনপেক্ষিক, অপরটি আপেক্ষিক, অর্থাৎ অন্য বস্তুর যোগে কার্য প্রকাশ করে। তাহার মতে উত্তাপের মুখ্য কারণই মূল অগ্নি। উত্তাপ অগ্নি হইতে বিভেদ্য নহে। উত্তাপের পরিমাণ, অগ্নির পরিমাণ বিশেষ। যাহা অগ্নি তাহাই উত্তাপ। কঠিন বস্তুর অনুপ্রসারণ, এবং জ্বল বস্তুর অনুসংকোচন, ক্রিয়া মূল অগ্নির দ্বিতীয় ফল। একখানি লৌহ উত্তপ্ত হইলে, ইহার বিস্তৃতি বর্দ্ধিত হয়, এবং উত্তাপ অধিকপরিমাণে দিলে পুনরায় আরো বর্দ্ধিত হয়, আবার স্ফীত হইলে, সংকুচিত হয়। এবং পূর্বে যত বড় ছিল তাহাই হয়। স্বর্ণকে গলাইলে পূর্বে হইতে অধিক স্থান গ্রহণ করে। একটি স্ক নলের ভিতরে পারদ রাখিয়া উত্তাপ দিলে, পূর্বে যতটুকু

স্থান লইয়া ছিল, তাহার ত্রিশত গুণ অধিক উচ্চে উঠিবে।

বস্তুর এরূপ বিস্তৃতির কারণ বোয়েরহেভে সাহেবই আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ যথা। জ্বল জ্বা যতটুকু সময়ে, যে পরিমাণ অগ্নিতে যত অধিক বিস্তৃতি লাভ করিবে, কঠিন জ্বা, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ে, এবং সেই পরিমাণ অগ্নিতে সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের অন্যথা হইলে তাপমাপক যন্ত্র কার্যকারী হইতে পারিত না, কেননা, তাহা হইলে যে সময়ে এবং যে উত্তাপে পারদ বিস্তৃতি লাভ করিত, নলের অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্র ও তবে ঠিক ঐ সময়ে এবং ঐ উত্তাপে আপনি বিস্তৃত হইত। দ্বিতীয়তঃ। জ্বল জ্বা যত লঘু হইবে, অগ্নি তাপে উহার তত বিস্তার হইবে। তিনি বলেন, বায়ুর ন্যায় লঘু বস্তু বিয়ল, অথচ উহার ন্যায় আর কোন জ্বা অধিক ছড়াইয়া পড়েনা। বায়ুর পরেই ঐ গুণ সুরাসার বা স্পিরিট অব ওয়াইনের অধিক। তিনি আরো বলেন, প্রকৃতিতে যত প্রকার শক্তি এবং গতির উৎপত্তি হয়, অগ্নিই তাহার কারণ। তাহা হইতে অগ্নিকে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে সমস্ত যত পদার্থ অচল হইয়া পড়িয়া থাকিত। এবং অগ্নির অভাবে, জল, তৈল, সুরাসার জীব-দেহ, উদ্ভিদ সমস্তই কঠিন, জীবনহীন এবং অকর্মণ্য হইয়া যাইত। যদি অসাধারণ শীতপ্রবাহে, জগতের সমস্ত অগ্নি, বিনাশ হইয়া যায় তাহা হইলে, এই জড়-

জগৎ স্বর্ণ ও হিরকের ন্যায় মহা কাঠিন্য-ময় একটি স্তপাকার বস্তু হইয়া পড়িয়া থাকিবে । এবং অগ্নিপ্রয়োগে পুনরায় উহা প্রকৃতিস্থ হইবে ।

বোয়েরহেভের কথিত, মূল্যম্নি সং-রক্ষণ বা গ্রহণ করিতে হইলে, সে আঙনের আহার বা বায়ু যোগাইতে হয় না । যদি কিয়ৎপরিমাণ কোন মৌগন্ধিক তৈলসার, শূন্য হইতে যবক্ষারিক স্তরায় ঢালা যায়, তৎক্ষণাৎ (উহা) হইতে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে । তিনি বলেন কতক গুলিন উপায়ে মূল অগ্নির ফল জানা যাইতে পারে । যথা নকলেই জানে, চকুমকী ও লৌহের ঘর্ষণে, অগ্নি উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ এক দ্রব্যে অন্য দ্রব্য কর্তৃক বিষম সং-ঘাত পাইলেই তাহা হইতে অগ্নি উঠিবে, এই জন্য হুঙ্ক টানিলে নবনীত তাহা হইতে স্রবজ হয় । ছুরি কি ক্ষুর সানাইবার সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়,—এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অগ্নি মৌলিক পদার্থ । নতুবা বাহ্যতে অগ্নি ছিল না তাহা হইতে অগ্নি কখনই জাত হইবার সম্ভাবনা নহে ।

যদি অত্যন্ত শীতের দিনে একখানি স্বর্ণখালী আর একখানি স্বর্ণখালীর সহিত বলপূর্বক ঘর্ষণ করা যায়, তবে ঘর্ষণে ঘর্ষণে মহাউত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ এবং পরে গলিবার উপক্রম হইলেও কিঞ্চিৎমাত্রায় ও তাহার গুরুত্বের স্বংশ হইবে না, কেবল আয়তনে হ্রাস হইবে, বা স্ফীত হইবে, ই-

হাতে এই উপলব্ধি হয় যে, সংঘর্ষণে স্বর্ণের একটিমাত্র অণুও অগ্নিরূপে পরিণত বা পরিবর্তিত হয় না ।—কেন না অগ্নি উহাতে পূর্ব হইতেই আছে । ঘর্ষণ মর্দনের ফলে এইমাত্র হয় যে, বাহ্য পূর্ব হইতে স্থিতি করিতেছে তাহারই কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে বা আনিতে পারা যায়, উহার ফল এরূপ নহে যে, উহা হইতে অগ্নি জন্মাইতে বা করিতে পারা যায় । তবে, আমরা এই পরীক্ষা করি যে অপ্রজ্বলিতকে জ্বালিত করি, এবং বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন সঙ্কীর্ণস্থানে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য স্থাপন করি ।

এতদ্বাতিত বোয়েরহেভে সাহেব আরো বলেন যে, যেরূপ নিত্যাগ্নি অনন্তকাল হইতে অহরহ সর্বদ্রব্যে দ্রব্যে স্থিতি করিতেছে উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও তদনুরূপ অবস্থায় বিরাজিত আছে । তিনি বলেন ৪০ বা ৫০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নদেশে এত উষ্ণ যে তথায় বরফ থাকিতে পারে না, তাহা হইতে আরো গভীরতর প্রদেশে এতাদিক উষ্ণ যে তথায় ক্ষণকালও তিস্তিতে পারা যায় না । মৃত্তিকার গভীরতম প্রদেশের এই উষ্ণ ভাব দৃষ্টে তিনি বলেন, যে ভূগর্ভে আর একটি অগ্নির আকর বা সূর্য্য আছে । তাহাতেই, বাহ্যারা ভূগর্ভে বাপৃষ্ঠে জগ্রে তাহাদের জীবন রক্ষা এবং গতি বিধান করিতেছে এমন কি ভূকেন্দ্রে কেবল অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই নাই । এবং এই মহা অনল, অনন্ত কাল

হইতে বিরাজ করিতেছে। তিনি ইহাও বলেন, ভূচর, খেচর, জলচর, প্রভৃতির ন্যায় অগ্নিচর জীব পর্য্যাপ্ত আছে। বহুকাল পোষিত রহৎ অনল কুণ্ড, অত্যাৎকৃষ্ট আতশ পাথর দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই সকল জীব দেখা যায়, এই সকল অনলবাসী জীবের নাম (Salamander) সালামাণ্ডর। এখন দেখা যাইবে বোঁদ্রহেতে সাহেবের যুক্তি নিয়ম কতদূর সুসঙ্গত।

তাহার পরবর্তী রসায়ণবিদেরা আগ্নেয় কার্যের চারিটি তাপাংশ পরিমাপ করিয়াছেন। প্রথমটি মানবশরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতার তুল্য, বা যে পরিমাণ উষ্ণতা কপোত ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়। ডিম্বের সহিত একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র রাখিয়া তত্পরি একটি কপোতিনীকে বসাইয়া এই তাপাংশ পরিমিত হইয়াছে। কোন কোন রাসায়নিক আবার এই পরিমাণ উত্তপ্ত দায়ক আগুন, কপোতিনীর পরিবর্তে ডিম্বের চতুর্দিকে রাখিয়া তদ্বারা ডিম্ব ফুটাইয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় স্বর্ষ্য কীরণ শরীরে লাগিলে জ্বালা করে, বা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্ম্ম বেদনা হয়, অথবা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্ম্ম ফোঁসা পড়ে, কিন্তু তদ্বারা শরীরের কোন অংশের স্ব্ৰ্ণ বা অভাব হয় না, ইহাই তাপের দ্বিতীয় পরিমাণ। এই পরিমাণ তাপেই মনুষ্যরক্তে লেগ্নবৎ এক পদার্থ (Serum) জন্মে এবং ডিম্বের—ঐবীভূত ধ্বলাংশ কর্ত্তন হয়, সময়ে সময়ে এই পরিমাণ উ-

ত্তাপেই আবার ভয়ানক গাত্র দাহ হইতে পারে, ইহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে পরিমাণ উত্তাপে জল অতিশয় গরম হয়, ইহাই উত্তাপের তৃতীয় পরিমাণ। তাহার বিবেচনা করেন উত্তাপের এই পরিমাণই সম্পূর্ণ অটল। কেন না, জল যত উত্তাপ সহিতে পারে অর্থাৎ পূর্ণমাত্রার উত্তাপে উষ্ম করিলে (পাত্রেয় মুখ খুলিয়া বাষ্প উঠিতে দিলেও) যে পরিমাণ তাহার উত্তাপ রক্ষি হইবে, আর হাজার কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে, কি আরো উত্তাপ দিলে কিছুতেই তাহার পরিমাণ রক্ষি হইতে পারে না। এই সকল প্রাচীন রাসায়নিক বোধ হয় জানিতেন না যে, সমুদ্র সমতল স্থানের উষ্ণ জলের উত্তাপ, বাঙ্গা গিরির উপরিভাগের উত্তপ্ত জলের উত্তাপ হইতে হ্রাসতর। আর পেপিন* সাহেব উত্তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার যুক্তিনিচয় ও সম্ভবতঃ সিদ্ধি বা পরীক্ষিত নহে। যে উত্তাপে ধাতু বা অন্য কোন দ্রব্যকে ধ্বংশ বা ঐবীভূত করিতে পারে, তাহা উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ।

উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ যে কিরূপে নিরূপিত হইল বুঝিতে পারা যায় না। তাপপরিমাপক যন্ত্র ও বোধ হয়, এত প্রচণ্ড উত্তাপে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সময়ে এই সকল মত প্রচলিত হয় বোধ

* প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে এই ভয়ে উক্ত ভ্রমাত্মক মত অপ্রকাশিত রহিল।

হয় এঞ্জউডের অনলপরিমাপক যন্ত্রের (Wedge wood's Pyrometer) সজ্জন, বা সেবিষয়ের চিন্তা কাহারও মনে উদয় হয় নাই, ইহাতেই অনুমিত হইতে পারে যে উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ কেবল মাত্র অনুমান এবং ধাতুর প্রবৃত্তাবস্থা দেখিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উষ্ণ জলের উত্তাপ যেমন রুদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু প্রবীভূত ধাতুর উত্তাপ-পরিমাণ জানিবার যদি তাহাদিগের কোন উপায় ছিল না তবে ইহা তাঁহার কিরূপে জানিলেন?—যাহাহউক প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ মণ্ডলীর মতে উত্তাপের এই শেষ পরিমাণ। কিন্তু তাহার পরবর্তী বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞসম্প্রদায়, আর একটি পরিমাণ রুদ্ধ করিয়া, উত্তাপের পঞ্চম পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। এই উত্তাপে, স্বর্ণ হইতে ধূম এবং বাষ্প নির্গত করায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মন্সুর সিরাজহোসেন (M. Tschirnhausen) প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্বর্ণ উত্তাপে একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে। তাহার পর এই অগ্নিময় দৃশ্য, তাপক (Caloric) নামে এক সূক্ষ্ম দ্রব্য লীলা করিতে থাকে। সিরাজহোসেনের পরে তাপকই অগ্নিজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্ণীত হয়। যাহাতে, উত্তাপের অনুভূতি প্রকাশমান করে, তাহারই নাম “তাপক” রাখা হইয়াছিল। এই তাপকই বরফকে গলিত করে, জল উত্তপ্ত করে এবং লৌহকে রক্তোত্তপ্ত করিয়া

তুলে। তবে এই উত্তাপক কি? ইহাকে কি তবে পদার্থ বলিব, না কি বলিব? উত্তাপসম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে তন্মধ্যে কেবল দুইটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণ্য বলিয়া, অদ্যাপি মানবের বিশ্বাসক্ষেত্রে সম্ভব রহিয়াছে। একটি (Theory of Emission) উৎক্ষেপণ অনুমান, দ্বিতীয়টি (Theory of Undulation) গুণিতরঙ্গ অনুমান।

প্রথম অনুমান। উত্তাপের কারণ ভূতাত্ত্বিক, বায়ুর ন্যায় বা বায়ু হইতে উহা সূক্ষ্ম তরল এক শরীর হইতে শরীরান্তরে গমনক্ষম, এবং উহার পরিমাণ নিচয় অবিশ্রান্ত অস্বাক্ষর্য্যবস্থাপন্ন। (In a state of repulsion). এই সূক্ষ্ম ধার তরল, সকল দ্রব্যেরই মূল পরিমাণের সহিত বাস করে, অথচ কাহারও সহিত প্রকৃতরূপে সংযুক্ত হয় না। এই হিসাবে উত্তাপক নামক যে সূক্ষ্ম ধার তরল, তাহা বস্তু, কিন্তু ভৌতিক উত্তাপক প্রমাণতঃ দিন দিন জীর্ণাবস্থা পাইতেছে। তাপকের পরিমাণ বা মূর্তি পরিমাপনীয় নহে। এমন মহা সূক্ষ্ম কোন যন্ত্র অদ্যাপি মানববুদ্ধিতে প্রস্তুত হয় নাই যাহাতে উহার পরিমাণ করা যাইতে পারে বা উহার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। আমাদিগের ক্ষমতায় যখন উহার পরিমাণ করিবার সাধ্য নাই তখন আমাদিগের ইহাও বলা উচিত নহে, যে উহার গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন অনেকই বলেন যে মূলেই উহার গুরুত্ব নাস্তি।

গতি-তরঙ্গ, বা দ্বিতীয় অনুমান এই যে—পদার্থের পরমাণুর উত্তাল তরঙ্গাতিঘাতে,—উত্তাপ উপস্থিত করে। সে তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া, অত্যন্ত লঘু, এবং স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট একটি তরল পদার্থের সাহায্যে অন্য বস্তুর পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাকেই ইথর (Ether)* বলে। যেরূপ বায়ু মণ্ডলে শব্দতরঙ্গ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ইথর মণ্ডলে পরমাণু তরঙ্গোৎপাদিত উত্তাপও মৃত্যু করিয়া বেড়ায়। যে ত্রবোর পরমাণুতরঙ্গ তবে যত বিস্তারময় এবং যত দ্রুতবেগবিশিষ্ট, সেই বস্তুর শরীর তত অধিক উত্তাপযুক্ত হয়। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি কেবল পরমাণুতরঙ্গের গতির অনুপাতানুসারেই হইয়া থাকে, আর কিছুই নহে। প্রথম অনুমান মতে, উত্তাপক জড় পদার্থকে পরিত্যাগ করিলেই তাহার স্নিগ্ধত সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় অনুমানসিদ্ধ ফল তাহা নহে। পরমাণুগণ তরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত মুক্তি ধারণ করিলেই তত্তৎ শরীরের দেহ শীতল হয়। এই দ্বিতীয় অনুমানে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শব্দের ন্যায়, অগ্নিও বস্তুজ সম্পন্ন নহে। কেবল বায়বীয় তরঙ্গাতিঘাতের অনুভূতি বা দমক মাত্র। ‘শব্দ’ ও গতি ব্যতীত কিছু নহে। যদিও প্রাচীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রে * শব্দ এবং গতির মূল নির্দিষ্ট

* এদেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন কথা অগ্নি অবগত নহি। লেখক।

নাই—তথাপি ‘শব্দ’ গতি (Motion) মাত্র বলিয়া অনুমিত হওয়া সর্বথাই যুক্তি সঙ্গত। অতএব সম্বন্ধে যিনি ক্রিষ্ট অ-ভিনিবেশ প্রদান করিবেন—উহার উৎপত্তি যে কেবল সাধারণ গতি হইতে, তাহারই মনে এরূপ একটি ভাব উপলব্ধি হইবে। যদিও শব্দ কেবল মাত্র গতি তথাপি আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—শব্দ যাইতেছে, শব্দ উদ্ভূত হইতেছে। উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ইহারা যে কেবল গতি মাত্র এবং বস্তু নহে তাহা কাহারও মনে ধারণা করাইবার জন্য এখন বোধ হয় আর আমাদেরকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

গতিতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মতে অগ্নি বস্তু নহে, কার্য্য, পরিবর্তন, বা গতি। ইহা কি ভৌতিক পদার্থ, কি রাসায়নিক পদার্থ, কি রূহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি ভার, কি লঘু, কি তরল, কি ত্রয়, কিছুই নহে। ইহার সংস্পর্শে ইথর (Ether) অনুতরঙ্গমালা হইতে উত্তাপকে বহন করিয়া তাহার সমষ্টিতে অনল রচনা করে।

অগ্নি বলিতে গেলেই একবারে অতাবের কতগুলিন প্রকৃতিকে বুঝায়—যথা—উত্তাপ, রূপান্তরক্রিয়া, বিস্তারক্রিয়া, এবং বাষ্পীকরণ প্রভৃতি। কাহারও মতানুসারে ইহা (Caloric) উত্তাপকের কার্য্য। এবং কাহারও মতে—কেবল পরমাণুর তরঙ্গে বা গতিতে এরূপ হইয়া

থাকে। দহনশীল পদার্থের দহন ক্রিয়াকেই অগ্নি বলিতে হইবে। যাহাতে ইথর সংমিশ্রিত অক্সিজেন (অক্সিজেন) কিছু অধিক পরিমাণে থাকে, বা কৌশলে কোনও বস্তুকে উক্ত ধর্মাক্রান্ত করা যায় তাহাই দহনশীল পদার্থ।—তাই বলিয়া যে ঐ বস্তু বায়ুর মধ্যে রাখিয়া দিলে যে আপনি জ্বলিয়া উঠিবে তাহা নহে। যাহাতে এমন গুণ আছে যে অল্প বা অধিক গৌণে ইহার পরিপুষ্ট অক্সিজেন বায়ু শোষণ করিতে পারে, বা উহার ক্ষতি কিম্বা প্রজ্বলন ক্রিয়ার অভাব ঘটাইতে পারে, তাহাও এক প্রকার দাহ্য। এমন বস্তু কি সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না বাহার প্রচণ্ড উত্তাপ আছে, অথচ তাহা ধীরেই এমন ভাবে জ্বলে যে তাহাতে শিখা, বা অন্য কোনরূপ জ্বলন ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবল মাত্র তাহার শারীরিক দহনীয় বস্তু টুকু নিঃশেষিত হইয়া যায়? তাহাতে অগ্নিশিখার অনুপস্থিতি স্বত্বেও তাহা সামান্য দহনশীল পদার্থ নহে।

এরূপ স্তিমিত দহন ক্রিয়া সমস্ত উষ্ণ রক্তসম্পন্ন জীব জন্তু শরীরেও হইতেছে। অনাহারে জীবদেহের উত্তাপকে ক্ষীণতর করে, এবং তাহার দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও, যত দিন দেহের দাহ্য পদার্থ নিঃশেষিত না হয়, ততদিন পুড়িতে থাকে, যখন দাহ্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় তখনই জীবদেহ ভগ্নর শীতলভাব ধারণ করে তাহাই তাহার মৃত্যু। জীবদেহের

শক্তি ও কেবল, অঙ্গারক (Carbon) এবং উদজান, (Hydrogen) তাহাদের, আহারীয় দ্রব্যে প্রচুর থাকে বলিয়া ক্রিমার কল্লাব্যতীত যেরূপ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে, ঘোটকেরও, ঘাস এবং যব বা বুটের অভাবে তদবস্থাপন্ন হইতে হয়। এবং দস্তা না থাকিলে বোল্‌তাইক * যন্ত্রেরও শক্তি লোপ হয়।—কোনই রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যেখানে ধাতু দ্রব্যাদি গলান যায়, সেখানে ১০ হইতে ২০ গুণ পর্যন্ত কাঠ দাহন করিয়া ঐ স্থান জীবদেহের তুল্য উত্তপ্ত হয়। মেচুসী (Mathuici) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বোল্‌তাইক যন্ত্রে দস্তার অভাবেও তৎক্ষণাৎ একটি ভেক মারিয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রসায়নিক কার্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে। (ভেক জীবিত থাকিলে কার্য আরো অধিক পরিমাণে প্রকাশমান করা যাইতে পারে) যাহাইউক ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দহনক্রিয়া হইতেছে অথচ অনেক সময় আমরা বস্তুর বাহ্য অবয়ব দেখিয়া বুঝিতে পারি না। দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, যে রসায়ন প্রভাবে কেমন আশ্চর্য্য আলো বিকিষ্ট হইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করে অথচ ঐ রসায়নিক অনল প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ পদার্থ

* (Volta) বোল্‌তা সাহেব যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করেন তাহারই নাম বোলতাইক ব্যটারী।

দহন করে না ইহা কেবলমাত্র রাসায়নিক যোগের এবং দাহ্যের সহিত অস্বাভাবিক বা-স্থুর (অক্সিজনের) সামীপ্যাকর্ষণে-পাদিত ফল।

অগ্নি বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, সুতরাং আকর্ষণ বা শক্তি ইহার মূল কারণ। আমরা সচরাচর মাধ্যাকর্ষণেরই কার্য স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারি, ইহা ব্যতীত অন্যান্য আকর্ষণশক্তির প্রভাব তত স্পষ্ট অনুভূত হয় না। বৈদ্যুতিক সাধন, রসায়ন উদ্ভাবন, এবং পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা মাত্র বুঝা যায়।

তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক, রাসায়নিক সংযোগ, এবং গতি ইহারাই নৈসর্গিক শক্তি বলিয়া স্বীকার্য। সুতরাং অগ্নি এই সমস্ত শক্তির অন্যতরের পরিষ্কৃষ্ট ক্রিয়া মাত্র। পণ্ডিতগণ আরও বলেন, যে এই সকল শক্তির যে কেবল বিশেষ পারস্পারিক সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, ইহার সকলেই এক সূত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং ইহাও অনুমিত হইয়াছে যে ইহাদের যে কোন একটি আপনায় সম-শক্তি আর একটি শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। বিদ্যুতে, রসায়ন যোগ, চুম্বকের শক্তি, উত্তাপ বা গতি, উৎপাদন করিতে পারে। আবার গতিতেও উত্তাপ জন্মাইতে পারে। যথা ঘর্ষণে, সকেটচক্রে আ-গুন লাগিতে পারে, পাথরে ক্ষুর সানাইলে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়; কলের সহায়-তায় বা একটুকরা চান্দরূষ কোটের (ধা-

তুময়) বোতামের সহিত ঘর্ষণ করিলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার আলোকে বিদ্যুৎ, গতি, এবং শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এবং উত্তাপেও যথাক্রমে আলো, বিদ্যুৎ এবং গতির উৎপাদন করিতে পারে। নৈসর্গিক শক্তি পরিবর্তন সহ-কারে যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, বীজ-গণিতের পরিবর্তন এবং যোগসাধন-প্রক্রিয়াতে (The Law of permutation and combination) তাহার সীমা নির্ধা-চিত হইতে পারে। আপাততঃ প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে আমরা তাহার প্রক্রিয়া প্র-দর্শন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পত্র ব্যতীত, উহা সাহিত্যিক পত্রিকার উপযুক্তও নহে।

এইক্ষণ আবার বলিতেছি অগ্নি কি ? উত্তর। উহা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের একটি প্রকাশমান ক্রিয়া মাত্র। উত্তাপের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেই, ঐ উত্তাপের শক্তিও বৃদ্ধি হয়, অবশেষে এই মহাশক্তি হইতে শিখা এবং ধূম উদ্গীরিত হইতে থাকে।

আমরা শক্তির কারণ ব্যাখ্যা করি-লাম না বলিয়া যদি পাঠকগণ, এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইলেন, তথাপি অন্ততঃ তীক্ষ্ণ দি-গের এইটি ধারণা হইবে যে, বস্তু গুণ স-ম্পন্ন, নিত্যমি, ও তাপক প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমসঙ্কুল।

আমরা যাহা জানি বা দেখি সমস্তই আকর্ষণোৎপাদিত শক্তির ফল,—কিন্তু

আমরা শক্তি দেখি না। আমরা কেবল,
গতি এবং গতিজনিত কার্য দেখি। আ-
মরা কোন বস্তুর কোন বিশেষ পরিবর্তন
বা রূপান্তরিত অবস্থা জানিতে পারি—

এবং তাহারই একটি পরিবর্তন বা রূপান্তর-
শীলতার নাম সাধারণ উত্থাপ। সেই
উত্থাপের প্রকৃত স্বরূপ অদ্যাপি অপ্রকা-
শিত আছে—।

* মহামায়ার চিত্রপট ।

সুরভি পবন-রথে ধীরে ধীরে
করি আরোহণ,
উত্তরিল ব্রহ্মপুরে আরতির প্রতিধ্বনি
মধুর নিকর।
ভারতীর আসন বেড়িয়া,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
অমিতে লাগিল পার্থিব শব্দ
সেন পথ হারাইয়া।
কম্পনা সুন্দরী
আপনার করণস্থ ছুটি
ধীরে ধীরে একত্রিত করি, কহিল,
“ বৎসরাস্ত্রে পুনঃ, দেবি, ভারতে তোমার
ভারত বাসীরা স্মরিল। ”
ভারতীর ইন্দ্রবর আঁধি দুটি
ঈষদ ফুটিল ;
অতুল অপরপ্রাস্তে, উষার রেখার ন্যায়
হাসি প্রকাশিল।
ইন্দ্রধনুঃ যিনি বরণ
অমনি স্যামন,
বকে তুলি সে শুভ প্রতিমা খানি
অনন্ত শূন্যে ছুটিল তখন।

জ্যোতিহীন তারা ;
অত্র অঙ্গে বহিল গলিত স্বর্ণের শতধারা,
সুন্দর ;
মুহূর্তে নামিল রথ শ্যামলবসনা
চাক বজ্রের উপর।
অমনি চৌদিকে কিরণ ছুটিল,
সংগীততরঙ্গে দিগন্ত ডুবিল,
স্বর্গীয় সৌরভে ভুবন ভরিল,
আহা কি আনন্দ আজ !
বহুদিন পরে অশ্রু-জল মুছি
পরেছে বঙ্গ মোহন সাজ !
সাজিল বঙ্গ কি সুন্দর সাজে !
মরি কি মধুর আরতি বাজে !
উচ্ছে বাজিছে ঝাঁঝর শঙ্খ,
টিগ্ টিগ্ টিগ্ ঘনটা বোলে,
আহা মরি যেন মায়ের অঙ্কে
নিদ্রিত শিশুর নুপুর দোলে !
আহা কি আনন্দ আজ !
তাজিয়া জীর্ণ মলিন বসন
পরেছে বঙ্গ কুসুমসাজ !

* ময়মনসিং সারস্বত উৎসব উপলক্ষে লিখিত।

বাছিয়া বাছিয়া অঞ্জলী ভরিয়া
চন্দনচর্চিত কুসুম লইয়া,
ভক্তিরসে গ'লে, ঢালিছে সকলে,
ভারতীর চাকু চরণ কমলে !
ঘরে ঘরে যেন জ্যোৎস্নাবসনা, শান্তি
সুধাময়ী করিছে বিরাজ !
আহা কি আনন্দ আজ !

মহামায়া মায়া কল্পনারে
করিয়া সহায়,
মুহূর্তে সে রঙ্গভূমি অপরূপ
করিয়া সাজায় !
পদ্মের আঁকারে
পদ্ম পুষ্পে গড়ে
পরিষ্কার করি সুন্দর আঁসন,
লতা পাতা দিয়ে
সুন্দর করিয়ে
গড়ে স্তম্ভাবলী নয়নরঞ্জন ।
তরুপরি নীল অপরাজিতায়
শারদ নিশার আঁকাশের প্রায়
চাকু চন্দ্রোতপ খুলাইল ;
মধ্যে মধ্যে তার গুচ্ছ গুচ্ছ বেলি
নন্দনের ন্যায় বসাইল ।
লইয়া গোলাপি গোলাপের কলি
তার চারি ধারে, সারি সারি,
বসাইয়া ফুটন্ত চামেলী
খুলা'ল ঝালর তায় ;
নন্দন কুসুমে নয়নাভিরাম
শোভিলা মুহূর্তে বাণী
মায়ায় মায়ায় !

ওই শুন শুন ! কে গাইছে গান ।
তস্ত্রে তস্ত্রে নাচে তান লয় মান !
ছয় রাগ সহ ছত্রিশ রাগিনী
আহা কি সুন্দর মিলিল রে !
জড়া মৃত্যু পাপ জঞ্জাল জড়িত
ভব মঞ্চভূমে কেরে আঁচড়িত,
এহেন সুধার সংগীতলহরী
জুড়াইতে প্রাণ উঠাল—রে !

তেজস্বী মুরতি, যেন ত্রিষাঙ্গুতি
মহাশ্মি আসি প্রণাম করিলা,
দেবতাবাহিত পাদপদ্ম দু'টি
ধীরে মাতা তার শিরে ছোঁয়াইলা ।
মহর্ষির শিরে শোভে জটাভার,
শুভ শশ্রু আসি পড়েছে উরসে ;
মুখে রাম রাম শব্দ অনিবার,
ঢল ঢল দেহ যেন ভক্তিরসে !
তাহার পশ্চাতে মেঘের বরণ
মহাকায় এক মহর্ষি আসিয়া
ধীরে বরদার বন্দিল চরণ ;
আশীষিলা মাতা দ্বন্দ্ব হাসিয়া ।
রসে অঙ্গ ভরা নয়ন চটুল,
সংগীত সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ
মুঞ্জরিয়া লতা ফুটাইয়া ফুল
দেখা দিলা পরে সুবক ধীমান্ ।
সাক্ষাৎ সুবক প্রণাম করিলা ।
আপনার বীণা শ্রবণ কমলে
তুলি বীণাধারী সুবকে অর্পিলা ।
হে সুবক ! তুমি ধন্য ধরাতলে !
মৃদল মধুর বীণা বাজাইয়া,

ভয়কণ্ঠে গায়ি বিরহ সংগীত,
কে আইল ? শোক তরঙ্গ তুলিয়া
প্রকৃতিরে আজ করিল প্লাবিত ।
তাহার পশ্চাতে রক্তবর্ণ কাগর,
বিদেশীর বেশে ওকে দেখা দিল ?
অভিনব তানে কি মধুর গায় !
মৃত বঙ্গে যেন চেতনা ঢালিল !

সমস্বরে সবে বাঁধি স্বীয় স্বীয়
তন্ত্রী তার
গাইল হর্ষে, মহামায়ার মায়া
বোঝা ভার !

অমনি সম্মুখে শোভিল অতুল
সুখধাম বনস্থলী ।
সুবকে শুধকে ফুল আছে ফুটি
শাখে শাখে ফল ঝুলি ।
প্রকৃতির সেই সোহাগের বনে
একিরে একিরে হেরি !
কক্ষদ্রষ্ট্র প্রব নক্ষত্রের প্রায়
ধরাসনে এক নারী ।
এদিকে দেখনা ঐ কি ভীষণ
রগস্থলে দেখা যায় !
ওই দেখ মহা জ্যোতিষ্মান যোদ্ধা
শুইয়া শরশয্যায়া !
অন্যদিকে কিরাইয়া আঁধি, কর
একবার দরশন,
ঘোর বনে গুরভি কুসমে ঘেরা
ওই শাস্তি নিকেতন ।
স্বভাবের ছবি ভুল মোহিনী

রক্ষালাে তনু ঢাকা,
আলবালে জল করিছে সিঞ্জন
বদনে লজ্জার রেখা !
আবার এদিকে শ্যামলপুলিনা
যমুনা বহিছে ধীরে ;
পাগলিনী প্রায় এক রমণী ওই
কাঁদে বসি তার তীরে !
মহামায়া একি দেখালে স্বপন
এমনত দেখি নাই !
বাজি পূর্বে শত বীর্ষবতী নারী
দেখে মনে ভয় পাই ।
কটীদেশে আঁটা শরাসন ; শিরে
রতন চূড়া নাচিছে !
রহি রহি রোষে ধনুক টক্কারে
হস্তে শূল আক্ষালিছে ।

মহামায়া মায়া বোঝা ভার !
পরিবর্তিল দৃশ্য পুনর্ব্বার ।
নিবিল দেউটা হ'ল আঁধার ।

হস্তে ভাঙ্গা লাঠি,
অঙ্গে মাখা মাটি,
উচ্চ খুঙ্ক কেশ,
পাগলিনী বেশ,
অঞ্চল ধরায়,
হেলায় লুটায়,
দেহ লতা শীর্ণ,
শরীর বিবর্ণ,
জ্যোতিষ্মান ভার্য,
অপাঙ্গেতে ধার্য,

কাঁপিতে কাঁপিতে,
 পড়িতে পড়িতে,
 একটি রমণী আইল উথায়।
 সঁজল নয়নে সুধাইলা বাণী ;—
 ‘কে তুমি ম? তুমি কাহার রমণী ?
 তব দশা দেখে বুক ফেটে যায় !’
 মুছি অশ্রু জল,
 চাপি বক্ষস্থল,
 যষ্টির উপর,
 রাখি-অঙ্গ ভর,
 ভগ্ন স্বরে মরি
 কহিলা সুন্দরী ;—
 “আমার কাহিনী
 শুনিবে কি বাণী ?
 আমার বেদনা
 কেহুত বোঝে না !
 তুমি কি বুঝিবে ?
 মোরে কি চিনিবে ?
 ‘স্মৃতি’ নাম ধরে এই অভাগিনী !’
 যদি মোর প্রতি এত দয়া তব
 এসো সঙ্গে মোর, এসো বীণাপাণি,
 গত দৃশ্য কিছু তোমারে দেখাব।’
 দৈবদ হাসিয়া, কহিলা ভারতী
 ‘দেবতা আমরা ;
 দিব্য চক্ষু ধরি, এক দৃষ্টে হেরি,
 সঙ্গাগরা ধরা।
 সেই দিব্য চক্ষু তোমারেও আমি
 করিহু প্রদান,
 দূর দৃশ্য স্মৃতি দেখিবে এখন
 যেম চক্ষে বিদ্যমান।

অশ্রু জল মুছি ভগ্ন কণ্ঠে স্মৃতি
 কহিলা বাণীর কাছে ;
 ‘অলকা সদৃশ ভারত ভূমির
 আর কি সেদিন আছে !
 ওই দেখ মাগো যমুন্য বহিছে
 আঁধারে ঢাকিয়া কায়া !
 বীচিরবচ্ছলে কালিন্দী কাতরে
 বিবাদ সংগীত গায়।
 এই যমুন্যার স্ফটিক সলিলে
 প্রভাতে সঙ্ক্যায় মরি,
 মন্দাকিনী জলে বিদ্যাধরী প্রায়
 ভেসেছে প্রমোদ-তরী !
 এই যমুন্যার শ্যামল পুলিনে
 বিচিত্র চিত্রিত কত,
 শত সৌধমালা ছিল দাঁড়াইয়া
 স্বর্গীয় পরীর মত !
 সেই যমুন্যার সেই সে পুলিনে
 আজি কি দেখিতে পাই।
 মহা মকছুমি অনন্ত আশান
 শূন্য শূন্য সব ঠাই !
 যেখানে সেখানে ভগ্ন অট্টালিকা
 পড়ে আছে স্তূপাকার !
 লতা পাতা ঘেরা এই স্তূপোপরি
 ফিরাও আঁধি তোমার।
 ওই স্তূপে বসি অশ্রুময়ী শোক,
 কাঁদিয়া জুড়ায় প্রাণ !
 হিম তত্ত্ব কণ্ঠে ভগ্ন বীণে বাঁধি
 ভগ্ন কণ্ঠে করে গান।
 ওই দেখ মাগো মহা তীর্থ স্থান
 কুরুক্ষেত্র দেখ ওই,

কুৰুক্ষেত্র আছে বল মা আমার
 সে কুৰু পাণ্ডব কই ?
 কই সে অর্জুন ? বীর্য্য মুক্তিমান্,
 ভীমসেন মহাকায ;
 সত্য সত্য কি মা ভীষ্ম মহাবীর
 নিদ্রিত চির নিদ্রায় ?
 দেখ প্রান্তরের প্রান্তভাগে ওই
 স্রিয়মান মহাবীর,
 ধূলায় লুটায় পর্ব্বতের প্রায়
 তার প্রকাণ্ড শরীর ।
 ভীষ্ম শরাসন শতখণ্ড হয়ে
 পড়িয়া রয়েছে ভূমে ;
 কতু যেন বীর নয়ন মুদিয়া
 অচেতন ঘোর ঘুমে !
 কতু যেন ক্রোধে ভগ্ন কটি আঁটি
 উঠিয়া বসিতে চায় ;
 ভগ্ন বাহু ভাঙ্গি তখনি আবার
 ভূতলে পড়িয়া যায় !
 এই হতভাগ্য এক দিন মাগো
 ভারত ঈশ্বর ছিল !
 ‘বীর রস’ নাম কালচক্রে পড়ি
 ইহার এদশা হলো !’

এই শোক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে
 অপাঙ্গে বাণীর অশ্রু দেখা দিল ;
 মায়ার মায়ার আঁধার নাশিতে
 জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আসি দাঁড়াইল ।

ভুবন ঘোহিনী
 আইলা রমণী

তুময় যেন মাদুরী মাখা !
 শতচন্দ্র যিনি
 সে বদনখানি
 নিবিড় কুন্তলে অর্ধেক ঢাকা ।
 আস্য ভরা হাসি,
 হেন জ্যোৎস্না রাশি,
 ‘অপাঙ্গে বিজলি জ্বলে !
 কোহিনূরে ছায়
 পরাজি প্রভায়
 একটি হীরক গলে !
 মহা মূল্য কত
 রত্ন শত শত
 জ্বলিছে সর্ব্বাঙ্গে তার ,
 খচিত রতনে
 কোশিকি বসনে
 সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা বামার !
 স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাশি
 ঘেরে মুখশশি
 হস্তে বিদ্রুত মশাল ।
 মুহূর্ত্তে সে আলো
 দিশি উজলিল
 হরি আঁধার ভয়ায় !
 অন্য এক করে
 রত্ন বীণা ধরে,
 দাঁড়াল প্রতিয়া স্থির ;
 স্রীর পাদমূলে
 পুতিয়া মশালে
 ধীরে নোয়াইল শির ।
 সম্মোহন মন্ত্রে
 বাঁধি বীণা যন্ত্রে

দিল সে ভঞ্জে স্বাক্ষর ;
আরম্ভিল গান
মোহিল পরাগ
সুচিল বিষাদ ভার ।

‘উঠ উঠ মাগো !

ধরাসন ত্যাগো ।
তব দশা হেরে হৃদি ফেটে যায় ।
চিরদিন কাক সমান না যায় ।
ঝাড় ধূলি ঝাড়
নব বস্ত্র পড়
রাজরাণী তুমি কেন হেন বেশ ।
কেন ধূলিমাখা এ চাঁচর কেশ ।
তব পায়ে ধরি
মুছ অশ্রুবারি ।
বিশুদ্ধ অধরে একবার হাসো ।
একবার সুখ তরঙ্গেতে ভাসো ।

উঠ উঠ মাগো !

দেখ পূর্বভাগো !

তপ্ত কাকনের আভার শোভিল !
কাল নিশি তব বুঝি মা পহাল !
বলি যা শোনো মা !
কেঁদোনা কেঁদোনা !
মোর কথা রাখ ‘অশশা’ মোর নাম
দৈর্ঘ্যধর পূর্ণ হবে মনস্কাম ।
নিরবিলা বিণা । ক্রোধ ভরে
ভগ্নবাহু যুগে করি বশ
ভগ্ন ধনুঃখণ্ড—যোড়া দিয়ে
উঠিতে চাহিল বীর রস,
নির্দয় বিধির কি বিচার
হায় হস্ত ভাঙ্গি পড়ি গেল !
অন্তর্জাম আশা বাণী সব
যাঃ রে মায়ার মায়ী কুরাল ।
শ্রীদী—

জীবনপ্রভাত ।

যড়্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

আরম্ভজীব ।

‘আপনি কাটারি মারি আপনার পায় ।
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায় ॥
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা ।
শিরেকৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধবি ভাগা
সর্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ ।
বলে কথা বুঝিস নাহি এই বড় দুঃখ ॥’
কীৰ্ত্তিবাস ওঝা ।

পর দিন প্রায় এক প্রহর বেলার স-
ময় শিবজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, জাগরিত
হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনি-
লেন, উঠিয়া গবাক দিয়া নিম্নদিকে চাহি-
লেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও
স্তম্ভিত হইলেন,—

দেখিলেন বাটির পশ্চাতে দুই পার্শ্বে,
সম্মুখ দ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান
রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয় না পাইলে বা-
হিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দি-

তেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল, কল্যাণি তিনি পলাইতে পারিতেন, অন্য আরংজীবের বন্দী !

তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; জানিলেন যে, তিনি সত্ৰাটের নিকট স্বদেশ যাঁহিবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্ভেদক হইয়াছিল, সেই সন্দেহপ্রযুক্তই সত্ৰাট নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে শিবজীর বাটীর চতুর্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হিঁতৈষী সীতাপতি গোস্থামী গণনা দ্বারা বা কোনও অনুসন্ধান আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়া রজনী বিপ্ররের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এত দিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্বক পত্র লিখিয়া দিলিতে আহ্বান করিলেন,—শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজ্য সভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত

বন্দী করিলেন। কোন কোন অজগর সর্প গো মহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রুর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে অভিমানের গর্জিয়া উঠিলেন। ক্রতপদনিষ্ক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অপরোক্ষের উপর দস্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অশ্রুফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্ধক্ষুণ্ট স্বরে বলিলেন—

‘আবংজীব ! শিবজীকে এখনও জান না ; চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। * * এই ঋণ এক দিন পরিশোধ করিব,—দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে !’

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাতথপুত্রে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, শিবজীর আজ্ঞায় সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

শিবজী বলিলেন—‘পশ্চিম প্রবর ! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন ;—এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে ;

আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অ-
পরিপক্ব নহে,—খেলিবে।

‘অন্য আমরা বন্দী হইয়াছি, আমি
কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছি-
লাম; কিন্তু অনুচরবর্গকে পূর্বে পরিজ্ঞা-
না করিয়া আমার আত্মপরিজ্ঞানের ইচ্ছা
নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?’

ম্যারশাল্জী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া
বলিলেন—‘আপনার অনুচরদিগের স্ব-
দেশ গমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনু-
মতি প্রার্থনা করুন, এক্ষণে আপনাকে
বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুচরসংখ্যা
যত হ্রাস হয় তাহাতে সম্রাট আত্মদিত
ভিন্ন হুঃখিত হইবেন না। আমি বিবে-
চনা করি অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।’

শিবজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলি-
লেন—‘মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই
শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত আরংজীব
এবিষয়ে আপত্তি করিবেন না।’

সেই মর্মে একখানি আবেদন পত্র
প্রস্তুত হইল; শিবজী যাহা মনে করিয়া-
ছিলেন তাহাই ঘটিল; শিবজীর অনুচর
সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া
সম্রাট আত্মদিত হইয়া তাহাদিগের স-
কলকে এক একখানি, অনুমতি-পত্র দান
করিলেন। শিবজী কএক দিন মধ্যে সেই
সমস্ত অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, মনে
মনে বলিলেন,—

‘মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে?
এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার

মধ্যে একখানি অনুমতিপত্র লইয়া দিল্লী
ত্যাগ করিলে কি করিতে পারি? যাহা
হউক অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাইবে,
শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবনা
করিতে সক্ষম।’

* * * *

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা বু-
দ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ত্রাতৃগণকে প-
রাস্ত করিয়া, বহু পিতাকে বন্দী করিয়া
দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়া-
ছিলেন, যিনি কাস্মীর হইতে বঙ্গদেশ প-
র্যন্ত সমস্ত আর্ধ্যাবর্তের অধিপতি হইয়াও
পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় করিয়া সমগ্র
ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প
করিয়াছিলেন, যিনি অদ্য চতুরতার দ্বারা
মহাবীর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন,
চল একবার সেই ক্রুর, কপটাচারী, অথচ
সাহসী, হ্রদর্শী আরংজীবের প্রাসাদা-
ভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের
ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, আরং-
জীব ‘গোসলখানা’ নামক সভাগৃহের
পার্শ্বস্থ একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আ-
ছেন। সেটি মন্ত্রিদিগের সহিত গুপ্ত প-
রামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব এ-
কাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কখন
কখন ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা
যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল মগনে ও কম্পিত
অধরে রোষ, অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার
লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-স-

ফলতাজনিত সমস্তাৰে সেই ওষ্ঠপ্রাপ্ত হা-
সারেখায় অঙ্কিত হইতেছে । সত্ৰাট কি
কৰিতেছেন ? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত
হিন্দুস্থানের একাধীশ্বৰ হইয়াছেন, সেই
কথা স্মরণ কৰিতেছেন ? হিন্দু ধৰ্ম্মের
আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহা-
রাষ্ট্ৰদিগকে আরও পদদলিত কৰিবার স-
ঙ্কল্প কৰিতেছেন ? শিবজীকে বন্দী ক-
ৰিয়া মমে মমে উল্লাসিত হইতেছেন ?
জানি না সত্ৰাটের কি চিন্তা । তাঁহার স-
ভার মধ্যে, ভাৰতবৰ্ষের মধ্যে কোনও
লোক, কোমণ্ড সেনাপতি, কোনও মন্ত্ৰীকে
সন্নিধননা আরংজীব কখন সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস
কৰিতেন না,—মনের ভাব বলিতেন না ।
নিজের বুদ্ধি প্রাথৰ্ণ্য সকলকে পুত্তলিকার
ন্যায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন
কৰিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য । বা-
বুরকী যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ
কৰিতেছেন, বিশ্বাম চাহেন না, কাহারও স-
হায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসা-
ধারণ মানসিক বলে ভাৰতমাত্ৰাজ্যের শা-
সনকার্য্য একাকী বহনকৰিবার মানস কৰি-
য়াছিলেন, কাহারও পরামৰ্শ চাহিতেননা ।

অনেককণ উপবেশন কৰিয়াছিলেন,
এরূপ সময় একজন সৈনিক তসলীম ক-
ৰিয়া বলিল—

‘সত্ৰাটের জয় হউক ! জহাঁপনা ।
দানেশমন্দ্ নামক আপনাব সত্যসূ আ-
পনাব সাক্ষাৎ অভিলাষী, স্বাৰদেশে দ-
ওয়ারমান আছেন ।’

সত্ৰাট দানেশমন্দ্কে আশিতে আজ্ঞা
দিলেন, চিত্তাৱেখাগুলি ললাট হইতে অ-
পসৃত কৰিলেন, সুন্দর হাস্য মুখে ধারণ
কৰিলেন ।

দানেশমন্দ্ আরংজীবের মন্ত্ৰী ছিলেন
না, রাজকাৰ্ণ্যে পরামৰ্শ দিতে সাহস ক-
ৰিতেন না । তবে তিনি পারস্য ও আ-
রবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, স্মৃতাং স-
ত্ৰাট তাহাকে অতিশয় সম্মান কৰিতেন,
কখন কখন কোন কোন কথায় বাকাচ্ছলে
পরামৰ্শ জিজ্ঞাসা কৰিতেন । উদারচেতা
দানেশমন্দ্ প্রায়ই উদার সরল পরামৰ্শ
দিতেন ; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দাৱা যখন
বন্দী হইলেন, দানেশমন্দ্ তাঁহার প্রাণর-
ক্ষার পরামৰ্শই দিয়াছিলেন । এবস্থিধ
পরামৰ্শ কুটিল আরংজীবের মনোগত হ-
ইতনা,—আরংজীব তাঁহাকে অপ্সবুদ্ধি ও
অদূৰদৰ্শী বলিয়া মনে কৰিতেন,—তথাপি
তাঁহার বিদ্যা ও ধন ও পদ-মৰ্যাদার জন্য
সমাক্ আদর কৰিতেন । সরলস্বভাব বুদ্ধ
দানেশমন্দ্ সত্ৰাটকে অভিবাদন কৰিয়া
উপবেশন কৰিলেন ।

বলিলেন—

‘এ সময়ে জহাঁপনাব সহিত সাক্ষাৎ
কৰিতে আসা দাসের স্মৃতিতা,—কেন না
এ সময় সত্ৰাট রাজকাৰ্ণ্যের পর বিশ্বাস
করেন । তবে যে আশিয়াছি,—কেবল
আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত; পারস্য
কবি সুন্দর লিখিয়াছে, ‘স্বৰ্ণের দিকে
জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া

দেখে, স্বর্গ্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণ দানে বিরত হয়? ”

সত্ৰাট সন্ধ্যা বদনে বলিলেন, ‘দা-
নেশমন্দ্! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক,
আপনি সর্ব সময়েই সমাদরের পাত্র।’

এইরূপ মিষ্টালাপ ক্ষণেক হইলে পর
দানেশমন্দ্ অন্য কথা আনিলেন; ‘বলি-
লেন,—

‘জহাঁপনা! ‘আলমগীর’ নাম সা-
র্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার
পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য
জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।’

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলি-
লেন—

‘কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ
দেখিলেন?’

দানে। ‘দক্ষিণদেশের প্রধাম শত্রু
আপনার পদতলে।’

আরং। ‘শিবজীর কথা বলিতে-
ছেন? হাঁ ইন্দুর কলে পাড়িয়াছে!’
তৎক্ষণাৎ আপন মন্তব্য গোপনার্থে বলি-
লেন, ‘দানেশমন্দ্ আপনি আমাদের উ-
দ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্র-
ধান ব্যক্তিকে সর্বদাই সম্মান করা আমার
উদ্দেশ্য। শিবজী ধৃত বিদ্রোহী হউক,
যোদ্ধা বটে তাহাকে সম্মানার্থে দিল্লীতে
আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত স-
ম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আ-
মাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মুর্থ
যে রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল।

আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার
প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, স্তত্রাৎ
অন্য শান্তি না দিয়া কেবল রাজসভায়
আসিতে নিবেদন করিয়াছিলাম। এখন
শুনিতেছি, যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক
সন্ধ্যামী ও বিজোহীর সহিত পরামর্শ করে
স্তত্রাৎ কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে
না পারে এই জন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি
রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর স-
ম্মান পূর্বক বিদায় দিব।’

দানে। ‘সত্ৰাটের এ আদেশ শুনিয়া
অতিশয় আশ্চর্য হইলাম।’

আরং। ‘কেন?’ আরংজীবের মুখে
সেইরূপ হাস্য,—কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়নে দানে-
শমন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, তা-
হার অন্তরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে
ছিলেন।

উদারচেতা দানেশমন্দ্ বলিলেন, ‘স-
ম্মাটিকে পরামর্শ দি আমার কি সাধ্য,
কিন্তু জহাঁপনা! যদি শিবজীর প্রতি দয়াশু-
ভাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে মন্দ্
লোকে নানারূপ অত্যাতি করিত, বলিত,
যে শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্ধ করা
ন্যায়সম্মত নহে।’

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্কোচন ক-
রিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন,—

‘দানেশমন্দ্, মন্দ্ লোকের কথায়
দিল্লীস্থরের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার
ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার ক-
রিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে স-

তর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তা-
হাকে সম্মানে বিদায় দিব ।’

দানে । ‘এরূপ সদাচরণেই জহাঁপ-
নার প্রাপিতামহ আকবর দেশ শাসন ক-
রিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনাকেও
খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে ।’

আরং । ‘সে কিরূপ ?’

দানে । ‘সম্রাটের অগোচর কিছুই
নাই । দেখুন, আকবরশাহ যখন দিল্লীর
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত
সাম্রাজ্য শত্রু-সঙ্কুল ছিল ; রাজস্থানে, বি-
হারে, দাক্ষিণাত্যে সর্বস্থানেই বিদ্রোহী
ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল
না । তাঁহার মৃত্যুকালে, সমস্ত সাম্রাজ্য
নিঃশত্রু ও নির্বিরোধ হইয়াছিল,—যা-
হারা পূর্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজ-
পুত্রেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার ক-
রিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লী-
শ্বরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে । এ
জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল ? কেবল বা-
হবলে ? কেবল সাহসে ? তৈমুরের বংশে
কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব
নাই,—তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন
করিতে পারেন নাই কি জন্য ? না জহাঁ-
পনা ! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ
হইয়াছিল । তিনি শত্রুদিগের প্রতি স-
দাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগকে বি-
শ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবিধ সম্রাটের
বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত, মান-
সিংহ, টোডর মল্ল, বীরবল প্রভৃতি, হিন্দু-

গণই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হ-
ইয়াছিলেন । উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস
করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম
কাফেরের প্রতি ও সদাচরণ ও বিশ্বাস ক-
রিলে, তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয় ;
মানবের এই প্রকৃতি,—শাস্ত্রের এই লি-
খন । ০ আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শি-
বজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জহাঁ-
পনা ! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যত
দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি দ-
ক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ
থাকিবেন !’

দানেশমন্দের কি জন্য সম্রাটের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক,
বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিয়াছেন । দিল্লীশ্বর
শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায়
জানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ মা-
দ্রেই লজ্জিত হইয়াছিলেন ; দানেশমন্দের
সম্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে
কথাকূলে সম্রাটের কুপ্রকৃতি ও মন্দ উ-
দ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎ-
সুক হইয়াছিলেন । শিবজীর প্রতি ভ-
দ্রাচরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বদেশে
যাইতে দেন, দানেশমন্দের এই উদ্দেশ্যে
আসিয়াছিলেন । দানেশমন্দের জানিতেন
না যে হস্তদ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত
করা যায়, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরংজী-
বের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বি-
চলিত করা যায় না ।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথা-

গুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয়
নির্যোদ্ধের কথাই নায় বোধ হইল।
তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

‘হাঁ, দানেশমন্দ্ৰ! আপনি যেরূপ
শাস্ত্রবিশারদ, মানব-হৃদয়ও সেইরূপ পাঠ
করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শি-
বজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবেন, রাজস্থান ত
বিদ্রোহিণ স্তম্ভ স্থাপন পূর্বেই করিয়াছে;
কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব, ও
বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর
পূর্বক আহ্বান করিব,—এই চতুঃস্তম্ভের
উপর মোগল সাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ়
স্থাপিত হইবে।’

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল,
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘সম্রাটের
পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও
যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য কখন
কখন মনের কথা বলি,—নচেৎ জহাঁপ-
নাকে পরামর্শ দি, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।’

আরংজীব দানেশমন্দ্কে নির্যোদ্ধ
সরল জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার
জন্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেন,—তাঁহাকে
কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন,—

‘দানেশমন্দ্! আমার কথার দোষ
গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান
ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুস-
লমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি
ধর্ম-সজ্ঞত আচরণ করিয়াছিলেন? আর
একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের
সামান্য দৈনিক কার্য সম্পাদনকালেও

দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ
কার্য হয় পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এ-
রূপ বিশ্বাস সাম্রাজ্য শাসন কার্যেও সেই-
রূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং
সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ
বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন ক-
রিতে সমর্থ হই, কি জন্য যুগিত কাফের-
দিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরং-
জীব বাল্যাবস্থা অবদি নিজ অসির উপর
নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহা-
সনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসি-
দ্বারা দেশ-শাসন করিবে, কাহারও স-
হায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস ক-
রিবে না।’

দানে। ‘জহাঁপনা! স্বহস্তে দৈ-
নিক কার্য নির্যাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ
সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পা-
দিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি
স্থানে কি সর্ব সময়ে আপনি বর্তমান থা-
কিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত
না করিলে কার্য কিরূপে সম্পাদিত
হইবে?’

আরং। ‘অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত ক-
রিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায়
থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে।
অথ আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব,
কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্য-
বহার করিতে পারে। অন্য যাহাকে অ-
ধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাত-
কতা করিতে পারে; এ অবস্থায় ক্ষমতা

ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপ-
নাতে রাখাই ভাল । দানেশমন্দ্ ! তুমি
যখন অশ্ব আরোহণ কর, অশ্বকে বল্গা
ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যে-
দিকে ফিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য
হয় । সত্ৰাটেরও সেইরূপে শাসন করা
উচিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না,
কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না,
সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্তৃচারী
ও সেনাপতিদ্বিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীকরণ
পূর্বক তাহাদিগের নিকট কার্য গ্রহণ
করিবে ।’

দানে । ‘প্রভু ! মনুষ্যত অশ্ব নহে,
তাহাদিগের মহত্ব আছে, নিজ নিজ স-
ম্মান-জ্ঞান আছে ।’

আরং । ‘মনুষ্য অশ্ব নহে তাহা
জানি ; সেই জনাই অশ্বকে বল্গাদ্বারা
চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শান্তির
ভয়ের দ্বারা চালাই । যে উত্তম কার্য
করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম
কার্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব । পু-
রস্কার-আশা ও শান্তি-ভয়ে সকলে কার্য
করিবে ; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা, আরং-
জীব নিজ হৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত
রাখিবে ।’

দানে । ‘প্রভু ! পুরস্কার-আশা ও
শান্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভাবও
আছে । মনুষ্যের মহত্ব আছে, উচ্চাভি-
লাষ আছে, নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে ।
যে শান্তি-ভয়ে কার্য করে, সে কোন

রূপে কেবল কার্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত
থাকে ; কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান
করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বি-
শ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর
ও বিশ্বাসের উপযোগী, প্রমাণ করিবার
জন্য প্রভুকার্যে নিজের ধন, মান, জ্ঞান
পর্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণ ও
শাস্ত্রে দেখা যায় ।’

আরংজীব সহাসো বলিলেন,—

‘দানেশমন্দ্ ! আমি তোমার নায়
শাস্ত্রজ্ঞ নহি ; কবিতায় যাহা লিখে তাহা
বিশ্বাস করি না । মানবপ্রকৃতি আমার
শাস্ত্র ; মানবের মহত্ব আমি অল্প দেখি-
রাছি । শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা
অনেক দেখিয়াছি । সেই শাস্ত্র পাঠ ক-
রিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে
শিখিয়াছি, সেই জন্য কাফেরদিগের উপ-
র জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বি-
ক্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর
শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু ক-
রিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হি-
মালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত আরংজীব এ-
কাঁকী শাসন করিবে, কাহার ও সহায়তা
লইবে না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক
করিবে ।’

উৎসাহে সত্ৰাটের নগন উজ্জ্বল হই-
রাছিল, তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন
কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অত
কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ ক-
রিয়া ফেলিয়াছিলেন ! এতদ্বিষয় তিনি দা-

নেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট ছই একটি কথা কহিলে কোমও হানি নাই, জানিতেন।

কণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরং-জীব বলিলেন,—‘সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মজ্জনা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?’

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মজ্জনা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না।

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল—

‘রামসিংহ জহাঁপানার সাক্ষাৎ অভিলষী, স্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।’

সম্রাট আদেশ করিলেন,—‘আসিতে দাও।’

কণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহের সহিত পাঠকের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। আকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, নরনয়ন উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অবয়ব যৌবনকান্তিতে শোভিত, যৌবন বলে বলিষ্ঠ। যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘সম্রাটের সহিত এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু

পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।’

আরং। ‘আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।’

রাম। ‘তবে সম্রাট অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অস্পৃশ্য বশতঃ সে নগর এপর্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষ গল-খন্দের সুলতান বিজয়পুরের সহায়ার্থে নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্যসমেত প্রেরণ করিয়াছেন।’

আরং। ‘সমস্ত অবগত হইয়াছি।’

রাম। ‘চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অস্পৃশ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।’

আরং। ‘আপনার পিতা বীরপ্রগাণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?’

রাম। ‘মম্বোর যাহা সাধা, পিতা তাহা করিবেন; শিবজী পূর্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা ততদূর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখন আপনার নিকট

অপ্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতে-
ছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য শেষ
হয়, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত
ও দৃঢ়ীভূত হয়।’

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্মুখি
সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দক্ষিণাত্য-
দেশবিজয়কার্য সমাধা করিতেন। আ-
রংজীব আপনাকে বহুদূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি
মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ
করিলেন না—বলিলেন—

‘রামসিংহ! আপনার পিতা আমা-
দের স্নহদুঃপ্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শু-
নিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাবুল হইলাম,
তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের
অসাধারণ বাহুবলে জয় সাধন করিবেন,
সম্মুখি দিবানিশি এইরূপ আকাজক্ষা ক-
রেন; কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা
অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে
অক্ষম।’

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, ‘জহাঁ-
পনা! পিতা দিল্লীস্থরের পুরাতন দাস,
আপনার কালে, আপনার পিতার কালে
অসংখ্য যুদ্ধ যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য সা-
ধন করিয়াছেন; দিল্লীস্থরের কার্যসাধন
ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই।
এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সা-
হায্য দান না করিলে, তিনি বোধ হয়,
সর্বসময়ে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।’ রামসিং-
হের কথ কব্জ হইল, তাঁহার নয়নে জল-
বিন্দু উদ্ভিত হইল।

বালক! জলবিন্দুতে আরংজীবের গ-
ভীর উদ্দেশ্য, দৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না।

সে উদ্দেশ্য—সে মন্ত্রণা কি? রাজা
জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপা-
বিত্ত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বি-
স্তীর্ণ যশ, অনন্ত দৌর্দণ্ড প্রতাপ! আ-
জীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীস্থরের কার্য
করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন
সেনাপতির থাকা বিধেয় নহে; সম্মুখি এ-
তদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন
না। এযুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ
করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে
সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে।
যদি সর্বসময়ে বিজয়পুর সম্মুখে নষ্ট হয়েন,
দিল্লীস্থরের হৃদয়ের একটি কটেকোদ্ধার হ-
ইবে। উর্দুনাতের জালের ন্যায় আরংজী-
বের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য
জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উ-
দ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীস্থরের
কার্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে-
জন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচরিত্র যুবকপুত্র স-
ম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন
বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী
সম্মুখি উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি প্রকুমার মনোহর-
সমূহ আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ
হৃদয়েও স্থান দিতেন না; আত্মপথ পরি-
ষ্কারার্থ অদ্য একটি পতঙ্গ সরাইয়া ফেলি-

লেন, কল্যা একজন মহোদয় ভাতাকে হ-
নন করিলেন, উভয় কাৰ্য্যই একই প্রকার
ধীর নিঃশেষে স্বদয়ে করিতেন। একদিন
পিতা; ভাতা, ভাতপুত্র আত্মীয়বর্গ সেই
উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁ-
হাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে
মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ
ভাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন
নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁ-
হার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে
ভবিষ্যতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই, আপন
উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না,
তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠ ভাতা জী-
বিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক
হইতে পারে; জন্মাদ। তাহাকে সরাইয়া
সমুট আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া
দাও।

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক
যে জয়সিংহ সর্বসৈন্য হত হইবেন; তিনি
ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী অনু-
সন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সর্বসৈন্যে ম-
রিবেন। এই পরিচ্ছেদ-বিস্তৃতি সময়ের পর
কএক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ
আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক-
রিয়া রামসিংহ বলিলেন—

‘প্রভু আমার একটি যাচঞা
আছে।’

আরং। ‘নিবেদন করুন।’

রাম। ‘শিবজী যখন দিল্লী আগমন
করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান
করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কো-
নও আপদ ঘটিবে না।’

আরং। ‘আপনার পিতা সে কথা
আমাদের অবগত করাইয়াছেন।’

রাম। ‘রাজপুতদিগের মধ্যে বা-
ক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয়
নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দা-
সের প্রার্থনা যে প্রভু শিবজীর যে কোন
ও দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়া তাঁ-
হাকে বিদায় দিন।’

আরংজীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে
ধীরে বলিলেন, সমুটের যাহা উচিত কাৰ্য্য
সমুট তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি
চিন্তিত হইবেন না।’

আরও ক্ষণেক দানেশমন্দের সহিত
কথোপকথনের পর সমুট বেগমমহলে
যাইলেন, দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ কুপ্তমনে
প্রাসাদ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটি কীট স-
মুটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত
হইয়াছেন; দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁ-
হাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

জয়সিংহের যে দোষ শিবজীরও সেই
দোষ; শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণ-
পণে দিল্লীর কাৰ্য্য করিয়াছেন নিজ সৈন্য
দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা;
আরংজীব কোনও ভূতের উপর বিপুল

ক্ষমতা নাস্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

যাহাকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহার ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও দিল্লীর চিরবিশ্বস্ত রাজপুতেরা, দিল্লীর বিকল্পে যে ভীষণ যুদ্ধাঙ্গল প্রজ্জ্বলিত করিল, যোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।



“দূরে গেল জটাজুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবা নিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার বন্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহহীন, অদ্য যেরূপ রোগ রুজি হইয়াছে কল্যাণ্যস্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে শিবজী আর নাই। রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক সোক গমনাগমন করিত ও সেই বন্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিত, অখারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অস্থ থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা

করিতেন; শিবিকারোহী রাজা বা মনসব্দার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন; শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্যাণ্যস্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে সর্বদাই ভাবিতেন, “যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনাগাসে কটকোদ্ধার হইবে!”

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবির হইতে শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।’ হাকিম উত্তর করিলেন, ‘সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।’ সম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যা শয়ন করিয়া আছেন, তাহার ভৃত্য সন্বাদ দিল যে সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণ

বুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিবপ্রয়োগের জন্য সত্ৰাট এ কাণ্ড করিতেছেন; ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—

‘হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সত্ৰাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবেন।’ কিন্তু ভৃত্য এই আদেশ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্বেই হাকিম অনাহৃত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধ সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সন্মোচন করিয়া অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুক্ল শ্মশ্রু লব্ধিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে; মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বয়ং দীর্ঘ ও গম্ভীর। বলিলেন—

‘নহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুত হইয়াছি, আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না; তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম, আমি স্বধর্মসাধন করিব।’

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হই-

লেন, ভাবিলেন এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। ‘আপনার পীড়া কি?’

কাতর স্বরে শিবজী বলিলেন, ‘জানি না এ কি ভীষণ পীড়া; শরীর সর্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্বস্থানে বেদনা।’

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ‘পীড়া অপেক্ষা জিহাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্রেশ-সঞ্চার; আপনার কি সেই পীড়া?’

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন; মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরন্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন।

শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—

‘আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ীত সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সঞ্চারে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এসমস্ত কি প্রবঞ্চনা মাত্র?’

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপরূপ চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখ মণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল না। শিব-

জীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুমরায় ক্ষীণশ্বরে বলিলেন,—

আপনি যে রূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন; এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবন নাশ করিতেছে।’

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

‘আলফলায়লা ও লায়লুন’ নামক আমাদের যে প্রকাণ্ড চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দেশ আছে; তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার কথা লিখিত আছে। একটির নাম ‘আকলতু সামাকাতা হওয়া রাশি হা’। বালকেরা এই পীড়া ভোগ করিয়া চুরি করিয়া মৎস ভক্ষণ করে, ইহার চিকিৎসা প্রহার। আর একটির নাম ‘বকুসুতনে আসিরী ইশারৎ কর্দ’, কয়েদগণ কাজ না করিবার জন্য এই পীড়া ভোগ করে, ইহার চিকিৎসা শিরচ্ছেদন। তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, শত্রুহস্ত হইতে পলাতুকাম বন্দীদিগের সেই পীড়া ঘটে, তাহারও ঔষধি নির্দেশ আছে; আমি তাহাই আপনাকে দিতেছি।’

শিবজী এসমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝি-

য়াছেন তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সে ঔষধি কি?’

হাকিম উত্তর করিলেন, ‘সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকর্ষ বিমণ্ড বটে রক্ষুল আলমিনার নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয় অব্যর্থ বিবে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।’ এই বলিয়া হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে শ্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল! ঔষধি সেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিল, শিবজী বলিলেন, ‘মুসলমানের পৃষ্ঠে পানীয় আমি পান করিব না;’ মজোরহস্ত সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

হাকিম কিছুমাত্র কষ্ট হইলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘এরূপ মজোর হস্ত সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে!’

শিবজী অনেক্ষণ অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। মহসী উঠিয়া বসিলেন, ‘রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি,’ বলিয়া মন্তকে চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুল্ক অক্ষ মজোরে আকর্ষণ করিলেন।

বিম্মিত হইয়া দেখিলেন সেই মিথ্যা অশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে

উল্লীষ মূরে নিকিণ্ড হইল, তাঁহার বাল্য-সুহৃদ তন্নজী মালজী খিল খিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল !

কম্বেট অনেক্ষণের হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিলেন । পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—

‘প্রভু কি সর্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন ? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে ! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে !’

শিবজী সহাস্যে বলিলেন, ‘বন্ধু, সিংহের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয় । যাহা হউক তোমাকে দেখিয়া কতদূর আশ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম, এখন সংবাদ কি বল ।’

তন্ন । ‘প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি ।’

‘সত্ৰাট যে অনুমতি পত্র দিয়াছিলেন তদ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সমস্তই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিক্রান্ত হইয়াছে ।’

শিব । ‘সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করি । এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না; গগনবিহারী গরুড়পক্ষী সামান্য পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকে না ।’

তন্ন । ‘সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিক্রান্ত হইয়া গোঁস্বামীর বেশ-ধরিয়া মথুরা ও রুম্ভাবনে অবস্থিতি করিতেছে ; মথুরায় অনেক দেবালয়ে পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে ! আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে যেরূপ লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি ।’

শিব । ‘চির বন্ধু ! তুমি যেরূপ কার্যাদক্ষ অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারিব ।’

তন্ন । ‘দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি, যে দিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে ।’

শিব । ‘ভাল ।’

তন্ন । ‘রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম । রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদার-চেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সত্ৰাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাক্ষাৎকারে আবেদন করিয়াছিলেন ।’

শিব । ‘সত্ৰাট কি বলিলেন ?’

তন্ন । ‘বলিলেন সত্ৰাটের যাহা কর্তব্য তাহা করিবেন ।’

শিব । ‘বিশ্বাসঘাতক ! কপটা-

চারী ! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রশ্রয় দিবে !’

তন্ন। ‘রামসিংহ সে বিষয়ে বিফল-প্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার নিকট বলিলেন, যে রাজপুত্রের বাক্য অন্যথা হয় না, অর্থ দ্বারা সৈন্যদ্বারা যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি কাঁহার প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার আছেন ।’

শিব। ‘পিতার উপযুক্ত পুত্র ! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহি না, আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ ?’

তন্ন। ‘জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।’

শিব। ‘ভাল ।’

তন্ন। ‘এতস্তির দানেশমন্দ্ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদকে মিষ্ট কথায় বা অর্থদ্বারা, বা নজর-দিয়া আপনার পক্ষবর্তী করিয়াছি । দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান একরূপ বড় লোক কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্তী নহেন ; কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না ।’

শিব। ‘তবে সমস্ত প্রস্তুত ! আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারি ?’

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন, ‘আমার শ্রায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার

চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে ? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন ?’

শিবজী বলিলেন, ‘বন্ধু, আর এক পাত্র প্রস্তুত কর ।’ তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন ; শিবজী পান করিলেন,—সহাস্যে বলিলেন, ‘চিকিৎসক ! আপনার ঔষধি-যে-রূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদায়ী, আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে ।’

তন্ন। ‘তবে এখন প্রস্থান করি ।’ শিবজীকে সম্মুখে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন ।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, ‘পীড়া কিরূপ দেখিলেন ?’

হাকিম উত্তর করিলেন, ‘পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে ; বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এক ক্রেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন ।’

হাকিম শিবিকাষোণে চলিয়া গেলেন ; এক প্রহরী অশ্রুকে বলিল,—

‘এ হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না,—হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিল কিরূপে ?’

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, ‘হবে না কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম ?’

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

আরোগ্য ।

—o—o—o—

‘এত শুনি উত্তর কণ্ঠে কঁপে উঠে ।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
হে বীর, কমল চক্ষে কর পরিহার ।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥

কাশীরাম দাস ।

উপরি উক্ত ঘটনার কএকদিন পর
নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে শিবজীর
পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে । নগরে
পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল ; সকলেই
সেই কথা কহিতে লাগিল । কেহ কেহ
শিবজীর আরোগ্যে দুঃখিত হইলেন ; কোন
কোন মহাদাশয় মুসলমান এই সংবাদ পা-
ইয়া সুখী হইলেন । পথে, ঘাটে, দো-
কানে, মসজিদে সকলেই এই কথা কহিতে
লাগিল ; আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া
যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল ! শিবজী
ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান ক-
রিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠা-
ইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থ-
দানে সন্তুষ্ট করিলেন । বাজারে আর
মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মি-
ষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড় লো-
কের বাটিতে পাঠাইতে লাগিলেন । পরি-
চিত সমস্ত লোকের নিকট পাঠাইতে লা-
গিলেন, এমন কি প্রতি মসজিদে ফকীর-
গণের সেবনার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন

পাঠাইতে লাগিলেন ! সত্ৰাটের মনে যা-
হাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই
বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ‘দিল্লীকা-
লাভ’র ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তা-
হাতে আর কেহ ‘পস্তাইয়া’ ছিল কি
না বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি
শীঘ্রই পস্তাইয়াছিলেন !

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া
সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া
নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড
প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্মাণ করাইয়া স্বয়ং
মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন । সে
আধার কখন কখন তিন চারিহাত দীর্ঘ হ-
ইত, ৮ কি ১০ জন লোকে বহিয়া লইয়া
যাইত । কএক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন
বিতরিত হইতে লাগিল ।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি
প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ
হইতে বাহির হইল । প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা
করিল,—

‘এ কাছার বাটিতে যাইবে ?’ বাহ-
কেরা উত্তর করিল, ‘রাজা জয়সিংহ-স-
দনে ।’

প্রহ । ‘তোমাদের প্রভু আর কত
দিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন ?’

বাহ । ‘এই অদ্যই শেষ !’

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া
গেল ।

কতক পথ যাইয়া একটি অতি সজ্জু

স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটি আধার নামাইল । বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যা-ইতেছে ? বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হঠাৎ শিবজী, অপরটি হঠাৎ শম্ভুজী বাহির হইলেন ; উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরভিত্তিতে যাইলেন । সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি, রাজপথে এক একজন লোক যখন নিকট দিয়া যার শম্ভুজীর হৃদয় ভরে, উদ্বেগে, নৃত্য করিয়া উঠে । শিবজীর চিরজীবন একরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই নূতন নহে ; তথাপি তাঁহার ও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না ।

কম্পিত হৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে যার ?’

শিবজী উত্তর করিলেন, ‘গোশ্বামী । হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম কেবলং ।’

‘কোথায় যাইতেছ ?’

‘মথুরা তীর্থস্থানে । কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।’

প্রাচীর পার হইলেন ।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হুঁসিয়াছিল, অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন । সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী ঘুরিতে

পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । ‘হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম—ইত্যাদি ।’

দূরে একটি স্বাক্ষতলে একটি অশ্ব বন্ধ রহিয়াছে দেখিলেন । অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজীবনী অশ্বই বটে ।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভাই, অশ্বরক্ষক ! তোমার নাম কি ?’

‘জানকীনাথ ,’

‘কোথায় যাইবে ?’

‘মথুরা ,’

শিবজী বলিলেন, ‘হাঁ এই অশ্ব বটে । শিবজী অশ্ব আরোহণ করিলেন, পঞ্চায়ে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন । অশ্বরক্ষক পঞ্চায়ে পঞ্চায়ে পদব্রজে চলিতে লাগিল ।

অন্ধকার নিশীথে, নিঃশব্দ পল্লী বা প্রান্ত দিয়া নিরবাক হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন । আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট-মিট করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণ কলেবরা যমুনা নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ ঘাট কর্দম বা জলপূর্ণ । শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন ।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল ; শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে স্বাক্ষ বা কুটির নাই, অগত্যা পূর্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন ।

তিন জন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী

অভিযুগে... আসিতেছেন; আমাদিগের কোবে অসি, হস্তে বর্ধা। দুই হইতে শিবজীর অর্থ দেখিতে পাইয়া সেই দিকে অর্থ প্রদান করিলেন। শিবজীর কদম উত্তেগে হুক্‌হুক্‌ করিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কে যার?’

শিব। ‘গোন্দারী।’

অশ্বারোহী। ‘কোথা হইতে আসিতেছ?’

শিব। ‘দিল্লী নগর হইতে।’

অশ্বারোহী। ‘আমরা দিল্লী নগর যাইব; কিন্তু পথ হারায়াছি। আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পরে মথুরায় যাইও।’

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বল প্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কেননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহজ বিপদ। ইতি কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অশ্বারোহীরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল, ‘এ অশ্বারোহী জানি—আমি দিল্লীতে গিয়া আশ্রয় পাইব।’

আমি দিল্লীতে গিয়া পাবিক গোন্দারী নহে।

অপর বলিল, ‘তবে কে?’

‘আমি সন্দেহ করি এ অশ্বারোহী শিবজী, দুইজন মস্তকে কণ্ঠের ঠিক একরূপ হয় না।’

‘দূর, মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।’

‘সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল।’

‘ভাল, মস্তকের বজ্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে,’

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উকীষ দূরে নিক্ষেপ করিল, শিবজী চিনিলেন শায়েস্তাখাঁর অধীনস্থ একজন প্রদান সেনানী!

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু হস্তেও একজনকে মুক্তি আঘাতে অচেতন করিলেন। এমন সময় আর দুইজন অসি হস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী নির্ঝাঁক! ইচ্ছা দেবতাকে স্মরণ করিতেছিলেন। আবার বন্দী হইবেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরও জীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শিবজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্

জলে আণ্ডিত হইল। বলিলেন, ‘দেব দেব মহাদেব, জীবনে একমনে আপনার পূজা করিয়াছি, হিম্মুখ্য রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহা উদ্দেশ্য থাকে তাহাই করুন। আশা, ভরসা, উদ্যম এক মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অস্থারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিন জন শত্রুই ভূতলশায়ী। তিন জনই গত-জীবন।

যে দিক হইতে তীর আসিল, শিবজী সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন অশ্বরক্ষক জানকীনাথ।

অশ্বরক্ষক নিকটে আসিল;—শিবজী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন অশ্বরক্ষকরেশে সীতাপতি গোস্বামী।

সাক্ষাৎকালে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন ‘শিবজীর প্রকৃত বন্ধু! আপনি না হইলে এদাসকে কে রক্ষা করে? পুণ্ডদর সীতাপতি! অশ্বরক্ষক বলিয়া যদি ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া থাকি ক্ষমা করুন, অদ্য শিবজী আপনার রূপায় জীবন দান পাইল।

অশ্বরক্ষকবেশধারী ধীরে ধীরে শিবজীর পদতলে পতিত হইয়া অক্ষপূর্ণ ময়মে কহিলেন।

‘প্রভু ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন; আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি,—

আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবেলদার।, প্রভুর নিকট শত অপরাধ করিয়াছি কিন্তু প্রভু ক্ষমা না করিলে আর কে ক্ষমা করিবে?,

শিবজী আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—বালিকার মায়ার উত্তেজনের ক্রন্দন করিয়া রঘুনাথকে জনয়ে ধারণ করিলেন, কহিলেন ‘রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট যে পাপ করিয়াছি তাহার ক্ষমা নাই, তোমার শ্রুণের পরিশোধ নাই। শিবজীর জীবনের বন্ধু। আর যেন শিবজী এজীবনে তোমাকে না হারায়।,

অদ্য নিশীথে রঘুনাথের ব্রত উদ্যাপন হইল, শিবজীর কোভ দূর হইল,—পরস্পরের জনয়ে পরস্পর শান্তি লাভ করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

“ কি দাক্ষণ বুকের বাখা।

সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ
পিরিতের কথা।

সই। কে বলে পিরিতি ডাল।

হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া
জন্ম গেল।

কুলবতী হইয়া ফুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী
পিরিতি করে।

তুখের অনল বেন লাজাইয়া এমতি পুড়িয়া
মরে।

হাম বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে
হুল হুল আঁখি।

চতীদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাণ
. সংশয় দেখি ॥”

চতীদাস।

মিনীখে সীতাপতি গোআমীর নিকট
বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসি-
লেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরসু দেখিলেন
হৃদয় শূন্য। কে না জানে প্রথম কষ্ট
যদিও অতিশয় ভীষণ ও দুর্লভগীর্ণ, কিন্তু
তাঁহার পর সেই কথা স্মরণ করিলে হৃ-
দয়ে যে দুঃখ উজ্জলিতে থাকে, নীরবে নয়ন
হইতে যে অশ্রু বহির্গত হইতে থাকে সেই
শোক অদিক মর্যভেদী। জগতের মধ্যে
প্রিয়জনের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিলে আমরা
বালকের ভায় উঠে:স্বরে রোদন করিয়া
উঠি, জ্ঞানশূন্যের নায় জুড়িতে গড়াগড়ি
দি,—সে প্রথম শোক-উজ্জ্বাস সেই আ-
র্জুনাদেই নিবর্তিত হয়। কিন্তু দিবস যা-
ইলে, মাস গত হইলে, বৎসর অতিবাহিত
হইলে, সেই প্রিয়জনের কথা যখন স্মরণ
হয়, নীরবে রজনীর অন্ধকারে যখন হৃদয়
আগনি শোকপারাবারে ভাসিতে থাকে,
মরনের দ্বার যখন উদ্ঘাটিত হয়, নীরবে
অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে,—উঃ মনুষ্য-
জীবনে সেই ব্যতনাই অসহ্য। প্রিয়জ-
নের মুখ মনে পড়ে, তাঁহার বাক্যগুলি,
কার্যপরিণাম, স্নেহ, ভালবাসা, একে
একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে, নি-
শ্চয় রজনীতে সেই পূর্ব কথা একে একে

উদয় হইতে থাকে, তখনই হৃদয় শূন্য হয়,
আমরা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া
নীরবে রোদন করিতে থাকি।

দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অ-
তিবাহিত হইল, সরসুর চিন্তা দিনে দিনে
মর্যভেদী হইতে লাগিল। অন্ধকার নি-
শীখে কখন কখন বালিকা একাকী গবা-
ক্ষপার্থে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে
দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল
পর্যন্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত
কথা একে একে স্মরণ হইত, কতবার নী-
রবে নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু প্র-
বাহিত হইত। নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া
পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ
দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আনিলেন না।

কখন বা সেই পূর্বতনস্মৃতি কল্পদেশ
মনে জাগরিত হইত, সেই তোরণ-দুর্গ
মনে উদয় হইত। সরসু একাকী ছাদে
আসীন রহিয়াছেন, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে
গগন ও জগৎ আবৃত করিতেছে, সন্ধ্যার
বায়ু বহিয়া বহিয়া সরসুর কেশ লইয়া
কৌড়া করিতেছে;—এমত সময় সেই দী-
র্ঘাকার উদার মুক্তি যুক যেন আকাশ-
পটে দেবচিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। সর-
সুর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, বালিকার হৃদয়
নব নব ভাবে উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল।
অদ্য তিন বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু
সে মুক্তি সরসুর হৃদয় হইতে অপনীত হয়
নাই।

তাঁহার পরদিন সেই পুণ্যসিংহ যে

স্নেহগন্ধাদ্বারা সরযুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সভয়ে ধীরে ধীরে সরযুর কণ্ঠে যে কণ্ঠমালা দোলাইয়া দিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে সরযু কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? পুনরায় কি সে বীর সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠমালা পরাইয়া দিবেন, পুনরায় কি সরযু সেই হৃদয়বল্লভকে দেখিতে পাইবেন?—নীরবে সরযু দীর্ঘনিঃশ্বাস ভাগ করিলেন, নীরবে গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল ।

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযু আত্মকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত । বৃষ্কের উপর হইতে কপোত কপোতী বৃহস্পরে প্রেমগীত গাইতেছে, সেই গীত শুনিয়া একদিন রঘুনাথ কাণে কাণে সরযুকে কি কথা বলিয়াছিলেন অরণ হইল ; সরযুর মুখে বিষাদের হাসি আদিল । আর এক দিন ঐ বিশাল আত্ম বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ ও সরযু একত্রে একটি স্মৃতি-আত্ম ভক্ষণ করিয়াছিলেন, খাইতে ছিলেন আর পরস্পরে পরস্পরের দিকে স্নেহে চাহিতে ছিলেন, সে কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল । ঐ কটক বনের ভিতর দিয়া আর এক দিন রঘুনাথ অরণ্য ক্ষতবিক্ষত হইয়াও একটি সুন্দর বন্যপুষ্প চয়ন করিয়া সরযুর কেশে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, পরে কি মিটেস্বরে বলিয়াছিলেন, “সরযু! কি অপরূপ বনদেবীর রূপ ধারণ করিয়াছ! ” আহা! সে স্মৃতিধুর স্বর কি

সরযু আর শুনিবেন, পুনরায় কি রঘুনাথ দুঃখিনীর জন্য পুষ্প চয়ন করিবেন, হতভাগিনীর ভাগ্যে কি এরূপ সুখ আছে? সরযু শোকে বিবশা হইলেন, নয়ন হইতে দুই চারি বিন্দু জল টস্ টস্ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল, নীরবে আপনায় অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন । রূথা চেফ্টা, আবার চিন্তা আসিল, আবার নয়ন পূর্ণ হইল !

কখন কখন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সহসা হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হইত, তাত্ত্ব মাসের নদীর ন্যায় শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত । তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণভরে কাঁদিতেন, আবেগ মাসের ধারায় ন্যায় নয়ন হইতে অভ্রান্ত বারিধারা বহিতে থাকিত । রঘুনাথের মধুময় মুখ, মধুময় কথা মনে পড়িত, একটি কথার পর অন্য কথা মনে উদয় হইত, শোকতরঙ্গের পর শোকতরঙ্গ হৃদয়ের উপর বহিয়া যাত, —উপাধানে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালিকা বিবশা ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া দরবিগলিত ধারায় উপাধান সিক্ত করিত । রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিম-চ্ছটা পূর্বদিকে দেখা দিত; বালিকা তখনও চিন্তাবিদম্বা, অথবা শোকে বিবশা হইয়া লুপ্তিত রহিয়াছেন !

প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন করিতে উদ্ভ্রানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর নীচ চিন্তাকরিতেন কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের

দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশি-
শিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ
অক্ষবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে
বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন;
—আহা সে যে শোকের গীত, শ্রোতৃ-
দিগের নয়নেও জল আসিত। বাল্যকালে
রাজপুত্র চরণদিগের নিকট যত শোকের
গীত শিখিয়াছিলেন তাহাই গাইতেন,
ভিখারিণীর গীত গাইতেন, দুঃখিনীর
গীত গাইতেন, অনাধিনীর গীত গাই-
তেন, সায়ংকালের নিস্তব্ধতার সেই গীত
ছাদ হইতে ধীরে ধীরে নৈশ আকাশে
উদ্ভিত হইত, ধীরে ধীরে বায়ুমার্গে বি-
স্তৃত হইত, গীতের সহিত গায়কীর নয়ন
হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইত, অথবা
শোকপারাবার সহসা উপলিয়া উঠিত,
গায়কীর কণ্ঠক্লব্ধ হইত, গীত সহসা লীন
হইয়া যাইত।

দিবারাত্রি শোকচিন্তা শেষ হইত না,
দিবারাত্রি সেই পথেরদিকে সরযুবালা
চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়ব-
ল্লভ আর আসিলেন না।

বসন্তকালে রঘুনাথ বিদায় হইয়া-
ছেন, সে বসন্তকাল অতিবাহিত হইল,
স্বকণ্ঠ পক্ষীগুলি একে একে কুলায় হ-
ইতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষসমূহে স্তম্ভের
পুষ্পগুলি একে একে অদৃশ্য হইল, গ্রীষ্ম
কাল নানারূপ সুস্বাদু ফল আনিয়া মানব
হৃদয় আনন্দিত করিল, জগৎকে সুশো-
ভিত করিল। সরযুবালা সেই পথ চা-

হিয়া রহিয়াছেন,—সে পথে রঘুনাথ
দর্শন দিলেন না।

আকাশে মেঘাভ্রমর হইল, ক্রমে বর্ষার
ধারা আরম্ভ হইল, নদ নদী জলাশয় পূর্ণ-
কলেবর হইল, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য শোভা
পাইতে লাগিল, জলে মাঠ, বিল, প্রান্তর
প্লাবিত হইল। সেই প্রান্তরের উপর সরযু
একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়ে
কি এখনও কাঁষাসিক্তি লাভ করেন নাই,
হৃদয়ের কি এখনও সরযুকে মনে
আছে? হৃদয়ে কি কুশলে আছেন?
জলে নয়ন প্লাবিত হইল,—আর দেখিতে
পাইলেন না।

ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপসৃত হইল,
আকাশ পরিষ্কার হইল, নিশীথে শরচ্ছত্র
উদয় হইয়া গগণে ও ভগতে জ্যোতিঃ বি-
স্তার করিতে লাগিল। সরযুর হৃদয়াকাশ
কবে পরিষ্কার হইবে, হৃদয়নাথ কবে নি-
শানাথের ন্যায় উদয় হইয়া সরযুর মনে
আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন? সরযু
পথ চাহিয়া রহিলেন, হৃদয়নাথ আসি-
লেন না।

এরূপ ভীষণ চিন্তায় ক্রমে সরযুর শ-
রীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডু-
বর্ণধারণ করিল, গগন কালিমাবেষ্টিত হ-
ইল। সরলস্বভাব জনার্দন এখনও সরযুর
হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সর-
যুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি
চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে
লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযু অনেক ঘণ্টে শোক সজোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল, ক্রমে সেই কথা বৃদ্ধ জমার্দনের কণে উঠিল ।

জমার্দন সরল ও নির্মলচরিত্র, তথাপি জমার্দন রাজপুত, সকল রাজপুত ব্রাহ্মণের ন্যায় অতিশয় বংশমর্যাদাগর্ব্বী । যখন শুনিলেন, আপনার একমাত্র দুহিতা একজন সামান্য মহারাষ্ট্র সৈনিককে বিবাহ করিতে চাহে, বিদ্রোহীর সহিত বিবাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিতে চাহে ; তখন জমার্দনের নয়ন আরক্ত হইল, বৃদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল ।

গৃহভাস্ত্রের আসিয়া বালিকাকে ‘পাপীয়াসী’ ‘পীশাচী’ বলিয়া গালি দিলেন, সরযু পিতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেন, জগতে এরূপ কি যাতনা আছে হৃদয়বলভের জন্য নারী যে যাতনা সহ্য করিতে পরাধুখ ?

বৃদ্ধ, বাতুলের ন্যায় একমাত্র দুহিতাকে শোকার্ত নীরবে দেখিয়া ক্রোধ সঞ্চার করিলেন, সরযুকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনয়নে বলিলেন—

‘দেখ দেখি মা ! আমার মস্তকে একটি কেশও রুদ্ধ নাই, এই বৃদ্ধ বয়সে কি তুমি আমাকে যাতনা দিবে ?’ উঃ ! সে সময়েই তৎসমা সরযু সহ্য করিতে পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ ধরিয়া উঠিলে—

‘যদি রোদন করিতে লাগিলেন, পিতাও রোদন করিলেন ।

বৃদ্ধ সরযুর সখীদিগের দ্বারা সরযুকে অনেক বুঝাইলেন, অন্য যুবকের সহিত সরযুর বিবাহ স্থির করিতে চাহিলেন, নিজের কুল-গৌরবের কথা অনেক বলিলেন ।

সরযুর একই উত্তর ‘পিতাকে বলিও আমার বিবাহে কচি নাই, চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব ।’

বৃদ্ধ কণেক কণেক শোকার্ত হইতেন, কণেক কণেক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন । এক দিন ক্রোধপরবশ হইয়া সরযুকে বলিলেন—

‘সরযু ! আমি রাজপুত, রাজপুতরা কন্য়ার অবমাননা দেখিবার পূর্বে কন্য়ার হৃদয়ে ছুরিকা স্থাপন করে, চরণদিগের গীতে এরূপ শুনিয়া থাকিবে ।’

যীরে ধীরে সরযু উত্তর করিলেন—

‘পিতা, সেইরূপ জনকই যথার্থ দয়ালু ! পিতা আপনিও যদি সেইরূপ আচরণে আমার হৃদয়ের অসহ্য বেদনা লাভ করেন, আমি ক্রোধে ক্রোধে আপনার দয়ার কীর্তন করিব ।’—বৃদ্ধ অশ্রুনয়নে গৃহত্যাগ করিলেন ।

ক্রমে চারিদিকে এ কথা বিস্তার হইতে লাগিল, মন্ডলোকে আরও দুই একটি কথা বাড়াইল,—কেহ কেহ বলিতে লাগিল, জমার্দনের কন্যা ব্যাভিচারিণী ; তাঁহার বিবাহ হইতেছে না ।

যেদিন জনার্দন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার কলেবর ক্ষেপে কম্পিত হইতে লাগিল; গৃহে আসিয়া কন্যাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

‘পাপীয়সি, তোর জন্য কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অবমানিত হইব? তুই আমার নিছলক কুলে কলঙ্ক দিবি? আমার বাটি হইতে দূর হ।’

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণনয়নে সরসু উত্তর করিলেন—

‘পিতা! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি মার্জনা করুন, কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমাহইতে আপনার অবমাননা হইবে না।’

এ কথার অর্থ তখন জনার্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পর দিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন।

সেই দিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা একাকিনী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন, একাকিনী সংসারের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

হৃৎথে গৃহে খুলনা শরৎকাল ভাবে।

আশ্বিনে আলিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥

কার্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।

গৃহে নাহি আগনাথ করি বনবাস॥

যুগ্মদাম চক্রবর্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমলীয় আলোকে বেগবতী নীরা নদী বহিয়া যাইতেছে, স্বর্ধাকিরণে জলের হিলোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উত্তর পাশে সুন্দর শ্যামলক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পুঞ্জার যেন সমুদ্ভূত হইয়া মেদিনী সেই হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা স্রুদূরে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্বতরাশির উপর পর্বতরাশি বালস্বর্ধাকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটি সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল, গ্রামের এক প্রান্তে একটি কৃষকের কুটীরের নিকট একটি বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দামী দণ্ডারমান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটি গোলাঘর রহিয়াছে, পাশ্বে চারি পাঁচটি গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটির ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয় গৃহস্থানী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন ‘মাতঙ্গর’ লোক,—ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া, শ্যামবর্ণ, চঞ্চল,

প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল নয়না। একবার নদীকূলে দৌড়া দৌড়ি করিতেছে একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছেন, তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে অথবা প্রফুল্লতার হাস্য হাসিতেছে।

বালিকা বলিল, ‘দিদি, আয় না কালকের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব।’

দাসী। ‘না দিদি, মা বারণ করিয়াছেন, ঘাটে যেও না।’

বালিকা। ‘মা টের পাবে না।’

দাসী। ‘না ছি, মা যং বারণ করেন তা করিতে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে।’

বালিকা। ‘আচ্ছা দিদি, মা কি তো-রও মা হয়?’

দাসী হাসিয়া বলিল—‘হয় বৈ কি?’

বালিকা। ‘না সত্য করিয়া বল।’

দাসী। ‘সত্যই মা হয়।’

বালিকা। ‘না দিদি, তুই যে বামু-ণের মেয়ে, আমরা তো বামুণ নয়।’

দাসী বালিকাকে চুষন করিয়া বলিল ‘এতদূর যদি জান তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?’

বালিকা। ‘জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাঝে মাঝে বলিস্ কেন?’

দাসী। ‘যিনি আমাকে খাইতে প-রিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার

স্থান দিয়াছেন,—যিনি আমাকে মেয়ের মত লালনপালন করেন তাঁকে মা বলিব না ত কি বলিব? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।’

বালিকা। ‘ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি?’

দাসী। ‘না দিদি কাঁদব কেন।’

বালিকা। ‘তোর চক্ষে জল দেখলে আমার চক্ষে জল আসে কেন দিদি?’

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুষন করিয়া বলিল,—‘তুমি যে আমাকে ভাল বাস।’

বালিকা। ‘আর তুই আমাকে ভাল বাসিস্?’

দাসী। ‘বাসি বৈ কি।’

বালিকা। ‘বরাবর ভাল বাসবি, কখনও আমাকে ভুলবি নি?’

দাসী। ‘না, আর তুমি, দিদি তুমি আমাকে ভাল বাসবে, কখনও ভুলিবে না?’

বালিকা। ‘না।’

দাসী। ‘হাঁ তুমি আমাকে একদিন ভুলবে।’

বালিকা। ‘কবে?’

দাসী। ‘যবে তোমার বয় আসবে।’

বালিকা। ‘সে কবে?’

দাসী। ‘আর দুই একবৎসরের মধ্যেই।’

বালিকা । ‘না দিদি, তখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভাল বাসব । আর তুই দিদি,—তোর যখন বর আসবে তখন আমাকে ভুলবিনি ?’

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, তাহা মোচন করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, দ্বৈত হাস্য করিয়া বলিল,—

‘না তখনও ভুলব না ।’

বালিকা । ‘বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভাল বাসবি ?’

দাসী হাস্য করিয়া বলিল ‘সমান সমান ।’

বালিকা । ‘তোর বর কবে আসবে দিদি ?’

দাসী । ‘ভগবান্ জানেন ! ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই ।’ দাসী অন্ন প্রস্তুত করিতে গেল ।

পাঠক বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযুবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটিতে দাস্যহস্তি স্বীকার করিয়াছিলেন । কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনি ছিল, নাম গোকর্ণনাথ । গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকন্যাকে নিজের বাটিতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন । গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত ; নিরাশ্রয় ভদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেন । সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর প্রথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে হই-

বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, স্নতরাং কৃষক ও কৃষক-পত্নীর কার্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারিও দিন দিন সরযুর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন ।

সরযুনাথের অবর্তমানে যদি সরযুর কোথাও স্নতের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরল গৃহিণীর বাটিতে থাকিয়া সরযু পরম স্নত লাভ করিতে পারিতেন । গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ । গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটি ত্যাগ করিয়াছে ; শেষে যে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন । প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতেন । গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, ‘বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন ? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব ।’ সরযু স্নেহে উত্তর করিতেন, ‘মা, তুমি আমাকে যে রূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও ।’ স্নেহবাক্যে সরলস্বভাব বৃদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,

‘সরযু ! বাছা ভোর মত মেয়ে কখনও দেখি নাই, তোমার মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দি।’ পুত্র অনেক দিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিতেন ।

ত্রিপ্রহরের সময় যখন গোকর্ণ ও তাঁহার গৃহিণী গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতেন, সরযু বালিকাকে ঘুম পাড়াইতেন, পরে ধীরে ধীরে স্নান গৃহের পার্শ্ববর্তী সুন্দর বিশাল একটি আশ্রয়স্থানের তলে বসিয়া কখন বা স্ত্রী কান্দিতেন, অনেক ক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিতেন । বিশাল আশ্রয়স্থানের ছায়া অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিত, ত্রিপ্রহরের মৃদু বায়ু পত্র হইতে সুস্বাদু মধুর শব্দ আকর্ষণ করিত, দুই একটি কপোত বা শূষু সেই ছায়ার ডালে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে গীত গাইতে থাকিত, সেই সুস্বাদু শাস্ত পাদপঙ্খায় সরযু একাকিনী বসিয়া অনন্ত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন । ছয় মাস অতীত হইয়াছে হৃদয়বল্লভ স্বকার্যসাধনে গিয়াছেন, রঘুনাথ কবে আসিবেন, অন্তাধিনী কত দিন পথ চাহিয়া থাকিবেন ? এত দিন কি সরযুকে স্মরণ আছে ? যুদ্ধকালে, বিজয়ের কালে কি একবার স্মরণ করেন যে, দূর মহারাষ্ট্র দেশে একজন অভাগিনী তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন, তাঁহার আশায় জীবনী ধারণ করিয়া আ-

ছেন ? দিল্লীর অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত সুখ ! সে স্মৃতি রত হইয়া কি হৃদয়ের বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন ?

তৎক্ষণাৎ বিদায়ের কথা স্মরণ হইল, বিদায়ের সময় সরযুর হস্ত ধরিয়া রঘুনাথ যে সন্মোহের কথা গুলি বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল । না, রঘুনাথ দাসীকে ভুলিবেন না, তাঁহার প্রাণ অবিচলিত ! কার্যাসিদ্ধ হইলেই আসিবেন ।

ঐ স্বপ্নের পক্ষীর মত সরযু যদি একবার পক্ষ পাশ, তাহা হইলে এই ক্ষণেই সেই দূর দিল্লীতে উড়িয়া যায়, যথায় হৃদয়ে বসিয়া আছেন তথায় যায়, তাঁহার হৃদয়ে মস্তকখানি রাখিয়া সরযু একবার প্রাণতরে ক্রন্দন করে ।

এই রূপ নানা চিন্তায় দিবস অতিবাহিত হইত, বৈকালে পুনরায় গৃহকার্য করিতেন, সায়াংকালে যখন গোকর্ণ পরিবারের মধ্যে বসিয়া পুত্রের কথা, যুদ্ধের কথা কহিতেন, অবগুণ্ঠনবতী সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মনোনিবেশ করিয়া সেই কথা শুনিতেন ।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস অতিবাহিত হইল । এক দিন সায়াংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়াছেন, এক প্রান্তে সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এক্ষণে সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—

‘গৃহিণী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।’

গৃহিণী । ‘আহা ! তোমার মুখে কুল চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ ?’

গোক । ‘শিখি পাইব, পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,—অদ্য শুনিলাম দুই বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন, আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।’

গৃহিণী । ‘আহা ভগবান্ তাহাই কখন, প্রায় একবৎসর হইল বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তাহা ভগবানই জানেন।’

গোক । ‘ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবেলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীর সম্বাদ পাইয়াছি।’

সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উৎসেগে শ্বাস কঁক করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন । গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—

‘যে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?’

গৃহিণী । ‘আমি মেয়ে মানুষ আমার কি অত মনে থাকে?’

গোক । ‘পুত্র বলিয়াছিল ‘পিতা, রঘুনাথজী যদি বিদ্রোহী হইলেন তাহা হইলে আমি যেন কখনও খজা ধারণ করিতে না পারি। আমি হাবেলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে

আমি নাই, কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,—পশ্চাৎ জানিবেন, তখন রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন’ পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।’

সরযুর হৃদয় উল্লাসে উদ্বেগে দ্রুত দ্রুত করিতে লাগিল, তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে শ্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল । এ উদ্বেগ অসহ্য ।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন—

‘রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন কৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূর্ণ নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন; শুনিয়াছি শিবজী সাক্ষাৎসন্নে আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে জাতি বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবেলদারের পদ হইতে একেবারে ‘পাঁচ হাজারী’ করিয়া দিয়াছেন । সহরে অন্য কথা নাই, হাটে বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।’

আনন্দে, উল্লাসে সরযুর হৃদয় একেবারে উৎকণ্ঠ হইয়া উঠিল,—রমণী আর সছ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দ করিয়া মুচ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন !

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অপ্ন দর্শন ।

“বঁধু কি আর বলিব আমি ।

মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ

হইও তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল

প্রেমের কান্সি ।

সব সহপরিণা এক মন লইয়া নিশ্চয় হ-

ইলাম দাসী ॥

ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর

কেহ মোর কাছে ।

রাধা বলি কেহ মুখাইতে নাই, দাঁড়াব

কাহার কাছে ॥

একূলে ওকূলে গোকূলে দুকূলে,

আপনা বলিব কার্য ।

শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি

কমল পায় ?”

চণ্ডীদাস ।

অনেক শুভ্রবায় সরসু চেতনা প্রাপ্ত

হইলেন, হৃদয়ে সহসা বেদনা পাইয়াছি-

লেন বলিয়া গোকর্ণও তাঁহার স্রোকে ডু-

লাইলেন কিন্তু সেই অবধি উভয়ে সরসুর

আহার নিদ্রা নিয়মানুসারে হইত না, দিন

গণিতেন, প্রহর গণিতেন, দণ্ড গণিতেন,

সময়ে সময়ে পদ শব্দে চকিত হইতেন ।

চিন্তায় ও অতিশয় উত্তেজিত শরীরে রো-

গের সঞ্চার হইতে লাগিল ।

এক দিন, দুই দিন, দশ দিন, একমাস

অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ আসিলেন না ।

তখন সরসু আর সন্ধ্যা করিতে পারিলেন না ; চিন্তায় শরীর কণি হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে শরীর জ্বালা করিত, মধ্যে মধ্যে মুচ্ছা বাইতেন ।

রঘুনাথ জীবিত আছেন সরসু তাহা জানিলেন, রঘুনাথ তবে আসেন না কেন? সরসুকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন ! বজ্রাঘাতের ন্যায় সরসুর হৃদয়ে এই ভীষণ চিন্তার আঘাত হইল ।

দিন দিন এই হৃদয় চিন্তা প্রবলতর হইতে লাগিল, অবশেষে সরসু স্থির বুঝিলেন, বিজয়ী, গৌরবান্বিত রঘুনাথ অভাগিনী দুঃখিনীকে আর চাছেন না ! উঃ শেলসম এ চিন্তা প্রগল্ভীর হৃদয়কে ব্যথিত করে ! সরসুর পক্ষে জগৎ অদ্য শূন্য ! জীবন অদ্য অন্ধকারময় !

ঊষাদিনী ভূমিতে লুটাইয়া বলিতেন — ‘হৃদয়েশ ! কেন বাল্যকালে স্মৃতিচিহ্ন কথায় বালিকার মন ভুলাইয়াছিলে ? কেন বিদায়কালে সুরম্য আশাবাক্যে অবলাকে বুঝাইয়াছিলে ? তুমি পুরুষ, অদ্য তোমার পদোন্নতির সহিত নব নব উদ্দেশ্য হইতেছে, হৃদয় উদ্যম, হৃদয় আশা উদয় হইতেছে—জগৎ গুরুশত্রু, তোমার কার্যপরাশ্রয় বিস্তীর্ণ ও অব্যাহত । কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে ? হৃদয়ে হৃদয়ে যে আশা ভূমি স্থাপন করিয়াছে, অভাগিনী সেই আশা এখনও চিন্তা করিতেছে । মৃত্যুকাল অবধি সেই আশা সযতনে গোপন করিবে । বালিকার প্রেম

লইয়া যৌবনে একদিন খেলা করিয়া অ-
চিরে সে কথা বিস্মৃত হইলে, বালিকা সে
কথা বিস্মৃত হইতে পারে না; পুরুষের
খেলা,—রমণীর মৃত্যু।

কখন বা বিপ্রহর রজনীতে শোকা-
ত্বালা ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন, বলিতেন—

‘হা নাথ! জগত যখন আমাকে
তাগ করিয়াছিল, লোকে যখন নিন্দা ক-
রিয়াছিল, পিতা যখন তিরস্কার করিয়াছি-
লেন, তখন আমি সহ্য করিয়াছিলাম।
হৃদয়েশ্বর! শেষে কি তুমিও অভাগিনীকে
তাগ করিলে? দুঃখিনী তোমার নিকট
কি দোষে দোষী? তুমি আমার জন্য কষ্ট
স্বীকার করিয়াছ। নাথ! আমি কি কষ্ট
স্বীকার করি নাই? পিতা গালি দিয়া-
ছেন, অন্য লোকে মন্দ বলিয়াছে, হৃদ-
য়েশ! তোমার কথা শ্রবণ করিয়া সকল
সহ্য করিয়াছি। তোমার জন্য সংসার
হারাইয়াছিলাম, জগৎ তুচ্ছ করিয়া, পি-
তৃহু তাগ করিয়া, দেশে দেশে দাসী-
বেশে ভিক্ষা করিয়াছি; এখন কি শেষ
আশা ছিন্ন হইল! বিধাতা, তুমিও কি অ-
ভাগিনীকে তাগ করিলে?’

পুনরায় বলিলেন, ‘বিধাতা যদি চি-
রদুঃখিনী করিতেন, কারিক পরিশ্রমে যদি
জীবন ধারণ করিতে হইত, ভগ্নকূটরে যদি
বাস করিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া যদি
দিন বাপন করিতে হইত, হৃদয়েশ! সরস্ব
তোমাকে পাইলে এ সমস্ত উন্মাদে সহ্য
করিত! পিতা দূর করিয়াছেন, মাতা বা-

ল্যাকালে তাগ করিয়াছেন, হৃদয়নাথ,
তাহা সহ্য করিয়াছি! লোকে আমাকে
কলঙ্কিনী বলিয়াছে, জগতে নিন্দা করি-
য়াছে, নাথ, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তো-
মার চিন্তা করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি,
জগতে এরূপ কি আছে অভাগিনী তো-
মার জন্য যাহা সহ্য করিতে না পারে?
রোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যে
কোন ক্লেশ এ দুঃখিনীকে দিতেন, নাথ!
তোমাকে পাইলে সমস্ত সহ্য করিতে পা-
রিতাম। কিন্তু সরস্বর জীবন এখন শূন্য!
নাথ, চিরজীবী হও, তোমার যশ, তো-
মার মান, তোমার ধনের সীমা থাকিবে
না, অনেক দাসী পাইবে, কিন্তু সরস্বর
ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে পারিবে না!
আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই,
জগদীশ্বর তোমাকে মুখে রাখুন।’ নয়ন-
জলে বালিকা শরীর আত্ম করিল। শেষে
শ্রান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলি-
লেন—‘বাল্যকালে মাতাকে হারাইলাম,
যৌবনে ধর্মপরাগণ পিতা হারাইলাম।
নাথ! অন্য তুমিও অভাগিনীকে পায়ে চে-
লিলে। তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত
থাকিতে সরস্ব যেন তোমার নিন্দা না
করে। অন্য তুমি বড় লোক, অনেক
ভাগ্যবতী তোমার পার্শ্বে বাসিবে, অভা-
গিনী সরস্বর বাল্যকালে মনে একদিন এ-
কটি আশার উদয় হইয়াছিল, দুঃখিনী
তাহা ত্যাগ করিয়াছে, অচীরে জীবন
ত্যাগ করিবে।’

এই রূপ দিবানিশি চিন্তা করিতেন, আহা! নিত্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিতে লুটাইতেন, অথবা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিতেন।

গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রী অনেক শ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু সরযুর হৃদয় শান্ত হইল না; তাঁহার হৃদয়ের কথাও কেহ জানিতে পারিল না। হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, প্রায় নয় মাস হইতে এইরূপ পীড়া হইয়াছে, বেদনা আসিলে রোদন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল এইমাত্র সরযু বলিতেন। সরল স্বভাব গৃহিণী তাহাই বিশ্বাস করিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযু নদীকূলে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন, হস্তে গাণ্ডুল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণের কন্যা আসিয়া ধীরে ধীরে সরযুর পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—

‘দিদি! তোর বুকে বেদনা হইয়াছে তবে তুই অত ভাবিস কেন? ভাবলেই ও বেদনা বৃদ্ধি হয়।’

সরযু। ‘না দিদি, ভাবলে বেদনা একটু কমে, সেই জন্য ভাবি।’

বালিকা। ‘তুই কি ভাবিস দিদি? তোর বরের কথা বুঝি ভাবিস?’

সরযু। সজল নগনে দ্বিধা হাসিয়া বলিল ‘হাঁ বরের কথাই ভাবি।’

বালি। ‘বর কবে আসবে?’

সর। ‘বর আমাকে তুলিয়া গিয়াছে।’ সরযুর মুখে হাস্য, চক্ষে জলবিন্দু!

বালি। ‘তবে কি হবে?’

সর। ‘আর একজন বন্ধু আমাকে বিবাহ করিবে।’

বালি। ‘সে কে দিদি?’

সর। ‘যম।’

বালি। ‘সে কে?’

সর। ‘আমার মত যাহাদের বরে তুলিয়া যায়, যম তাহাকে বিবাহ করে।’

বালি। ‘তাঁহার ত বড় দয়ার শরীর।’

সর। ‘অতিশয় দয়ার শরীর; আহা! কবে সে আমাকে নেবে?’

বালি। ‘সে তোকে বিবাহ করিলে তোর পীড়া আর থাকিবে না?’

সর। ‘না; সমস্ত কষ্ট নিবারণ হবে। হা জগদীশ্বর!’

বালি। ‘সে কবে আসিবে?’

সর। ‘আজ রাত্রিতে!’

ক্ষণেক এইরূপ কথার পর বালিকা শয়ন করিতে গেল,—সরযু একাকিনী সেই নদীকূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল, আকাশে তারাগুলি মিট মিট করিতেছে, সম্মুখে নদী কূল কূল শব্দ করিয়া বহিয়া বাইতেছে। সরযু নদীর দিকে চাহিলেন, পার্শ্বস্থ কুঞ্জবনের দিকে চাহিলেন। শেষে সেই মৈশ আকাশের দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরমেন্ত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

‘জীবিতনাথ ! সরযুর লীলাখেলা শেষ হইল, সরযুকে বিদায় দাও ! বাল্যকালে একদিন ঐ দেবমূর্তি দেখিয়া বালিকার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে সরযুর হৃদয় শান্ত । শান্ত—কিন্তু সেই অবয়ব এখনও হৃদয় ধারণ করিতেছে, যতদিন সরযু জীবিত থাকিবে সেই মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিবে । রঘুনাথ ! অভাগিনীকে মৃত্যুর বিলম্ব নাই, কিন্তু মৃত্যুর সময়ও ঐ দেবমূর্তি সরযু মননে দেখিতে থাকিবে, ঐ মধুময় কথাগুলি কর্ণে শুনিতে থাকিবে, তোমার মধুময় নাম উচ্চারণ করিবে, তোমার স্রন্দর মুখচ্ছবি হৃদয়ে স্মরণ করিবে । বাল্যকালে যে আশা দিয়াছিল, তাহা যদি সফল হইত, জীবিতেশ্বর ! দাসী তোমার সেবার ক্রটি করিত না, দাসী বিশ্বাসঘাতিনী হইত না । কিন্তু সে কথায় কায় নাই, সে আশা দূর করিয়াছি, মৃত্যুর প্রাক্কালে জগদীশ্বরের নিকট সরযুর প্রার্থনা যেন তুমি চিরজীবী হও, যেন জগদীশ্বর তোমাকে চিরশুখে রাখেন । আর সরযুর হৃদয়ে খেদ নাই । জীবিতনাথ ! সরযুকে বিদায় দাও, যদি কষ্ট না হয়, তোমার মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে জীবন বিসর্জন করিয়াছে, কখন কখন সে অভাগিনীকে স্মরণ করিও ।’

অভাগিনী নগ্ন মুদিত করিলেন ; অনেকক্ষণ সেই দেবনির্মিত পুরুষের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । ‘আহা ! সেই মধুময় কথাগুলি যেন এখনও সরযু শুনি-

তেছেন ‘সরযু ! সরযু ! আমি তোমার রঘুনাথ !’

নগ্ন উদ্বীলিত করিলেন,—সহসা তারকালোকে সেই দীর্ঘাকার বীরপুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন ;—বাৎসর্য সরযুর দিকে প্রসারিত, চক্ষুর্ভয় অশ্রুপূর্ণ !

এ কি রোগীর স্বপ্ন মাত্র ? বিদাতি ! এ বিড়ম্বনা কি জন্য ? সরযু নগ্ন পুনরায় মুদিত করিলেন ।

এ স্বপ্ন নহে, এ বিড়ম্বনা নহে ! সরযু পুনরায় চাহিলেন, কি দেখিলেন ?

দেখিলেন হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ ! সরযুর তপ্ত হৃদয় সেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হইল, সরযুর ঘনশ্বাসের সহিত রঘুনাথের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল সরযুর কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল !

উঃ ! সে স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল, বালিকা সংজ্ঞাশূন্য ! একি প্রকৃত না স্বপ্ন ? আনন্দভরে বায়ুতড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন ‘জগদীশ্বর ! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখ নিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই !’

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ ।

জীবন নির্বাণ ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন ।

যথা ধর্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন ।

ধর্ম অনুসারে জয় দৈবের বচন ।

কাশীরাম দাস ।

মহারাজ্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল । শিবজী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, পুনরাগ্ন আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, স্নেহ-দিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন । নগরে প্রাণে পথে ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল ।

এদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না । তিনি বার বার দিল্লীর সত্ৰাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সৈন্য সমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই । তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন । আরংজীব তাঁহার প্রতি এরূপ অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সত্ৰাটের কার্য্যে ভদ্রাসা প্রকাশ করিলেন না । যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাজ্র দেশ ত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সত্ৰাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন । লোহগড়, সিংহগড় পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে, সত্ৰাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, ভক্তি য়ে য়ে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে ।

কিন্তু এ ক্ষণিতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই ; জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্ত তাঁহাকে দক্ষিণ দেশের সেনাপতি হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে ‘তলব’ করিলেন, যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন ।

রুদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধামতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন ; শেষ দশায় এ অবমাননার তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুমুখোন্মুগ্ন হইলেন ।

অবমানিত, পীড়িত, রুদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুমুখোন্মুগ্ন হইয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন—

‘মহারাজ ! একজন মহারাজ্র সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী । তিনি বলিলেন যে তিনি আপনার চরণোপাস্তে বসিয়া এক দিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক দিন উপদেশ পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন ।’

রাজা উত্তর করিলেন—

‘সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইল । তিনি দিল্লীর শত্রু কিন্তু দূতরূপে আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি, রাজপুত্রের বাক্যের অন্যথা হয় না ।’

‘কণেক’ পর একজন মহারাজ্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন ।

রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—

‘সুহৃদ্র শিবজী! মৃত্যুর পূর্বে আর একবার দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না, আসন গ্রহণ করুন।’

সজ্জননয়নে শিবজী বলিলেন, ‘পিতাঃ! যখন শেষ আপনাদের নিকট বিদায় লইয়াছিলাম তখন আপনাকে এত লীজ্ঞ রূপে অবস্থায় দেখিব কখন মনে করি নাই।’

জয়। ‘রাজন্! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি।’ ক্ষণেক পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ‘শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলাম; এখন কি দেখিতেছ?’,

শিব। ‘মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ অরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।’

জয়। ‘বৎস! তাহা মহে। রাজ-হানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অশ্রু জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের নাগ্ন সহস্র যোদ্ধা এখনও বর্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি বুদ্ধি নাই।’

শিব। ‘আপনার অমূল্য অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?’

জয়। ‘শিবজী! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।’

শিব। ‘নিবেদন করুন।’

জয়। ‘যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীস্থরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; আপনাদের স্থির সংকল্প ছিল, দিল্লীস্থর যত দিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনাদের প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণ দেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থাকিত, কপটাচরণ বশতঃ সেই স্থানে একজন দুর্দমনীয় শত্রু হইয়াছেন।’

শিব। ‘মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানেন।’

জয়। ‘আরও প্রবণ করুন। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যত দূর সাধ্য, দিল্লীস্থরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি, বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপন বিবেচনা করি নাই, বাহ্যিক কার্যে রতী হইয়াছি জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্যসাধন করিয়াছি। বুদ্ধকালে সম্রাট আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন,

পরে অবমাননা করিলেন। সে জন্য আমার কার্যে বৈলক্ষণ্য নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী, তাহার বিদ্যা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে আরংজীব অস্বস্তি প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বরাধিপেরা দিল্লীস্থরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অস্ত্রের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।’

ক্রোধে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, মহাত্মা জয়সিংহ সে ক্রোধ নিবারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

‘দুইটি উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্র দেশের ও অস্বর দেশের। সমস্ত ভারতবর্ষে এইরূপ। শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষে বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন, বারাগসী মন্দির বিনষ্ট করিয়া ওখান মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে, সর্বদেশে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া করস্থাপন করিতেছেন।’ ক্ষণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন—যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিবা চক্ষু উদ্বীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—‘শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চারি দিকে যুদ্ধা-নল প্রজ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল প্রজ্ব-

লিত হইল, মহারাষ্ট্রে অনল জ্বলিল, পূর্ব দিকে অনল জ্বলিল। আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্বাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; রক্ত বয়সে পশ্চাৎ তাপ করিয়া দিল্লীস্থর প্রাণভাগ করিলেন। অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীরগণ। অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর।’

রাজার বচন রোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন তাঁহার নানা ঔষধি দিলেন, কিন্তু জয়সিংহ অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে বলিলেন, ‘কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে; সত্যমেব জয়তি।’

শাস রোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ নির্গত হইল।

শিবজী বালিকার ন্যায় উঠেঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; মৃত জয়সিংহের পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন প্রভাত।



‘ধর্মুর্জর আছ যত, সাজ শীত করি
চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে তুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে তুলিতে !,
মধুস্থদন দ্রুত।

রজনী এক গ্রহর মাত্র আছে এরূপ
সময়ে শিবজী রাজপুতশিবির ত্যাগ করি-
লেন। বাহিরে আসিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রা-
হ্মণকে দেখিতে পাইলেন, চিনিলেন তিনি
রাজা জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলিলেন, ‘রাজন্ ! মহারাজা
জয়সিংহ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন,
যে তাঁহার মৃত্যুর পর আপনার হস্তে এই
সমস্ত কাগজ দিব। এত দিন এ সমস্ত
সাবধানে রাখিয়াছিলাম, আপনি এক্ষণে
গ্রহণ করুন।

শিবজী সে সময়ে অতিশয় শৌকার্ত্ত
ছিলেন; কোন উত্তর না করিয়া সেই
কাগজ লইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন
করিলেন।

প্রাতঃকালের পূর্বেই প্রধান প্রধান
সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করি-
লেন। ক্রমে পুরোষাচার্য করিলেন, পরে
শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত
সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন—

‘বন্ধুগণ ! প্রায় একবৎসর হইল আ-
মরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করি-
য়াছিলাম; আরংজীবের নিজের দোষে

ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি খণ্ডন হই-
য়াছে; অদ্য আমরা সে কপট আচরণের
পরিশোধ করিব,—মুসলমানদিগের স-
হিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

‘যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি
ছিলেন, ঈশানীদেবী যাহার সহিত যুদ্ধ
নিষেধ করিয়াছিলেন; যাহার নিকট শি-
বজী বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন;
অদ্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ
আরংজীবের অসদাচরণে ভগ্নচেতা হইয়া
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। সৈন্যগণ !
দিল্লীতে আমার কারাবরোধ, হিন্দুপ্রবর
জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত এক্ষণে আমরা
পরিশোধ করিব।

‘চারিদিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিকে
হিন্দুর অবমাননা,—হিন্দুদেবের অবমাননা
দেবালয়ের অবমাননা। হিন্দুগণ, অদ্য
আমরা এ অবমাননা দূর করিব; এশোক,
এ অবমাননার যদি পরিশোধ থাকে,
বীরগণ ! রণরঙ্গে আমরা ইহার পরিশোধ
করিব।

‘মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দি-
বাচক্ৰ উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখি-
লেন মোগলদিগের ভাগ্যান্ধ্র অবনতি-
শীল,—মহারাত্রীদিগের ভাগ্যান্ধ্র উ-
ন্নতিশীল,—দিল্লীর সিংহাসন দ্বরায় শূন্য
হইবে; বন্ধুগণ অগ্রসর হও, যুদ্ধার্থ ও
পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার
করিব।

‘পূর্বদিকে রক্তিমাক্ষট দেখিতে পা-

ইতেছে, ও প্রভাতের রক্তিমাস্ফটা । কিন্তু ও আমাদিগের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে ; মহারাষ্ট্রীগণ ! হিন্দুগণ ! অদ্য আমাদের **জীবনপ্রভাত !**”

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জিয়া উঠিল, ‘অদ্য আমাদের **জীবনপ্রভাত !**’

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ ।

বিচার ।

—•••••

‘পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত ।’
কাশীরাম দাস ।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণা করিতেছিলেন ; আপনীর পদোন্নতি, সরসুর সহিত পুনর্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এইরূপ নব বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল । সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন—

‘রঘুনাথ !’

রঘুনাথ পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন চন্দ্রাও জুম্ভাদার ! রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু দেশানীমন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মিত করেন নাই ।

চন্দ্রাও বলিলেন, ‘রঘুনাথ ! এজগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব ।’

রঘুনাথ রোষ সঞ্চার করিয়া দীর্ঘশ্বরে বলিলেন, ‘চন্দ্রাও ! কণ্টার্চারী, মিত্র-হন্তা চন্দ্রাও ! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন,—জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।’

চন্দ্র ! ‘বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই । তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথা শুন ।

‘জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু । বাল্যকালে তোমাকে আমি দিবাচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে ! তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশাত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিজোহী বলিয়া অবমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি ! চন্দ্রাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল ।

‘তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত পদ লাভ করিয়া সৈন্যমাধ্যে আসিয়াছ । চন্দ্রাওয়ের হির প্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না । অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নিব্বাণ করিব । ভীক ! তোমার অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই ।’

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিত-
তেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন ‘পামর !
সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র
প্রতিজ্ঞা বিন্যস্ত হইব, সহসা তোমার পাপের
দণ্ড দিব।’

চন্দ্র। ‘ভীক ! এখনও যুদ্ধে পরা-
জুখ, তবে আরও শোন্। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে
যে ভীরে তোর পিতায় হৃদয় বিদীর্ণ হই-
য়াছিল সে শত্রুনিশ্চিন্ত নহে, চন্দ্রাও
তোমার পিতৃহন্তা !’

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পা-
ইলেন না, কর্ণেশুনিতে পাইলেন না, রোষে
অসি নিক্ষেপিত করিয়া চন্দ্রাওকে আ-
ক্রমণ করিলেন। চন্দ্রাও ও ক্ষীণহস্তে
অসি ধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ
হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের শরীর ক্ষ-
তবিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষায় ধারার স্রায়
উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।
চন্দ্রাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ
দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া-
ছিলেন, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্রাওকে
পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পা-
তিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জামু স্থা-
পিত করিলেন ; বলিলেন—

‘পামর ! অদ্য তোর পাপরাশির শেষ
হইল, পিতা ! আপনায় মৃত্যুর পরিশোধ
হইল।’

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্রাও নির্ভীক ; বি-
কট হাস্য হাসিয়া বলিলেন, ‘আর তোর
ভগ্নী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া স্মৃথে

প্রাণ বিসর্জন করিব।’ পুনরায় হাস্য ক-
রিয়া উঠিলেন।

বিদ্রোহের নায় সমস্ত কথা তখন রঘু-
নাথের মনে উপদন্ধি হইল ! এই জন্য
লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এই জন্য
চন্দ্রাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করি-
য়াছিলেন ! পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দ্রাও
বলপূর্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করি-
য়াছে ! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি
বহির্গত হইতে লাগিল ; দস্ত কড়মড় ক-
রিল ; কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্রাও-
য়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না ; তিনি ধীরে
ধীরে চন্দ্রাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান
হইলেন।

কম্পিতস্বরে কহিলেন ‘পিশাচ !
তোমার পাপ জগদীশ্বর বিচার কখন, রঘু-
নাথ তোমার দণ্ড দিতে অক্ষম !

‘দোষের, বিদ্রোহিতার দণ্ড দিতে
অক্ষম নহি, বলিয়া পশ্চাৎ হইতে এক-
জন লোক নিকটে আসিলেন, রঘুনাথ
চাহিয়া দেখিলেন শিবজী !

শিবজী ইঙ্গিত করাতে অন্তরাল হইতে
চারিজন সৈনিক আসিল, চন্দ্রাওয়ের হস্ত
বদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দীস্বরূপ লইয়া গেল।

পর দিন প্রাতে চন্দ্রাওয়ের বিচার।
রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন,
সে দোষের বিচার নহে ; রঘুনাথকে কল্যা
অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দো-
ষের বিচার নহে ; ক্রমশঃ লুপ্ত আক্রম-
ণের পূর্বক শত্রু রহস্যময়ীকে গুপ্ত সংবাদ

দিয়াছিলেন, পরে সে দোষে রহুনাথকে দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহারই বিচার।

পূর্বে বলা হইয়াছে—আফগান সেনাপতি রহমৎখাঁ কত্মগুলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হইলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা ব্যথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।’

রহমৎখাঁ বলিলেন—‘আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন ককন, আপনার নিকট আমার অবস্তব্য কিছুই নাই।’

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, ‘কত্মগুল আক্রমণের পূর্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল; সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অনায় দণ্ডিত হইয়াছে।’

রহমৎ। ‘আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু পাঠানপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্তি।’

জয়সিংহ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, ‘যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোনও নিদর্শন থাকে তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?’

রহমৎ। ‘প্রতিজ্ঞা ককন সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করিবেন না।’

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন; তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন।

রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্রাও!

চন্দ্রাও রহমৎখাঁকে অহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্রাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পা-

ইয়াছিছেন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন।

জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচার কার্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাধা হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিজোহী, অসং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী নিষ্কলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন একথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন—‘পাপাচারী বিজোহী তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে।’

মৃত্যুর সময়ও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দমনীর দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ববৎ। বলিলেন—

‘আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ। এক দিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর এক দিন আর এক জনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিমু বিসর্গে জানে না, এসমস্ত প্রমাণ মিথ্যা।’

এই বিজ্ঞপ্তি শিবজী মর্যাস্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন—

‘জলাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর; তাহা হইলে আর ঘৃণ্য হইতে পারিবে না, তাহার পর তপ্ত লৌহদ্বারা ললাটে ‘বিশ্বাসঘাতক’ অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

জলাদ এই হৃৎসং আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, এক্ষণে সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।

শিব। ‘রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেন না এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। ‘মহারাজের অস্বীকার অলঙ্ঘ্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাক্সা করি, যে চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্ত দিন।’

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও শুদ্ধ।

শিবজী ক্রোধ সঞ্চার করিয়া কহিলেন—

‘তোমার প্রতি যে অত্যাচার করা হইয়াছিল,—তোমার অনুরোধে সে জন্য চন্দ্ররাওকে রক্ষা করিলাম। রাজ-বিজোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জলাদ আপন কার্য্য কর।’

রঘু । ‘মহারাজের বিচার অনিন্দ-
নীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা
চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তি
দান করুন ।

শিব । ‘এ ভিক্ষা দানে আমি অসমর্থ,
রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম,—
অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না । শিব-
জীর নয়ন প্রজ্বলিত হইতেছিল ।

রঘু । ‘প্রভু দুই একটি মুহুর্তে এ
দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া-
ছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার
দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, অতঃ সেই পুর-
স্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে
মুক্ত করুন ।

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি-
কণা বাহির হইতেছিল ; গর্জন করিয়া
বলিলেন ‘রঘুনাথ ! রঘুনাথ ! কখন ক-
খন আমাদের উপকার করিয়াছিলে ব-
লিয়া অদ্য আমাদের বিচার অন্যথা
করিতে চাহ ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয়
না ; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা
আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও ।

এ তিরস্কার বাক্যে রঘুনাথের মুখ
আরক্ত হইয়া উঠিল ; ধীরে ধীরে কম্পিত
স্বরে উত্তর করিলেন,—

‘প্রভু ! পুরস্কার চাহা দাসের অ-
ভ্যাস নাই । অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথম-
বার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ
পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন, দাস দ্বি-
তীয়বার চাহিবে না । দাসের কেবল

এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে
বিদায় দিন, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ভাংগ
করিবে, পুনরায় গোলামী হইয়া দেশে
দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে ।’

শিবজী অনেকক্ষণ নিশ্চব্দ হইয়া রহি-
লেন, রঘুনাথের নিকট কত উপকার প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন স্মরণ করিলেন,—রঘুনাথের
চক্ষুতে জল দেখিয়া কাতর হইলেন, ক্রোধ
বিলুপ্ত হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

‘রঘুনাথ ! তোমার যাক্সা দান করি-
লাম ; চন্দ্ররাওকে মুক্ত করিলাম ; রঘু-
নাথ ! যে ব্রত ধারণ করিয়াছ তাহা-
তেই অবস্থিতি কর,—চিরকাল শিবজীর
দক্ষিণ হস্তের ন্যায় হইয়া থাকিও ।’

সভাসদ সকলে নিশ্চব্দ ! সকলে
স্বগার সহিত চন্দ্ররাওয়ের দিকে চাহি-
লেন,—

ঘোর অভিমানী চন্দ্ররাও সাধারণের
এ-স্বগা ও নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারি-
লেন না, রঘুনাথের দয়াতে তাঁহার রক্ষা
হইল এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না ।

চন্দ্ররাও ভীক নহেন । ধীরে ধীরে
ক্রোধ-জর্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট
যাইয়া বলিলেন—

‘বালক ! তোমার দয়া আমি চাহি
না, তোমার দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি,
তোমার অনুগ্রহে আমি এইরূপে পদাঘাত
করি, বলিতে বলিতে রঘুনাথের বক্ষঃস্থলে
পদাঘাত করিলেন । পরে কণে আপন
ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অ-

ভিমানী ভীষণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্রাও জয়লাভের
সাধারণের ঘৃণা হইতে আপনার চিরনিষ্কৃতি
সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ মতা-
স্থলে পতিত হইল!

—o—o—o—

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জাতা ভগিনী।

—

‘সুত পরিবার,

কেবা বল কার,

যেমত রক্ষের ছায়া।

জলবিশ্ব প্রায়,

সকল মিছাময়,

কেবল ভবের মায়া॥

কীৰ্ত্তিবাস ওয়া।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে;
একগুণে নায়ক নায়িকাদিগের বিষয় দুই এ-
কটি কথা বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট
বিদায় লইব।

রক্ত জনার্দন কন্যাকে ছাড়াইয়া বাতু-
লের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে
পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন, ‘সরযু! সরযু! তোমার ন্যায় রক্ত
আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম? তোমাকে
ত্যাগ করিয়া কি একদিনও জীবন ধারণ
করিতে পারি?’ সরযুও পিতার গলা
ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—‘পিতঃ,
আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, জীবন ধা-
কিতে আর কখনও আপনার ছাড়া হ-
ইব না।’

পুলকিত হৃদয়ে রক্ত শুনিলেন যে রঘু-
নাথ রাজপুত্র-সন্তান, অতি উন্নত ব্রাহ্মণ-
বংশীয় বীরপ্রবর গজপতি সিংহের পুত্র;
মানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যা দান করি-
লেন। সরযুর স্মৃতি কে বর্ণনা করিবে?
চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়া-
ছিলেন, সেই পুরুষ-দেবকে যখন আপন
কোমলহৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার
ওষ্ঠে যখন ঊষ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন
সরযু স্মৃতি উদ্ভাসিত হইলেন। যাহারা
সে স্মৃতি ভোগ করিয়াছে, অনুভব কর,
লেখক বর্ণনায় অক্ষম!

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদ্বর্গে
যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কি অল্প
সার্থক হইল? সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার
বার সরযুর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই
পুষ্পবিনিমিত্ত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন,
সেই বিশাল স্নেহপূর্ণনয়নের দিকে চাহিয়া
চাহিয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন!

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া ‘দিদি’
কে বিম্বিত হইলেন না। রঘুনাথের অনু-
রোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জাগরী
দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীম-
জীকে উন্নতি দান করিয়া হাবেলদার পদে
নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদির সর্বদাই আপন গৃহে
রাখিতেন, ও বরের সহিত ‘সামান সমান’
ভাল বাসিতেন,—কয়েক বৎসর পরে
একটি সন্তানীয় সূচরিত্র পাত্র দেখিয়া দি-
দির বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিবসে স-

রঘু ও রঘুনাথ অসং উপস্থিত রহিলেন ; সরযু কন্ঠার কাণে কাণে বলিলেন,— ‘দেখিও দিদি! যাহা বলিয়াছিলে সে কথা যেন রাখিও,—বরের চেয়ে আমাকে ভাল বাসিবে!’

রঘুনাথ আধ্যাতিকাবিরত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত সিংহ যখন জানিতে পারিলেন রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অনুচর গজপতি সিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন, তাহা ভিন্ন অনেক জারগীর দান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দে চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, যখন অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিককে একে একে অবমানিত বা কারাকদ্ধ করিতে লাগিলেন; রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযু ও জনার্দনের সহিত অদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন, পৈতৃক জারগীর অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রশস্ত গৃহ রঘুনাথ ও সরযুর বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াশয় ও হাস্যধ্বনিতে শব্দিত হইতে লাগিল।

পাঠক! ইচ্ছা এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর এক জনের কথা বলিতে বাকি আছে; শান্ত চির-সহিষ্ণু লক্ষ্মীকপিণী লক্ষ্মীর কি হইল?

যেদিন চন্দ্রাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ অনতিবিলম্বে তর্পণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলাগিত বেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণনা করিতে পারে? অজ্ঞ লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নিসর্গ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে, বিষাদে, নৈরাশে, নব বৈধব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আর্তনাদ করিতেছে।

রঘুনাথ সাস্তুনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সাস্তুনা দূরে থাকুক লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। আর আর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ অক্ষর শব্দ অক্ষপুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুতলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদুপদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—

‘ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল আমার পারম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।’

মাস্তানয়নে রঘুনাথ বলিলেন—‘প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?’

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন—

‘সত্য ভাই, তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি! আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুরে রাখুন।’ নিজের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল মোচন করিলেন।

রঘু। ‘লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকাল জানি, অনহা শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল ঘটয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর, আইস আমার গৃহে আইস, জাতির ভালবাসায় জাতির যত্নে যদি সম্ভব দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ক্রটি করি না।’

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈশ্বর হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—

‘ভাতা, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সাস্থনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বর চির নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।’

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শাস্ত ভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মী সহমরণে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন; দীর্ঘ শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর ‘হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।’

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—

‘লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন নৈরাশে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কণায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি ভা-

তার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভাতাকে ভালবাস না?'

লক্ষ্মী পূর্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—

‘ভাই সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটি যাইলে অন্যটি থাকে, একটি চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয়। ভাই তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটি রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুখ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটি হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অদ্য সদয় হও, লক্ষ্মীর একমাত্র স্মৃতির পথে কাঁটা দিও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন তাঁহার সহিত যাইতে দাও!’

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন; স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় ঝর ঝরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভাতা ভগিনীর অঞ্চলীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র

স্বিচ্ছ প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময় ভাতা বা স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্ররাগের শব্দ তাহার উপর স্থাপিত হইল, হাস্যবাদনা লক্ষ্মী স্মরণ পট-বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। চিতা পার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সাঙ্গুনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূসি লইলেন, মপত্নীদিগের আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে রঘুনাথের নিকট আসিলেন—

বলিলেন ‘ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে তুমি বড় ভালবাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভালবাসার কাজ কর—সম্মুখে কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।’

রঘুনাথ আর সছা করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটি হাত ধরিয়া উল্টে-স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সন্মুখে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া
লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন—

‘ছি ভাই শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল
কি জন্য ? পিতার ন্যায় তোমার সাহস,
পিতার ন্যায় তোমার সহৎ অন্তঃকরণ, জ-
গদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করি-
বেন; জগৎ তোমার বশে পূর্ণ হইবে! ল-
ক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘু-
নাথকে স্মৃতে রাখেন ! ভাই, বিদায় দাও,
দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।’

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছজ্ঞান
হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি
আছে ? প্রাণের লক্ষ্মী ! তাকে কিরূপে
বিদায় দিব, তাকে ছাড়িয়া আমি কি-
রূপে জীবন ধারণ করিব ?’ আত্মনাশ ক-
রিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন ।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে
উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দি-
লেন, অনেক সাহসনা করিলেন, অনেক
বুঝাইলেন, বলিলেন, ‘ভাতঃ তুমি বীর-
শ্রেষ্ঠ ! পুরুষের যাছা ধর্ম্ম তাছা তুমি পা-
লন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর
ধর্ম্ম পালন করিতে দাও । আর বিলম্ব ক-
রিও না, বাধা দিও না ; এই দেখ পূর্-
দিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার
লক্ষ্মীকে বিদায় দাও ।’

গদ্ গদ্ স্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এজগতে তো-

মাকে বিদায় দিলাম, এই আকাশে এই পু-
ণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব ।
সে পর্যান্ত জীবন হইয়া রহিলাম ।’

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতা-
পার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মন্তক স্তা-
পন করিয়া বলিলেন ‘হৃদয়েশ্বর ! জীবনে
তুমি দাসীকে বড় ভাল বাসিতে, এখন অ-
মুণ্ড কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া
তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন
তোমাকে স্বামী পাই,—জন্ম জন্ম যেন
লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায় ।
জগদীশ্বর ! লক্ষ্মীর অন্য কামনা নাই ।’

ধীরে ধীরে চিতা আরোহণ করিলেন,
স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তি-
ভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন । নয়ন
মুদ্রিত করিলেন,—বোধ হইল যেন সেই মু-
হূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল ।

অগ্নি জ্বলিল, অতিশয় যত থাকায়
শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল । প্র-
থমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লে-
হন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারি
দিক বেষ্টিত করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর
উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধা-
বমান হইল । লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল
না, একটি কেশ কম্পিত হইল না ।

এক প্রহরের মধ্যে অগ্নি নির্বাণ হ-
ইল ; কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য, চিতার সেই
নৈরাশজনক ধূ ধূ শব্দ রঘুনাথ জীবনে
বিস্মৃত হইলেন না ।

আর্য্যাবর্ষেদ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

এ দেশের প্রায় সমস্ত আর্য্যকারই 'কবিচিত্ত ফুলবনমধু কল্পনার' মাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। কেবল স্মৃতিশাস্ত্রকারগণই এই কল্পনাম্পৃহা কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন ; তথাপি তাহারাও জগৎপতি প্রকরণাদিতে অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক অপরাপর সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে স্মৃতিকারগণ বড় একটা উপন্যাস বা অলঙ্কারের ছটা প্রকাশ করিয়া কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিতে ব্যাকুল হন নাই। দেখা যাউক অমৃতচার্য্য ধনুস্তরির সম্বন্ধে ইহার। কি বলেন। ব্রাহ্মণবৈশ্যকন্যাগ্রামস্বর্গো নাম জায়তে। নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পরাশর উচ্যতে ।

মতুঃ ।

বিশ্রাম্যুর্দ্ধাবসিতোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ-
স্ত্রিয়াম্
অস্বর্গঃ শূদ্রাংনিবাদোজাতঃ পারশরোহ-
পিবা ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

বৈশ্যায়্যং ব্রাহ্মণজাতোহস্বর্গোহি মুনি
সত্তমঃ ।

ব্রাহ্মণঃ চিকিৎসার্থং নির্দিষ্টো মুনি-
পুঙ্গবৈঃ ॥ পরাশরঃ ।

বেদান্তজাতোহি বৈদ্যাঃ স্যাদস্বর্গো ব্রহ্মপু-

ত্রকঃ ॥ শঙ্কঃ ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি সকল স্মৃতিকারই একবাক্যে অস্বর্গবংশপ্রবর্তককে ব্রাহ্মণবিবাহিতা বৈশ্যায়্যর সন্তান বলিয়াছেন। পুত্ররূপে প্রাপ্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হইতে আমরা যে ঐতিহাসিক সারসঙ্কলন করিলাম তাহার সহিত প্রায় সমস্ত স্মৃতিকারদিগের ঐকমত্য দেখা যায় অতএব প্রাপ্তকৃত বিবরণই আমরা ধনুস্তরির প্রকৃত জন্মবিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পুরাণ কবি আরও বলেন যে ধনুস্তরি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনদ্বয়ের মানবীকন্যাভ্রয়ের পাণিগ্রহণ করেন। অশ্বিনদিগের অপর নাম মনু-কুমার। সিদ্ধবিদ্যা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে ধনুস্তরির সেন দামাদি চতুর্দশ পুত্র জন্মে। অশ্বিনদ্বয় মানসপুত্র, চিরকুমার ছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, পুরাণ কবি ইহাদের মানসী কন্যার কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক, উপন্যাস ভাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ধনুস্তরির তিন পাণিগ্রহের সম্বন্ধ করিবার কোনও কারণ নাই। মহোজা গালব-দ্রু সুকীর প্রাতি-

ভাবলে বয়োবৃদ্ধি সহকারে মুনি সমাজে
অতীব খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন ।
পুত্রগণও পিতার অনুবর্তন করিয়া উত্ত-
রোত্তর বংশোদ্ভূত করিতে লাগিলেন ।
আমরা পাঠকগণকে বিনীত ভাবে অনু-
রোধ করি যে তাঁহারা যেন বর্তমান কা-
লের বৈদ্যকুলকুঠার নিরক্ষর ভিক্ষুনা-
মধারীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন
ভিক্ষুবংশের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত না করেন ।
বর্তমান কালের ব্রাহ্মণবৈদ্য দেখিয়া পুরা-
কালের ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ছায়া অঙ্কনপ্রারম্ভ
বিরম্বনা মাত্র । স্মৃতিকারগণ বলেন যে
আনুলৌমিক জাতির মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ
ঔরসে ও বৈশ্যগর্ভে জন্মিয়াছেন তাঁহারা
সকলেই বেদ বেদাঙ্গ পারগ ও মুনি বলিয়া
খ্যাত । *

ধনুত্রিসমস্তান ব্যতীত মহামতী অগ্নিবেশ
অপর একপ্রকার অশ্বষ্ঠের উল্লেখ করেন ।
তিনি বলেন, বিপ্রপুত্র অশ্বষ্ঠের ঔরসে ও
বিপ্রকন্যা অশ্বষ্ঠার গর্ভে যে সমস্তান
জন্মে সেও অশ্বষ্ঠ ঽ ব্রাহ্মণের সহিত
তাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড । তিনি

* তত্র বৈশ্য স্ত্রতয়াং যে জ-
জ্জিরে তনয়া অমী । সর্বেতে যুনয়ঃখ্যাতা
বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥

† একমেকস্য বিপ্রন্যাস্তজাত্যা
স্বজাৎসুতঃ । সোহন্যবিপ্রস্য কন্যাস্যামশ্ব
ষ্ঠাস্তপাত্সো । ব্রাহ্মণেন সপিণ্ডং তেষাং
ত্রৈপুরুষাবধিঃ । দারপ্রাপ্তিঞ্চ বিপ্রস্য ধর্ম্ম-
শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ অগ্নিবেশঃ ।

ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণতাক্ত ধনাদির
ও অধিকারী । যাহা হউক বর্তমানকালে
এবম্বিধ অশ্বষ্ঠসমস্তানদিগকে ধনুত্রিসমস্তান
হইতে নির্দেশ করা শ্রুতিন ; প্রত্যুত অ-
সম্ভব ব্যাপার । বিশেষতঃ যখন উভয়েই
একজাতিভুক্ত, তখন তদর্থ যত্নের প্রয়ো-
জনীয়তা দৃষ্ট হয় না । হারীত স্বপ্রণীত
সংহিতায় বলিয়াছেন ‘ ব্রাহ্মণ, মুর্দ্ধাভি-
ষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা ই দ্বিজ
এবং ইহাদের যথাপূর্ব গৌরব । *
অগ্নিবেশও পদমর্যাদানিবন্ধনকালে ব-
লিয়াছেন, ইহারা মতো পিতৃভুল্য, ব্রো-
তাতে তদ্রূপ, দ্বাপরে ক্ষত্রিয়বৎ, কলিতে
বৈশ্যোপম † এই সমস্ত প্রাচীন সং-
হিতাবচনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অমৃ-
তাচার্যের বংশপরম্পরা অনেকেই সেই
দেবভুল্য মহাপ্রভাববান্ পিতৃপুরুষের
কুলের অলঙ্কার ছিলেন । কিন্তু, বিচার-
মনে বসিয়া কে বলিতে পারে যে এই
বৈদ্যনামধারী অদৃষ্টায়ুর্বেদ বৈদ্যকুলকণ্ঠক
কবিরাজ মহাশয়ের তাহাদেরই বংশধর
এবং তাদৃশ সম্মান ও ভক্তির পাত্র ?

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ধনুত্রি ইক্ষু
হইতে আয়ুর্বেদ লাভ করেন এবং ব্রাহ্ম-

* ব্রহ্মা মুর্দ্ধাভিষিক্তঞ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্র
বিশাবপি । অমীপুরুষদ্বিজা এবাং যথাপূ-
র্ষক গৌরবন্ । হারীতঃ ।

† মতো বৈদ্যঃ পিতৃভুল্য স্ত্রোতা-
রাক্তথাশ্রুতা । দ্বাপরে ক্ষত্রবৎপ্রোক্তাঃ
কলৌ বৈশ্যোপমশ্রুতাঃ । অগ্নিবেশঃ ।

গণগ বৈদ্যাদিগকে আত্মকর্মেদব্যবসায় স-
প্রদান করেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত
গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এরূপ প্রতীত হয়
যে, ব্রাহ্মণাদিও তৎকালে এই ব্যবসায়ে
লিপ্ত হইতেন। কারণ, যে কাল পর্য্যন্ত
সমাজস্থ সকলের চিকিৎসোপযোগী বৈ-
দ্যের সংখ্যাধিক্য হয় নাই সেই পর্য্যন্ত
বৈদ্যোত্তরজাতিকেও বাধ্য হইয়া তদ্ব্যবসায়
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক
এবস্থিধ প্রয়োজনপ্রণোদিত বৈদ্যব্যবসায়ী
ব্রাহ্মণ কদাচ অনুযোগ্য নহেন। কিন্তু
এতদ্দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্যবাহুল্য
হইলেও লোভপরায়ণ হইয়া বৈদ্যব্যব-
সায় অবলম্বন করিতেন। যৎকালে চরক
অধিবেশতত্ত্ব প্রতিসংস্কার করেন, অথবা
যে সময়ে অধিবেশ স্বয়ং আত্মকর্মেদসং-
হিতা প্রণয়ন করেন সেই সময়েও ব্রাহ্মণের
বৈদ্যবেশ ধারণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়
অবলম্বন করিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।
তিনি দীর্ঘজীবিত নামাধ্যায়ে বলিয়াছেন
যে পীড়িত ব্যক্তি বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণের
শরণাপন্ন হইবেক না * সুতরাং তৎসময়ে
এরূপ প্রথা প্রচলিত থাকার কোনও সন্দেহ
নাই। ব্যবহারশাস্ত্রকারগণও এবস্থিধ প্র-
ভারণা নিবারণোপায়ে স্বপ্রণীত সংহিতায়
বিবিধ অনুশাসনবাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন।
বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র সবস্ত্র
স্নান করিবেক, এইবাক্য আজও আমাদের

* নচক্ষতবতঃ বেশবিভ্রতাং শরণং
গতাঃ ॥ চরকে।

দেশে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় *।
যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক তাহার অন্ন পূর্যবৎ,
যিনি কুসীদগ্রহণকারী, তাহার অন্ন বিষ্ঠা
ইত্যাদি †। অনুশাসনবাক্যে স্পষ্ট প্রতীত
হয় যে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা লোভ
সংবরণ করিতে না পারিয়া অন্য জাতির
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু
এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণগণ
বৈদ্যাদিগকে চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে
আত্মকর্মেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এক চে-
টিয়া রূপে দান করেন নাই। স্মৃতি পুরা-
ণাদিতে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়
না। পক্ষান্তরে এরূপ হইলে আত্রেয় ভ-
রদ্বাজাদির আত্মকর্মেদাধ্যাপন ধর্মবিবর্জিত
হইয়া উঠে। ইহাও অনুসন্ধান য়ে তৎ-
কালে তাহাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ও
বিচার করিতে গেলে অসম্ভব প্রতীয়মান
হয় না। কারণ ধর্মস্তুরির আত্মকর্মেদ ব্য-
বসায় লাভ ভরদ্বাজের সময়ে ঘটে। সু-
তরাং তৎপূর্ববর্তী আত্রেয়ের চিকিৎসা-
ব্যবসায় দত্তাপহারীতদোষসম্মূল নহে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান ধনু-
স্তুরি ইজ্র হইতে আত্মকর্মেদ লাভ করিয়া
ভরদ্বাজ ও গালব প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গের

* ব্রাহ্মণং ভিবজং দৃষ্টা সচেলং
জলমাবিশেৎ।

† পূর্যং চিকিৎসকস্যায়ং পুঞ্চল্যা-
স্তমস্ত্রিয়ম্।

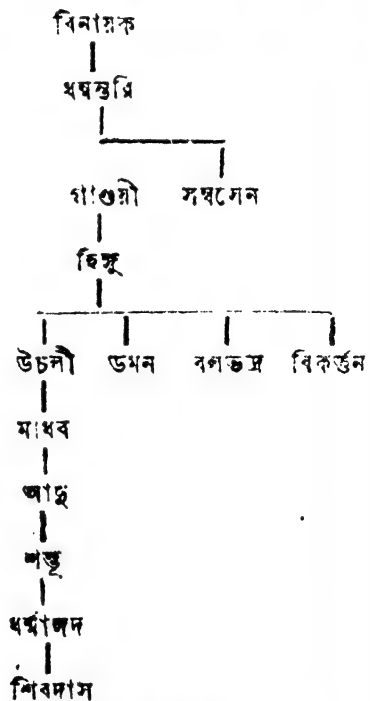
বিষ্ঠা-বার্দ্ধক্যবিক্রিয়ায়ং শত্রুবিক্রয়িণো-
মলম্ ॥

সম্মতি অনুসারে আপন সম্মানদায়কে ত-
দ্বাবসারে অধিকারী করেন । এবং উত্তর-
কালের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে স্বয়ং একখানা
সংহিতা প্রণয়ন করেন । আনুসঙ্গিক
যত সংহিতা প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যে আ-
ত্রেয় ও ধনুস্তরিকৃত সংহিতাই সর্বাপেক্ষা
প্রাচীন । অমিতপ্রতিভ ধনুস্তরী অতীব
অধাবসায়বলে মানবশরীরতত্ত্ব, লতা, ও-
দ্ভাদি, ওষধি ও ইত্য প্রাণীর সহিত মান-
বদেহের সম্বন্ধপরীক্ষায় অতি সংক্ষেপে
স্বপ্রণীত সংহিতায় নিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।
নানাবিধ রোগের নিদান, চিকিৎসা ও
রোগহেতু নির্ণয় কুরিয়া মানবজাতির
পরম বাঞ্ছবের কার্য্য করিয়াছেন । আজ
কাল ধনুস্তরিসংহিতা এতদেশে প্রচলিত
আছে কিনা সন্দেহহীন ; প্রস্তাবলেখক
যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন
তাঁহাতে তিনি সফলকাম হইতে পারেন
নাই । যদিও কেহ কিয়ৎপরিমাণে প্রচ-
লিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু
সেই সকল খণ্ডিত অংশ একত্র করিলেও
মূলগ্রন্থের ছায়ামাত্রও পাওয়া যায় কিনা
সন্দেহ । সুরসংগ্রহাদিসংহিতা সম্প্রতি যে
একেবারে অপ্রাপ্য না হইলেও দুপ্রাপ্য
হইয়াছে তদ্বিবয়ে কোনও সংশয় নাই ।

কতকাল হইল ধনুস্তরিসংহিতা দু-
প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্থিরনিদ্ধান্ত
করা শ্রুতকঠিন । আনুসঙ্গিক অনেক গ্র-
ন্থের ব্যাখ্যানকালে কোন কোন অন্বষ্ঠরত
ধনুস্তরিসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া

ছেন বলিয়া আমরা এতদ্বিবয়ের কথঞ্চিৎ
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম ।

বঙ্গালসেনসংস্থাপিত আটজন্ম অ-
শ্বষ্ঠকুলতিলকেরই একতমের অধস্তন স-
ন্তান পাণ্ডিত্যর শিবদাস মহামতি চক্র-
পাণিদত্তকৃতসংগ্রহের টীকা ও ব্যাখ্যান-
কালে ধনুস্তরিসংহিতার অনেক শ্লোক গ্র-
হণ করিয়া প্রমাণ ও মতান্তর সমর্থন ক-
রিয়াছেন । বিনায়ক সেন বঙ্গাল সংস্থাপিত
বৈদ্যরত্নের একতম ব্যক্তি । *
নিম্নলিখিত বংশপরম্পরায় দৃষ্ট হয় যে
শিবদাস বিনায়ক হইতে দশম পুরুষ ।



* দুহির্বিনায়কশাস্ত্রঃ কাস্ত্রঃ পাস্ত্র ত্রি

পুরুষঃ ।

শিয়ালো গরিরিছাক্টো রাঢ়েবঙ্গে প্রতি-
ষ্ঠিতাঃ । কবিকঠহার ।

ইহাদের প্রত্যেক পুত্রের স্থিতিকাল গড়ে ৩০ বৎসর ধরিলে বিনায়ক ছইতে শিবদাস পর্যন্ত ৩০০ বৎসর গত ছইয়াছিল । বল্লাল সেন ও খৃঃ ১১শ শতাব্দির প্রারম্ভে বর্তমান থাকার সম্ভব । এই গণনানুসারে শিবদাস খৃঃ ১৪শ শতাব্দির লোক বলিয়া অনুমিত হয় । সুতরাং ধনুস্তরিসংহিতা অব্দান ৪০০০ বৎসর পূর্বে এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল । বিশেষতঃ শিবদাস-রূত ঢাকাতে বহুল পরিমাণে ধনুস্তরির ধনি থাকাতে এরূপ অনুমান করাও অসম্ভব নহে যে উক্ত সংহিতা তৎকালে সাধারণের মধ্যে বিশেষ মান্য ছিল । এবৎ-বিধ গ্রন্থের বিরলপ্রচার ছইতে ও অন্ততঃ শতবৎসর কাল গত হওয়ার সম্ভব । সুতরাং যখন পাঠানকরতলস্থ বঙ্গদেশে মোগলদের আক্রমণে উপযুগপরি বাত্ৰিবাণ্ড ছইয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গবাসী এক দিকে স্বদেশীয় পাঠান কর্তৃক উপদ্রুত, অপরদিকে দিল্লীর সম্রাটদিগের প্রেরিত সেনা দ্বারা ভূয়োভূয়ঃ লুণ্ঠিত, সেই অরাজকের সময়ই অপিৎ ২ আয়ুর্কর্ষেদের এই প্রাচীন গ্রন্থও অপরাপর শাস্ত্রের সঙ্গে ২ বিলুপ্ত ছইতে থাকে ।

ধনুস্তরি অমৃতচাৰ্য্য ও গালবওরয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবকাল ছইতেই কঠোর তপশ্চর্যাতে ও আয়ুর্কর্ষদানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন ; বিশেষতঃ তাহার জন্মবৈচিত্র্য ও আয়ুর্কর্ষদীর অসামান্য প্রতিভা তাহাকে সহজেই মৌনব্রতে প্রণোদিত করিয়াছিল ।

গৃহী ছইয়াও তিনি সংসারে নিতান্ত বীভম্প্র হইলেন । তাহার এইরূপ সহজ বৈরাগ্যে অপরজনমানসে ত্রাসের অনু-রোধে ভরদ্বাজ গালব প্রভৃতি ব্রহ্মবিবর্ণ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন । কিন্তু তাহার জীবন মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত ছইয়াছিল, তিনি রোগ-সন্তপ্ত মানুষের নিদারুণ যন্ত্রণার মর্মবেদনা অনুভব করিতেন, তাহার জীবন কার্য্যান্তরে ব্যয়িত ছইবার নহে । তিনি নামে মাত্র কাশীপতি রহিলেন, তাহার সমস্ত সময় আয়ুর্কর্ষেদ অনুশীলনেই পর্যাবসিত ছইত । কাশীর আশ্রমে বসিয়া তিনি বহু শিষ্যকে আয়ুর্কর্ষেদ উপদেশ দিতে লাগিলেন । সমাগত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি শরীরবিজ্ঞানে বস্তুত্বাদ্বারা উপদেশ দিতেন । শিষ্যগণ যথোচিত যত্নসহকারে তদুপদেশ সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া স্মরণ-সৌকর্য্যার্থে এক এক খানা সংহিতার প্রণয়ন করেন । বারাণসীর আশ্রমে তিনি ১০০ শিষ্যকে উপনীত করেন । তিনিই প্রথমতঃ মানবগরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শরীরস্থানের ব্যাখ্যা করেন ও শিষ্যদিগকে তদর্থে যত্নবান ছইতে আদেশ করেন । (১)

(১) তস্মাদ্ভিঃ সংশয়ং জ্ঞানং হত্বা শাস্য বাজ্ঞতা ।

শোষণিত্বা মৃতং দেহং . জঘ্যে বোহুজবিনি-
শ্চয়ঃ ॥

প্রত্যক্ষতোহিযদৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টকথ্যভবেৎ ।
সমাসত শুভুস্তয়ং ভূয়োজ্ঞানবিবর্জনম্ ॥

তিনি একই যুক্তিসহকারে শল্য তন্ত্রের
মুখ্য প্রয়োজনীয়তা ও অপরাপর অনেক
অপেক্ষা ইহার প্রাধান্যতা প্রদর্শন করিয়া-
ছেন। * যাহা হউক, যে মহাত্মার
সংহিতায় আমরা এক্ষণে ধ্বস্তুরির উপ-
দেশ পাঠ করি, তাহার কৃতিবিরণ-
কালেই আমরা অমৃতচর্চার অন্যান্য উ-
পদেশ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। সম্প্রতি
আদি বৈদ্যের সময়সম্পর্কে কএকটি
কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার ক-
রিতে চাই।

ধ্বস্তুরির কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া-
ছিলেন, তাহার নিরাকরণ করা বড় শ্রু-
তিন। প্রাচীন সংস্কৃতের বত্ৰ প্রাপ্ত
হওয়া যায় তদ্ব্যতীত বেদসংহিতার পরই ম-
নুর প্রাচীনত্ব ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বী-
কৃত। অক্ষয়মণ্ডিতমবিষোপহৃত মদীর্ঘব্যাধি-
পীড়িতমবর্ষ শতিকং নিঃশ্বস্তাপ্তপূরীষপুষ্ক-
বমবহন্যামাপগারাত্ নিবন্ধংপঞ্জরস্থং মু-
ঞ্জবল্কলকুণ্ঠশাণাদীনামনাতমেনাবেষ্টিতাদম
প্রকাশে দেশে কোথরেৎ। সমাক্ প্রকৃ-
তিতক্ষোদ্ধতা ততোদেহং লপ্তরাত্নাদ্ধীর
বালরেণুল্কলকুচীনামনাতমেন শনৈঃ শ-
নৈরবধবর্ষয়ং শুগাদিন্ সর্বানৈব লক্ষণে
চক্ষুবা।

* শল্যাজমজৈরপটৈর কপেতং প্রা-
প্তোহস্মি গাংভূয় ইহোপদেক্টুম্ সর্বৈষু
আম্বুর্বেদতন্ত্রেষু এতদেবাধিকমভিমতং
যজ্ঞশাস্ত্রকারামিপ্রণিধানাৎ আশু ক্রিয়া-
করণাৎ সর্বতন্ত্র সামান্যাক। সৌত্রতে।

কার করেন। তাঁহার বলেন, মনু খৃঃ জ-
ন্মের ১০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
যদিও তিনি ধ্বস্তুরির নামোল্লেখ করেন
নাই, কিন্তু তিনি অশ্বত্থের নাম উল্লেখ ক-
রিয়াছেন। বাস্তবিক, পরে দৃষ্ট হইবে
যে, ধ্বস্তুরি কোন শরীরীমনুষ্যের নাম
নহে, পুরাণকর্তারা কল্পিতস্বর্গবৈদ্যের ধ-
্বস্তুরি-উপাধিই অশ্বত্থকে প্রদান করেন।
সুতরাং আদিবৈদ্য মনুরও পূর্ববর্তী। মনু
যে বংশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেই
বংশ অন্ততঃ ৩০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হ-
ইয়াছিল। অন্যথা ব্যবহারশাস্ত্রকার ধ-
র্মশাস্ত্রে তাহার নামোল্লেখ করিতেন না।
একটি লোকের বংশপরম্পরা যেপরমাণে
অধিকসংখ্যক হইলে তাহা সমাজের একটি
অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সেপরি-
মাণ হইতে অতীন ২০০। ৩০০ বৎসর গত
হওয়া আবশ্যক। সুতরাং অশ্বত্থবংশের আদি
পুরুষ অন্ততঃ খৃঃ জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্বে
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধ্বস্তুরির এই স-
ময় আমরা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতা-
নুসরণ করিয়া নির্ধারণ করিলাম। কিন্তু
এলফিনষ্টোন প্রভৃতি যে যুক্তিমাৰ্গে গ-
মন করিয়া মনুর সময় নির্ধারণ করিয়া-
ছেন, তাহা ভ্রান্তক বলিয়া বোধ হয়।
তিনি স্বয়ংই বলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খৃঃ জ-
ন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হ-
য়েন। পরাশর তাহার পিতা; সুতরাং
তিনিও অবশ্য ঐ কালের পূর্বে জন্মিয়া-
ছিলেন। সুতরাং যে মনুর প্রাধান্য, প-

রাশির, বাজবল্লা প্রভৃতি সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই যমু যে কেমন করিয়া ১০০ ঋঃ পূঃ আবির্ভূত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং বেদের সংগ্রহকাল হইতে গণনা করিলে অশ্বত্থের কাল ১৪০০ বৎসরেরও পূর্বে আসিয়া পড়ে।

এতলে এলফিনষ্টোন ও মার্শমেন প্রভৃতি ভারতইতিহাসলেখকদের বেদের সংগ্রহকাল নির্বাচনসম্পর্কেও দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। বড় লোকের ভুল অনুসন্ধান আমাদের দ্রষ্টব্য; পাঠক মাপ করিবেন।

ইহারা বলেন যে ‘প্রত্যেক বেদেই জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অংশ আছে। ইহাতে Solsticial বিন্দুর যে অবস্থান আছে, ঋঃ জন্মের ১০০০ বৎসর পূর্বেও তাহাদের ঐ অবস্থান ছিল। * সুতরাং বেদ বিভাগ ঐ সময়ে ঘটয়াছিল। এই গণনার বল কত, পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা অন্ততঃ দুটি স্থাপনার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে, বেদের ঐ গণনা বৈষ্ণবায়নের সমকালবর্তী কোন ব্যক্তি

করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ সূর্যের ককট রাশিতে গমন (Solsticial Point) একাধিক সময়ে ঘটিতে পারে না। অনেকেই জানেন যে ঐ চক্রেরও গতি আছে। সুতরাং খ্রীঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্বে যেখানে (Solsticial) বিন্দু ছিল, ঐ চক্রের সম্পূর্ণ একবার আবর্তনে যত সময় লাগে, তৎপূর্বেও তাহাদের সেই অবস্থান ছিল। তিনি কেন যে এরূপ কঠকল্পনার বশবর্তী হইলেন, অথচ রাজতরঙ্গিণীর নির্দিষ্ট কৃকপাওবদের সময় হইতে বৈষ্ণবায়নের সময় নির্বাচিত করিলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ রাজতরঙ্গিণীর নির্বাচিত কৃকপাওবের সময়ের সহিত কালিদাসকৃত জ্যোতির্বিদ্যাতরঙ্গ গ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। তদনুসারে বেদবিভাগ অন্ততঃ বর্তমান সময়ের ৫০০০ বৎসর পূর্বে ঘটয়াছিল।

ধনুস্তরিসম্পর্কে পুরাণ ও ভাবপ্রকাশের মতবৈধ আছে। ভাবপ্রকাশ একখানা পরবর্তী সংগ্রহ। গ্রন্থকর্তাকে আমরা জানি না, কেহ কেহ বলেন ভাবমিশ্র ইহার প্রণেতা। যাহা হউক, ভাবপ্রকাশ বলেন ধনুস্তরি বাজ্র যুগে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সূর্য্যত প্রভৃতি শত শিবাকে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদেন। তিনি দিবোদাস ও কাশীরাজ নামে খ্যাত। * এমত

* But the decisive argument is that the place assigned to the Solsticial points in the treatises is that in which those Points were situated in the 14th Century before Christ. Elphinstone's History of India. Append

* অদীতাচাষুষো বেদ মিশ্র। ধনুস্তরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যা জাতো বাজ্রবেশ্মনী। নান্নাতু সৌমিতবৎ খ্যাতো।

অবস্থায় আমরা কোন্ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। যদি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে যাই তবে অবিচলিত চিত্তে পুরাণই মানিতে হইবেক, কারণ আদৌ ঋতি, তৎপর স্মৃতি, ও তৎপর পুরাণই প্রামাণ্য। যাঁহা হউক এবং বিদ্য অষ্টকোর কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা বিদ্যাস্তে উপনীত হই দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে কাশী-রাজগোত্রের ধনুস্তুরি নামে একজন রাজা ছিলেন। ভাবপ্রকাশকার বোধ হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং পুরাণোন্নিখিত ধনুস্তুরির অলৌকিক জ্ঞান-ভাস্ত্রে অনাঙ্ক্য হওয়ারই তাঁদৃশ বিবরণ লিখিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় ধনুস্তুরিকে বৈদ্যধনুস্তুরি গ্রহণ করিলে কতকগুলি গোলযোগ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও চরক ঐ ধনুস্তুরির পূর্ববর্তী। সুতরাং অমৃত্যুচর্য্য ধনুস্তুরি, ক্ষত্রিয়রাজা ধনুস্তুরি হইলে চরক কোন মতেই স্ব-পুনঃসংস্কৃত অগ্নিবৈবর্তসংহিতাতে ধনুস্তুরির মতগ্রহণ

দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। বালএব বির-
ক্কাইভূচ্চচার স্মহতপঃ। যত্নেন মহতা
ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোয়ু পম্। * *

বিশ্বামিত্র মুনিভ্যে পুত্রং সুশ্রুতমু-
বাম্। তত্রান্না দিবোদাসঃ কাশীরা-
জোন্তি বালজঃ। মহিধনুস্তুরিঃ সাক্ষাদা-
য়ুর্বেদবিদাংবরঃ। * * * ভাবপ্রকাশঃ।

করিতে পারেন না। কিন্তু চরকসংহি-
তাতে ধনুস্তুরির মত গ্রহণ দৃষ্ট হয়। *
বিশেষতঃ যদি বিষ্ণুপুরাণোক্ত বংশাবলী
গ্রহণ করা যায়, তবে ধনুস্তুরিঃ দিবোদাস-
নাম অসঙ্গত হইয়া উঠে। কাশীরাজের
পৌত্র ধনুস্তুরি নামে এক রাজা ছিলেন ;
বিষ্ণুপুরাণে তাহার নামান্তর দিবোদাস
উল্লিখিত নাই। কিন্তু ধনুস্তুরি-প্রপৌত্র
দিবোদাস নামে একরাজা ছিলেন। সু-
তরাং সুশ্রুতগুপ্ত ধনুস্তুরিকে ক্ষত্রিয় ধনু-
স্তুরি গ্রহণ করিলে এও আর একটি অস-
ঙ্গতি হইয়া উঠে। কারণ, ইহার কাশী-
রাজ আখ্যা সঙ্গত হইলেও দিবোদাস
নাম সঙ্গত হইয়া উঠে না। অপিচ,
যদি আর্য্যুর্বেদে ধনুস্তুরি ক্ষত্রিয়সন্তান হই-
তেন, তবে সৌশ্রুতায়ুর্বেদে তাঁহাকে
নিমিত্তান্তর ভূমি প বলিয়া কীর্তিত †
হইত না। রাজাই ক্ষত্রিয়ের সহজ ব্যব-
সায় ; বিশেষতঃ কাশীরাজ পৌত্ররাজ-
তীয় ব্যবসায় ও উত্তরাধিকারীত্ব উভয়স্থত্রেই
রাজা। সুতরাং, এ আর একটি তৃতীয়
দোষ আসিয়া পড়ে।

* সর্বাঙ্গনিরুতি যুগপদিত ধনু-
স্তুরিস্ত তরুপন্নঃ সর্বাঙ্গানাং তুল্যকাল-
নিবর্তিভিহাং * *। চরকে।

† সর্বামরগুহঃ জীমান্ নিমিত্তা-
স্তরভূমিপঃ।
শিষ্যায়োবাচ নিখিলমিদং বিদ্রুখিলক্ষণম্ ॥
সৌশ্রুতে।

নিশীথ-চিন্তা ।

আশার ছলনা ।

“ আশার ছলনে তুলি, কি ফল লভিবু,

হায় ! তাই ভাবি মনে । ”

এই তৃষিত মেদিনী যেমন আজি
আশানাথ্র অবলম্বনে আকাশের পানে
চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আশা করিয়া
সহস্রগুণে অধিকতর ক্লেশ পাইতেছে ;
আমার এই মকময় দক্ষ হৃদয়ও সেইরূপ
আশাপথপানে উদ্ধীনয়নে চাহিয়া আছে,
এবং হায় ! আশার আশ্বাসপ্রদ মধুরকণ্ঠে
বিশ্বাস করিয়াই জীবনে এত ব্যস্ততা ও এত
লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে । এ আশা কি
স্বাভাবিক ?

আশা ছিল জ্ঞানার্ণবে সঁতার দিয়া
সুখী হইব,—জ্ঞানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দর্শন
করিবার জন্য এপ্রাণ মন বিসর্জন করিব ।
কিন্তু আমার সে আশা কি আর সফল
হইবে ? যে জানে এতদিন আমার এত
অনুরাগ ছিল, সেই জানে এইক্ষণ আমার
বিরাগ । বুদ্ধি আরও কি জ্ঞানের অনুসরণ
করিয়া বিভ্রান্ত হইতে চাহিবে ?—জ্ঞান
আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর
আলোক এক । হে জ্ঞানাত্মানি ধীর !
তুমি কি ইহা অস্বীকার করিতে পার ?
তোমার জ্ঞানে তুমি কি পাইয়াছ ?—না

নৈরাশোর অন্ধতম অবিশ্বাস,—অন্ধকা-
রের শূন্যতা । তুমি এই শূন্যময় অন্ধকারে
কোন প্রাণে আর কিরূপে নিরালম্ব অব-
স্থান করিবে ?—তোমার ঐ জ্ঞান সমু-
দ্রের অতলজলে ডুবায়া দেও । জ্ঞানী
সে, যে অজ্ঞান ;—জ্ঞানে সে, যে জানিতে
চাহে না । তুমি জানিতে যাইয়াই, জা-
নিতে পাইলে না । আমিও এই জনাই
আর জানিতে চাহি না । আমার মন
বহুদিনের চিন্তাশমে হতাশ ও অবসন্ন
হইয়া এইক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বসিতেছে, জ্ঞান
আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর
আলোক এক । ঐ যে বায়ু, কখনও মুহু-
হিমোলে, কখনও ঝঞ্ঝাবেগে, প্রবাহিত
হইতেছে, জ্ঞান আর উহার প্রস্রবণ কো-
থায় ?—এই যে আলোক, চক্ষুর সম্মুখীন
হইয়া গতিপথ প্রদর্শন করিতেছে জ্ঞান
উহা কি ? কোন্ সময় হইতে কালের
আরম্ভ, আর কোথায় গিয়া দেশের শেষ
সীমা ? সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুলিয়া
যাই । কিন্তু সৌন্দর্য্য এমন সুন্দর কেন ?
এবং চিন্তাই বা কেন উহার জন্য লালায়িত

হয় ? জগতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণ লইয়া, ভোগ্যবস্তুর জন্য চতুর্দিকে প্রধাবিত রহিয়াছে, এবং ভোগতৃষ্ণার পরিতৃপ্তিতে মুখে উৎফুল্ল, অথবা অভাব-জন্য দুঃখে ত্রিসমাগ্ন হইতেছে। এই প্রাণ আর মুখ দুঃখ, সমস্তই কি স্বপ্নলীলা নহে ? হায় ! এই সকল সামান্যত্বের অন্ত পাই না ; যাহা অসামান্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব ?

তবে কি জানে মুখ ? শৈশবের সরলা বুদ্ধি একপাই মানিয়া লইত। কিন্তু প্রতারণার পর প্রতারণায়, বিভ্রমনার পর বিভ্রমনার, বুদ্ধির সে সরলমতি বিনষ্ট হইয়াছে। উহা এইক্ষণ আর এসকল কথায় তুলিয়া যায় না। জানে যদি মুখ তবে সংসারে অরুখ আর কি ? কোন্ জানী এই অবনীমণ্ডলে মুখী হইয়াছে ?

যাহার চক্ষু ফোটে নাই, যে সংসারে আজও কিছু দেখে নাই, কিংবা দেখিবার জন্য উৎসুক হয় নাই, সেই দুঃখের হল-হলকে মুখের অমৃতধারা বলিয়া পান করে, কালকূটময়ী ভুজঙ্গীকে চন্দন-লতা-জ্ঞানে কণ্ঠহার করিয়া লয়, বিপদকে সম্পদ বলিয়া আলিঙ্গন দেয়, এবং বাকদ-গৃহে শয়ান হইয়াও মুখে নিদ্রা যায়। কি নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব ! কি অনির্ব-চনীয় শান্তি ! কিন্তু যাহার চক্ষু, পূর্ণ দৃ-ষ্টিতে বঞ্চিত রহিয়াও, একটুকু একটুকু দেখিতে শিখিয়াছে, আলোক কি তাহা না জানিয়াও আলোকের আভ্যাত্ম দর্শ-

নেই অতৃপ্তির অন্তর্দাহে উদ্গাদিত হইয়াছে, ঐ শান্তি আর ঐ নির্ভরের ভাব আর কি তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে পারে ? জানেই বেদনা এবং বেদনাই সমস্ত দুঃ-খের বীজ। যে দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চাহে, সে যেন প্ররোচিত পতঙ্গের মত জা-নের শোভাময়ী বঙ্কি-শিখায় ঝাঁপ দিয়া গিয়া না পড়ে ! মনুষ্যের হৃদয় নিভৃত নি-র্জনে এবং স্বপ্নে ও জাগরণে, সর্বদাই অতি গোপনে বিলাপ করে। কিন্তু সেই বি-লাপের সার কথা কি ?—না, হায় ! কেন দেখিলাম, হায় ! কেন জানিলাম, হায় ! কেন অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর জন্ত প্রধাবিত হইলাম ! কি যোগী, কি ভোগী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই অন্তরের অন্ত-রতম প্রদেশে ঐ অপরিষ্কৃত বিলাপ-ধ্বনি। আমরা যে সকল সময়ে উহা শু-নিতো পাই না, সে কেবল সংসার-চক্রের আবর্ত্তকোলাহলে। ইহার পরও কি আশা করিব যে, জানে আমার মুখ হ-ইবে, এবং সেই আশায় আমি অদীর র-হিব ? মুখী আমার ঐ অজ্ঞান মনু। উহার হাতে তোমরা জ্ঞানের নিষিদ্ধ ফল তুলিয়া দিও না। ঐ যে অবোধ, পৃথি-বীর কোন ভাবনা না ভাবিয়া, কোন তত্ত্ব না জানিয়া, ধূল্য পড়িয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছে, উহাকে ক্ষণকাল ঐ নিদ্রা-মুখ ভোগ করিতে দেও। যদি আশার ছলনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, মনুষ্য বুদ্ধির দুরধিগম্য অজ্ঞের জ্ঞান-তত্ত্বের জন্য

উদ্গাদপ্রাপ্ত না হইতাম, তাহা হইলে হয়ত আমিও আজি উহার মত ধূলি শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াই কুসুমাস্ত্রিণ দেশশয়ার সুখানুভব করিতাম, এবং আশাতজের অকস্মদ বেদনা হইতে মুক্ত রহিয়া, আপনাকে আপনি সুখী বলিতাম। কখনও ইহা কহিয়া পরিতাপ করিতাম না,—

“ কেন আশা ছলিলি আমার ? ”—

আশাছিল, গৃহবাসে থাকিয়া হৃদয়ের সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করিব,—মনুষ্যকে ভাল বাসিব এবং মনুষ্যের ভালবাসা আকণ্ঠ পান করিয়া, তৃপ্তির পরিপূর্ণতায় রুতার্থ হইব। এ আশা বাল্যে প্রথম বিকশিত হইয়াছে, যৌবনে প্রমত্ত ক্ষুধিত্তিতে ক্রীড়া করিয়াছে, এবং আজি বার্দ্ধক্যের শীতসমাগমে সঙ্গুচিত হইয়া, আমাকে দূর হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে যেন ‘না না’ বলিয়া হতাশ করিতেছে। হৃদয়! পৃথিবীর গৃহবাস যে নিরয়নিবাসের পূর্ব-চ্ছবি, তাহা কি তুমি এখনও অনুভব করিতে সমর্থ হও না? যেখানে মনুষ্য সর্পের মত মনুষ্যকে দংশন করে, জলৌকার মত মনুষ্যের শোণিত শোষণ করে, এবং শক্তি থাকিলে বজ্রের মত মনুষ্যকে আক্রমণ করে, তুমি কি এখনও সেই গৃহবাসের জন্য লালায়িত? যেখানে প্রাতঃসময়ের ফুল প্রীতি, প্রাতঃকালীন পদ্ম-কান্তির ন্যায়, কণকালমাত্র নয়ন বিনোদন করিয়া, সন্ধ্যা না হইতেই শুষ্ক ও মলিন হয়,—অদ্যকার অকৃত্রিম সৌহার্দ

কলাই অকৃত্রিম শত্রুতাতে পরিণতি পায়, ক্রিওপেট্রা ঠিকশোরের প্রাসে এটনোকে বলিম্বরূপ উপহার দিয়া আপনায় প্রাণ লইয়া আপনি পলায়ন করে এবং অরজ-জীবের মত পুত্রও পুত্রের প্রতিমূর্তি ব-লিয়া সকলের পুজা পাইয়া থাকে, তুমি কি সেই গৃহবাসের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত? যেখানে স্বার্থসেবার নাম সংসার-হিতৈষণা, ধর্ম লইয়া বাণিজ্যের নাম ধর্ম-প্রচার, যশঃস্পৃহার কণ্ডুগনের নাম অধ্যাত্ম-উদ্দীপনা এবং পরপীড়নের নাম পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন, তুমি কি অদ্যপি সেই গৃহবাসের জন্য আকুলিত?

গৃহবাস কি? পার্থিব গৃহবাস প্রায় সকলের পক্ষেই বনবাস! বনে ব্যাত্ত ভিক্ষুক; গৃহে হিংসা ঘেষ। হায়! যখন দেখিয়াছি যে, পুত্রশোকাভুরা জননী, এই মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্য আর্তনাদ করিয়া, পর মুহূর্ত্তেই পুত্রের তাজা সম্পত্তির জন্য প্রতিবেশী কি বিধবা পুত্রবধূর সহিত ঘোরতর বিবাদে প্ররুতা হইয়াছে, আমি তখনই বলিয়াছি পৃথিবীর এ গৃহবাসে নুতর আশা নুপা। যখন দেখিয়াছি যে, ভ্রাতা ভ্রাতার বন্ধে আঘাত করিয়া আপনায় অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় দেখিয়াছে, ভগিনী বিষয়-বাসনার তৃপ্তির নিমিত্ত ভ্রাতৃ-বিরোধের দিন গণনা করিয়াছে এবং প্রাণাদিক শ্রিয়তমা প্রেম-বিস্মলা ভার্যা শত্রু-ভ্রাতৃর ত্বর্জন মদিয়া পানেই নববৈধবের গ-কল দুঃখ বিস্তৃত হইয়াছে, আমি তখনই

বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রুখা। যখন দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যে তরুর ছায়া অবলম্বন করিয়া দগ্ধদেহ শীতল করিয়াছে, সেই তরুরই মূলোচ্ছেদে যত্ন পাইয়াছে, যে হস্ত রোগ, শোক কি বিপদের সময়ে তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছে, সেই হস্তই সে বিষদন্তে দংশন করিয়াছে, এবং রুতজ্ঞতা, এই সমস্ত অভূত ব্যাপার দর্শনে মর্মাহত হইয়া, মনুষ্যানিবাস হইতে উদ্ধৃষ্টাসে ও ত্রাহিরবে পলাইয়া যাইতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রুখা। যখন দেখিয়াছি যে, লোকে দেবতার অঙ্গে ধূলি কর্দম দিয়া, পিণ্ডাচের পদধূলি লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে, বিপন্ন মহত্ত্বের মস্তকে পদানাত করিয়া, পাপপঙ্কে নিমগ্ন পাপাঙ্গ সম্পদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তের মত দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে, এবং দিনকে রাত্রি, সত্যকে অসত্য এবং আলোককে অন্ধকারে পরিণত করিয়া কুটিলবুদ্ধির কূট অভিসন্ধি সম্পূরণ করিতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রুখা। যখন দেখিয়াছি যে, যাহার জন্য বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, সে বিরলে বসিয়া অভিসম্পাত করিয়াছে, যাহাকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া নিকটে গিয়াছি, সে দেখা দিতে না ছর এজন্য বিরাগভরে দূরে গিয়াছে, এবং যাহাদিগের জন্য ভিকারী বনিয়াছি, করে মুক্তিমিত ভিক্ষার তুলিয়া দিতেও পরি-

শেষে তাহার রূপণ ও কাতর হইয়াছে, আমি তখনই সহস্রজিহ্বায় বলিয়াছি যে, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রুখা।

তবে কেন পড়িয়া রহিয়াছি?—আশা তুমিই এই প্রথের উত্তর দাও। মনুষ্যকে ত্যাগ করিয়াও তুমি ত্যাগ কর না এবং মনুষ্যের প্রলুব্ধ প্রাণ পুনঃ পুনঃ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াও একেবারে তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারে না। দীপ নিৰ্কাণ হইয়া যায়, তথাপি আশা আছে, আবার উহা জ্বলিয়া উঠিবে,—হৃদয় তুবানলে ভস্ম হইয়া যায়, তথাপি আশা করি, আবার উহা অমৃতরসে সিক্ত হইবে। আশার কণ্ঠধ্বনি এমনই উন্মাদিনী!

এ শুন আশার মোহন মুরলী এই গভীর নিশীথে কি অপূৰ্ব মাধুরীতে নিনাদিত হইতেছে এবং সেই মূহুমোহনমধুরলহরী, নিদ্রা-মৃত মনুষ্য-হৃদয়ের রন্ধে, রন্ধে প্রবিষ্ট হইয়া, মনুষ্যকে কিরূপ আকুল, উৎফুল্ল এবং উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ বিরহবিধুরা দুঃখিনী, অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণায় অন্তরে জর্জরিত হইয়া, নিদ্রার আবেশে দীনবেশে পড়িয়া রহিয়াছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে, ‘নিদ্রা-বেশ পর বারিধারা, দুঃখের পর স্রুথ’। এ যে ক্ষীণকলেবর স্মন্দর যুবা, জীবনসংগ্রামে অবসন্ন এবং জীবনের সমস্ত উদ্যমে ব্যর্থ হইয়া, আছে কি নাই এইভাবে নিপতিত দৃষ্ট হইতেছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে, ‘অন্ধকারের পর

জ্যোৎস্না, দুঃখের পর সুখ '। ঐ যে অ-
 নীনস্বভা অতিমানী পুরুষ, পৃথিবীতে পৌ-
 কষ ও প্রতিভার বিড়ম্বনা এবং নীচতা ও
 ক্ষুদ্রতারই পরিপুষ্টি দেখিয়া, অপমানের
 বিষদাহে নিজার মধ্যেও পুনঃ পুনঃ প্রতপ্ত
 দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, আশা তাহার
 কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—‘নী-
 তের পর বসন্তুচী, দুঃখের পর সুখ '। আর
 ঐ যে জগদগ্রগণ্য, জগন্মান্য ‘মলিনমু-
 রতি’ ভারতলক্ষ্মী, অযোধ্যায় রামলক্ষ্মণকে
 সরযুর জলে ভাসাইয়া দিয়া, হস্তিনার ভীষ্ম
 দ্রোণ ও কর্ণার্জুনের এবং তাহাদের পৃষ্ঠপু-
 রক অশ্বোহিনী কুরুক্ষেত্রের শ্মশাননে

ভস্ম করিয়া, রাজপথের কাকালিনীর মত
 আজি এই ঘোর বামিনীতে ভারত-শ্মশানে
 পরিভ্রমণ করিতেছেন,—সেই শোভা
 নাই, সেই মহিমা নাই—তথাপি সেই পু-
 রাতন গৌরবের ছটায় গম্বিত রহিয়া, অ-
 দ্বকারে পাগলিনীর মায় কি যেন খুঁজিয়া
 বেড়াইতেছেন, আশা, ভয়ে ভয়ে, ভীত-
 পদবিক্ষেপে, তাহারও স্নানীপবর্তিনী হইয়া,
 ভীতি-কক্ক অক্ষুটস্বরে কহিতেছে,—

‘রাত্রির পর প্রভাতসূর্য্য,

দুঃখের পর সুখ ।’

(উদাসীন)

বিজ্ঞাপনী ।

১।

চাই

একখানি পরশ পাথর,—

যাহা ছুইলে তামা, কাঁসা, পিতল
 প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সোণা হয়,—বিষয় মন
 প্রসন্ন হইয়া উঠে, জরাজীর্ণ ভয়দেহে
 চির-যৌবন ও চির-বসন্ত বিরাজ করে,
 এইরূপ একখানি অমূল্য পাথর। বিনা
 মূল্যে পাইলে ক্রয় করিতে ইচ্ছা আছে ।

২।

চাই

একটি উত্তম স্ত্রী চাই ।

একজন অস্পৃশ্য অরসিক স্বকের জন্য অতি
 বড় ভাল একটি ভার্য্যা চাই ।

কথার অকথার স্বাক্ষর না দেন, বর্ষা-
 কালীন মেঘের মত সর্বদাই মুখ ভার ক-
 রিয়া বসিয়া না থাকেন, কথক্কায়া পিতা-
 মহীর মত আমোদ-প্রমোদে সকল সম-
 য়েই ভারমুখে ভিন্নস্বর না করেন, ছোট

খাট একটি মুরফি অথবা আধুনিক পাদ-
রীদিগের মত মানুসামিক স্বরে লেকচার
দিতে অগ্রসর না হন, এবং গোবিন্দপু-
রের গোবিন্দমিনীদিগের মত আলতামাখা
পা হুখানি সম্মুখে প্রসারণ করিয়া তা-
হাতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে না বলেন, এইরূপ
একটি ব্যাপার নাই ভাল, অমৃতময়ী অবলা
চাই।

তঁাহার কণ্ঠস্বর, কোকিল কণ্ঠের মত
উৎকৃষ্ট, ভ্রমরগুচ্ছের মত নিম্নোপ্রম, এবং
ত্রিতন্ত্রী মৃদলহরীর মত সুললিত না হই-
লেও, স্নেহরসসিক্ত মধুর হইবে,—অর্থাৎ
তিনি যখন বালক বালিকাদিগের উপর
গর্জিয়া উঠিবেন, তখন যেন আমার কণ্ঠ-
লব্ধ নিম্নোপ্রম ভাঙ্গিয়া না যায়, এবং
তিনি যখন প্রতিবেশিনীদিগের সহিত
ভৈরবীর মত বাততাড়নসহকারে বিবাদ
করিতে প্ররতা হইবেন, আমার এই চি-
ন্তাকাতর প্রাণ যেন তখন ভয়ে না চম-
কিয়া উঠে।

তঁাহার হৃদয় ধৃতীর মত ধবল, নব-
নীতের মত কোমল এবং পারিজাত পু-
স্পের মত পৃথিবীভর না হইলেও উহাতে
অন্ততঃ গোলাপের সৌন্দর্য্য ও গোলাপের
সৌরভ থাকা নিতান্ত আবশ্যিক। অর্থাৎ
আমি যেন সমস্ত দিবসের পরিভ্রমের পর
গৃহে আসিয়া হিংসার তুফানলে জর্জ-
রিত এবং নীচতার অসহ্য দুর্গন্ধে ক্লিষ্ট
না হই;—আর লোকে যে স্বর্ণলাভের
জন্য এত তপস্যা ও এত সাধনা করে,

আমার এই অলস আত্মা যেন বিনা তপ-
স্যায় ও বিনা সাধনায় স্বগৃহে বসিয়াই
সেই স্রুদর স্বর্ণের পূর্বস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

অপিচ, তাঁহাতে অভিমানের মোহন
মাদুরী থাকিবে, কিন্তু অহঙ্কারের মদগর্ভ
থাকিবে না;—সংসারের উপযোগিনী
সুতীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি থাকিবে, কিন্তু বিষয়ীর
জ্ঞান্য সংসার-লিপ্সা কোন মতে স্থান
পাইতে পারিবে না। তিনি কবি না হ-
ইলেও কল্পনার লীলায় সচরীর স্রাণ
চিতবিনোদিনী হইবেন; ভাগীরথী গঙ্গার
নায় গভীরসলিলা না হইলেও, নিত্য
নৃতন তরঙ্গে তরঙ্গময়ী রহিবেন; এবং
স্বখে সোহাগ, দুঃখে শান্তি, জ্ঞানে শিষ্য,
প্রেমে গুরু, এবং সম্পদে শোভা ও বি-
পদে বল স্বরূপ হইয়া, জ্যোৎস্না ও অন্ধ-
কার সকল সময়েই—হৃদয়ের সান্নিধ্যে,
হৃদয়ের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করিবেন।

পৃথিবীর ধন মান বৈভবে,—অর্থাৎ
কাচ কাঞ্চন তাত্র রজতে তাঁহার অনুরাগ
থাকিলে পোষাইবে না। কারণ, আমি
পোদ্দার কি দোকানদার নহি। এবং
তিনি ক্ষুদ্র-স্বখ-লোলুপ। বিভ্রালঙ্কী ব-
গিগুধু অর্থাৎ কটাচক্ষুশালিনী বেণে বো
হইলেও আমার চলিবে না। কারণ, আমি
একমাত্র মহত্ত্বেরই উপাসক। তাঁহাকে
লইয়া মুদী কি বেণের ব্যবসায় অবলম্বন
করা আমার অভিপ্রেত নহে।

পরন্তু তাঁহাতে ধার্মিকতার ভাণ ও
ক্রকুটি থাকিবে না, কিন্তু ধর্ম থাকিবে;—

প্রেমিকার আবিলতা থাকিবে না, কিন্তু প্রেমের প্রমত্ত প্রবাহ থাকিবে ;—এবং পাণ্ডিত্যের ঘনঘটা থাকিবে না, কিন্তু বিদ্যার বিনোদ কান্তিতে প্রকৃত অনুরাগ থাকিবে ।

যদি কেহ এইরূপ একটি অবলারত্বের সংবাদ পাইয়া থাকেন, তিনি অনুরোধ পূর্বক জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট সারস্ব-তাশ্রমের ঠিকানায় ব্যারিং পত্র লিখিবেন । মূল্য,—চিরজীবনের জন্য একজন সরলপ্রাণ মনুষ্যের মনঃপ্রাণ,—সর্বস্ব ।

৩।

অর্থপুস্তক ! !

অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক !
প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের
অর্থপুস্তক।

ইহাতে স্বরের অ আ, এবং ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের এবং কট মট খট ঘট প্রভৃতি কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ অতি বিশদ ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।—স্বকুমারমতি শিশুদিগের বিশেষ উপযোগি,—বহুবিন্দ্যালয় সমূহে বিশেষ ব্যবহারের উপযুক্ত এবং বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডিপুটী ইন্সপেক্টর বারুদিগের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রণতঃসি। মূল্য চারিআনা মাত্র । যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি ঢাকা, বাবুর বাজার ছি ছি আই আই বানরজী এণ্ড কোর শিশুগ্রাসিনী নামক সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে পত্র লিখিবেন ।

বেন । কেহ এক সঙ্গে ২৫ খণ্ডের অধিক ক্রয় করিলে, শতকরা সোয়াশত টাকা হিসাবে কমিসন পাইবেন ।

আশ্চর্য্যকারী ।

৪।

কুন্তলব্যা বৃকভানুমন্দিনী ।

আশ্চর্য্য তৈল ! আশ্চর্য্য তৈল !

প্রতিশিশী একটাকা । পেকেট খরচ পাঁচসিকা । ইহা একমাসকাল মস্তকে ব্যবহার করিলে চন্নিশের অনধিক বয়স্ক অকালপক রক্তের খেঁত কেশ 'নিবিড় কৃষ্ণ' কালো হয়, এবং আধ-বৃদ্ধা আধ-যুবতী, অকুটময়ী ভামিনীদিগের 'ভ্রমর-কৃষ্ণ' চূর্ণকুন্তল শঙ্খ কি তুষারের মত শাদা হইয়া যায় । কলিকাতা, পাটুয়াটুলী জাতীয় স্বাধীনতার মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে প্রাপ্তব্য ।

৫।

প্রেম-জ্বর-হর-গজেন্দ্র- কেশরী বটিকা ।

গম্যাসী প্রদত্ত মহা মহৌষধ ।

ইহার ৩টি মাত্র বটিকা যেখানে একা-
হিক, দ্বাহিক, ত্রাহিক ও সাপ্তাহিক
প্রভৃতি সর্ববিধ প্রেমজ্বর একবারে বিনষ্ট
হয় । বহুদিনের পুরাতন পৈত্তিক প্রেম
এবং তৎসংক্রান্ত জ্বালা ও গাত্র দাহ

প্রভৃতি উপসর্গ সকল সম্পূর্ণরূপে বিলোপ
পায়,—আর অতি বড় কঠিন ও সাধারণতঃ
চিকিৎসার অসাধ্য মেলেরিয়ার প্রেমও
এই বটিকা সেবনে উৎসৃষ্ট হয়।
কলিকাতা, বটতলা, গোবিন্দচন্দ্র কবি-
ভূষণ কিংবা কবিরাজ চূড়ামণি দাশরথি
রায়ের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ে প্রাপ-
্তব্য। মূল্য প্রত্যেক বটিকা পাঁচপয়সা
মাত্র।

৬।

সাহিত্য বিকাশিনী

লাইব্রেরী।

ঢাকা, তাঁতিবাজার, ১২ নং বাটী।

মুখরজী এবং কোঁ কর্তৃক সংস্থাপিত।

আমাদিগের দোকানে নিম্নলিখিত
নূতন পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ আগন্তু হই-
য়াছে।

রাই-রঙ্গ-তরঙ্গ-ভজি-বিলাসিনী নাটক।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র-জীমূত-মন্দ্র-গজ্জিনী নাটক।

প্রভুচন্দ্র নন্দিনী।

স্পেলিঙের কি (?)

ফাউবুকের কি (?)

থার্ডবুকের অর্থপুস্তকে কি (?)

দ্রুত-বসন্ত-কৃতান্ত-শান্তকারিণী নাটক।

৭

ঘুমের ঔষধ।

অব্যর্থ! অব্যর্থ! অব্যর্থ!

আরু গওহরের আবিষ্কৃত,—

পারস্যের শৈলাধিপতি কর্তৃক,

প্রথম ব্যবহৃত,

মণ্ডিকুর্কের পরীক্ষিত,

কমলাকান্তের চির-বাস্তিত, চিরসেবিত।

বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

অশ্রুমন্তের ঘুম হয়,

অলসের আলস্য যায়,

অকবি কবিত্ব লাভ করে,

আকাশের চাঁদ হাতে আসে,

আঁধার ঘরে তারা ফোটে।

যিনি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া সকলকে উ-
দ্ভাদিত করিতে চান, এই ঔষধ তাঁহার
জন্য। যিনি ভাষার স্রোতে তরঙ্গ তুলিয়া,
পাল উড়াইয়া, চলিয়া যাইতে চাহেন, এই
ঔষধ তাঁহার জন্য। যিনি ঋনুক দিয়া
সমুদ্র মেচিত্তে ইচ্ছা করেন, এই ঔষধ তাঁ-
হার জন্য। যিনি নীরবজগতে ঝিল্লিরব
শুনিতে অভিলাষী হন, এই ঔষধ তাঁহার
জন্য। যিনি কমলাকান্ত শর্ম্মার মত ঋ-
মিয়া ঝিমিয়া রসের কথা লিখিতে ভাল
বাসেন, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। আর,
যিনি বয়সে বৃদ্ধ হইলেও ছন্দয়ে চিরযৌবন

পুথিয়া রাখিতে আঁকাঙ্ক্ষী, এই অমোঘ
অমূল্য ঔষধ তাঁহার জন্য ।

শ্রীমমৃতকান্ত বসু
উদয়পুর পোস্টআফিস হইয়া,
বিনোদগঞ্জের বঙ্গবিদ্যালয় ।

হুতন নাটক ।

রসের চটক ।

না মিষ্টি না টক ।

অতি চমৎকার রচনা ।

একজন অত্যন্ত বিখ্যাত কবিকর্তৃক বিরচিত ।

ইহাতে

ভ্রমরের গুন্ গুন্, ভোমরার ভন্ ভন্,
কোকিলের কুহ কুহ, উকীলের আহা উহ,
বিরহীর দশ দশা, বসন্তের মাছি মশা,
মারামারি কাটাকাটি, ধরাধরি ঝাঁটা ঝাঁটি,

জাতি যুতি ফুল

পাপিয়া বুল বুল

প্রভৃতি ।

উৎকৃষ্ট নাটকের সমস্ত উপকরণ আছে ।

মূল্য অল্প, মূল্য নগদ, মূল্য এক টাকা ।

কলিকাতা, ভবানীপুর, রামদাস শ-
র্ম্মার ভারত উদ্ধার নামক ভারতবিখ্যাত
ডাক্তরখানায় প্রাপ্য ।

১।

কর্মখালি ।

কুশলজপুরস্থ রাজবাটীর প্রধান চাটুক-
রের পদ অল্প দিন হইল খালি হইয়াছে ।

বেতন মাসিক ১২৫ টাকা । যিনি এই পদে
নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত কার্য
সকল স্বেচ্ছাক্রমে সম্পন্ন করিতে হইবে ।—

১। কর্তার একটি ত্রিলোক বাছা
অলোক-সামান্য ছেলে আছে । উহার
আকৃতি ছোট একটি ভল্লকের মত । প্র-
কৃতি মর্কটের মত, এবং কণ্ঠস্বর ঠিক একটি
দীর্ঘশ্বাসের মত । প্রধান চাটুকর ঐ
বালককে দণ্ডে দশবার সজলনয়নে ও গদ-
গদ বচনে দশরথের রামচন্দ্র এবং নন্দীর
গোপাল হইতেও উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া
সকলের কাছে ব্যাখ্যা করিবেন ; যখন ঐ
কম-কান্তি কার্তিকের স্কুলের ছেলেদের
কাগজ কি কেতাব চুরি করে, হালুই দো-
কানের মিঠাই লইয়া দৌড় দেয়, অথবা
প্রতিবেশী কোন বালকের উপর অকারণ
অত্যাচার করে, তখন তিনি বাহার কেতাব
কি কাগজ চুরি গেল, দৌড়িয়া তাহাকে
মারিতে যাইবেন,—বাহার মিঠাই অপহৃত
হইল, তাহাকে দণ্ড করিবার জন্য দেওয়া-
নকে অনুরোধ করিতে থাকিবেন, এবং
পাড়ার যে বালক বিনাকারণে লাথী কীল
খাইল, তাহার চৌদ্দ পুরুষকে উল্লেখের
তিরস্কার করিতে প্ররত্ত হইবেন ।

২। কর্তার একখানি অতি কদর্য
পুরাণ গাড়ি আছে, সে খানিকে তিনি
লাট সাহেবের আট ঘোড়ার গাড়ি অ-
পেক্ষা প্রদর বলিবেন ;—কর্তা মধ্যে মধ্যে
কশিকাম্প-ভালে, খষভ রাগে বিরহের
টপ্পা গাইয়া থাকেন, তখন তিনি ময়ন যু-

দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিবেন,—
আর কর্তার একটি গৃহপ্রতিষ্ঠিতা পিশাচী
আছে, সেটিকে তিনি ধ্বংসের ভগিনী ব-
লিয়া সম্ভাষণ করিবেন।

৩। কর্তা আপনার বিদ্যা প্রকা-
শের জন্য মধ্যে মধ্যে বেদ বেদাদি প্রভৃতি
বিবিধ শাস্ত্র লইয়া সভাস্থ অভ্যাগত বা-
স্তিদিগের সহিত তর্ক করিয়া থাকেন।
যিনি দুঃসাহসে তর্ক করিয়া তর্কে কর্তাকে
পরাস্তব করেন, প্রধান চাটুকর, সমক্ষে
তঁাহার প্রতি আরক্ত লোচনে চাহিয়া ধা-
কিয়া, পরোক্ষে তঁাহাকে খ্রিষ্টান ও মূর্খ
বলিয়া গালি দিবেন;—এবং কর্তা যদি
ঐশ্বর্যাতিশয়োও একটু শিরঃপীড়া অনু-
ভব করেন, তাহা হইলে তিনি, ডাক্তার ও
কবিরাজ মহলে এক হট্‌গোল ঘটাওয়া,
সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া, মাথার হাত দিয়া
বসিয়া থাকিবেন। তঁাহার উপদেশ মতে
সে দিন স্কুল, আফিশ, ডাক্তার খানা, ও
হাট বাজার বন্ধ থাকিবে।

বলা বাহুল্য যে, যিনি এইরূপ প্রথম
শ্রেণীর কর্তাভজা নছেন, তঁাহার আবেদন
গ্রাহ্য হইবে না। জীবলাসরঞ্জন রায়।

১০

নিবেদন।

যিনি একঘণ্টার মধ্যে স্বকীর মনোম-
ন্দিরে জীবাত্মার আবির্ভাব অনুভব ক-
রিয়্যা, দুইঘণ্টার মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ ক-
রিতে চাহেন, তিনি আমার নিকট পেইড্-

পত্রদ্বারা সবিশেষ লিখিবেন, এবং সেই
পত্রের সহিত আশ্রয়ানা মূল্যের একটাকার
ডাকের টিকিট পাঠাইয়া দিবেন।

জীগিরিজাকান্ত গুহ।

সাং জানকীপুর।

১১।

কোন্ডলের বীজ।

আশ্চর্য্য চীজ।

তত্ত্বমতে মস্ত্রপুত তামার তাবিজ।

হিংস্রকের কটা চক্ষু, কেউটে সাপের দাঁত,
নিম্নূকের জিহ্বা আর ইহঁরের আঁত;—
সাত সতিনের শাদা চুল, শেউতি ফুলের
কাঁটা,

সাত পুকুরের পচা জল, খেতকরবীর আঁটা,
শকুনের নখ আর বোলতার ছল;

অমাবস্যার রাত্রে তোলা রক্তদ্রব্য ফুল।

এই সমস্ত বস্তু মস্ত্রসংস্কৃত হইয়া উক্ত তা-
বিজে আছে। যে সকল গৃহলক্ষ্মীরা ইহা
ব্যবহার করিতে চাহেন, তঁাহারা, কৃষ্ণপ-
ক্ষের অষ্টমীতে রাত্রি ঠিক দুই প্রহরের স-
ময়, পোঁচার ডাকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উ-
ঠিবেন;—এবং অঘাট আঁদি পুকুরের জলে,
এলোচুলে একডুবে স্বান করিয়া, আর্দ্র আ-
চলের পুতাদিয়া ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবেন।
এই তাবিজ কুমিল্লার জেলায় মেহাতের কা-
লীবাড়ী, জিমদৈরবগিরি মোহন্ত ঠাকুরের
নিকট মস্ত্রশোধনের জন্য একবোতল সা-
মগ্রী মাত্র পাঠাইয়া দিলেই পাওগল-ঘায়।

১২

খট্টাপুরাণ ত্রয়োদশ স্কন্ধ

বিনামূল্যে বিতরণ।

ডাকমান্দলও দিতে হইবে না।

যাঁহার গ্রাহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি পাকেট খরচ প্রভৃতি অপরিহার্য্য ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র ১০ টাকার একখানি বেঙ্গ নোট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীঅদ্ভুতচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

— সাং পঞ্চকরণ।

১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য, শতবার দেখিতব্য,

অতি নূতন উপন্যাস।

অতি পুরাতন গীত।

“ কাব্য কথা। ”

মূল্য বার্ষিক ৩৮ আনা মাত্র।

ইহার বিজ্ঞাপনে লেখা আছে “ যাঁ-

হাদিগের নিকট বান্ধবের হাল ব-
কয়া মূল্য বাকি, তাঁহারা দয়ার অনু-
রোধে, দাক্ষিণ্যের অনুরোধে, এবং দয়া
পর্য্য না থাকিলে ভদ্রতার অনুরোধে,
তাঁহা পাঠাইয়া দিবেন। ইহাতে কোন-
মতে,—লৌকিক কি অলৌকিক কোন
হেতুতে বিলম্ব না হয়।—যাঁহারা এতদিন
বান্ধবের মিত্র ছিলেন, তাঁহারা প্রেমের
অনুরোধে ইহার গাঢ়তর মিত্র হইবেন ;—
যাঁহারা এতদিন বান্ধবের শত্রু ছিলেন,
তাঁহারা আমাদিগের মিনতি বিনতি প্র-
ণতি অথবা বাস্তালির একতা এবং বা-
জলার উন্নতির অনুরোধে, এইক্ষণ ইহার
মিত্র হইয়া দাঁড়াইবেন। আর যাঁহারা
বান্ধবের গ্রাহক নহেন, তাঁহারা নূতন
বৎসরে নূতন গ্রাহক হইয়া নিজেরা কু-
তার্থ হইবেন, এবং আমাদিগকেও চরি-
তার্থ করিবেন। ”

সমালোচনা।

১। “ কবি-কাহিনী। জ্বরবীজনাথ
ঠাকুর প্রণীত। ” শব্দে কবিতার শরীর গ-
ঠন, ছন্দে উহার ভঙ্গি কিংবা গতির ঠাম,
কিন্তু ভাবগত রসই উহার প্রাণ। নিম্ন-
লিখিত পদ্যাবলীতে কবিতার শব্দ আছে
ও ছন্দ আছে; কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই।
যথা—

“আয়লো আলি, সবায় মিলি
কুসুম তুলি, মনের সুখে। ”

অথবা—

“ বকুল বনে, আকুল মনে
হুকুল উড়ায় ঘোঁকুল চোরে।
বাজলো বাঁশী, গলায় ফাসি,
ঘরে আসি কেমন কোঁরে ॥ ”

এইরূপ ললিত পদাবলীতে প্রতিরঞ্জন হয়, কিন্তু মানবহৃদয়ের অন্তস্তল কখনও স্পৃষ্ট কিংবা আলোড়িত হয় না। বা-
জালি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তরলমতি বালিকা-
দিগের মত, এইরূপ পদাবলীরই ভর্তুকি এবং
এই নিমিত্তই এদেশে ঈশ্বরগুপ্ত ও হরিশ
মিত্র প্রভৃতি ললিতপদ-ব্যবসায়িদিগের
এত আদর ছিল। আর এক শ্রেণীর পা-
ঠক ললিত পদ অপেক্ষা পদ-বিন্যাসের
মুগ্ধিয়ানা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা
‘আয়লো আলি কুসুম তুলি’ শুনিবার
জন্য অধীর হন না, এবং বকুল বনেও
হুকুল উড়াইতে ভাল বাসেন না। তাঁ-
হাদের কচি ‘নিপট কপট পাঠ লম্পট
ঝম্পটে।’ দাসুয়ায় তাঁহাদিগের কালি-
দাস, গোবিন্দ, অধিকারী তাঁহাদিগের
জয়দেব এবং বর্তমান কালের যাত্রাওয়া-
লাবর্গ তাঁহাদিগের কবিসম্প্রদায়। এই
তিন শ্রেণীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবি-
কাহিনীতে অধুনাও স্খানুভব করিবেন
না। কিন্তু বাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা
কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন,
তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাজালা
ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া
গ্রহণ করিবেন। ইহাতে ষপার্থই কবিতা
আছে। যে কবিতা ঘনাক্ষর নভোমণ্ডলে
দামিনীর মত রূপের ছটায় নয়ন ধাঁদা
দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা
দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রগল্ভা
রসিকার মত আপনার ভারে আপনি দু-

লিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণ
পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে কবিতা,
শিশির-সিক্ত কমল-কলির মত কথা না
কহিয়াও মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত নীরবে ক-
থোপকথন করে;—যে কবিতা ফোটে
ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরি-
ক্ষুট সৌন্দর্য্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়,
এই কবি-কাহিনীর প্রায় সর্বত্রই সেইরূপ
প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা স্নকচিসম্পন্ন
পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে। এদেশের
কত সহস্র কবিই ভালবাসা প্রসঙ্গে কত
সহস্র কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু কবি-কা-
হিনীতে অতি অল্প কএকটি পংক্তিতে
ভালবাসা কিরূপ বর্ণিত ও সূচাকরূপে
ব্যখ্যাত হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার
করুন।

“একি দেবি কলপনা, এতদ্বন্দ্ব প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!

কি এক অমৃতধারা ঢেলেছ প্রাণের পারে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?

অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,

সে কি এক স্বর্গীয় আঘোদ।

এক গান গায় যদি, দুইটি হৃদয়ে মিলি

দেখে যদি একই স্বপ্ন,

এক চিন্তা এক আশা, এক ইচ্ছা দুজনার

একভাবে দুজনে পাগল,

হৃদয়ে হৃদয়ে হয়, সে কি গো স্নেহের মিল,

এজনমে ভাঙ্গিবেনা তাহা।

আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবি,

তোমনি মিশিয়া যায় যদি—

একসাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুইজনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর !
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণো বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হয়ে—

কিছুভয় করি নাকো—বিহ্বল প্রণয়ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া !

তাই হোক—হোক দেবি আমাদের দুইজনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্ ।

মজি স্বপনের ঘোরে, হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া । ”

পুনশ্চ,

“নিশীথে একেলা হোলে, এইরূপ কতগান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া ।

স্বপ্ন বা দুখের কথা, বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রাণ,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে,
জীবন হইয়া পড়ে দাক্ষণ বাণিত ।

কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা

কি করি যে প্রকাশিবে পোত না ভাবিয়া ।

পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা

পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ ।

ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,

কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,

বিবাদ যতই হয়, দাক্ষণ অন্তর্ভেদী

অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন । ”

বাবু রবীন্দ্র নাথ প্রকৃতির শোভা-ব-
র্ণনোৎসাহী । প্রকৃতির মহা প্রকৃ-
তির যে একটি সৌন্দর্য রহিয়াছে, তাহা
উচ্চ শ্রেণীর কবিরোগা না হইলেও মনো-
হর ; কিন্তু আমরা সেটি উদ্ধৃত না করিয়া,

হিমালয় বর্ণনার আরম্ভভাগ নিম্নে তুলিয়া
দিলাম । বাহাদিগের হৃদয় আছে, এবং
হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি প্রতি ও সহানুভূতি
আছে, তাহারাই এই বর্ণনা পাঠ করিয়া
মোহিত হইবেন ।

“কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,

তোমার বিশালতম শিখরের শিরে

একটি সজ্জার তারা ! সুনীল গগন

ভেদিয়া, তুষার শুভ মস্তক তোমার !

সরল পাদপরাজি আঁপার করিয়া

উঠেছে তাহার পরে ; সে ঘোর অরণ্য

ঘেরিয়া হুত্ব করি তীব্র শীত বারু

দিবা নিশি ফেলিতেছে বিকর নিশ্বাস !

শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল

অন্তমান তপনের আরক্ত কিরণে

প্রদীপ্ত জলদ-চূর্ণ । শিখরে শিখরে

মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,

শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল

আঁধারের বনিকা ধীরে ধীরে ধীরে !

পার্বত্যের বনে বনে গাঢ়তর হোল

সুময় অন্ধকার । গভীর নীরব !

মাড়া শব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে

অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী

সুগভীর পার্বত্যের পদতল দিয়া !

কি মহান ! কি প্রশান্ত ! কি গভীর ভাব !

ধরার সকল ছোঁতে উপরে উঠিয়া

স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়

জড়িত মস্তক তব, ওগো হিমালয়,

নীরব ভাষায় ভূমি কি যেম একটি

গভীর আদেশ যেন করিছ প্রচার !

সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্য মনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী ছেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছে মিশাগে,
ক্ষুদ্রহোতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ !
অকুল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগিদিক্, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে হোয়ে হত জ্ঞান প্রায়
তোমার চরণ তলে রয়েছি পড়িয়া।
উর্দ্ধ মুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমেষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কি গভীর ভাবে
দাঁড়িয়ে রয়েছ ছেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কতবার আইল ফিরিয়া !
সিঙ্গুর বেলার বন্ধে গড়ায় যেমন
অমৃত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া,
কতকাল আইলরে, গেল কতকাল
হিমাত্রি, তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবা কর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কতরাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,
মানুষ-সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এই খানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?
যা'দেখিছ যা'দেখিছ, তাতে কি এখনো
সর্ব্বাঙ্গ তোমার গিরি, উঠেনি শিহরি ?

বাল্লালা কবিতার পঙ্কিল জলে এইরূপ
নির্ম্মল পুষ্প কি প্রীতি-প্রদ ! ইহাতে সৌ-
ন্দর্য্য আছে, অথচ সে সৌন্দর্য্যে কোন অং-
শেও কচির বিকার সজাবনা নাই। ইহাতে
সৌরভ আছে, অথচ সে সৌরভে কোন
অংশেও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা
নাই। ভাষা ইহার কোথাও শোভা বর্জ-
নের জন্য কৃত্রিম কাককাব্যে বিভূষিতা হয়
নাই ; এবং ভাব-লহরী ক্ষীণসলিলা পয়-
স্বিনীর ক্ষীণলহরীর মত, যার পর নাই মৃ-
দুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইলেও, কোন স্থানে
প্রাণ-শূন্য হইয়া পড়ে নাই। এইরূপ নির্ম্মল
কবিতায় অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীয় কাব্যশা-
স্ত্রের অদোগতি না হইয়া উপকার হইবে,
এবং বাঁহারা কবিতায় ইদানীং বীত-স্পৃহ,
তঁাহাদিগের শুষ্ক মনেও কাব্যে পুনরায়
প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকিবে।

কবি-কাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য
রচনায় মাইকেলের ন্যায় সর্ব্বত্র মিষ্টনের
অনুসরণ এবং হেম বাবুর ন্যায় সংস্কৃত
কবিসিগের ছন্দানুবর্তন না করিয়া, কোন
কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে এক নূতন পথ
অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা
সুন্দর না হইত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য
কাহারও নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু
তাঁহার পদ্য যেমনই কেন না হউক, উহা
কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।

২। “নিশীথচিন্তা। জিরাঙ্গরক্ষ রায়
বিরচিত।” কবিবর রাজরক্ষ বাবু এই
ক্ষুদ্র কাব্যখানি বান্ধবসম্পাদককে উপ-

হার দিয়া, বান্ধবের সহিত আমরা যে যে ব্যক্তি সংস্পর্শে আছি, আমাদের সকলকেই নিতান্ত বাধিত করিয়াছেন। ইহার লেখা নিন্দনীয় হইলেও সামাজিকতার অনুরোধে প্রশংসা করাই আমাদের কর্তব্য হইত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদেরকে এইরূপ ক্ষুদ্রদৃশ্য সামাজিকতা করিতে হইবে না। প্রযোগ্য সাধারণীসম্পাদক যেরূপ বলিয়াছেন যে, “এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে” আমরাও সেইরূপ নির্মুক্তচিত্তে বলিতে পারি যে, বস্তুতঃই এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার রচনা রাজকৃষ্ণ বাবুর অন্যান্য রচনা অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় এবং অলঙ্কারবিন্যাসে স্থানে স্থানে দোষ লক্ষিত হইলেও ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব নিতান্ত সুন্দর। আমরা নিম্নে ষষ্ঠ ও সপ্তম এই দুইটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। বোধ হয় অনেকেই এই দুইটি কবিতায় মাধুর্য্য ও গাঙ্গীর্য্যের মিশ্রণ দেখিয়া পুলকিত হইবেন। কিন্তু নিশীথচিন্তার প্রায় সমস্ত কবিতাই এইরূপ মধুর ও গাঙ্গীর।

৬—“পরিপ্রাস্ত বিশ্ব এবে ঘুমি অচেতন ;
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।

অন্ধকার-জলে সবি হুঁয়েছে মগন ;
মায়াবলে স্বর্গ যেন ঘোর রসাতল।
কিংবা হেন বোধ হয়, এ ভাব দেখিয়া,
জগত-স্বপ্ন-পূর্ব্ব-কল্পিত-সময় ;
ছিল না এ বিশ্ব-মুষ্টি ; কেবল ডুবিয়া
আছিল শূন্যতা-তমে ঘোর তমোময়।

হইলেও হুঁতে পারে—কেনই না হুঁনে,
কল্পনাই যেইকালে সকলি প্রসবে ?

৭—অহো, কি অচিন্ত্য দৃশ্য নিশীথ সময়ে,
সাগর, ভূগর, আর মকড়, কামন

একাকার একভাবের ; বসুধা-হৃদয়ে

নিপুণ নটের কি এ পট-আবর্তন ?

কোথায় সে দিবসের ঘোর কোলাহল ?

কোথায় সে তরু-শাখাে বিহঙ্গের ধ্বনি ?

কোথায় সে বিভ্রাময় নীল নভস্তল ?

কোথায় সে তমোহর দীপ্ত দিনমণি ?

দিবসে উজ্জ্বল আলো—নিশীথে আঁধার,
স্বপ্নের পরেতে ঠিক দুঃখের সঞ্চার।”

৩। “নাট্যসম্ভব। উপরূপক। বঙ্গ
রঙ্গভূমিতে অভিনয়জন্য জীরাঙ্গকৃষ্ণ রায়
বিরচিত।”—সত্য কথা বলিতে কি, নি-
শীথচিন্তার উচ্চতার পর এই সাড়ে সাই-
ত্রিশ পংক্তির নাট্যসম্ভব আমাদের নি-
কট ভাল লাগে নাই। ইহার লেখা প্রা-
ঞ্জল বটে, কিন্তু ঐ প্রাঞ্জলতা মাত্রই উহার
গুণ। এই নাট্যসম্ভবে শচীবিরহ-কাতর
ইন্দ্রের হুঁখে কাহারও হুঁখ বোধ হয় না,
এবং নাটক রচনার আদিমুক বাণীশুণ-
গায়ক ভরতমুনি ইন্দ্রকে যে ভাবে সান্ত্বনা
দিতেছেন, তাহাতেও কাহারও চিত্তে কো-
নরূপ মহাবুভূতির সঞ্চার হয় না। “ভরত
ইন্দ্রকে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তেবসিতেছেন”—
“দেবরাজ, কেন আজ হেন মাজ দেখিছে ?
মুখ তুলে, কণ্ঠ খুলে, কেন এত দুখী হে ?”
এইরূপ কবিতা বাসর ঘরের বিলা-
সিনীদিগের মুখেই শোভা পায়। ভরত

মুনির মুখে, অমরাধিপতি দেবাদিদেব ই-
ন্দ্রের প্রতি সন্তাষণে এইরূপ কবিতা বিড়-
ঘনা মাত্র। বিশেষতঃ অমরাপছতঃ শ-
চীর বিরহে ইন্দ্র তখন হৃদয়ে যেমন জর্জ-
রিত, তেমনই আবার অপমানের অকল্পদ
যন্ত্রণায় অন্তরের অন্তস্তলে আহত। এ-
দিকে ভরত মুনিও নাকি “বিস্মিতচিত্ত।”

ইহার পর অমরাবতীর ইন্দ্রসভা। সেই
ইন্দ্রসভায় নাটকাতিনয়ের কি হইল?—
না—কতকগুলি নর্তকী আসিয়া নাচিতে
আরম্ভ করিল। কিন্তু ভেবা গঙ্গারাম
ইন্দ্র তাহাতেই শচীর বিরহ এবং শত্রুর
পদাঘাত ভুলিয়া গেলেন এবং ভরত যেমন
জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কহ সুর! দ্রুহ দূর হইল কি না হইল?”
ইন্দ্রও তেমনই হাবা ছেলের মত উত্তর ক-
রিলেন,—

“অবশ্য মানিব সুর—হৃদিমনে প্রবাহিল।”

৪। “বীণা।—নানা বিষয়িনী ক-
বিতাপ্রসাবিনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীরা-
জকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত।” বীণা বিবিধ-
সুরে, বিবিধ তালে এক বৎসর কাল না-
নাবিধ গীত গাইয়া আর এক বৎসরে প্র-
বেশ করিল। নিরন্তর কবিতা বর্ষণ ক-
রিতে গেলে নিরন্তর পুষ্প বর্ষণ হয় না।
কিন্তু ওথাপি বলিতে হইবে যে, ‘অবসর
সরোজিনী’ প্রভৃতি কবিতা রচনা-দ্বারা
রাজকৃষ্ণ বাবু যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা
উপার্জন করিয়াছেন, বীণায় তাহার অপ-
চয় হয় নাই। বীণা নিতান্ত ধর্ম্মায়ত্তনা

হইয়াছে। ইহার আকার পরিবর্ত হইলে
ভাল হয়।

৫। “কৌমুদী।—বিবিধ সঙ্গীত
ও নানা বিষয়িনী কবিতা বিকাশিনী মা-
সিক পত্রিকা। শ্রীকাকিনী কান্ত ঠাকুর
কর্তৃক প্রকাশিত।” কৌমুদী উপেক্ষার
বস্তু নহে। ইহাতে যে সকল কবিতা প্র-
কাশিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই
প্রশংসার্হ। বীণা অপেক্ষা কৌমুদীর লেখা
সাধারণতঃ অধিকতর গভীর, কিন্তু কো-
মুদীতে পরকীয় লেখার যে পরিমাণ অনু-
করণ দৃষ্ট হয়, বীণায় তাহা হয় না। বি-
গত ফাল্গুণের কৌমুদীতে কম্পার্নিয়া না-
মক কবিতার আরম্ভ এইরূপ,—

“দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নীরব অধনী;
নিবিড় জলদ পূর্ণ গগন মণ্ডল;
বিকাশি ভুবন-দীপ্তি—হাস্য-বিমোহিনী
খেলিছে জলদ প্রান্তে বিজলী চঞ্চল।
যেন রোম-লক্ষ্মী পশি ভবিষ্য গেছে,
দেখিলা বিষাদবর্ণে ভবিষ্য চিত্রিত।”

এই বর্ণনাটির প্রথম চারি পংক্তি নি-
তান্ত সুন্দর। কিন্তু সুন্দর হইলেও উহা
পড়িবার সময়ে লেখকের কথা ভুলিয়া
গিয়া আমরা প্রিয়তম নবীন চন্দ্রকে স্মরণ
করিয়াছি। শেষ দুই পংক্তিতে অলঙ্কার
ও অর্থের কিরূপ অহয় হইল, তাহা আ-
মরা বুঝি নাই।

কৌমুদীও বীণার মত বর্ষ কাল অতি-
ক্রম করিয়া বর্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছে;
কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই, গুণ-প্রাণী (?)

গ্রাহকদিগের দয়ার ক্রটিতে ইহার তিষ্ঠি-
বার স্থান এখন পর্য্যন্তও দৃঢ় হইতেছে
না। সাঁহার বাজালা ভাষার অনুরাগী,
ভাঁহার কৌমুদীতে আর কোন উপকার
লাভ না করুন, ইহার সরস মধুর পদাব-
লীতে অবশ্যই প্রীতি লাভ করিবেন ;—
এবং সাঁহার ভূতপূর্ব রবিনসনের আইন
কানুন ও হাইকোর্টের নজীর মাত্র পড়িয়া
বাজালায় ‘মুর্তিমান’ হইয়াছেন, ভাঁ-
হার কৌমুদীর কবিতা পড়িলে ভাষা-
শিক্ষা-বিষয়ে নিশ্চয় উপকৃত হইবেন।
ভাবে কৌমুদী অনেক স্থলে অনুকারিনী
হইলেও, ভাষায় অনুকরণীয়া।

আমরা নিদর্শনের জন্য আশ্বিনের
কৌমুদী হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত
করিলাম। বোধ হয় এরূপ রচনা বহুলো-
কের হৃদয়-গ্রাহিনী হইবে।

“এস বঙ্গ-গৃহ লক্ষ্মি !—কুলেন্দু-বদন !

নিসর্গপুঙ্করজাত হৈম মৃণালিনি !

কজ্জল চর্চিত চাকু—বিলোললোচনা !

বহু হৃদি-পিঞ্জরের স্বর্ণ বিহঙ্গিনী !”

“কেন ভূমি-তলে অই লুটাও অঞ্চল !

উঁচাও উঁচাও দেবি ! উঁচাও উঁচাও !

অই মাত্র বাজালির জীবন সম্বল ;

যাতনা নিম্নত-অশ্রু মার্জন উপায় !”

অন্যত্র,

“প্রকৃতি-বিনোদ-চিত্র !—নিসর্গের খেলা”

দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল অবশ ;

চিন্তার বিদ্রাৎ বেগ—কথির ফুটিয়ে

হৃদয়ের প্রতি রক্তে,—হইল চঞ্চল !

মরমের তত্ত্বচয়, একতানে হ’ল লয়,

গভীর সঙ্গীত ধনি সহসা জাগিল,

“কে আমি?”—এ মহাধ্বনি ধ্বনিত হইল !”

৩। “কামিনী কুঞ্জ। গীতিকাব্য।

জাতীয় নাট্যশালার নিমিত্ত,—জিগো-

পালচন্দ্র মুখপাধ্যায় প্রণীত।” এই কা-

মিনী কুঞ্জের বিষয় ব্রজবিলাসিনী রাধার

মানভঞ্জন, গোপাল বাবু ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া

কেন শেষটায় এই মানভঞ্জনের পালা

গাইতে গেলেন, তাহা আমাদিগের বোধ-

গম্য হইতেছে না। ইহার কাহিনী সেই

সুতরশ তিরনকই সনের চিরস্থায়ী বন্দো-

বস্তুর বহু পূর্বের ব্রজের কাহিনী ;—ই-

হার কথা, সেই যাত্রাওয়ালাদিগের চির-

চর্চিত পুরাণ কথা ; এবং ইহার রসও

সেই বটতলার অতি পুরাতন আদিরস,

একদিকে রাধা, আর একদিকে চন্দ্রা-

বলী,—মধ্যে আমাদিগের পীতবাস জিনি-

বাস। আশার যামিনী যখন প্রভাত হইয়া

আইসে, তখন জীরাধা গাইতেছেন,—

“কৈ এল মই !

আমার শ্যাম গুণমণি ?

অস্তাচলে চলে শশী পোহাল রজনী !

শঠ কালাচাঁদ, পাতি প্রেমফাঁদ,

বিষম প্রমাদ, হরিবে নিষাদ, ঘটালে

সজনী !”

এই গীতের সহিত পাঠক গোবিন্দ-

অধিকারীর নিম্নোদ্ধৃত গীত তুলনা করিয়া

দেখিতে পারেন।—

“রুদে ! কৈলো কৈ

কুঞ্জে এলো জীহরি।

চেয়ে দেখলো, পোহাইল শরীরী। ইত্যাদি
রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতে কৃষ্ণকমল গো-
স্বামীই এইকণ বস্তু অদ্বিতীয়। তাঁহার
'নিপট কপট' এবং 'আটি পাটি শাটি
'বাঁচিতে' মধ্যে মধ্যে প্রাণান্ত হইলেও,
সাধারণতঃ তাঁহার গীত গুলি রসভারে
পরিপূর্ণ। কৃষ্ণকমলের বিচিত্রবিলাসে ঘাছা
আছে, হৃৎকের বিষয় এই যে, কামিনী-
কুঞ্জে তাছাও আমরা পাইলাম না। যিনি
"যৌবনে যোগিনী" ও "পাষণ্ড প্রতিমা"র
রচয়িতা, তাঁহার কেন এই বুদ্ধি, এই মতি?
অথবা করকণ্ঠমুখই বর্তমান বঙ্গীয় যুবার
প্রধান রোগ'।

৭। "নবাব সেরাজ্জন্দোলা। ঐতি-
হাসিক নাটক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী
প্রণীত।" বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রকা-
রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিলেও,
আজি পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালি একখানি
প্রকৃত নাটক লিখিয়া জাতীয় ভাষার গো-
রববর্ধনে সমর্থ হন নাই। এদেশে অনে-
কেরই এইরূপ ধারণা যে, কথার সহিত
কথা গাঁথিয়া কথোপকথনচ্ছলে উপন্যাস
লিখিলেই তাহার নাম নাটক, এবং যিনি
তাছা লিখিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস।
হুঁতুগাবশতঃ এইরূপ কালিদাসের সংখ্যা
ত্রয়োদশের সকল স্থান ছাড়িয়া বঞ্চে দিন
দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সেই স-
কল কালিদাসেরা অছোরাত্র এত নাটক
লিখিতেছেন যে, আমরা হতভাগ্য মন্নি-

নাথেরা এইকণ আর চীকা করিব কি—
মূলগ্রন্থ পড়িয়া উঠাই আশাদিগের অসাধা
হইয়াছে। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের ইহাই
যার পর নাই প্রশংসার কথা যে, তিনি
বঞ্চের কালিদাস নহেন। বাঙ্গালায় ভাল
নাটক না থাকুক, সাহিত্য সমাজ মন্দের
ভাল বলিয়া যে কদখানি নাটককে আদর
করিয়াছেন, "সেরাজ্জন্দোলা, সর্ব্বথা ত-
দ্রাধ্য স্থান পাইবার যোগা;—এবং বাবু
দীনবন্ধু মিত্র ও উপেন্দ্রনাথ দাস যে শ্রে-
ণীর নাটককার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,
শক্তি ও ক্ষমতায় বহুতরতমা থাকিলেও,
বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী সেই শ্রেণীরই
অনতিদূরে আসন পাইবার উপযুক্ত। য-
দিও আমরা তাঁহার আর কোন নাটক
পড়ি নাই; কিন্তু এই একখানি মাত্র পড়ি-
য়াই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পাইয়াছি যে,
তিনি একজন সুলেখক ও সহৃদয় কবি।
এইরূপ লোকের আদর হওয়া উচিত।

সেরাজ্জন্দোলার কাহিনী এদেশে প্রায়
সকলেরই একপ্রকার কণ্ঠস্থ আছে। মার্শ-
মেনের ইংরেজী ইতিহাস, বিদ্যাসাগরের
বাঙ্গালা ইতিহাস, রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন
ইতিহাস এবং আরও অনেকের নানাবিধ
ইতিহাসের প্রসাদাৎ সকলেই কিস্কিন্ধ্যা-
কাণ্ডের কথার মত ক্লাইব ও সিরাজ্জন্দো-
লার কথা অবগত আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ
বাবু সেই পুনঃ পুনঃ চর্চিত পুরাতন কথা-
তেও যে নূতনরস ঢালিতে পারিয়াছেন,
এবং গ্রন্থখানিকে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের

পাঠযোগ্য করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার গুণবত্তার প্রচুর-প্রমাণ । তাঁহার লেখা পড়িতে কাহারও বিরক্তি জন্মিবে না, এবং ক্রমশঃ তৎস্বকোর বুদ্ধি হইবে, এবং ইতিহাসের সেরাজ্জুদ্দৌলাকে নাটকের নিপুণ তুলিকার চিত্রিত দেখিয়া সকলেই নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিবে ।

কিন্তু চিত্রে বহুদোষ আছে এবং চিত্র অপেক্ষাও পাঁচটি সকলগুলি চিত্রের বিন্যাস বিষয়ে গ্রন্থকারের অধিকতর দোষ প্রকাশ পাইয়াছে ! সেরাজ্জুদ্দৌলার ঘটনা এবং সেই ঘটনের সঙ্গে ভারতে রুটিশ শক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা একটি সামান্য ঘটনা নহে । সমগ্র ইতিহাসে না হউক, বোম্ব হয় আধুনিক ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ নাই । আমাদিগের নাটককার সেই অসামান্য ঘটনাকে একটি সামান্য ঘটনার ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন, এবং যে অভিনয়ে ভারতের বর্তমান বিপ্লব, যে অভিনয়ে এনিয়ার বর্তমান পরিবর্ত, গৌসাইদাস নামক একটি অপমানিত ব্রাহ্মণ এবং সত্যবতী নামী একটি অপহৃত ব্রাহ্মণ কন্যার হস্তে তাঁহার মূলমন্ত্র বাঁধিয়া দিয়া, আর সকলকে অন্ধকারে ফেলিয়াছেন । রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ, তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস, মন্ত্রিমুখ্য মহারাজ মহেন্দ্র রায়চন্দ্র, মাতাব রায়, জগতশেঠ, পাটনার প্রতিনিধি রাজা রামনারায়ণ, এবং অবলা বলিয়া নগণ্য হই-

লেও প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্রগণ্য অরপূর্ণা রাণী ভবানী প্রভৃতি তদানীন্তন প্রধান ব্যক্তির। যে তমোময় ষড়যন্ত্র করেন, তাহাতেই সেরাজ্জুদ্দৌলার রাজ্যভ্রষ্ট হয় । তাঁহাদিগের অতিমান্নে আঘাত করিয়া বাদ্যলার সুবেদার ধনে প্রাণে বিনাশ পায় । কিন্তু আমরা এই নাটকে তাঁহাদিগের কাহাকেও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখি না । তাঁহারা সকলেই অজ্ঞাত নাম গৌসাইদাসের করদ্রুত ক্রীড়া পুতুল এবং গৌসাইদাসের কৃত্রিম জ্যোতিতে লজ্জায় হীন-প্রভ । গৌসাইদাস যাহা বলায় তাহা তাঁহারা বলেন, গৌসাইদাস যাহা করায় তাহা তাঁহারা করেন । নাটকের আদি, মধ্য, অন্ত সর্বত্রই সেই গৌসাইদাস, অথচ গৌসাইদাস যে একটা কেমনতর কি, তাহাও নাটকে আমরা ভাল করিয়া দেখিতে পাই না, এবং যে গৌসাইদাস সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন এবং সীতা উদ্ধার প্রভৃতি এতকাণ্ড করিল, গ্রন্থকার তাহাকেও একবার ভাল করিয়া দেখিতে ও চিনিতে দিলেন না ।

এদিকে নবাবের অন্তঃপুরে গৌসাইদাসের রূপাভিমানিনী অথচ পতিশ্রোমা-নুরাগিনী ভার্যা, ধর্ম্মশীলা সত্যবতী । সত্যবতীর জন্য মীরণ, মীরণের জন্য মিরজাকর, এবং মিরজাকরের জন্য ক্রাইব । সত্যবতীর ছবিটি অতি সুন্দর হইয়াছে, সত্যবতী যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহা যেন মাধুর্যাগুণে আমাদিগের কর্ণে একে-

বারে লাগিয়া রহিয়াছে। অমন প্রীতি-মধুর প্রিয়কণ্ঠ একবার শুনিলে, শীত্র কেহ তুলিতে পারে না। কিন্তু হায়! সেখানেনও আবার ফতিমা। আর সেই ফতিমা কে? না, প্রচ্ছন্নরূপী গোঁসাইদাস। বস্তুতঃ গ্রন্থকার এক গোঁসাইদাসের কথা ও কাণ্ড লইয়াই গ্রন্থের সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং গোঁসাইদাসকে ভাবিতে ভাবিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্রাইবের ছবি চিত্র করিতেও তুলিয়া গিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণকথাস্থান্য শিশুপালবধ, তেমনই ক্রাইবের কথাস্থান্য সেরাজবধ। ক্রাইবের চিত্র মুচাকরূপে ফলিত না হইবার গ্রন্থের এক অংশই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অপূর্ণতা ও দোষ আরও অনেক আছে।

কিন্তু অপূর্ণতা ও দোষ সত্ত্বেও এই নাটকখানি প্রশংসাযোগ্য;—রচনা শব্দভাণ্ডারশূন্য অশচ মধুর, বর্ণনা মনোহারিণী, এবং প্রায় সমস্ত অংশই ভাবুকতার পরিচায়ক। শব্দবিন্যাসে অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমাদ আছে। যথা;—“সে আপনাকে সমূহ মান্য করে” —“বাজালির সহাগুণ” ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু গুণের ভাগ অধিক হইলে এ সমস্ত সামান্য দোষ প্রায়শঃ গণনায় আইসে না। পূর্বেই বলিয়াছি, বাজালায় ভাল নাটক নাই। যে সকল নাটক একদিনে কণ্ঠিত, দুই দিনে লিখিত এবং তিন দিনে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া সমালোচনার জন্য সর্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, যদি সেগুলি

অন্ততঃ এই শ্রেণীর নাটক হইত, তাহা হইলে আমাদের ক্রেশের তার বিস্তর লঘু হইয়া পড়িত। আমরা গ্রন্থগুলি পড়িতে পারিতাম, পড়িলে সমালোচনা করিতেও সক্ষম হইতাম। যে সকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠাই এক বিষম যন্ত্রণা, তাহার সমালোচনা করা কিরূপ ব্যাপার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সমালোচ্য নাটকখানি সম্বন্ধে এ কথা আমরা পুনরপি বলা কর্তব্য জ্ঞান করিতেছি যে, নাটক্যাংশে ইহার যাহাই দোষ গুণ থাকুক, ইহা একখানি সুপাঠ্য ও মুখপাঠ্য গ্রন্থ।

৮। “বাবস্থা বিজ্ঞান। প্রথমভাগ। ত্রিগোবিন্দচন্দ্র বসাক, বিএ বিএল প্রণীত।”—এই পুস্তক খানি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বাবস্থাশাস্ত্রের ইতিহাস ও মূলমন্ত্রসম্পর্কিত অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে। বাবস্থাশাস্ত্রের ইংরেজী গ্রন্থ পড়া বাঁহাদিগের অসাধ্য, তাহারা ইহা পড়িলে উপকৃত হইবেন। বাঁহারা ইংরেজী না শিখিয়া ওকালতি করিতেছেন, এই উনপঞ্চাশৎ পৃষ্ঠাত্মক পুস্তক খানিকে তাঁহাদিগের অবশ্যই একবার পড়িয়া ফেলা উচিত।

৯। “গৃহ-চিকিৎসা। প্রথমভাগ। সচিব চিকিৎসা সূত্র। শ্রীবসন্তকুমার দত্ত প্রণীত।”—পূর্বোক্ত বাবস্থাবিজ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানির সম্বন্ধেও আমাদের প্রায় তাহাই বক্তব্য। অ-

খাঁ বাঁহারা ইংরেজীতে হোমিওপেথিক কোন পুস্তক পড়েন নাই, এখানিতে তাঁহাদিগের বিস্তর উপকার দর্শিবে, এবং একটি ঔষধের বাস্তব ঘরে থাকিলে গৃহস্থের পক্ষেও এই গ্রন্থ উপকারে আসিবে ।

আমরা বসন্ত বাবুর অধাবসায়কে ধন্যবাদ দি। হোমিওপেথিতে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে তাহা বঙ্গদেশে প্রচার করা কর্তব্য, এবং এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ সেই প্রচারের অন্যতম পথ ।

বিবিধ ।

আলস্যের পৌষকতা ।

যে অলস, সে সমাজের গলগ্রহ ।
তবে তাহার পৌষকতা কর কেন ? যে অলস, সে পাপের প্রিয়নিকেতন,—পৃথিবীর ভয়দন্ত, দুষ্কৃতির মুষ্টিমান্ অবতার, পণের কণ্টক, উন্নতির অন্তরাগ এবং অনন্ত দোষের আবাসস্থল । তবে তাকে প্রশ্রয় দাও কেন ?—যখন অকার্য্যই তাহার এক মাত্র কার্য্য, তখন তাহার কার্য্যে আবার অনুরাগ ও উৎসাহ কেন ?

জড়পিণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে অলস নহে । কারণ জড়পিণ্ড জড়পিণ্ডের উপর কার্য্য করে, জড়জগতের স্থিতি ও গতি রক্ষা রূপ চিন্তার অগম্য মহান্ ব্যাপারে ব্যাপৃত রহে । উহাকে কে অলস বলিবে ? হিমাচল হইতে বালুকণা, অতলবারিধি হইতে বারিবিন্দু,—জড়জগতের এই সমস্ত বস্তুই প্রকৃতির অভিপ্সিত কোন না কোন কার্য্য করিতেছে । উহারা না থাকিলে জগদ্বস্ত্র থাকে না,—জগদ্বস্ত্র চলে না । সুতরাং উহাদিগের নিন্দা নাই ।

পশু পক্ষীও অলস নহে । কবির প্রিয় এবং কাবোর চির আদরের ধন মধুকর যেমন ফুলে ফুলে বিচরণ করিয়া ফুলের মধু সংগ্ৰহন করে, প্রাণিজগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত জীবই সেইরূপ আশ্রদেহ রক্ষার নিমিত্ত অছোরাত্র নানাবিধ চেষ্টায় রহে । কেহই বসিয়া থাকে না । কেহই বসিয়া বসিয়া, কথা মাত্র কহিয়া, আপনার ও পরের সময় ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্রের ঢেউ গণে না । তাহাদিগের নাম ব্যাভ্র হউক, আর ভল্লুক হউক, রখা কেন তাহাদিগকে অপবাদ দিবে ?

জগতে আলস্যের অপবাদ যদি কাহাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে, তবে তাহা কেবল এক অকৃতী ও অক্রিয়ামিত্ত মনুষ্যে । জানি না সমাজ কেন ইহাদিগের ভার বহন করেন ।

বঙ্গদেশ ছয়কোটি লোকের বাসভূমি । এই ছয়কোটির মধ্যে অন্ততঃ দুই কোটি লোক আলস্য মাত্র ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালির রক্তশোষণ করি-

তেছে। ব্রিটিশশাসনাধীন ভারতবর্ষে হান
কম্পে আটকোটি লোক আলসো ডুবিয়া,
মনুষ্যাগণনার বাহিরে গিয়াছে। যদি ই-
হারা প্রত্যেকে আপনার আহাৰ্য্যসমেত
দশটি টাকা উপার্জন করে, তাহা হইলে
বাল্লার সাধারণসম্পত্তিতে বৎসরে বিশ
কোটি, এবং ভারতবর্ষের সম্পত্তিতে বৎ-
সরে আশী কোটি টাকা সমাগত হয়।
যাঁহারা এদেশের দারিদ্রদুঃখ, অন্নক্লেশ
এবং হুতিফের ছাঁহাকারে আকুল হইয়া
স্বজাতির জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন,
তাঁহারা কি এই গণনার প্রতি দৃষ্টিপাত
করেন?—যাঁহারা ভারতের উদ্ধার-সাধ-
নের জন্য নবরসের নাটক লিখেন, অথবা
কবিতার কোমলকুমুমে মালা গাঁথিয়া
ভারতবাসীকে বীর-বেশে বিভূষিত করেন,
তাঁহারা কি এই সামান্য কথাটিকে ফণ-
কালের জন্যও মনে আনেন?—ভারতের
অকর্ম্ম আট কোটি যদি আশী কোটি
টাকা বৎসরে ঘরে আনে, তাহা হইলে
বোধ হয়, বিনা নাটক, বিনা নবন্যাস,
এবং বিনা কবিতার রসের উচ্ছ্বাসেও
ভারতভূমি উদ্ধার পাইয়া যায়,—এবং ভা-
রতভূমি উদ্ধার না পাউক, অন্ততঃ ভারত-
বাসী উদরে অন্ন এবং অঙ্গে বস্ত্র দিয়া
পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান পায়। ভারতে
কেহই কি যোগতত্ত্ব ছাড়িয়া বিয়োগত-
ত্ত্বের এসকল কথা লইয়া আলোচনা ক-
রিবে না?

যে ভারতভূমি রত্নেরখনি এবং কুবে-

রের ভাণ্ডার বলিয়া ইউরোপে পরিচিত
ছিল, এবার সেই ভারতভূমি বিলাতীয়
বিজ্ঞলোক ও বণিকদিগের নিকট অন্ন
কাদালিনী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।
আমরা যদি আলস্যকেই আমাদিগের পুষ্-
শয়া জ্ঞান করি,—অলস ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া
পরিচিত হইতে লজ্জায় স্রিয়মাণ না হই,
এবং দেশের সমস্ত ব্যক্তিকে সমাজের
স্বদৃঢ় শাসনে বাধ্য করিয়া, কাৰ্য্যক্ষেত্রে
পাঠাইয়া না দি, তাহা হইলে বোধ হয়
ঐ পুষ্ণশয়াই অচিরে আমাদিগের শব-
শয়া হইবে। ভারতবাসী, সাবধান!

পিপিলিকা রাজ্য।

ম্যার জে লাবক নামে একজন প-
ণ্ডিত তাঁহার জীবতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লি-
খিয়াছেন যে, পিপিলিকাগণের অবস্থা
এবং সামাজিক ব্যবহারের প্রতি অভি-
নিবেশপূৰ্ব্বক অনুদ্যান করিলে বোধ হয়,
উহারা কোন অংশে সভ্যতার অভিমানী
মানবসন্তানগণ হইতে নিকৃষ্ট নহে। পি-
পিলিকার ক্ষুদ্র সংসার স্নেহ দয়া, আশ্রয়-
দান, শুশ্রূষা প্রভৃতি সকলগণের আদার।
উহারা একে অন্যকে সাহায্য করে, পীড়া
হইলে আহাৰ বিধান করে, এবং পৃষ্ঠে ক-
রিয়া লইয়া বেড়ায়। লক্ষ্যাদিক পিপি-
লিকায় এক একটি উপনিবেশ সংস্থাপন
করিয়া বাস করে, উহারা পরস্পর সকল-
কেই চিনিতে পারে। অথচ মুহূর্তের জন্য
বিবাদ করে না। শিশুগণ এবং রোগী ও

রুদ্ধগণ গৃহে থাকে, যাঁহারা বলবান্ তা-
হারা আঁহারাঘেষণ করিয়া আনে। যদি দূর
হইতে অপর একটি বাসার পিপিলিকাকে
আর এক নূতন পিপিলিকার দলে ছাড়িয়া
দেওয়া যায়, তাহা হইলে, উঁহারা ঐ বি-
দেশীকে আঁগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে
এবং আপন করিয়া লয়। এক বাসা হ-
ইতে একটি পিপিলিকাভিষ, আর এক
বাসায় রাখিলে, ঐ বাসায় পিপিলিকা
আপন ভিষের ন্যায় নিশ্চার্থ স্নেহ ও যত্নের
সহিত প্রাণ পণে উঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ
করে। লাবক সাহেব বলেন তিনি প-
রীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পিপিলিকাগণ
পাঁচ বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল জী-
বিত থাকিতে পারে। তিনি একাদশটি
পিপিলিকা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হ-
ইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত পালন
করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নয়টির মৃত্যু হইয়া
ছিল, দুইটি জীবিতছিল, কিন্তু তাঁহারা বি-
বর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পরে তাঁহাদিগকে
তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

উদ্ভট ।

যত দুখ আছে বিনি
দাও তাহা সহিব,
মরমে পুড়িব তবু
মুখে নাহি কহিব ;—
অরসিকে রসাল্যাপ,
এষে এক যাতনা,

ললাটে লিখ'না মোর
ললাটেতে লিখ'না ।

বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে উড়িব,
বন-বিটপীতে বসি
প্রিয়-নাম গাইব ;—
বনফুল, বনফল
বনা এই পরিমল,
ইহাই সম্পদ মম,
ইহা লয়ে রহিব ;—
প্রিয়-বিল্বদেবের দুঃখ
বনবাসে ভুলিব ।

হায়! কেন না হইবু
মেঘের মতন,
পর্যর্থ ঢালিয়া দিতে
নিজের জীবন।
দামিনী তুলিত অঙ্গে
থাকিতাম সুখ সঙ্গে
খেলিতাম বঙ্গে লয়ে
মত্ত প্রভঞ্জন।
ভূষিতে পরের প্রাণ,
করিতাম প্রাণ দান,
বজ্রাঘাতে নিজ দেহ
করি বিদারণ।

লজ্জাবতীলতা ।

লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ কর, বজ্রীয়
নব বধুর ন্যায় লাজে উঁহা মুগ্ধমাণা হইবে।

এই জনাই কবিগণ ইহার নাম লজ্জাবতী-
গণের উপর্য্যায় স্থলে ব্যবহার করেন যথা,
“কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী
যথা, মৃতপ্রায় পর-পরশনে”—বাহা হ-
উক বধুগণের লজ্জার কারণ আছে, তাই-
বলিয়া বনের লতা লজ্জার মাথা লুকাইবে
কেন? হেন্কে এবং মাফারস প্রভৃতি
উদ্ভিদভ্রমের তাহার কারণ নির্দেশ
করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লজ্জাবতীর
পত্র-দণ্ডের অভাঙের ছিঁড় আছে, ঐ সকল
ছিঁড়ের মধ্যে প্রতি পত্রের নিম্নদেশে ক্রু-
শের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক একটি
অতি মৃদুপ্রাণ স্প্রিঙ্গ আছে, অতএব উক্ত
লতাকে স্পর্শ করিলেই ঐ স্প্রিঙ্গ কুঞ্চিত
হইয়া যায়, সুতরাং উহার পত্র নিচয় ট-
লিয়া পড়ে ॥

শিক্ষিত শুক পাখী।

মুপ্রসিদ্ধ জুলিয়স্ সিজরের আনন্দ
বিধানার্থ কয়েক জন রোমক, তাঁহাকে
শিক্ষিত শুক পক্ষী উপঢৌকন দিয়া
ছিলেন। পাখিগণ সিজরকে দেখিলেই
“মহাবীর সিজর তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ
কর” এইরূপ বলিত।—সিজর সন্তুষ্ট হইয়া
এক একটি পাখীর জন্য এক এক সহস্র
মুদ্রা পারিতোষিক দেন। ইহা দেখিয়া
আর এক ব্যক্তি একটি শিক্ষিত শুক পক্ষী
উক্ত মহাত্মাকে উপহার দান করেন, কিন্তু
জুলিয়স তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে
ঐ ব্যক্তি হুঃখিত হইয়া পক্ষীটিকে ছাড়িয়া

দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিবার সময় এই ব-
লিয়া হুঃখ করিয়াছিলেন, যে, “হায়,
হুঃখী দেখিয়া সিজর আমার উপেক্ষা ক-
রিলেন।”—এই ঘটনার দুইদিন পরে
সিজর একদিন তাঁহার বিলাসকাননে
বেড়াইতে যান, যেই প্রবেশ করিয়াছেন,
অমনি শুনিতে পাইলেন কে যেন বলি-
তেছে, “হায়, হুঃখী দেখিয়া সিজর আ-
মায় উপেক্ষা করিলেন।” তিনি বিস্মিত
হইয়া চাহিয়া দেখেন, নিকটে তরুশাখায়
বসিয়া একটি ক্ষুদ্র শুক-শিশু মধুর স্বরে অ-
নবরতঃ ঐ কথা বলিতেছে। ইহাতে তিনি
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শুক-শিক্ষককে ডা-
কিয়া দুই সহস্র টাকা পুরস্কার দান করি-
লেন। তৃতীয় (লুই) নিপলিয়নের উদ্যান
সমূহেও এইরূপ অনেক শিক্ষিত পক্ষী
ছিল। ইহারা ফরাসী বিজয়-গীতি প-
র্য্যন্ত গান করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট
করিত। আমাদিগুর দেশে পাখিগণকে
রাধাকৃষ্ণ নাম শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বদেশ বৎসল কপোত।

গত ফ্রান্স প্রেশিয়ান যুদ্ধের সময়
জর্মানগণ প্যারে নগর অবরোধ ক-
রিলে, স্বক্ষমবুদ্ধি ফরাসীরা, শিক্ষিত ক-
পোত দ্বারা, নগরের বাহিরে আত্মীয়গ-
ণের নিকটে সংবাদ পাঠাইতেন। জর্মানগ-
ণ, শিক্ষিত বাজ পক্ষী দ্বারা ঐ সকল
কপোতগণকে ধৃত করিয়া, বিপক্ষের গুপ্ত
সংবাদ পাঠ করিতেন।—এই সময়ে একটি

কপোত যেরূপ অসাধারণ প্রভুভক্তি এবং
বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা মনে
করিলে মানবগণকেও দিকার দিতে
ইচ্ছা হয় । একদা একটি কপোত দুর্গ
হইতে এক খানী পত্র * মুখে করিয়া
বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে বি-
পাক্ষের বাজপক্ষী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া
লইয়া গেল । কপোত বিপাক্ষের হস্তগত
হইলে, তাহার উহার চক্ষু হইতে পত্র লই-
বার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল ।
কিন্তু কিছুতেই কপোত তাহা দিল না ।
অবশেষে সে যখন দেখিল, চোটে করিয়া
দীর্ঘকাল উহা রাখা অসম্ভব এবং বিপাক্ষে
উহা লইবে, তখন বুদ্ধিমান কপোত উহা
গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল । জর্যাণেরা
কপোতের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া পত্র বাহির
করিয়া পাঠ করিল । ফরাসী নগরে এ-
কটি রমণী একটি কবিতা লিখিয়া এই স্ব-
দেশবৎসল মহাত্মা কপোতবরকে চিরস্ম-
রণীয় করিয়াছেন । তাহা পাঠ করিলে
নরাদম ব্যক্তিরও দেশানুরাগ হৃদয়ে প্রজ্ব-
লিত হয় । যে কুলান্ধারগণের দেশের জন্য
মায়া মমতা নাই, তাহারাই এই সাধু ক-
পোতের নিকট নীতি শিক্ষা করুক ।

* চারি বর্গইঞ্চি পরিমিত অতি সূক্ষ্ম
কাগজে প্রায় ২০০০ হাজার শব্দ লাকিত,
এবং তাহা কেবল যন্ত্রের সাহায্যে পাঠ-
করা যাইত ।

বিনাকুলে ফল ।

আম্যানিগের দেশে একটি প্রহেলিকা
প্রচলিত আছে,—তাঁহার তাৎপর্য্য এই
“ বিনাকুলে ফল ধরে, কোন্ কোন্
রক্ষে ? ” এই প্রহেলিকা যাহাকেই হউক
না কেন জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি মীমাংসা
করিয়া দিবেন যে—“ডুমুর প্রভৃতি ।” ফ-
লতঃ এ সিদ্ধান্ত ভুল, এবং এ প্রহেলিকা-
গত প্রমত্তিও বিষম ভ্রমাত্মক । ডুমুর প্র-
ভৃতি বাস্তব ফল নহে উহার ফুল, । এই
জাতীয় ফুল হইবার উপক্রম হইতেই ইহা-
দিগের বোটার ডক এবং মাংস এত পুষ্ট
এবং রুক্ষি হইয়া থাকে যে, উহাতে ফুলকে
একবারে আস করিয়া ফেলে । এই সকল
ফলাকৃতি ফুল দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া দে-
খিলেই ফল কি ফুল ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান
হইবে । ডুমুর প্রভৃতিকে কর্তন করিলে
উহাদের অভ্যন্তর প্রদেশে পরাগকেশর
দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

বুদ্ধিমান দরিদ্র ।

এক দরিদ্র ব্যক্তির কোনও প্রকারেই
দিনপাত হইত না । তিনি একদা কোন স-
ম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট একঘণ্টাকালের জন্ত
একখানি উৎকৃষ্টশাল এবং তদনুরূপ অ-
ন্যান্য বস্তাদি চাহিলেন, তাহাতে সম্ভ্রান্ত
ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ইহা
একঘণ্টা কালের জন্য পরিধান করিয়া কি
উপকার পাইবে ?—দরিদ্র ব্যক্তি বলি-
লেন, গরিব অবস্থা দেখিলে সকলেই ঘৃণা

করে। অতএব বড় মানুষ সাজিয়া গেলে ধনিগণ আত্মসহকারে আমার উপকার করিতে যত্নশীল হইবেন, সংসারের এই রীতি।

আশ্চর্য-যান।

এক ব্যক্তি আর এক বিদেশী ব্যক্তির সহিত কোন দূরতানে যাইতেছেন, যাইতে যাইতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল মহাশয়, কাস্তিক, গণেশ, নারায়ণ প্রভৃতি, পাখী এবং ক্ষুদ্র জন্তুর পৃষ্ঠারোহণ পূর্বক কিরূপে বেড়াইতেন? বিদেশী বলিলেন, তাঁহার ত দেবতা ছিলেন, ইচ্ছা করিলে যানবাতীত শূন্যেও যাইতে পারিতেন। আমাদিগের দেশের রাজারা গাধায় চাপিয়া বেড়ান। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন, তাঁহাদের কি হয়, হস্তী প্রভৃতি কিছুই নাই। বিদেশী ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন, পূর্বে ছিল, রাজা হইয়া অবধি আর নাই। তাঁহার সঙ্গী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? বিদেশী ব্যক্তি বলিলেন, “আরে এখন যে তাঁহার আহার কমাইয়াছেন—সুতরাং শরীরও কমিয়াছে, এখন গাধাই অনায়াসে তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।” তাঁহার বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আহার কমানই বা কেন? বিদেশী বলিলেন, শুনিয়াছি আহার কমানিলে নাকি স্বপ্নবুদ্ধি হয়।

চতুরঙ্গ।

এতদেশে ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ পল্লিগ্রামস্থ জমিদার বর্গের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু চতুরঙ্গ খেলার অভ্যাস আছে। আজি কালি এমন কোন সভাদেশ নাই যেখানে চতুরঙ্গ খেলা একবারে অজ্ঞাত অথবা অনাদৃত। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, রাবণ স্বর্গ বিজয়ের পর যখন সংগ্রাম করিতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী খুজিয়া পাইলেন না, তখন এই অবসর সময়ের অলসতা পরিহার এবং সমরলিপ্সু চিত্তের অসহ্য কণ্ঠস্বর নিবারণ করিবার জন্য তিনি এই অপূর্ব চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি করেন। গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, লিডো এবং টাইরিনো নামক বীর-ভাতৃদ্বয় দুর্ভিক্ষে প্রাণীড়িত হইয়া তজ্জনিত দাক্ষ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার জন্য এই খেলার উদ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত যে, হিন্দুরাই এই খেলার প্রথম পথ-প্রদর্শক। সর উইলিয়ম জোন্স তাঁহার গভীর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, চতুরঙ্গ খেলা হিন্দুদিগের দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হইয়া ভারত বিজয়ের পর আফগানজাতি কর্তৃক তাহাদের দেশে নীত হয়, এবং সেইখান হইতেই মুসলমানজাতিরা শিক্ষা করিয়া সমস্ত ইউরোপে ইহা বিস্তৃত করে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারি অঙ্গে বি-

ভক্ত বলিয়া এই খেলার নাম চতুরঙ্গ, আফগানগণ এই শব্দটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ইহার নাম সেংরঞ্জ রাখিয়াছেন। পরিবর্তনের পর পরিবর্তন হইয়া অবশেষে এই শব্দ হইতে ইংলণ্ডীয় Check এবং Exchequer শব্দ বহির্গত হইয়াছে।

আমাদের দেশে তাম পাশা প্রভৃতি যে সকল ঠাঁচকী খেলা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে চতুরঙ্গ খেলাই সৰ্বাপেক্ষা বৃদ্ধি-নাপেক্ষ। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজ পুরুষেরা ইহাতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি অনেকের এই খেলায় সৰ্ব্বনাশ হইয়া যাইত, তথাপি তাঁহার অক্ষিপণ্ড করিতেন না। মহাভারতে পাণ্ডবগণের রাজ্য নিৰ্ব্বাসন, বিরাট সভায় যুদ্ধির অক্ষাঘাতে রক্তপাত প্রভৃতি পাশকীড়ার অনেক গর্হিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চতুরঙ্গ খেলাস্বত্বে পুরাণাদিতে কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। কিন্তু ইউরোপে এই খেলায় রাজ্যবিপ্লব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। টাইমুরলেন যখন তুর্কক আক্রমণ করেন, তখন তুর্ককেরসত্রাট বাজেজাত এই খেলায়

এইরূপ মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশ বিলুপ্তি হইল, তথাপি তিনি নিজের অথবা প্রজাপুঞ্জের রক্ষার্থ কোন চেষ্টাবলম্বন করিতে পারিলেন না। স্পেন যখন মুরদিগের অধিকৃত ছিল, তখন উক্তবংশীয় কোন রাজপুরুষ অনেক হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসন অধিকার করিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা বর্তমান থাক সত্ত্বে উহা তাঁহার বংশধরের উপভোগ্য হইবে না। তখন তিনি তাহারও বধসাধনে ক্লতসঙ্কল্প হইয়া তদর্থ এক দূত প্রেরণ করেন। এই সময়ে তিনি কোন বন্ধুর সহিত চতুরঙ্গ খেলার প্রবৃত্ত ছিলেন। দূত বাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তৎক্ষণাৎ এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তিনি অনেক মিনতি করিয়া আরক্ত খেলার পরিসমাপ্তির কালটুকু পর্য্যন্ত বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। খেলার অবসান হইলে যখন তাঁহাকে বধাভূমিতে নেওয়ার উপক্রম হইতেছিল, তখন আর এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সত্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি প্রজাপুঞ্জের সম্মতি অনুসারে সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়াছেন।



বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান।

মনে বড় সাধ মাতৃভাষার সেবা করি।
কিন্তু একে শক্তি অস্প, তাহাতে আবার
অবকাশ কম। আজ একটু অবসর সৃষ্টি
করিয়া ছুটা কথা লিখিতে সংকল্প করি-
লাম। সম্মুখে অনতিদূরে একখানি ইং-
রেজী ভাষার উচ্চারণের অভিধান পড়িয়া
আছে। ভাবিলাম, বঙ্গভাষায় কি কোন
দিন উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন হ-
ইবে?

উচ্চারণের অভিধান বর্ণমালার অভা-
বের উপরেই সংস্থাপিত। যে ভাষার
বর্ণমালা পূর্ণাবয়ব সে ভাষার উচ্চারণের
অভিধান প্রয়োজনীয় নহে। বঙ্গভাষার
বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বঙ্গভাষা
রাণীর কন্যা; জ্যোতনে সম্প্রাংশালিনী ও
গৌরবাস্বিতা। দেখিলাম বর্ণমালা সমগ্রই
জননী সংস্কৃত হইতে পাইয়াছেন। অতি
সুন্দর বর্ণমালা, বৈজ্ঞানিকসূত্রে শ্রেণীবদ্ধ।
ক্রমনির্ণয়ে কত না পাণ্ডিত্যের পরিচয় পা-
ওয়া যাইতেছে। ব্যঞ্জনে প্রথমেই উচ্চা-
রণে বায়ুর প্রাধান্য অপ্রাধান্য লইয়া বর্ণ-
বিভাগ। সর্বাণ্যে স্পর্শ বর্ণ, পরে অ-
ন্তঃস্থ বর্ণ, ও শেষে উষ্মবর্ণ। স্পর্শবর্ণে জি-
হ্বাস্পর্শে বায়ু কদ্ধ ও উচ্চারণ স্থগিত হয়।
অন্তঃস্থবর্ণে বায়ু কদ্ধ বা উচ্চারণ স্থগিত

না হইয়া অপ্রতিহতভাবে বাহির হইয়া
যায়। এবং উষ্মবর্ণে বায়ু অর্ধকদ্ধ হইয়া
শিথ দেওয়ার ন্যায় বহিয়া যায়। স্পর্শবর্ণ
পর্যালোচনা করিলাম, দেখিলাম উচ্চারণ
স্থানভেদে কেমন বর্ণে বর্ণে বিভক্ত রহি-
য়াছে। অন্তর্দেশ হইতে ক্রমশঃ বহির্দেশে
আমিলে প্রথমেই কণ্ঠ, পরে ক্রমশঃ তালু,
মূর্দ্ধা ও দন্ত, ও শেষে ওষ্ঠ। বর্ণমালারও
প্রথমে কণ্ঠ্য কবর্ণ, পরে তালব্য চবর্ণ,
মূর্দ্ধন্য টবর্ণ, দন্ত্য তবর্ণ ও শেষে ওষ্ঠ্য গ-
বর্ণ। সর্বশেষে একটি বর্ণের আলোচনা
করিলাম। দেখি প্রথমে তীক্ষ্ণ ক খ, পরে
স্থূল গ ঘ, ও শেষে নাসিক ঙ। ক, খ
এবং গ, ঘর মধ্যেও প্রথম কোমল ক ও
গ, ও পরে কর্কশ খ ও দ।

স্বরবর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম।
দেখি প্রথমে কণ্ঠ্য অ আ, পরে তালব্য ই
ঈ এবং তৎপরে ওষ্ঠ্য উ উ। শেষে মিশ্র
উচ্চারিত কণ্ঠ্যতালব্য এ এবং কণ্ঠ্য ঐ ও।
ঋ ঌ ৯ ঐ ও এই পাঁচবর্ণের কথা পরে
কহিব।

যে কএকটি ভাষার বর্ণমালা জানি তাহা-
দের সহিত বঙ্গভাষার তুলনা করিলাম।
দেখিলাম তাহাদিগের বর্ণমালা বালকের
ক্রীড়াকল্লুরের স্থায় ইত্যন্তঃ বিশৃঙ্খলভাবে

বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্বরের মধ্যে ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বর, ঔষ্ঠ্যবর্ণের পরে কণ্ঠ্যবর্ণ এবং স্পর্শবর্ণের মধ্যে অন্তঃস্থ বা উদ্ভাবন। লাতিন ও গ্রীক এবং তন্নিকট ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা, আরবী ও পারসী সকল ভাষার বর্ণমালাই একরূপ বিশৃঙ্খল ও যথেষ্ট হ্রাস্ত।

বঙ্গভাষার বর্ণমালায় যে কেবল ক্রম-বিশ্রাসের অতুল বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা নহে, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও অতিশয় পরিপুষ্ট। উহা পূর্ণাবয়ব নহে কিন্তু প্রায় পূর্ণাবয়ব। দুই চারিটি দোষ ও অভাব বাহা দেখিলাম তাহা বলিতেছি।

১। দেখিলাম ঋ ঌ ৯ ঐ ও এই পাঁচটি বর্ণ অনাবশ্যক। স্বরব্যঞ্জনে কিম্বা দুইটি স্বরে উহাদের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে। তন্নিম্ন উহাদের উচ্চারণ যৌগিক। যৌগিক উচ্চারণের জন্ত অগংযুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহাকে ক্রিপণে নির্দোষ কহিব ?

২। দেখিলাম অবহেলায় অন্তঃস্থ ব ও মূর্দ্ধণ্য ণ ও য এবং দন্ত্য স মৃতপ্রায় হইয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের আর তারতম্য নাই। দুই একটি সংস্কৃত ধরনে রচিত শ্লোক পাঠের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে প্রায় হ্রস্ব দীর্ঘের পার্থক্য থাকে না। মাতঃ বঙ্গভাষা, নিজে উপার্জন করা দূরে থাকুক, জীদনে প্রাপ্ত সম্পত্তিও যে খোয়া-

ইতে বসিয়াছে ? বাঙ্গালীরা হ্রস্বের মূর্দ্ধণ্যক বেদনাতেও একতাবদ্ধ হয় না। তোমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য কি একতাবদ্ধ হইবে ? আশা করিতে পারি না। তবে সরস্বতীর রূপা।

৩। দেখিলাম পদান্ত অকার অনেক স্থলে উচ্চারিত হয় না। একারের উচ্চারণ দুইটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত, মেথর, কেন, দেও, নেও ইত্যাদি শব্দে একারের উচ্চারণ সাধারণ উচ্চারণ হইতে বিভিন্ন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের সহিত আমার চিন্তার বিষয়ের সম্বন্ধ অস্পষ্ট, কিন্তু যদি অকার কোথায় উচ্চারিত, কোথায় বা অনুচ্চারিত হয়, এবং একারের যদি দুইটি বিভিন্ন উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে ক্রমেই উচ্চারণের অভিধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে থাকিবে। ইংরেজী উচ্চারণ পুরুষে পুরুষে যুগে যুগে এমন কি বৎসরে বৎসরে পরিবর্তিত হইতেছে। আর পারি না। সেই উৎপাত কি বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিবে ? আগে শুনিয়াছি ডাইভোর্স, এডুকেশন, নেচার, মাইনিরিটি, বেক্স, এখন শুনি ডিভোর্স, এডুকেশন, নেটিয়র, মিনিরিটি, বেন্শ। উদাহরণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যায়। হুতন কলেজের ছাত্রের নিকট ইংরাজী কহিতে ভয় হয়, পাছে আমার বিনা সম্মতিতে ও অজ্ঞাতে পরিবর্তিত কোন উচ্চারণের জন্য পুরাতন মূর্খ মধ্যে পরিগণিত হই।

ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার উচ্চারণের অ-

ভিধান আবশ্যিক না হয় তাহার কি কোন চেষ্টা করা যাইতে পারে? এত, মেথর, কেন, দেও ইত্যাদি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ পরিবর্তন করিয়া সাধারণ একারের উচ্চারণ নিরূপিত রাখা সম্ভব নহে। ভাষা ব্যবহারের দাসী। ব্যবহারকে ভাষার দাসী করা সম্ভবও নহে এবং সম্ভবও নহে। সম্ভব হইলে একার একারই থাকিত হ্রস্ব (৫) হইত না। তবে ইহার একটি উপায় আছে। উর্দু ভাষায় আবশ্যিক মত পারস্য বর্ণমালার অতিরিক্ত টে, ডাল প্রভৃতি কএকটি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলায় সেইরূপ একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করা আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। অকারের উপদ্রব আরও ভয়ানক। লুপ্ত অকারের পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও তাহার চেষ্টা রথ। * উচ্চারণের অনুকরণে পদান্ত বর্ণ সমস্ত লিখিলে কি চলিবে? না, তাহা হইলে সমুদয় সন্ধি সূত্র পরিবর্তন করিতে হয়। কএকটি সাধারণ সূত্রে কি পদান্ত অকারের উচ্চারণ অনুচ্চারণ নিয়মবদ্ধ করা যায়? নিয়ম বদ্ধ করা সম্ভব হইলেও সাধারণ বিধি হইতে বর্জিত বিধি অধিক হইবে; এবং সমুদায়গুলি একত্র বহু

* যদি কেহ 'অতএব এক্ষণ তোমার নাম কহ' (৫ সূ দেখ) এই কথাটির সমুদয় পদান্ত অকারের উচ্চারণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উড়িয়া-বাসী বলিয়া ভ্রম হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

সংখ্যক হইয়া পড়িবে। সূত্র বহুসংখ্যক হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রায় সমুদয় দোষ ও অসুবিধা রহিল। অতএব ইহাতে বিশেষ কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।

কতগুলি কথা আছে যাহার অন্য অকার কখন বা উচ্চারিত হয় কখন বা অনুচ্চারিত থাকে। যেখানে উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত স্থল কোন কোন পুস্তকে 'ও' বর্ণ সন্নিবেশ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা, কোন, কোনও। অকারকে বিদায় দিয়া ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করা কতদূর সম্ভব তাহার বিচারে লেখনীকে ব্যায়াম-ক্লিষ্ট না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উক্ত প্রণালীতে আমাদিগের প্রদর্শিত অসুবিধার অতি অস্পাংশে মাত্র সাহায্য হয়। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার একটি মাত্র সহজ উপায় আছে। পদান্ত অকারের অধিকাংশই অনুচ্চারিত থাকে, অল্প সংখ্যক মাত্র উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত পদান্ত অকারের একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে উচ্চারণের অভিধানের দুঃসহ জ্বালা হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। কমা, কোলন, সেমিকোলন, প্রেমের চিহ্ন, বিস্ময়ের চিহ্ন, ইত্যাদি তো অতি অস্পদিন হইল বঙ্গভাষায় গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে, উচ্চারিত অকারের একটি চিহ্ন করিলে তাহাও যে অতি অস্পদ কাল মধ্যে প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমেই বলিয়াছি যে বর্ণমালা পূর্ণ হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন

হয় না। বঙ্গভাষায় যে দুইটি অভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা উপরে নির্দেশ করিলাম। ভবিষ্যতে আরও অভাব হইতে পারে। অভাব মোচনের জন্য যদি বর্ণমালা বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ উচ্চারণের অভিধান আবশ্যক হইবে। উপরে যে একটি বর্ণের ও একটি চিহ্নের স্রষ্ট্রির কথা কহিলাম তাহা এক জনের কার্য্য নহে, সমস্ত সাহিত্য সমাজের কার্য্য। এক ব্যক্তি প্রথম পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ না করিলে সাহিত্য সমাজ ভবিষ্যৎ বংশের নিকট বিশেষ ধন্য বাদাই হইবেন না। ইংলণ্ডে কতকগুলি লোক ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ

গানুসারে বর্ণবিন্যাস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বর্ণবিন্যাসের প্রণালীর নাম ফনেটিক সিস্টেম্। এই সিস্টেমের চেষ্টা যে সফল হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। তাঁহারা বিফলপ্রযত হউন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্যমে প্রমাণিত হইতেছে বর্ণমালার অভাবে ভাষায় কি অকথ্য বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যদি বর্ণমালা পরিবর্দ্ধিত না করেন তাহা হইলে আধুনিক ইংরেজেরা উচ্চারণ লইয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন ভবিষ্যৎ বঙ্গালীরা ততদূর না হটুক কিন্তু তজ্জপ এক গোলযোগে যে পড়িবে তাহাতে মন্দেছ নাই। জীবি—

প্রেততত্ত্ব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা এই প্রস্তাবে মধ্যস্থ এবং আরো জনের কথা বলিব। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মধ্যস্থে না ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠককে ‘মধ্যস্থ’ কথা বুঝান বড় দুঃস্থ। মূল কথা যাহার অনুপস্থিতিতে প্রেতাগমের ব্যাঘাত জন্মে, তিনিই মধ্যস্থ (Medium)। যেখানে দশজনে মিলিয়া প্রেতাহ্বান করিতে থাকেন, সেস্থলে যে সকলকেই মধ্যস্থ হইতে হইবে, তাহার

কোন অর্থ নাই। তবে ন্যূনপক্ষে একজনকে ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে হইবে। তাহার অভাবে প্রেতাবির্ভাব হইবে না। সাধারণতঃ বাহাঁরা দুর্বল, বা অধিক চিন্তাশীল, বা বাহাঁদের প্রেতে অন্ধবিশ্বাস, বা বাহাঁদের স্বাস্থ্য বা ধর্ম্মনী সকল শীঘ্র উত্তেজিত হয় (Nervous) তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া থাকেন। এই মধ্যস্থের সহিত প্রেতের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যদি দশজন বাজে লোক প্রেতের জন্য গলবস্ত্র হইয়া

খান করিতে থাকেন, তথাপি তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তিন জনের মধ্যে যদি একজন মধ্যস্থ থাকেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত দশজনে যাহা করিতে না পারিয়াছে, এই তিনজনে তদধিক করিতে পারিবে। সুতরাং যখন যেরূপ আয়োজন করিয়া প্রোতাহ্বান করিতে থাকি নাথকেন, সকল সময়েই যান কপ্পে একজন মধ্যস্থ চাই। তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য।

একণ্ঠে আয়োজনের কথা—আমরা পূর্বে বলিয়াছি যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রোতাহ্বানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের প্রচলন আছে। আমরা তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি।

১ম। তিন চারিজন একটি চৌপায়ার চতুর্দিকে বসিয়া তৎপরে এরূপভাবে হস্ত রক্ষা করে যেন পরস্পরের হস্তের সহিত যোগ থাকে, এবং সকলেই কোন বিশেষ প্রেতের কথা মনে মনে স্মরণ করিতে থাকে। আর একজন হয়ত প্রোতাহ্বানকারীদিগের মনের দ্বৈত্ব্য সম্পাদনার্থ হুঃখ-রসাত্মক কোন পুস্তক পড়িতে থাকে বা কোন গান গাহিতে থাকে। অস্পৃক্ষণপরেই একজনের অঙ্গ শিথিল হইতে থাকে এবং সে ক্রমে অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রেত আসিয়াছে স্থির করিতে হইবে। এবং এই অজ্ঞানাবস্থাকে যাহা প্রমত্ত করা যায় প্রায় তাহার সকলগুলিরই সে যথাবিধি উত্তর দিয়া থাকে। প্রোত-

ত্ববাদীমতে ইহাই প্রেতের উত্তর। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান জাগ্রত এবং সে স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়; চেতনা হইলে তখন আর অজ্ঞানাবস্থার কথা কিছুই স্মরণ থাকেনা।

আমি স্মরণ একবার এইরূপ প্রোতাহ্বান দেখিতে গিয়াছিলাম। যথাসময়ে একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহাকে এইরূপ প্রমত্ত করা হয়।

প্র। তুমি কাহার আত্মা?

উত্তর নাই।

প্র। আপনি যদি কাহারও আত্মা হন, অতীত করিয়া উত্তর দেন, আমরা আপনার অপেক্ষা করিতেছি।

উ। মহাত্মা রামমোহন রায়ের।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অজ্ঞান ব্যক্তি এক উপদেশপূর্ণ বাচনিক বক্তৃতা দিল; তাহাতে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ বক্তৃতা শিক্ষিতব্যক্তিও আয়োজন বাতীত দিতে পারে কিনা সন্দেহস্থল। এতদ্ব্যতীত আমরা জীবনে তাহার নিকট কোনরূপ বক্তৃতা শুনি নাই।

আর একবার এইরূপ সভায় গিয়া দেখিলাম, যে অজ্ঞানব্যক্তি একজনকে ক্রমাগত প্রশ্ন করিতেছে, দশ বায় জনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে এক খানা পালক বাহিরে আনিয়া ফেলিল। পর দিবস সে পালক গৃহে লইয়া যাইতে পাঁচজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল।

২। প্রেতাহ্বানের আরও একরূপ আয়োজন হইয়া থাকে; তাহাতে সকলই পূর্কমত; কেবল প্রেতমহাশয় স্কন্ধে চাপিয়া কাহাকেও অজ্ঞান করেন না; চৌপায়ার পদাঘাতে উত্তর দিয়া থাকেন। পূর্কোক্তরূপ কিয়ৎক্ষণ বসিলেই টুল নড়িতে থাকে। তখন প্রশ্ন করা হয় 'আপনি যদি কোন প্রেত আসিয়া থাকেন, কাষ্ঠপাদ একবার আঘাত ককন'। কাষ্ঠপাদে একবার আঘাত পড়িল। তখন প্রেতের উপস্থিতি স্থির হইল। তৎপরে কিরূপে কথোপকথন চলিবে তাহারই উপায় স্থির হইতে থাকে। হয়ত আস্থানকারীরা বলেন 'হাঁ হইলে যেন একবার শব্দ হয়, না হইলে দুইবার, এবং সংশয়যুক্ত হইলে তিন বার' তার পর প্রশ্ন হইতে থাকে, এবং এই নিয়মমতে প্রেত মহাশয় উত্তর দেন। তখন বলা হয় যে, 'আপনার যে অক্ষরে লিখিবার ইচ্ছা, আমরা অক্ষর পড়িয়া যাইব, আপনি আপনার মনস্থ অক্ষরে আঘাত দিবেন, আমরা আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিব, আপনি আবার বক্তব্য অক্ষরে আঘাত দিবেন' এই রূপ। ইহাতে উত্তমরূপ কথোপকথন চলিতে পারে। আস্থানকারীরা জিজ্ঞাসা করিবেন, রাম শ্যামের কত টাকা ধারে? এই বলিয়া অ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাবর পড়িতে আরম্ভ করিল, 'শ' এ এক আঘাত পড়িল। আবার গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ ক-

রিল 'ও' এ এক আঘাত পড়িল,—হইল শত টাকা।

৩য়। আর একরূপ কথোপকথনের উপায় প্লাঞ্জেট (Planchette)। এই অভিনব অথবা কি তাহা স্থাধারণকে বুঝান অনাবশ্যক। কিছু দিবস হইল একজন সাহেব এই অদ্ভুত জিনিষ কলিকাতায় আমদানী করিয়া বড় মন্দ লাভ করিয়া যান নাই। ইহা একখানি ছোট তক্তা। তিনটি পায়া আছে। পায়াতে সূক্ষ্ম চক্র দেওয়া আছে। তাহা এত মন্থন যেহাত দিলেই সে চাকাগুলি ঘুরিতে থাকে এবং তক্তা গড়াইয়া যায়। এই তক্তার মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল বসান আছে। যেমন চাকা ঘুরিয়া এই তক্তাকে সরাইতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পেন্সিলও সরে এবং কাগজের উপর হইলে সেই পেন্সিলে প্রশ্নের উত্তর অতি সূক্ষ্ম অক্ষরে লিখিত হয়। এই প্লাঞ্জেটে একবার আমি কএকটি বন্ধু * লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্লাঞ্জেট ঘুরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। যে সকল উত্তর পাইলাম তাহার প্রশ্ন সকল গুলিই ঠিক। পাঠকগণকে তাহার নমুনা দেখাইতেছি।

প্র। মহারাজী কোনবর্ষে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

প্লাঞ্জেট প্রশ্ন শুনিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া

* তাহাদিগের অন্যতম বাবু রাজকৃষ্ণ রায়। (অবসর সরোজিনী রচয়িতা)।

কিয়ৎকণ পরে '১' অক্ষরটি লিখিয়া পরে ৮; ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার দুইটি অক্ষর বাহির হইল, পড়িলাম ১৮৩৭। পুনর্বার প্রশ্ন করিলাম।

—কোন বৎসরে বায়রণের মৃত্যু হয়? উত্তর। ১৮২৪।

প্র। বায়রণ বড় কবি না সেনী?

উ। দুইজন দুই প্রকার কবি; তুলনা অসম্ভব।

পাঠকগণকে বলা বাস্তব্য, যে আমাদের কেহই উত্তর সকল ইচ্ছাপূর্বক লিখি নাই। এমন কি যে সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা জানিতাম সেরূপ একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; অথচ প্রায় অধিকাংশ উত্তর গুলিই ঠিকই লিখিত হইয়াছিল।

একটি বৈঠক উত্তরের কথাও বলি। সেই স্থানে আমাদের আর একটি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি মরিব কবে?

প্ল্যাফেট স্বভাবমত ঘুরিতে লাগিল। অনেককণ ঘুরিয়া—প্রায় আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে একটি ১ অক্ষর লিখিত হইল। আবার পূর্বমত ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু আমরা নাছোড়বন্দা, প্ল্যাফেট ঘুরিয়াই আছি। বহুকণ পরে '৮' অক্ষর লিখিত হইল। পুনর্বার ঐ রূপ উৎপাত। চারিটি অক্ষর শেষে সমাপ্ত হইলে পড়িলাম ১৮৭৫। আমরা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই পরীক্ষা করিতে ছিলাম।

পাঠকগণকে ইহাও জানান আবশ্যক যে আমাদের বন্ধু এখনও জীবিত আছেন।

আমাদের একটি প্রোততত্ত্ববাদী বন্ধু এইরূপ প্ল্যাফেট ঘুরিয়া প্রোতাহান করিতে ছিলেন। তিনি প্ল্যাফেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তুমি কি পরকালের সমস্ত কথা জান? যে হেতু তুমি প্রোত।

উ। জানি।

প্র। আমাদেরকে বলিয়া দেওনা কেন?

উ। তাহাইলে সব গোল মিটিয়া যাইবে।

এই শেষ উত্তরটিতে আমাদের উক্ত বন্ধু একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি বলেন প্রোত ব্যতীত এরূপ উত্তর দেওয়া আর কাহারও কি সম্ভবে? ফল কথা কথাটি তাহাকে বড় মধুর লাগিয়াছে কাজেই প্রোতে তাঁহার বিশ্বাস এক ভিগ্নী উচু হইয়াছে।

৪র্থ। তৃতীয় আয়োজনে যে যে উপকরণ আবশ্যক, ইহাতেও তাই, কেবল প্ল্যাফেটের মধ্যস্থলে পেলিল না থাকিয়া একটি দণ্ড প্রোথিত থাকে। এবং টেবিলের উপর ক, খ, প্রভৃতি অক্ষর লিখিয়া প্ল্যাফেট ঘুরিলে, ঐ দণ্ডটি এক অক্ষরের পর আর এক অক্ষরের নিকট গিয়া আপন অভিমত প্রকাশ করিয়া দেয়।

উপযুক্ত আয়োজন ও মধ্যস্থ ব্যতীত অনেকরূপে প্রোতগম জানিতে পারা যায়। কখন কখন প্রোতক্রান্ত মধ্যস্থ ছবি আঁকে। কখন কখন বা পীড়িতের জন্য

বাবস্থাপত্র লিখিয়া দেয় । ওরূপ চিকিৎসা অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

প্রেতাহ্বান সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ আয়োজনের কথাও বলিয়া রাখি ।

যে গৃহে প্রেতাহ্বানের জন্য আয়োজন করা হইবে, সেটি নির্জন হওয়া চাই । অধিক উষ্ণ হইবে না, কারণ তাহাতে মনের তৈরী রক্ষিত হয় না । তীক্ষ্ণ শীত বায়ুও বহিবে না । চারি পাঁচ ছয় যত জনে ইচ্ছা চৌপায়ের (টুল বা টেবিলের) চতুর্দিকে বসিয়া পূর্বোক্ত নিয়মমতে একমন হইয়া ধ্যানলগ্ন হইবে যেন মাঝে কেহ বিরক্ত না করে । দুই শব্দে একত্রে আহ্বান করিবেন । প্রেতে যাহারা অবিশ্বাসী গৃহ মধ্যে তাহাদের উপস্থিতিও প্রেতাগমের ব্যাঘাতকারী । *

এক্ষণে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রেত সম্বন্ধীয় কএকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব ।

১। প্রায় দশ বার বৎসর হইল, জসেন খাঁ নামক জর্নৈক মুসলমান দৈবশক্তি বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন ।

* এই কথাটিতে প্রেততত্ত্ববাদীরা সাধারণকে অভ্যস্ত কান্দায় রাখিয়াছেন । কেহ প্রেত সম্বন্ধীয় কার্যকলাপের পরীক্ষা করিতে বাইলেই প্রায় সেবারে প্রেত মহাশয় নিয়মমত দেখা দেন না । প্রেততত্ত্ববাদীরা অমনি বলেন, আপনি প্রেতে বিশ্বাস করেন না, আপনার উপস্থিতিই আমাদিগের সফলতার প্রতিরোধক ।

যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাঁহাকে তাহাই দিতে পারিতেন * । তাঁহাকে অনেকই দেখিয়াছেন । তদ্ব্যতীত একজনের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি একবার জসেন খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । এবং জসেন খাঁ আসিলে তিনি আঙ্গুরের রস খাইতে প্রার্থনা করেন । কিছু পরেই জসেন খাঁ সত্য সত্যই আঙ্গুরের রস আনিয়াছিলেন । এজন্য তিনি একবার বাহিরেও যান নাই । আমাদিগের বন্ধুটি সেবন করিয়া দেখিলেন যে, উহা বাস্তবিকই আঙ্গুরের রস । বন্ধুটিকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না ।

২। আর একটি ঘটনা পাঠকগণের সমীপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম । এটিও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় । একবার ত্রিবাঙ্কুররাজার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, উক্ত রাজবংশের এইরূপ বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তি দক্ষ হইলে তাহার কিয়দংশ তন্ময় কোন পবিত্র (হিন্দুমতে) নদীজলে ভাষাইয়া দিলে উক্ত মৃত ব্যক্তির পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় । তদনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ জর্নৈক সন্ন্যাসী দিয়া তাঁহার মৃত আত্মীয়ের তন্ময় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ জন্য পাঠান । সন্ন্যাসী যথাসময়ে কাশীধামে উপস্থিত হন এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজদপত্রসহায়ে কাশীরাজের বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন । সেই সময়ে একজন ফরাসীও কাশীরাজের

* হুঃখের বিষয় এই, প্রস্তাবলেখক তাঁহাকে দেখেন নাই ।

বাঁজিতে আশ্রয় পাওয়াছিল। কাজেই উক্ত সন্ন্যাসীর (ফকির) সহিত ফরাসীর কক্ষিৎ সৌহার্দ জন্মে। ক্রমে ফরাসী শুনিলেন যে, ফকির দৈব-শক্তি-বিশিষ্ট। তখন তাহার ক্ষমতার কিছু নিদর্শন দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির স্বীকার পাঠিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে একটি জল-পূর্ণ রত্ন প্রাচীর-নির্মিত পাত্রাদ্বয়ের পাশে উভয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি আছে? ফরাসীর হস্তে একটি উডেন পেন্সিল ছিল, তিনি তাহাই ফকিরকে দিলেন। ‘ফকির পেন্সিল লইয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘বলুন দেখি এ পেন্সিল জলে ফেলিলে ভাসিবে না ডুবিবে?’ ফরাসী বলিলেন—ভাসিবে।

পেন্সিল জলে ফেলিয়া মাত্র ডুবিয়া গেল।

ফকির পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারে ভাসিবে না ডুবিবে?

ফ। ডুবিবে।

এবারে পেন্সিল ভাসিল।

ফরাসী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে সন্ন্যাসী সেই পেন্সিল দিয়া উক্ত জলধার স্পর্শ করিলেন, ‘অমনি তাহার একদিক উল্টে উঠিয়া, অপরদিক পূর্বমত রহিল। পাত্র ঠিক থাকিল, জলের এক দিক উঠিয়া রহিল অপর দিক নিচু রহিল। এইরূপ সেই জন লইয়া অনেক-রূপ রহস্য দেখাইতে লাগিলেন।

ফরাসী বলিলেন “আপনি যখন প্রেত মহায়ে এত অদ্ভুত অদ্ভুত কৰ্ম সমাধা করিতে পারেন, তখন প্রেত আপনার একান্ত বাধ্য বলিতে হইবে। যদিপি প্রেতকে আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার প্রেতে বিশ্বাস হয়। ফকির উত্তর করিলেন, প্রেতের দেখা পাওয়া না পাওয়া প্রেতের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আপনি তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিবেন।

ফরাসী। কিরূপে?

ফকির। তাহার কার্যকলাপে; এরূপ অমানুষিক কার্য দেখিবেন যে প্রেত ব্যতীত অন্য কাহার দ্বারা সে কৰ্ম অসম্ভব।

প্রেত দেখাইবার নির্দিষ্ট দিবস স্থির হইল।

সেই দিবস ফরাসী এক চতুস্তল বা-টির উর্দ্ধতম গৃহে গিয়া রাত্রি কাটাইবেন স্থির করিলেন। যাহারা কাশীধামে গিয়াছেন তাঁহারা হয়ত জানেন যে তথাকার উর্দ্ধতম গৃহের যে দ্বার, তাহা নামাইয়া দিলেই ত্রিতলের সহিত সিঁড়ির কার্য করে। আবার উঠাইয়া লইলেই দ্বার হইয়া যায়, এবং নিম্নের সহিত সকল সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বন্ধ হয়। ফরাসী যে গৃহে আশ্রয় লইলেন, তাহা এইরূপ। প্রথমতঃ বা-টিতে প্রবেশ করিয়াই তিনি চারিদিকের দ্বার বন্ধ করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কেহ কোথাও লুকাইয়া নাই। পরিশেষে সর্বো-

পরিষ্কৃ গৃহে উঠিলেন এবং সিঁড়ি তুলিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন । গৃহে পিস্তল বন্দুক প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল যথাকালে রক্ষিত হইল ।

সন্ধ্যা হইল । ফরাসী শস্যার উপর বসিয়া রহিলেন, রাত্রি যাঁচ না হইতে হইতেই ছাদের উপরে মনুবার পদশব্দ হইতে লাগিল । বলা বাহুল্য যে তিনি ছাদ ও উত্তমরূপ গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন । পরে জানালায় আঘাত হইতে লাগিল । ফরাসীর বন্দুক প্রস্তুত ছিল । সহসা জানালা গুলিয়াই বন্দুক ছুঁড়িলেন, কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না । ক্রমে সকল জানালাতেই ‘ধূপ’ ‘ধাপ’ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল । বন্দুক পিস্তল সকলই ছুঁড়িলেন, কাহাকেও দেখিলেন না । অবশেষে দ্বার খুলিয়া ছাদে উঠিলেন । সেখানেও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না । কেবল দূরে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই ফকির গাছাতিরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন * ।

* এই ঘটনাটি ‘The Spiritualist’ নামক পত্রে দৃষ্ট হয় । এক্ষণে উহা নিকটে না থাকায় যথাযথ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না । এবং কোন্ সংখ্যায় আছে তাহাও বলিতে পারিলাম না । যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উক্ত পত্রের ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ সনের সংখ্যাগুলির সূচিপত্র দেখিয়া বাহির করিয়া লইবেন ।

একটি বিদেশীয় ঐতিহাসিক ঘটনারও উল্লেখ করিতেছি । সেটিও বড় কম বিস্ময়জনক নহে ।

কমিয়ার কাউন্টেস্ ব্যাভাস্কী (Countess de Vassaky) সাধারণতঃ একজন ক্ষমতালালিনী মধ্যস্থ বয়স্ক পরিচিতা । তাহার সম্পাদিত হইটি ঐতিহাসিক কার্য্য বড় বিস্ময়াবহ । প্রথম, কমালের সূচিকাৰ্য্যে লিখিত একটি নামের পরিবর্তে আর একটি নাম স্থাপন । ঘটনাটি অতি অল্প সময় মধ্যে এবং অনেকগুলি পণ্ডিত লোকের সমক্ষে সম্পাদিত হয় । তদ্ব্যতীত উক্ত পশ্চিমাঞ্চলের কলেজের সাহেবও উপস্থিত ছিলেন । দ্বিতীয়টি এইরূপ । যখন উক্ত মধ্যস্থ লগুন হইতে বোম্বাই নগরে আসিতেছিলেন, তখন একজন ব্যারিস্টার তাহার পিতার (সুপরিচিত পার্লামেন্টের মেম্বার) অন্ধ হইয়া আসিয়া করিতে অনুরোধ করেন । ব্যাভাস্কী তাহাতে স্বীকৃতি হইলেন, এবং বলিলেন যে, ‘ ভারতবর্ষে যিগা আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিব । কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়া উভয়ের কথোপকথনের জন্য একটি উপায় আবশ্যক । রোগীর কোন দ্রব্য পাইলেই আমি সংবাদ চালাইতে পারি । ’ ইহাতে রোগীর হস্তাবরণ (Gloves) দেওয়া হইবে । ব্যাভাস্কী দস্তানা লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন । ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্ণেল অলকট্ (Col. Olcott) সাহেবের সমক্ষে

তিনি উক্ত দুইটি দস্তানাই একটি গৃহ মধ্যে
টেবিলে রাখিয়া গৃহে বারি দিলেন । কিছু
দিবস পরে বিলাত হইতে ১৮ই ফেব্রুয়া-
রির এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পু-

রোক্ত ব্যারিস্টার লিখিয়াছেন, যে তিনি
একটি হস্তাবরণ পাইয়াছেন । ইহাতে যে
মকল স্বাক্ষর উল্লেখ আছে তাহা কোন
ক্রমেই অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না ।

আর্য্যায়ুর্বেদ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বোধ হয় ভাবপ্রকাশচরিত্রা একদিকে
দ্বন্দ্বিতাকে কাশীরাজগোত্রী ও অপবিত্র
বিষ্ণুপুরাণে কাশীপুত্র দ্বন্দ্বিত্রির উল্লেখ দ-
র্শনে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ; এবং স্ত-
ত্রিয়, বৈশা, ব্রাহ্মণ ভিন্নজাতীয় হইয়াও
যে সূত্র চন্দ্রাদি বংশীয় ও শাণ্ডিল্য ভর-
দ্বাক্ষ প্রভৃতি গোত্রান্তর্ভূত হইতে পারেন,
তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ
দ্বন্দ্বিত্রির ক্ষত্রিয় হইলে, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের
বৈশ্যগর্ভজাত পুত্র সূত্রতঃ তাঁহার পাদ-
গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিতেন না । যদি
আমরা একপ কল্পনা করি যে দ্বন্দ্বিত্রি দুই
বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আদৌ
বৈদ্যবংশ প্রবর্তকরূপে, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয়-
রূপতিরূপে আর্য্যুর্বেদে উপদেশ দিয়াছেন,
এরূপ হইলে ভাবপ্রকাশ ও পুরাণের মি-
মাংসা হইতে পারে । কিন্তু তাহাতে আ-
পত্তি উপস্থিত হয় । কুত্রাপিও দ্বন্দ্বিত্রির
দ্বিতীয় অবতারের উল্লেখ নাই । সূত্রতে ও
পুরাণে একবাক্যে সূর্য্যবৈদ্য দ্বন্দ্বিত্রিরই উ-

ল্লেখ আছে । সূত্রতেই নানা স্থান হইতে
আমরা নিম্নলিখিত বাক্য সংগ্রহ করি-
লাম ।

দ্বন্দ্বিত্রির ধর্মভূতাং বরীকং অনুভোক্তব্যং
চরণাবৃণসংগৃহ্য সূত্রতঃ পরিপূচ্ছতি ॥

নিদানস্থান

চিকিৎসিতাং পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি সূ-
ত্রমঃ

স্ববৈরিজ্ঞপ্রভাবস্যামৃতবোনেতিবৃক্ষয়োঃ ॥

কল্পস্থান ।

যেনামৃতমপাং মধ্যাহ্নকৃতং পুষ্কজগনি ।

যতোহমরত্বং সংপ্রাপ্তাস্ত্রিদশাস্ত্রিদেবেশ্ব-

রাং ॥ উত্তরতন্ত্র ।

সূত্রতঃ সূত্রতঃ, চরক, যাকর ও মার্ক-
ণ্ডেয় একই দ্বন্দ্বিত্রির উল্লেখ করিতেছেন ।
ভাবপ্রকাশকার অন্যান্য সমুদয় বিবরণই
প্রাণ্ডক প্রমুখকারদিগের অনুরূপ লিখি-
রাছেন, কেবল মাত্র কাশীরাজ পুত্র দ্বন্দ্বি-
ত্রির মহিত গোলা করিয়া তাঁহাকে বা-
হুজ মনে করিয়াছেন । বোধ হয় প্রাণ-

গোল্লিখিত অলৌকিকাংশে অনাস্থা হওয়াতেই এরূপ গোলে পতিত হইরাছিলেন ।

এই সমস্ত অনুসন্ধানের পর আমরা এই মহাত্মার জীবনী সম্পর্কে এই মাত্র জানিলাম যে তিনি মহর্ষি গালবের পুত্র, বৈশ্যবংশ ললামভূতা বীরভদ্রা ইহার জননী । ইনি অদৃষ্ট বংশের আদি পুরুষ । অলৌকিক প্রতিভাবলে শরীর বিজ্ঞানের বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব জাতির নহোপকার সাধন করিয়াছেন । ইহার তিন পরিগ্রহ; একের নাম সিদ্ধবিদ্যা, দ্বিতীয়া সাধাবিদ্যা ও তৃতীয়া কঠসাধাবিদ্যা; ইহাদের যথেষ্ট মেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, ধর, কর, দেব, রক্ষিত, প্রভৃতি চতুর্দশ পুত্র জন্মে । ভরদ্বাজ, গালব, আত্রেয় প্রভৃতি ব্রহ্মবিবর্ণ তৎপ্রতি অতীব ভক্তিমান হইয়া তাঁহাকে আয়ুর্কর্ষদ ব্যবসায় সম্প্রদান করেন । তাঁহার সহজ বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া মুনিমাজ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; তদবধি তাহার বিশ্ববৈরাগ্য কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইরাছিল । তথাপি তিনি নামতঃ রাজা থাকিয়া সমস্ত জীবন কার্যতঃ আয়ুর্কর্ষদানুশীলনে অতিবাহিত করেন । তিনি বারাহসীর আশ্রমে বসিয়া উপধনব, পৌঞ্চলবত, করবীর্ষ্য, গোপুররক্ষিত ও স্বশ্রুত প্রভৃতি ১০০ শিষ্যকে আয়ুর্কর্ষদ উপদেশ দেন । যদিচ তৎপ্রণীত সংহিতা অল্প কাল হুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, ত-

থাচ চতুর্দশ ঋগ্বেদে তাহা বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল ।

আত্রেয় ও ভরদ্বাজ ।

বর্তমান কালে আয়ুর্কর্ষদীয় যত সংহিতা বর্তমান আছে তন্মধ্যে আত্রেয় সংহিতাই প্রাচীনতম । আত্রেয়, ভরদ্বাজ, গালব ও ধনুন্তরি প্রায় সমসাময়িক । সূত্ররূপে ধনুন্তরিসংহিতা ও আত্রেয়সংহিতা এক সময়ের গ্রন্থ । এই প্রস্তাবে আমরা এই প্রাচীনতম সংহিতার বিষয়মূল সংক্ষেপে উল্লেখ করিব । কিন্তু তৎপূর্বে ভরদ্বাজ ও আত্রেয়ঘটিত একটি মাহারণ প্রচলিত সন্দেহের আলোচনা করিতে চাই । পাঠক কিয়ৎকাল অবহিত চিত্তে দেখিবেন যে মুদ্রায়ত্রাভাবে এদেশের কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে পণ্ডিতবর শিবদাস নানাবিদ গ্রন্থের টিকাকার । তৎপ্রণীত চক্রপাণিকৃত সংগ্রহের টিকা অতীব উপাদেয় গ্রন্থ; এবংবিধ ব্যাখ্যান মূল পুস্তক হইতে ও অধিক মূল্যবান, পাঠকের সমদিক উপকারী । তৎপ্রণীত চরকসংহিতার টিকাতে দৃষ্ট হয় যে পুনর্কর্ষ ও ভরদ্বাজ একই* ব্যক্তি । চরকসংহিতাতে উল্লিখিত আছে যে পুনর্কর্ষ অগ্নিবেশ প্রভৃতির উপদেশটা, এবং কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে পুনর্কর্ষ

* পুনর্কর্ষঃ ভরদ্বাজঃ অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিস্তার কারিতত্ত্ব দস্য পুনর্কর্ষসংজ্ঞা । ইতি শিবদাস গুপ্তঃ ।

আত্রেয় মুনির উপাধি মাত্র । আমাদের বিবেচনার পরোল্লভ মতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় । কারণ, চরকসংহিতায় স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভগবান্ ভরদ্বাজই আদৌ ইন্দ্রসমীপে গমন করেন ও ত্রিষ্কন্ধ আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া আত্রেয়প্রমুখ ঋষিদিগকে উপদেশ দেন । তদনন্তর, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ভোগ জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদে উপনীত করেন । সুতরাং আত্রেয়কেই অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিস্তারক বলা যাইতে পারে । অতএব পুনর্বিস্তারক হেতু পুনর্কর্ষ সংজ্ঞা ভরদ্বাজ অপেক্ষা আত্রেয় প্রতিই সমধিক প্রযোজ্য । পুনর্কর্ষ ও ভরদ্বাজ যদি একই ব্যক্তি হইবেন, তবে চরকসংহিতাতে ‘হেতুগর্ভস্য নিরুত্তো রুদ্ধো জঘনি চৈবযঃ । পুনর্কর্ষ মতির্থাচ ভরদ্বাজমতিষ্ঠথা ।’ এরূপ শ্লোক কোন মতেই সম্ভবিত্তে পারে না । পক্ষান্তরে পুনর্কর্ষ ও ভগবান্ আত্রেয় যে একই ব্যক্তির উপাধি ও নাম তাহা চরকের নামা শ্লোকে প্রতিপন্ন হইতেছে । চরক প্রথমতঃই ‘ইতিহস্যাহ ভগবান্নাত্রেয়ঃ’ বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন । এতদ্ব্যতীত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাংশলি পাঠ করিলে কোনরূপেই পুনর্কর্ষ সংজ্ঞা আত্রেয়তে প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না ; ‘তমেবযুক্তবন্তমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্কর্ষ রাত্রেয় উবাচ ।’ চরকে—শাগ্রীরস্থানে ‘ইত্যগ্নিবেশস্য বচঃশ্রব্ধা মতিমতাংবরঃ ।

সর্বং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাত্মা পুনর্কর্ষঃ ।’

‘যাবন্তঃ পুরুশাস্তাবন্তো লোকা ইতি এবং বাদিনঃ ভগবন্তং আত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ ।’

‘সর্কশরীর সংখ্যানপ্রমাণজ্ঞান হেতো-
র্ভগবন্তমাত্রেয়ং অগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ । তনু-
বাচ ভগবান্নাত্রেয়ঃ শৃণুমতোইগ্নিবেশঃ *’
চরকে ।

এংবিধ বহুপ্রয়োগ চরকসংহিতায় ইত-
স্ততোবিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । সুতরাং পুন-
র্কর্ষ ও আত্রেয়ের একত্ব ও ভরদ্বাজের বি-
ভিন্নত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় ত্রিষ্টিতে পা-
রেনা । তবে আয়ুর্বেদপারদৃশ্য শিবদাস
যে কেন প্রাগুক্তরূপ ভ্রমাত্মক টীকা লি-
খিলেন, এ প্রস্তাব উত্তর বোধ হয় বড় ক-
ঠিন হইবে না । যিনি আমাদের দেশের
হস্তলিখিত প্রাচীনগ্রন্থ পাঁচ মাত খানা
পাড়াইয়াছেন তাঁহাকে এবিষয়ে আর বোধ
হয় বলিয়া দিতে হইবেকনা । ‘তিন নবলে
আসল খাস্তা’ একথা বোধ হয় অনেকেই
শুনিয়া থাকিবেন ; আমাদের বোধ হয়
কোন প্রাচীন লেখক লিখিতে লিখিতে
ভ্যক্ত বা উন্মনস্ক হইয়া ‘পুনর্কর্ষরাত্রেয়ঃ’
স্থানে ‘পুনর্কর্ষঃ ভরদ্বাজ’ লিখিয়া ফে-
লিয়াছেন ; অথবা যিনি বক্তা তিনিই আ-
ত্রেয় স্থলে ভরদ্বাজ বলিয়া লেখককে ভ্রম-
প্রণোদিত করিয়াছেন । কেহ মনে করিতে
পারেন যে ইহা শিবদাসের ভুল না বলিয়া
কেন আমরা এরূপ কষ্টকল্পনা করি-
তেছি ; তদুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে

সত্য বটে ‘মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ’ ; তথাপি এস্থলে শিবদাসের ভ্রম হওয়া অপেক্ষা লিপিকরদিগের ভ্রম হওয়াই অধিক সম্ভবপর ।

ভগবান্ আত্রেয় ও ধন্বন্তরির ন্যায় একথানা সংহিতা প্রণয়ন করেন । কিন্তু বাঙ্গালাতে এই গ্রন্থ অতীব দুষ্প্রাপ্য । পশ্চিম ভারতবর্ষে বোধাই অঞ্চলের সেনেউ * দিগের এই পুস্তকই চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন । এই গ্রন্থ ছয় পুস্তকে বিভক্ত ও পনের শত শ্লোকাক্রমক । প্রত্যেক পুস্তক আবার কএক অধ্যায়ে বিভক্ত ; অধ্যায়সংখ্যা সকলপুস্তকে সমান নহে । ভগবান্ আত্রেয়, এই গ্রন্থে জল, বায়ু, ঋতু, বয়স ও প্রকৃতির সহিত মানব শরীরের সম্বন্ধ ও ক্রিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । জল, দুগ্ধ, ইক্ষুরস প্রভৃতি দ্রব্যবোর গুণাগুণ ও নানা প্রকার ঔষধিতত্ত্ব

* ‘সেনেউ বোধাই অঞ্চলের বৈদ্যদিগের উপাধি আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণবৎ’ । কিন্তু তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না, অথচ এক পাকিতে আহারাদি করেন । বোধ হয়, ইহার সেনবংশীয় বৈদ্য হইবেন ।

ধর্ম ও বহুবিধ অরিষ্টের ক্রিয়া ও উপযোগিতা অতিসংক্ষেপে অথচ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তৎপরে চিকিৎসা প্রণালীর উপদেশ দিয়া সর্বশেষে ‘ঔষধি বিশেষের প্রতিক্রিয়ার উপায় (Antidotes) নির্দেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন । বাস্তবিক ইহাকে ‘বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার’ নাম দেওয়া যাইতে পারে ।

ভরদ্বাজকৃত কোন সংহিতা ছিল কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, থাকিলেও সম্প্রতি লুপ্ত হইয়াছে । ভরদ্বাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ লাভ করেন এক্রপ প্রথিত আছে । তিনিই আত্রেয়কে এই শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণসমাজে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের মূল কারণ হইলেন । এই ভরদ্বাজ, এবং কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রসংহিতাকার ভরদ্বাজ, একই ব্যক্তি কি না নিশ্চয় করিবার কোনও উপকরণ নাই । যদি নাট্যকাভিনয়ের উপদেষ্টা ভরদ্বাজ বালীকির সমসাময়িক হন, তবে ইহাদিগকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কারণ আয়ুর্বেদোপদেষ্টা ভরদ্বাজ মনুর পুত্ররাং বাল্মীকির অনেক পূর্ববর্তী ।

ভালমানুষ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে দেখান হইয়াছে যে, স্বার্থ-
তাগ ও প্রলোভন-জয় যে ‘ভাল-মানু-
ষের’ ব্রত, সেরূপ ভাল-মানুষ সংসারে
থাকিয়া হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা স্বী-
কার করিলেই একরূপ বলা হইল না যে সং-
সার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায়। সং-
সার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায় কিনা
তাহা একটি স্তত্র প্রশ্ন। আমরা নিম্নে
এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা করিব।

এই প্রশ্নের মীমাংসা কালে, আমরা
শুদ্ধ যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া প্রধা-
নতঃ ইতিহাসের সাহায্য অবলম্বন করিব।
পৃথিবীর অতি আদিম কাল হইতে আরম্ভ
করিয়া অন্য পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা ‘ভাল-মানুষ’
হইবার আশায় কখন বা একক, কখন বা
দলে দলে সংসার-ত্যাগ করিয়াছে। গ্রী-
সের সিনিক (Cynics) রোমের ফোইক্
(Stoics) ইউরোপের-ভিক্ষুক পাঙ্গ্রী এবং
সর্বশেষে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী, যতী, ভিক্ষু
প্রভৃতি এইরূপ সংসারত্যাগীর দৃষ্টান্ত।
ইহাদের সংসার-ত্যাগে কি ফল হইয়াছিল
বা হইতেছে আমরা নিম্নে তাহার আলো-
চনা করিব।

১ মতঃ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের
হর্তা কর্তা বিপাতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এই
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একরূপ সংসার-ত্যাগী।
ইহকালের সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। এস-
কল বিস্মৃত হইয়া পরকালের উপায় কর,
ইহাই ভারতবর্ষের প্রধানতম শিক্ষা।
আজি যে এই পাশ্চাত্য স্রোত এত প্রবল
হইয়া বহমান হইতেছে, আজি যে এই ধর্ম-
সংস্কার নব-বাজলার এক প্রকার বিলুপ্ত
প্রায় হইয়া উঠিতেছে, ইহার মধ্যেও সাংসা-
রিক সুখ দুঃখে অবহেলা দেখিতে পাওয়া
যায়। সাংসারিক সুখ দুঃখ ক্ষণ-বিধ্বংশী।
এই উপদেশ ভারত-বর্ষের আবাল বৃদ্ধের
হাড়ে হাড়ে বিধিয়া রহিয়াছে। সুতরাং
সংসার-ত্যাগীর অনুসন্ধান করিতে হইলে
সর্বপ্রাণে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি পড়ে।
কিন্তু ভারত-বর্ষের ইতিহাস নাই। স্র-
তরাং ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত কেহ শুনিবে না।
নতুবা দেখাইতাম যে, তপশ্চরণশীল, গ-
লিতপত্রভোজী, গ্রীষ্মে ‘পঞ্চতপকারী’
শীতে তরাণ-বাসী মুনি শ্রাবিরাও স্বর্গবে-
শ্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত তপ যপ
ত্যাগ করিতেন। নতুবা দেখাইতাম যে,

ভরত-রাজা রাজাস্বজন ভাগ করিয়া বনে বাস করিতে করিতে এক যুগ-শিশুতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে দুর্ক্সমা, বিশ্বাসিত্র, অটাবক্র প্রভৃতি ঋষিরা সর্বভাগী হইয়াও রিপুজয়ে অসমর্থ ছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে, ‘রক্তমাংসের’ শরীর বনে গেলেও অল্প বা অধিক পরিমাণে ‘রক্তমাংসের’ প্রভাব দেখাইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা ইউরোপের দাস। ইউরোপের পোষাক না হইলে পরিধান করিতে ইচ্ছা করে না, ইউরোপের খাদ্য না হইলে খাইতে ইচ্ছা করে না, লেখার যন্ত্রোপকরণ ইউরোপের চং (Idioms) না থাকিলে পড়িতে ইচ্ছা করে না। আর, ইউরোপ সভ্যতার আকর, জ্ঞান বুদ্ধির রঙ্গভূমি। ইউরোপ উন্নতি-স্রোতের নিয়ন্ত্র। ইউরোপ ছাড়িয়া দরিদ্র, পদানত, অর্ধসভ্য ভারত-বর্ষের কথা শুনিবে কে?

ইউরোপে সর্ব প্রথম গ্রীসদেশে সভ্যতার আলোক প্রভাসিত হয়। বহুদিন ধরিয়া জগতের আদি অন্ত প্রভৃতি তত্ত্ব গ্রীসে পর্যালোচিত হয়। পরে সঙ্ক্ৰতিসের সময় হইতেই গ্রীসের অবনতির ও স্তূপাত আরম্ভ হয়। গ্রীস ক্রমশঃই হতবল হইয়া এক শত্রুর পর অন্য শত্রুদ্বারা পদদলিত হইতে থাকে। গ্রীসের বলাহানির সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক ও নৈতিক অবনতি দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আলেক্সান্ডারের আবির্ভাবের

প্রায় বিংশতি বর্ষের পূর্বে গ্রীসের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। ধর্ম বিশ্বাস গুণানুলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন হইতে দূরীভূত হইতেছিল; নৈতিক শাসন প্রায় কিছুই ছিল না। ‘এই সময়েই গ্রীস-বার এপিকিউরিয়ানেরা (Epicureans) শিক্ষা দিল ‘Eat, drink & be merry’ ‘হেঁসে খেলে কাল কাটাও, মন, মনের সুখে। বহুদিন হইতেই গ্রীসবাসীরা ভোগবিলাসী হইতেছিল। এপিকিউরিয়ানদের নীতি-উপদেশে ভোগ-বিলাসের শিক্ষা আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রীসবাসীরা বিমুক্তরজ্জু বলীবর্দের ন্যায় পাপের পথে অপ্রতিহত বেগে চলিতে লাগিল।

এই সময়ে জিনো (Zeno) নামে এক মহাত্মা গ্রীসে আবির্ভূত হইলেন। তিনি গ্রীসকে পুনরায় নীতির পথে ও ধর্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়া নীতি-শিক্ষা হয় না। সুতরাং জিনো শিক্ষা দিলেন—‘সাংসারিক বিপদে অভিভূত হইও না; সাংসারিক সম্পদে অভিমান করিও না; এই যে সমস্ত সাংসারিক ঐশ্বর্য্য দেখিতেছ এ সমস্ত বাজিকরের খেলা, সমস্ত নাট্যশালায় অভিনয়। এ সমস্তে চিত্ত নিয়োজিত করিও না। নৈতিক উন্নতি মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য। যাহাতে সেই লক্ষ্য সূচা করুণে সংসাধিত হয় সেই চেষ্টা কর; সংসারে থাকিতে চাও থাক কিন্তু সংসারী হইও না; কারণ

সংসারী হইলে রিপু-জয় করিতে পারিবে না।' গ্রীস এ উপদেশ শুনিল। (কারণ উপদেশ-দাতার অভাব কোথায়? এই যে ভারতবর্ষ এত অবনত, ইহাতেই কি উপদেশ-দাতার অভাব আছে? প্রাপ্ত গ্রন্থের নং-ক্ষিপ্ত সমালোচক জানেন যে এ অভাব ভারতবর্ষে—বাক্সালায়—অতি অল্প) কিন্তু গ্রীসের তখন উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের ন্যায় গ্রীসবাসীরা ক্রমশঃই পাপের পথে অগ্রসর হইতেছিল। পাপী কবে ধর্মের কাহিনী শুনিয়াছে? সূতরাং জিনোর মত গ্রীস ছাড়িয়া রোমে বাইয়া আস্রয় লইল। তখন রোম উন্নতির অভিযুখে নব অনুরাগের সহিত ধাবমান। রোম শনিবা মাত্রই, জিনোর মতকে আদরের সহিত স্বদেশে স্থান দিল। ক্রমে রোমীয় প্রধান লোকেরা সকলেই জিনোর মত অবলম্বন করিল।

জিনোর মত রোমে কিছুকাল রাজত্ব করিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি অতি অল্পমাত্রই সংসাধিত হইল। মনুষ্য তাহার মনুষ্য ছাড়িতে পারিল না। দেবতা হইবার আশয়ে কিছুকাল অসাধারণ পরিশ্রম ও মনঃকষ্ট স্বীকার করিয়া মনুষ্য পূর্বের ন্যায় রিপুর অধীন হইতে লাগিল। সগতান ও তাঁহার চির-বিশ্বস্ত পরিচারকেরা পুনরায় মনুষ্য-মনে স্বরাজ্য সংস্থাপন করিল। বামন কিছুকাল প্রাংশুলভা ফলের আশয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পুনরায় যষ্টি অবলম্বনে সা-

ধারণ ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

মনুষ্য ভাল মানুষ হইতে পারিল না বটে, কিন্তু ভাল মানুষ হইবার আশা তাহার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল না। মনুষ্য বুঝিল যে শুদ্ধ সংসার-তাগে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। ভাল মানুষ হইবার আশায় মনুষ্য আর একবার সংসার ত্যাগ করিল। কিন্তু এবার শুদ্ধ সংসার তাগের উপর নির্ভর না করিয়া মনুষ্য জগদীশ্বরের সাহায্য অবলম্বন করিল। সংসার ত্যাগ করিব এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহান্ প্রেমপূর্ণ ঈশ্বরের পদাবলুণ্ঠিত হইব, ভাল-মানুষ-লোভীরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইল।

ইউরোপে সাঁহারা পূর্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লন, খ্রীষ্টীয় ভিক্টর পাদ্রী (Pater) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সাংসারিক চিন্তা-সমূহের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম অন্নচিন্তা, দ্বিতীয় পরিবার-প্রতিপালন। খ্রীষ্টীয় পাদ্রী, ধর্মশাসনের দোহাই দিয়া, সমাজ হইতে অন্নের যোগাড় করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় চিন্তাও খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর ছিল না। কারণ খ্রীষ্টীয় পাদ্রী দারস্থ্য। বিষয় স্পৃহা একবারে ত্যাগ করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী আর এক উপায় অবলম্বন করিল। সে শিক্ষা দিল যে একজনের পাপ অন্যে হরণ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ পাপ হরণের ক্ষমতা সকলের নাই। সাঁহারা সংসারত্যাগী ও অলোভী, শুদ্ধ তাঁহারাই

এই ক্ষমতা লইতে পারিতেন । সুতরাং সংসারভ্যাগী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর দুই মহৎ উদ্দেশ্য ছিল ।

১ম । ভাল মানুষ হইয়া নিজের মুক্তি সাধন । অলোভী হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর সে সমস্ত ছিল । তিনি অনেকের অন্ত্রে প্রতিপালিত । তিনি গৃহ-শূন্য, জাতিশূন্য ও সমাজশূন্য । সংসার-ভ্যাগে বিতৃষ্ণতা উৎপাদন করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী অন্য অন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল ।

কিন্তু এ সকল করিয়াও খ্রীষ্টীয় পাদ্রী ভাল মানুষ হইতে পারিয়াছিল কি ? উদ্দেশ্য মহৎ, উপায় অমোঘ, কিন্তু কার্য উদ্দেশ্য ও উপায়ের অনুযায়ী হইয়াছিল কি ? যাহারা Froude's History of England পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অনেকস্থলেই খ্রীষ্টীয়পাদ্রীর নৈতিক উন্নতি অতি যৎসামান্য হইয়াছিল । যাহারা Confessions of Maria Monk পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন মঠধারী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা তাড়েক্ষত্রের মোহন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে পাপাচরণে অধিক বড় ছিলেন না ।

যদি সংসার ভ্যাগ করিয়া কাহারও ভাল-মানুষ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহা এ পাদ্রীদের ছিল । বাহির হইতে দেখিতে খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর জীবন অ-তীব 'রমণীয়' । মাসে মাসে, দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা নব নব ধর্ম্মা-

লোচনা আবিষ্কার করিত । জন্ম, মৃত্যু, সমাধি প্রভৃতি নিত্য কার্য্য সমূহে নব নব ধর্ম্মপ্রণালী প্রদর্শিত হইত । এতদ্ভিন্ন, রোগীর শুশ্রূষা, আর্তের সহায়তা, দরিদ্রের অর্থানুকূল্য, যুযুযুস সাহসনা, পীড়িতের সেবা প্রভৃতি কার্য্য কাথলিক পাদ্রীর নি-তাত্বেও ছিল । কিন্তু এ সকল উদ্দেশ্য, এবং এ সকল উপায় এত মহৎ ও এত প্রবল হইলেও পাদ্রীরা নৈতিক উন্নতির পথে অতি অস্পন্দর মাত্রই অগ্রসর হইয়াছিল । Burns(ব্যার্নস) এক প্রকার আফ্রিকাদের সহিত বলিয়াছেন 'A man is a man for all that' আমরা আফ্রিকাদের সহিত বলি—'A man is a man for all that'*

পূর্বে এক প্রকার দেখান হইল যে সংসার ছাড়িলেও ভাল-মানুষ হওয়া যায় না । তবে কি স্থির করিতে হইবে যে মানুষ কোন অবস্থাতেই ভাল-মানুষ হইতে পারে না । এই মহামূল্য তত্ত্ব দেখাইবার জন্যই কি হাবড্‌হাটি লিখিয়া নিজের ও পাঠকের শিরঃপীড়া উৎপাদন করিতে ছিলাম ? যদি শুদ্ধ এই মাত্রই আমার উদ্দেশ্য হয়, যদি বীভৎস মানব-চরিত্রে আর একটি কলঙ্ক দেখান আমার অভি-প্রেত হয়, তাহা হইলে এ প্রস্তাব না লিখিলেই ভাল হইত । 'আমরা কখন ভাল মানুষ হইতে পারি না,' ইহা সত্য হইলে হইতে পারে । কিন্তু ইহা কাহাকেও

* সমস্ত (সম্পদ, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য) স-
ত্বেও মানুষ মানুষ-মাত্র

যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই। তবে আমার উদ্দেশ্য এই মনুষ্য যদি ভাল-মানুষত্ব রূপ আকাশকুসুমের অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে মানসিক প্রকৃতি, ও তদনুযায়ী চরিত্র গঠনের আলোচনায় চিত্ত

নিয়োজিত করে, যদি সকলেই এক প্রকারের ভাল-মানুষ হইবার চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে ভাল-মানুষত্ব অর্জন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাই হইলেও অনেক মনস্তাপ, অনেক মর্ঘ্যভেদী যাতনা, অনেক সাংসারিক অকুশল পৃথিবীহইতে দূরীভূত হয়।

প্রাণিজগতের ইতিহাস ।

প্রাণিসত্ত্বান্ত প্রকৃতি জগতের এক অত্যন্ত চর্চ্য উপন্যাস, এবং বিজ্ঞানভাণ্ডারের এক অতুল সম্পত্তি। প্রকৃতির আদি নাই, অন্ত নাই, এবং চিন্তার অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ট স্থান নাই। এই যে অনন্ত সমুদ্র, অনন্তের তুলনার জন্য কবি-কল্পনার এক মাত্র উপমান, ইহাও প্রকৃতি-জগতের একটি যৎসামান্য অংশ মাত্র; কে তবে ইহার ইয়ত্তা করিবে, অথচ এই বিশাল দৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া কেই বা অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া রহিবে? মনুষ্যের গবেষণার জন্য ইহা হইতে প্রশস্ততর ক্ষেত্র আর নাই—মনুষ্যের তৃপ্তির জন্য ইহা হইতে অধিকতর উপাদেয় সামগ্রীও কৃত্রাপি সম্ভবে না। যাহারা নিভৃতকক্ষের অপবিত্র বায়ু সেবনে ছৎপিড়ার কাতর হইয়া নৈসর্গিক বায়ু সেবন করিতে অভিলাষী হইয়েন, যাহারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিনিকুঞ্জে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখক্লিষ্ট হইয়া স্বভাবের বৈচিত্র্য দেখিতে চাহেন, এবং যাহারা কবিকল্পনার

তরল আমোদে পরিতৃপ্তি উপভোগ না করিয়া প্রকৃতির রম্য উপবনে ভ্রমণ করিতে সুখানুভব করেন, উল্লিখিত প্রকৃতি-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা অপেক্ষা তাঁহাদের সুখের ও আশার মহত্তর কোন সামগ্রী থাকিতে পারেনা। এ তত্ত্ব সহজ নহে ও সামান্য নহে এবং মনুষ্যের ক্ষণব্যাপি জীবনও ইহার গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিভাগানুসারে আপনাদের কার্যেরও বিভাগ করিয়া নিয়াছেন। প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত, চেতন ও অচেতন। এই চেতন আবার প্রাণী ও উদ্ভিদ এই শ্রেণীদ্বয়ে অংশীকৃত। পৃথ্বীকৃত শ্রেণীর সৃষ্টি ও স্থিতির মূলানুসন্ধানের নামই প্রাণিতত্ত্ব। যাহারা জড় জগতের নির্জীবতার কোনরূপ আমোদ অনুভব করেন না, উদ্ভীর্ণমান ও উৎপলমান প্রাণিস্বন্দের প্রকৃতি অবগত হইতে তাঁহাদেরও কোঁতুল জন্মে। এই বিস্তীর্ণ জগত অসংখ্য প্রাণিমণ্ডলের আবাস-স্থল। এমন মূঢ়াণ্ডে পরিমিত ভূমি স্পর্শ করিতে

পাইবে না, এমন জলবিন্দু দৃষ্টিগোচর হইবে না, যাহাতে রহৎ কি ক্ষুদ্র কোনরূপ প্রাণী বিদ্যমান নাই। আবার ইহাঁর প্রত্যেকটি প্রাণী এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণী-জগত,—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে দৃঢ় শত প্রাণী, আবার তাহার শরীরে ৫ ও ১০ প্রাণী, এবং এই অভ্যন্তরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণীর শরীরে আবার প্রাণী! অনুবীক্ষণ দ্বারা তোমার লোমকূপ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, শত শত প্রাণী উহাতে বিচরণ করিতেছে। অগ্নি যে সর্ব্বভুক, এবং প্রাণিসংহারের সাক্ষাৎ অবতার, তথাচ ইহা প্রাণিশূন্য নহে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, জল ও স্থলের জন্য যেরূপ বিশেষ বিশেষ জাতির প্রাণী রহিয়াছে, অগ্নির জন্যও সেইরূপ এক বিশেষ জাতীয় প্রাণী আছে। কোন স্থানে অধিকক্ষণ অগ্নি জ্বালিয়া রাখিলেই এই প্রাণীর সৃষ্টি হয়, এবং ইতস্ততঃ ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। প্লুলাদপি প্লু স ইহাতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই অসংখ্য জীবমণ্ডলের শ্রেণী-বিভাগপূর্ব্বক ইহাদিগকে বৈজ্ঞানিকমুদ্রে প্রণিহিত করাই প্রাণতিত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের সমীপে বাহ্য উপহার প্রেরণ করিতেছি, তৎসম্পর্কে কএকটি কথা বলিয়া আমরা এই অনুক্রম-নিকার উপসংহার করিব। বান্দালা ভা-

ষাণ বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক দুষ্কর ব্যাপার। আত্মতত্ত্বদর্শী এবং অধ্যাত্ম-খবিলাসী আধ্যাত্মবিগণ অন্তর্জগতের অভ্যন্তর নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব ছাড়িয়া বহির্জগতের রঙ্গভূমিতে কখনও প্রবেশ করেন নাই; সুতরাং ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল না। এবং ভারতে ছিলনা বলি-রায় বান্দালায়ও এপর্যন্ত ইহার অভ্যাস হয় নাই। অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কথা, প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা। যদিও এই বিষয়ে দুই এক শানি সামান্য আকারের গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সকলই ইংরাজি হইতে অনুবাদিত এবং আমাদিগের বিবেচনায় পাঠশালার বালকদিগের জন্য লিখিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিতে হইলে, বিশেষ কোন পুস্তক অধ্যয়ন না করিয়া বিজ্ঞানের মূল প্রভবন অধ্যয়ন করিতে হয়। আমি যথাসাধ্য এই পন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ব যেরূপ অনন্ত সমুদ্র, তাহাতে ইহা মত্তরণ করিতে যাইয়া কতদূর ক্লান্তকাৰ্য্য হই বলিতে পারি না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকমুদ্রে অবলম্বন না করিয়া কেবল কতকগুলি প্রাণীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা সফল হইলে, ইহাদের শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিবেশিত করিয়া, বিজ্ঞানের শৃঙ্খলার সহিত ইহাদিগকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ্য করিবার বাসনা রহিল

হস্তী।

চন্মণ্ডলে হস্তীই সর্ক্যাপেক্ষা বৃহৎ জন্তু, বহুকাল হইতে মানবজগতে বিগ্নিফ্ট-। পরিচিত। যদি শতসহস্র বৎসরের রাতন হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কর, তবে সেখানও প্রমাণ পাইবে যে এই জন্তু দীর্ঘকাল হইতেই মানুষের ব্যবহারে আনীত হইয়াছে। ছাপরযুগে কুকপাণ্ডবদিগের যুদ্ধাদির সময়ও হস্তীর ব্যবহারের সবিশেষ প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে। ত্রেতাযুগের রামায়ণাদি গ্রন্থেও অনেক স্থানে হস্তীর বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। এবং এতদপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদাদিতেও হস্তী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। অতএব আমরা এই সমস্ত কারণে, এই প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড জন্তুর ইতিহাস সর্ক্যপ্রথমে লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহাদের বন্যস্বভাব, গৃহাগত হইলে স্বভাবের বৈপরীত্য এবং আধুনিক যে যে প্রণালীতে উছাদিগকে আবদ্ধ করা যায়, তাহার সমস্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

হস্তী-শরীরের উচ্চতা সাধারণতঃ ৭ ফিট হইতে ১২ ফিট পর্য্যন্ত, কিন্তু ৯।১০ ফিটের অধিক উচ্চ হস্তী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইছাদিগের ৪টি পাই স্থূল এবং শুস্তের ন্যায় গোল। সম্মুখের

পা খচ্ছিন্ন পাছের পাগুলি কিছু খর্ব। সম্মুখের পায়ে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশটি নখ এবং পাছের দুই পায়ে ৪টি করিয়া ৮টি নখ। কিন্তু সমুদয় নখগুলি সমান অবয়ববিশিষ্ট নহে। মধ্যের গুলি কিছু বড় এবং অন্যান্যগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজী বহুবিধ প্রাণিবৃত্তান্তে দেখা যায় হস্তীর চারিটি পায়ের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে। বাঙ্গলাভাষায় যে কএকখানি সামান্য আকারের প্রাণি-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ লিখিত। কিন্তু আমরা বহু হস্তী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন হস্তীরই ১৮টি নখের অধিক পাইলাম না। স্মৃতরাং অন্যের কথার উপর নির্ভর না করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই যথাযথ বিবৃত করিলাম। আমি শুনিয়াছি, কদাচিত্ত কোন হস্তীর বিশটি নখ দেখা যায়।

হস্তীর শরীরের বর্ণ গাঢ় ধূসর; যতই ইছাদিগের বয়োরদ্ধি হইতে থাকে, ততই কপালের এবং কর্ণের অপার পৃষ্ঠের চর্মগুলি বিন্দু বিন্দু করিয়া শুভ্র বর্ণ হইয়া যায়। এবং কোন কোন হস্তীর এই সমস্ত

স্থান এত অধিক ধবলবর্ণ হয় যে, যখন তাহার উপর কোনরূপ ময়লা পড়িয়া না থাকে, তখন সেই চর্ম হস্তীর এক শরীরের চর্ম বলিয়াই অনুমিত হয় না । দূর হইতে এইরূপ হস্তীগুলিকে বড় স্তম্ভের দ্বারা ।

হস্তীর লাজুল প্রায় ত্রিটি দীর্ঘ ও পিঙ্গ-গামী; উহার অগ্রভাগে একগোছা মোটা চুল সম্মিলিত আছে, কিন্তু তাহা লাজুলের চতুর্দিক জড়াইয়া নহে, দুই পাশে । এই কারণেই স্থূলদৃষ্টিতে লাজুলের অগ্রভাগটি চেপ্টা বলিয়া বোধ হয় । শরীরের অন্যান্য স্থানও মোটা মোটা লোম দ্বারা আবৃত । কিন্তু সেইগুলি এত দূর-সম্মিলিত যে, নিকট হইতে না দেখিলে ভাল করিয়া দেখা যায় না । ইহাদের শরীরের বর্ণের সঙ্গে চুলের বর্ণ একেবারে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং বোধ করি চুলগুলি লক্ষিত না হইবার ইহাও একটি কারণ । মাথার উপরে যে সমস্ত চুল আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ঘন ও দীর্ঘ এবং স্থূল-দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান ।

হস্তীর মস্তকের গঠন অতি আশ্চর্য্য । ইহা দুই ভাগে বিভক্ত । দুইটি কুন্ত একত্র করিয়া উন্টাইয়া রাখিলে উহাদের উপরিভাগ যেরূপ দেখা যায়, হস্তীর মাথার উপরও ঠিক সেইরূপ । এইজন্য প্রাচীন কবির উহাদিগকে করিকুন্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে দুইটি স্নগোল বস্তুর উপরে কাপড় দিয়া কমিলা ধরিলে, উহার উপরিভাগ যেরূপ দেখায়, হস্তীর মাথার উপরিভাগও ঠিক সেইরূপ ।

কপালের মধ্যস্থানে গোল একটি উচ্চ স্থান আছে, উহাকে ইদানীন্তন হস্তীরক্ষকেরা 'পিতোরান' কহে । (বাঙ্গলায় ইহার আর কোন প্রতিশব্দ নাই, এই শব্দটিই বেশ প্রচলিত) । এই স্থান হইতে শুণুনামক হস্তীশরীরের একটি আশ্চর্য্য প্রত্যঙ্গ বাহির হইয়াছে । হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন উহা হস্তীর অঙ্গভাবিক অতিরিক্ত একটি প্রত্যঙ্গ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে । স্বক্ষরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শুণু মুখের উপরিস্থ ঠোঁট এবং নাসিকার অত্যশ্চর্য্য অপরিমিত বর্দ্ধিতাংশ । হস্তীর স্বদুন্দুপ, অত্যন্ত খর্ব্ব ; সুতরাং সম্মুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন দিকে একেবারে স্পর্শশরীর না ফিরাইয়া কিছুই অবলোকন করিতে পারে না । এবং ঐ কারণে অন্যান্য পশুর ন্যায় ঘাড় নোয়াইয়া মৃত্তিকা হইতে আহাৰ্য্য বস্তু তুলিয়া লইতেও ইহারা অক্ষম । কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা উহার একমাত্র শুণুই নিবারণ করিতেছে । হস্তী যখন লগ্নভাবে শুণু ছাড়িয়া দেয়, তখন শুণুর অগ্রভাগ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াও অর্ধ হস্ত পরিমাণ ভূমিতে গড়াইয়া রহে, কিন্তু আবার বক্র করিয়া সংকোচন করিলে মৃত্তিকা হইতে প্রায় দুই হস্ত উঠে থাকে ।

শুণু ইহাদের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, এমন কি উহা না থাকিলে কোন ঐক্যে উহার

যে জীবনধারণ করিতে পারিত এমন সম্ভাবনা ছিল না। হস্তী ইচ্ছামত শুণ্ডকে এদিক সেদিক ঘুরাইতে পারে। এবং ইহা দ্বারা রক্ষাদির শাখা ভাঙিতে, মৃত্তিকা হইতে ঘাস তুলিয়া খাইতে এবং প্রয়োজন হইলে শত্রু বিতাড়িত করিতে অক্লেশে সমর্থ হয়। শুণ্ডের অগ্রভাগে বাহিরের দিকের মধ্যস্থলে, অঙ্গুলির ন্যায় প্রয়োজনসাধক একটি সূক্ষ্মাগ্রভাগবিশিষ্ট বর্দ্ধিত চর্ম আছে। উহা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, এমন কি সিকি আধুলি প্রভৃতি ও অতি সহজে উঠাইয়া লইতে পারে। শুণ্ড যখন নাসিকা ও উপরিস্থ ওষ্ঠের বর্দ্ধিতাংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তখন নাসারন্ধ্র ও যে উহার মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। জলপান করিবার সময়েও ইহার। শুণ্ডদ্বারা জলপান করিয়া থাকে। জলের মধ্যে শুণ্ডের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিয়া জল আকর্ষণ পূর্বক শুণ্ডকে বাঁকাইয়া নিয়া মুখের মধ্যে জল ছাড়িয়া দেয়, এবং যে পর্যন্ত পিপাসার নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্যন্ত এইরূপে জল আকর্ষণ করিয়া নিয়া মুখের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শসাবীজ (ধান চিনা প্রভৃতি) খাইতে হইলেও ঐরূপ শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুখের ভিতরে ছাড়িয়া দেয়। শরীরের কোন স্থান চুলকাইলেও শুণ্ড দ্বারা একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা শরীর চুলকাইয়া লয়। বলিতে কি মনুষ্যেরা শরীর সম্পর্কে যে যে

কার্য্য হস্তদ্বারা সম্পাদন করে, হস্তী শুণ্ড দ্বারাই সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের শব্দভ্রষ্টা পণ্ডিত মহাশয়েরা বোধ হয় করিশুণ্ডের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াই উহার নাম 'কর' রাখিয়াছিলেন; ইদানীং ও মালতেরা শুণ্ডকে হস্তীর হাতে বলিয়া থাকে। হস্তীর শরীরের আকার যেরূপ প্রকাণ্ড, চক্ষুর অবয়ব তেমনি আবার ক্ষুদ্র। ইহার। সর্বদাই চক্ষুর জন্য ব্যতিব্যস্ত। কোনপ্রকারে চক্ষুর মধ্যে ক্ষুদ্র কাটাাদি প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য ইহার। সর্বদা কর্ণকে বিলোড়ন করিয়া চক্ষু রক্ষা করিয়া থাকে।

হস্তীর কর্ণদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ, আকারে প্রায় আমাদের দেশীয় শূর্পের ন্যায়। ইহার। ইচ্ছামত ইহাকে সম্মুখে ও পশ্চাদ্ধিকে সঞ্চালন করিতে পারে।

হস্তীর নিম্নের ঠোঁট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহা শুণ্ডের শতাংশের একাংশ ও কার্য্যোপযোগী নহে। উহার আকৃতি ইংরাজী, V অক্ষরের ন্যায়। অর্থাৎ মাটির অর্দ্ধহস্ত পরিমিত প্রশস্ত স্থান হইতে দীর্ঘ ও অর্দ্ধহস্ত পর্যন্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া নামিয়াছে। আহাৰ্য্য বস্তু মৃত্তিকায় পড়িতে না দেওয়াই নিম্নঠোঁটের প্রধান কার্য্য। হস্তীর জিহ্বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্থূল। মুখহইতে উহা বাহির হইতে পারে না এবং অন্যান্য পশুর ন্যায় কোন বস্তু লেহন করিতে সক্ষম হয় না। হস্তীর সম্মুখের কোন পাটিতেই দন্ত নাই, কেবল মাত্র মাটীতে

দুই দিকের উপরে ও নীচে ছয়টা করিয়া পেষক দন্ত আছে। এই দন্ত ব্যতীতও পুং হস্তী গুলির শুণ্ডের দুইপার্শ্ব দিয়া অতি প্রকাণ্ড দুইটি দন্তের ন্যায় দুইটি গোল অস্থি নির্গত হয়। কোন কোন হস্তীর এই অস্থিগুলি ৭।৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দেড় ফিট পর্য্যন্ত পূরিদি বিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। এই দুইটি হাড়কেই আমরা গজদন্ত বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটির সঙ্গে হস্তীর যথার্থ দন্তের কোন সম্পর্কই নাই। ইহা দন্ত হইলে অবশ্য মাটি হইতে নির্গত হইত, কিন্তু ইহার নির্গমন স্থল মাটি নহে। হস্তীর কপালের হাড় হইতে চক্ষুর নিম্নে এই অস্থি উৎপন্ন হয়; এবং শুণ্ডের ভিতর দিয়া একটি ছিদ্র দ্বারা উহা বাহির হইয়া পড়ে। যদি কেহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহেন, তবে একটি হাতীকে মুখ ব্যাদন করিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। এই বার আমরা হস্তীর করোটির আকৃতি প্রকাশ করিতে পারিলান না, সম্ভ্রান্তরে পাঠকসমীপে উপস্থিত হইলে, তখন হস্তীর দন্ত সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। যাহা হউক এক্ষণ আমরা উহাকে গজদন্ত বলিয়াই উল্লেখ করিব। এই গজদন্তের বহির্ভাগ নিরেট এবং যে খানি চর্ম ও মাংসাবৃত সেই খানিই শূন্যগর্ভ।

হস্তিনী গুলিরও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দন্ত নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা হস্তীর

দন্তের এক দশমাংশও স্থূল ও দীর্ঘ নহে। এবং সর্বদাই নিম্নমুখী।

হস্তিনী আঠার মাস গর্ভধারণ করিয়া এক কালে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। হস্তিনীর বক্ষস্থলে দুইটি স্তন আছে, যে পর্য্যন্ত উহার গর্ভাবতী না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহাদের স্তনদ্বয় ভালরূপ দেখা যায় না। প্রসবকাল যতই নিকটবর্তী হয় স্তন-যুগল ততই স্ফীত হইতে থাকে। হাতীর দুধ অতিশয় পাতল; কলেবরের সহিত তুলনায় স্তন যুগলও অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

আমাদের আখ্যা ভাষায় হস্তিনীকে করভ কহে। করভের শরীরের বর্ণ—ধূসরের উপরে একটুকু রক্তিমভাভ; মুখের মধ্যে এবং শুণ্ডের অগ্রভাগে জন্মকালের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত মেটে সিন্দূরের ন্যায় লাল থাকে। প্রসবের অব্যবহিত পরেই করভেরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, এবং মুখ দিয়া মাতৃদুগ্ধ চুষিয়া খায়। পূর্ণায়তন হস্তী যেমন শুণ্ডদ্বারা পানীয় আকর্ষণ করিয়া লয়, করভেরা সেইরূপ করে না; তাহার তাহাদের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময় শুণ্ডটি উদ্ধে উঠাইয়া অন্যান্য পশুর মত মাতৃস্তন মুখে লয়, এবং চুষিয়া চুষিয়া দুগ্ধ পান করে। করভগুলি সর্বদা উহাদের মাতার নিকটে নিকটে থাকে, মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র গমন করে না। রক্ত-গুলি জলে নামিবার সময়ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া সন্তরণ করে, এবং পরিপাক হইলে মাতৃপৃষ্ঠে ভর করিয়া বিশ্রাম করে।

হস্তিছাতি অপরিমিত বলশালী। বহুতরঙ্গলোক একত্র হইয়া যে বস্তু একটুকুও নাড়িতে না পারে, হস্তী অবলীলাক্রমে সেই বস্তু লইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এই জগতে হস্তীর ন্যায় বলশালী অন্য কোন জন্তু নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। কিন্তু ইহার অত্যন্ত বলশালী হইলেও স্বভাবতঃ ভীক এবং মূঢ়। এমন কি, কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর শব্দ শুনিলেই অমন ভয়ে জড়সড় হইয়া পলায়ন করে, এবং পলাইবার সময়ে সম্মুখে একাণ্ড বৃক্ষাদি থাকিলেও ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যায়।

হস্তী সর্বদা দলবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে। হস্তীর দলের মধ্যে কখন কখন একশত হস্তীর অধিকও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে একটির অধিক দুইটি পুংহস্তী সচরাচর দেখা যায়না। পুংহস্তীগুলিকে সাধারণ ভাষায় ‘গুণ্ডা’ বলিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ সেই দলে অন্য একটি গুণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধাশু হইয়া থাকে, এবং সেই যুদ্ধে যে জয়লাভ করে, সেই ঐ দলের দলপতি হইয়া পড়ে, এবং অপরটি পলাইয়া যায়। দলের মধ্যে আরও অল্পবয়স্ক পুংহস্তী থাকে বটে, কিন্তু সেইগুলির সঙ্গে বড়টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। এইরূপ অল্পবয়স্ক পুংহস্তীগুলিকে, ইদানীং মাজতেরা পাঠাঠা কহে। গুণ্ডাগুলির প্রকাণ্ড দুইটি দন্ত আছে বলিয়াই হস্তীর তথাবিধ রহৎ দল হইতে, প্রথম দৃষ্টিতেই

উহাদিগকে হস্তিনী হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি উহাদিগের এইরূপ দন্ত না থাকিত, তবে স্থূলদৃষ্টিতে গুণ্ডাগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতনা। পুংহস্তীর মধ্যে কোন কোনগুলির ঐরূপ রহৎ দন্ত নির্গত হয় না, এই প্রকার পুংহস্তীগুলিকে ‘মখনা’ কহে। যে কারণে কোন কোন পুরুষের দাড়ি গোপা হয় না, সেই কারণে কোন কোন পুংহস্তীরও দন্ত বাহিরে আইসে না। এই প্রকার পুংহস্তীগুলিও পূর্বেোক্ত দলের মধ্যেই যাতায়াত করে।

কোনরূপ ভয়ের কারণ হইলে অল্পবয়স্ক এবং দুর্বল হস্তীগুলিকে মধ্যে রাখিয়া সবলগুলি চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া থাকে। স্থানান্তরে বাইবার সময়ও সবল গুলি অগ্রপশ্চাৎ থাকিয়া দুর্বলগুলিকে মধ্যে রাখে। হস্তীর গতি অতি মনোহর এবং মৃদু। যখন স্বাধীনভাবে নিশিচেষ্টমানে গমন করিতে থাকে, তখন প্রকৃতই বড় সূন্দর দেখায়। প্রাচীন কবিরা হস্তীর মধুর গমনের সঙ্গে রূপসী কুলকামিনীগণের পাদচালনার তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হস্তীর গমনের দুই তিনটি বড় আশ্চর্য্য রীতি আছে। প্রথমতঃ, একদল একস্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পায়ের বিশেষ কোন শব্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অগ্রবর্তী হস্তীটি যেস্থানে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, পশ্চাৎবর্তীগুলিও ঠিক সেই স্থানে পা ফেলিয়া চলিবে। তৃতীয়তঃ

বহুসংখ্যক হস্তী এক স্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দেখিলে একটি হস্তী ভিন্ন দুইটি হস্তীর পদচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা যায় না । তৃতীয়তঃ, ইহারা কোন জঙ্গলারত স্থান দিয়া চলিয়া যাইবার সময় শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা পদ-নিষ্ক্ষেপোপযোগী স্থান স্পর্শ করিয়া লয়; যদি জানিতে পারে যে এই স্থানে পা ফেলিলে, পায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিবে, কিংবা স্থান অত্যন্ত কৰ্দমাক্ত হইলে পা গাড়িয়া পড়িবে, তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই সেই পথ দিয়া যাইবে না । হস্তী গুলি যখন স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের সম্মুখের পা যেস্থানে পড়ে, পাছের পাও ঠিক সেই স্থানেই নিষ্কিপ্ত হয় ।

হস্তীর ভীকতার কথা পূর্বে বলিয়াছি, এবং উহারা নামান্যভয়েই যে পলাইয়া যায়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি ; আর একান্তই যদি পলাইবার কোন পথ না দেখে, তবে তাহারা সেই ভয়দর্শকের বিকৃত দণ্ডায়মান হয় । উহাদিগের আঘাত করিবার প্রধানতম অস্ত্রই দন্ত, এবং দন্তীগুলিই প্রথমে আসিয়া আক্রমণ করে । যদিও পা এবং শুঁড়ের দ্বারা হস্তিনীগুলি আঘাত করে, কিন্তু তাহা গুণ্ডাদন্তের আঘাতের ন্যায় তত ভয়ানক নহে । দুইটি গুণ্ডার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দন্তই উহাদের প্রধান শস্ত্র । এতদ্ব্যতিত অন্য কোন সময়ে উহাদিগকে দন্ত ব্যবহার করিতে দেখা যায় না ।

হস্তী-জাতির শরীরভাস্তরে স্বভাবতঃ অধিক মাত্রায় বসা আছে, এই জন্যই উহারা অধিক কণ রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না । একটু উত্তপ্ত হইলেই জলে গিয়া সর্বশরীর ডুবাইয়া রাখে । হস্তী-জাতি অত্যন্ত সস্তরণ-পটু । ক্রমাগত ২।৩ প্রহর কাল তেমন প্রোতস্বতী নদীতে ও সস্তরণ করিতে পারে । সস্তরণের সময় উহাদের প্রায় সমস্ত শরীরই জলে ডুবিয়া রহে । কেবল পৃষ্ঠের উচ্চভাগ ও মস্তকের একটু অংশ জলের উপরে থাকে । আবার কখন কখন তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না । শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে হইলে এক এক বার শুণ্ডটিকে জলের উপর উঠাইয়া লয় ।

হস্তীর সর্পাঙ্গে কখনও স্নেদ জল নির্গত হয় না, যদি কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় পরিশ্রম করে, ও জলে নামিতে না পায়, তাহা হইলে উহাদিগের পায়ের নখের গোড়া হইতে এক প্রকার জল নির্গত হইতে থাকে । হস্তী-শরীরের স্বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইলে উহাকেই বলা উচিত ।

উদ্ভিদই হস্তিদিগের একমাত্র আহাৰ্য্য । এবং ইহারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ৪ । ৫ মণ করিয়া আহাৰ করিতে পারে । যে কোন স্থানে যাইয়া আহাৰ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থানেই উদরপূরণ অপেক্ষা পদমর্দনাদি হইতে অধিকতর অনিষ্ট উৎপন্ন হয় । ইহারা কিছুই না দেখিয়া খায় না । আ-

হার্ঘ্য বস্তু কোনরূপ দুর্গন্ধ যুক্ত হইলে, তাহা অমনি ফেলিয়া দেয়। শুণ্ডের দ্বারা আহারের জন্য এক বোঝা ঘাস ধরিয়া লইলে তাহা পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে পায়ের মধ্যে এমন করিয়া ঝাড়িতে থাকে যে, উহার অর্ধেক ঘাসও মুখে তুলিয়া দিতে পারে না, সকল গুলিই ঝড়িয়া যায়। কিন্তু তথাপিও অপরিষ্কার খায় না। কদলী রক্ষ, ঘাস, বাঁশপাতা, এবং দানাট ইছাদিগের প্রধান খাদ্য। শীতকালে যখন ঘাস ইত্যাদি অনান্য দ্রব্য খাইতে না পায়, তখন কেবল কদলীরক্ষ আহার করিয়া থাকে। কখন কখন বট অশ্বখ ও ডুমুর গাছের ডাল ও আহার করিয়া থাকে, কিন্তু ইছাতে যে কি সুখ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি ইহার কেহ কিছু জানেন, তবে জানাইলে বাধিত হইব।

হস্তীর শরীরভ্যন্তরে পানীর জল সংক্ৰান্ত রাখিবার জন্য, পাকস্থলী ভিন্ন অন্য একটি স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে। শুণ্ড দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া ঐ যন্ত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এবং আবশ্যক মত তথা হইতে আবার শুণ্ড দ্বারাই জল বাহির করিয়া লইতে পারে। যদি উহার রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া জলে নামিতে না পায়, অথবা পালিত হস্তীকে কার্য্যানুরোধে যথাসময়ে স্নান করিতে না দেওয়া হয়, তবে সেই যন্ত্র হইতে জল আনিয়া সর্ব শরীরে সিঞ্জন করিয়া দিতে থাকে।

হস্তীজাতির অত্যশ্চর্য্য অপত্যেষ্ট। উহাদের বংশপরম্পরা অবচ্ছিন্ন ভাবে একত্র থাকিলে একে অন্যকে চিনিতে পারে।

হস্তীর বয়সকাল ১০০ শত বৎসর। কিন্তু এত দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই। শুনিতে পাই ইহা অপেক্ষাও নাকি আরও অধিক দিন ইহারা বাচিয়া থাকে; পৃথিবীর দুইটি মাত্র মহাদেশ ইহাদের বাসস্থান, এমিয়া এবং আফ্রিকা। প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে হস্তীর প্রতিমূর্ত্তিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের এমিয়ার হস্তী। ভবিষ্যতে আফ্রিকার হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি সহ উহাদের বিবরণ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা বিবৃত করিতে বস্তুবান থাকিব।

হস্তীর সাধারণ অর্থাৎ সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা এক প্রকার পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে জীবশেষ্ট মনুষ্যের অপরিমিত বুদ্ধিকৌশলে ও অসাধারণ চাতুর্য্যে যে কি প্রকারে এই ভয়ঙ্কর বলশালী প্রকাণ্ডতন জন্তু ধৃত হইয়া সহস্র প্রকারের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বিস্তীর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। কি প্রণালীতে এই জন্তু অতি প্রথমে মনুষ্যের করায়ত্ত হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আজি পর্য্যন্তও জানিতে পারি নাই। আমরা অনুসন্ধানে থাকিলাম, যখনই জানিতে পারিব তখনই সাধারণ সমীপে প্র-

কাশ করিব। ইদানীং ইহাদিগকে যে প্রণালীতে আবদ্ধ করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

হস্তী পরিবার নিমিত্ত এক্ষণ তিনটি প্রণালী প্রচলিত আছে। ইহার একটির নাম পরতালা শিকার, অন্যটির নাম ফাঁসি এবং তৃতীয়টির নাম খেদা শিকার।

১ম। পরতালা শিকার—এই শিকারে কেবল গুণ্ডা হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কেবল ৩ টি পালিতা কুন্কীর আবশ্যক। কুন্কী দেখিলে বনাগুণ্ডা হস্তী দৌড়িয়া পলায়ন করে না, বরং দাঁড়াইয়া থাকে। এই সময় মাল্তেরা দুইটি কুন্কীকে গুণ্ডার দুই পার্শ্বে এমন ভাবে চাপাইয়া রাখে, যেন গুণ্ডা কোন মতেই মাল্তদিগকে দেখিতে না পায়; অর্থাৎ পার্শ্বস্থ কুন্কী দুইটির মুখ, গুণ্ডার মুখের বিপরীতদিক করিয়া রাখে। গুণ্ডা যদি কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হয়, তবে পার্শ্বস্থ কুন্কী দুইটির মুখ না ফিরাইয়া উহাদিগকে পিছেরদিকে হটাইয়া নিয়া যায়। কিন্তু কোন মতেই পার্শ্বের চাপা ছাড়িয়া দেয় না। এই সময়ে তৃতীয় পালিতা হস্তিনীটি একেবারে গুণ্ডার পিছনে আনিয়া রাখে, এবং উহার উপরেই দাঁড়াদার (হস্তী বন্ধনকারী) দড়ি কাছি প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত রহে, গুণ্ডাটি একটুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইলে, অমনি সে হস্তী হইতে নামিয়া গুণ্ডার পাছের দুই পা একত্র

করিয়া কাছি জড়াইতে থাকে। হস্তভাগা গুণ্ডা ঐ কুন্কী দেখিয়া অমনি মোহিত হইয়া যায় যে, উহার পাদদেশে কি ঘটনা হইতেছে তাহার অণুমাত্রও অনুসন্ধান করে না। পারের নীচু হইতে উপর পর্যন্ত কাছি জড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই উহাকে আবদ্ধ করা হইল। ইহার পরে যেক্ষণে ইচ্ছা সেইরূপে উহার গলা ও বক্ষ জড়াইয়া দড়ী লাগাইতে থাকে ও ক-একটি রহৎ রুক্ষের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে।

২য়। ফাঁসি শিকার—এই শিকারে কেবল কুন্কী হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। বন্য কুন্কীগুলি পালিতা কুন্কীর পৃষ্ঠদেশে লোক দেখিতে পাইলেই প্রাণপণ করিয়া দৌড়িতে থাকে, তখন মাল্তেরাও উহার পিছে পিছে পালিতা কুন্কী ধাবিত করিয়া দেয়; এবং পালিতা কুন্কীটি দৌড়িয়া গিয়া বন্য কুন্কীর পাশাপাশি হইলে, অমনি একজন মাল্ত বন্য হস্তিনীটির মস্তক এবং শৃঙ্গের উপর দিয়া মোটা রজ্জু নির্মিত ফাঁসি ফেলিয়া দেয়। আর ফাঁসিটি ক্রমশঃ টান লাগিয়া গলায় কসিয়া ধরে। ফাঁসি গলায় লাগাইবার সময়ে যদি বন্যহস্তিনীটি উহা শুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তবে অনায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিহীন হস্তিনী তাহা না করিয়া ভয়ে শুণ্ড সংকোচন করে, আর অমনি ফাঁসিও গলায় লাগিয়া যায়। এই প্রকার শিকারে প্রত্যেক হাতীতে দুইটি লোকের আবশ্যক। একটি চালক ও এ-

কটি বন্ধনকারী। যদি বন্য হস্তিনীটি দুর্বল হয়, তবে একটি পালিতা হস্তিনী দিয়াই উহাকে ধরা যায়, কিন্তু বলিষ্ঠ হইলে দুইটি পালিতা হস্তিনীর আবশ্যক।

এই প্রকারে গুলার ফাঁসি লাগাইয়া পূর্বোক্ত শিকারের ন্যায় ইহাদিগকেও বড় বড় গাছের সঙ্গে আনিয়া বান্ধিয়া রাখে।

পরতালি এবং ফাঁসি শিকারে একবারে একটি হস্তীর অধিক আবদ্ধ করা যায় না। বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরা এই শিকারের প্রণালী পাঠ করিয়াই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

৩য়। খেদা শিকার;—এই শিকার পূর্বোক্ত শিকারদ্বয় হইতে একবধের স্বতন্ত্র, এবং ইহাতে এক সময়ে অনেকগুলি হস্তী ধরা যাইতে পারে। যে স্থানে হস্তীগুলিকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়, শিকারীরা সেই স্থানের চতুর্দিকে বহু পরিমাণ ভূমি বেষ্টিত করিয়া অন্ততঃ ৭।৮ হাত অল্পর এক একজন প্রহরী রাখিয়া দেয়, ঐ প্রহরীরা প্রত্যেকে স্ব স্ব নিকটবর্তী স্থানে দুই একখানা করিয়া খাম গাড়িয়া রাখে, এবং সেই খামে লতা পাতা জড়াইয়া একটা বেড়া প্রস্তুত করে। এই বেড়াকে পাতবেড় কহে। হস্তীগুলি ‘আবদ্ধ হইতেছি’ ইহা যেন বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য প্রহরীরা এই সময় নির্বাক ও নিশুন্ধ হইয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যদি কোন হস্তী

এই সময় এই বেড়ার বাহির হইতে চায়, তবে যাহার নিকট দিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা করে, সে হয় বন্দুকের শব্দ করিয়া, না হয় অন্য কোন প্রকারে ভয় দেখাইয়া হস্তীটিকে বেড়ার কেন্দ্রাভিমুখে তাড়াইয়া দেয়। ইহার পরে এই পাতবেড়ের মধ্যে কোন স্থানে একটি স্রুদ্র খোয়াড় প্রস্তুত করা হয়, এই খোয়াড় হস্তী শীঘ্র ভাঙ্গিতে পারে না। খোয়াড়ের একদিকে একটি দরজা থাকে, এবং একটি কবাট উহার উপরে এমন কোশলে স্থাপিত করা হয়, যেন উহা ছাড়িয়া দিবামাত্র দরজা একবারে বদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর কোশলে আবার ঐ পাতবেড় হইতে সমগ্র হস্তীগুলি এই খোয়াড়ে আনিত হয় এবং আনিয়াই কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে পালিতা কুনকী ঐ খোয়াড়ে নিয়া বন্য হস্তীগুলিকে ইচ্ছামত পায়ে কি গলায় দড়ী লাগাইয়া বড় বড় গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়।

বন হইতে ধরিয়া আনিলে ইহারা সহজেই মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে, কখনও বা সম্ভাবহারে এবং কখনও বা কঠিন শাসনে উহাদিগকে সমুদ্র এবং অসমুদ্র করিতে হয়। প্রথমতঃ, ধৃত হস্তীর গলার সঙ্গে পালিত হস্তীর বক্ষ একত্র বন্ধন পূর্বক মনুষ্যালয়ে আনয়ন করা হয় এবং কিছুদিন কেবল উহাদিগের আহার যোগাইয়া পরে একটি বংশধরের অগ্রভাগ ৯।১০ ভাগে চিরিয়া দূর হইতে উহাদের

গা। ঘর্ষণ পূর্বক শুড়শুড়ি নিবারণ করা আ-
বশ্যক। এইরূপে শুড়শুড়ি কিছু ভাঙ্গিলে
পালিতা কুনকীর পৃষ্ঠে বসিয়া ক্রমে ক্রমে
উহার পৃষ্ঠে চড়িতে যত্ন করিতে হয়,
এবং পালিতা কুনকীর সঙ্গে বাঁধিয়া উ-
হার সহিত এদিক ওদিক ফিরাইতে হয়।
এইরূপ ফিরাইবার সময় উহার অগ্রে
অগ্রে একজন মানুষ দৌড়াইয়া যায় ও
উহার পৃষ্ঠদেশেও একজন মানুষ উপবিষ্ট
থাকে। এই সময় মানুষের ইচ্ছার বহি-
ভূত কোনরূপ আচরণ করিতে চাহিলে
উহাদিগকে অক্লুশ বা বলম দ্বারা আঘাত
করিতে হয়। এইরূপ কয়েক দিন অভ্যাস
করিলেই বন্য হস্তীরা মানুষের সঙ্গে বি-
শেষরূপে পরিচিত হইয়া পড়ে। পরিচিত
হইবার কিছুকাল পরে উহাদিগকে বসি-
বার প্রথা শিক্ষা দিতে হয়। কএক দিন
ভাল করিয়া আনাদি নাকরাইয়া প্রায়শঃই
রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, পরে একদিন
জলে লইয়া গেলে, উহার আপনা হইতেই
জলে বসিবার উপক্রম করে, আর অমনি
মাত্তেরা ‘বট, বট,’ করিতে থাকে।
এবং কিছু দিন এইরূপ করিলে উহার
জলে ও শুষ্কস্থানে ‘বট’ বলিলেই ব-
সিয়া পড়ে। যদি কোন হস্তী বসিতে
না চায়, তবে বলমদ্বারা উহার পৃষ্ঠে এত
জোরে জাঁতিয়া ধরিতে হয়, যে উহার
আর না বসিয়া থাকিতে পারেনা। কোন
কোন হস্তীর অভাব আবার এমনি দুট
যে উহার অনাহারে মরিয়া বাইবে, ত-

থাপি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিবে
না। এবং কোনটি বশ্যতা স্বীকার ক-
রিলেও মনের কুটিলতা ছাড়িবে না।
কিন্তু এই প্রকার অসরল এবং দুষ্কমতি
হস্তী একশতের মধ্যে একটি হয় কিনা স-
ন্দেহ। যাহা হউক, হস্তী বসিবার সময় স-
ম্মুখের পা সম্মুখের দিকে ও পিছনের
পা পিছনের দিকে প্রসারণ করিয়া দেয়।
এবং ভালরূপ বসিলে উহাদের উদরের
চর্ম মৃত্তিকা স্পর্শ করে।

হস্তীকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলে উহার
প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ কার্য করিতে
পারে। রক্ষাদি ভাঙ্গা, ঘারোদঘাটন
করা ও শুণ্ডদ্বারা মশাল ধরা প্রভৃতি কার্য
ইহার অনাগাসে করিতে পারে।

কুনকী এবং গুণ্ডা এতদ্বয়ের মধ্যে কু-
নকীগুলি পালিতেই অত্যন্ত সুবিধা। ই-
হার শীত্রেই বশ্যতা স্বীকার করে ও নানা
রূপ কার্য করিতে পারা হয়, এবং এক-
বার বাধ্য করিতে পারিলে আর আবাদ্য
হয় না, বরং ক্রমশঃ অধিকতর বশী-
ভূত হইতে থাকে। গুণ্ডাগুলি যদিও
মনুষ্যের কঠোর শাসনে বাধ্য না থাকিয়া
পারে না, তথাপি বৎসরের মধ্যে বিশে-
ষতঃ শীতকালে উহাদিগের শরীরের এত-
দূর তেজ রুদ্ধ হয় যে, তখন আর কোন-
রূপেই শাসনের অধীনে আসিতে চাহে না।
যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই মারিতে
উদ্যত হয়।

হস্তীর কপাটির উভয় পাশে দুইটি

ছিত্র আছে। গুণাগুলি যখন তথাবিধ উত্তেজিত হয়, তখন সেই ছিত্রদ্বয়দ্বারা অনবরত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে* ; কিন্তু উত্তেজিত না হইলে উহা হইতে কিছুই নির্গত হয় না। কেবল ছিত্রের চিহ্নমাত্র থাকে। কুনকী হস্তীরও কপাটিতে এইরূপ দুইটি ছিত্র আছে স্ফট, কিন্তু উহাদিগকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ ছিত্র দ্বারা কোনরূপ পদার্থেরও নির্গমন দৃষ্টিগোচর হয় না। গুণাগুলি যখন মনুষ্যালয়ে এইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে, তখন উহাদিগকে ‘কেতিল’ প্রভৃতি শীতল দ্রব্যাদি আহার করিতে দেওয়া আবশ্যিক; শরীর শীতল হইলেই মৃদুভাবে আবার মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

প্রাচীন শাস্ত্রকর্তারাও উত্তেজিত হস্তীতে আরোহণ করা নিবেদন লিখিয়াছেন, যথা—

‘নারোহেৎ কামুকোম্মত্তম্ গজং রাজা
কদাচন,

আক্ৰম্য কামুকং তন্ত পরদ্রেহ বিবিদতি।’
মথ্না জাতীয় অন্য একপ্রকার পুংহস্তীর কথা যে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, উহারাও উত্তেজিত হইলে ভয়ানক রূপধারণ করে। উহারা দস্ত না থাকা প্রযুক্ত যদিও গুণা

* আমাদের প্রাচীন কালের কবিরাও ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন,—

“তাক্তং মত্তকরীন্দ্র গণ্ডুগলং ভূয়-
শ্চলং কর্ণয়োঃ বিদ্বৈষান্নিকটেপি—”

অপেক্ষা অনেকাংশে হীনপ্রভ, তথাপি মনুষ্যাদি বিনাশ করিবার জন্য করপদম-
ঞ্চালনে বিশেষ পটু। আমরা দেখিয়াছি, একটি উত্তেজিত মথ্না হাতী পৃষ্ঠস্থিত মাজতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া পদাঘাতে উহার বাড় ভাঙ্গিয়া দিল।

অন্যান্য পশুর ন্যায় হস্তীর মুক বা-
হ্যিক দৃষ্টিগোচর হয় না, উহা পিছের স্পা-
য়ের উভয় পার্শ্বে মাংসের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট।

মনুষ্যেরা হস্তীর শরীরের গঠনকে ত্রি-
বিধরূপে বর্ণন করিয়াছেন। উহাদিগের
নাম—‘কুমারিয়া’ ‘মৃগা’ ‘দোনসলা’।
ইহার প্রথম নামটি বোধ হয় ‘কুস্তীর’
হইতে নেওয়া হইয়াছে। কুস্তীরের চর্ম যে-
মন বন্ধুর, ‘কুমারিয়া’ জাতীয় হস্তীরও
শরীর সেইরূপ দৃঢ় ও বন্ধুর। হস্ত পদাদির
গঠনও অতি বলিষ্ঠ ও স্থূল। সাধারণ দৃ-
ষ্টিতে দেখিলেই এই জাতীয় হস্তীকে অসা-
ধারণ বলশালী বলিয়া অনুমিত হইবে।

‘মৃগা’—আমরা অনুমান করি মৃগ
শরীরের গঠনাদি দেখিয়াই এই জাতীয়
হস্তীর ‘মৃগা’ নাম দেওয়া হইয়াছে।
‘মৃগা’ হস্তীর শরীরের চর্ম অপেক্ষাকৃত
পাতল; পাগুলি দীর্ঘ ও তত মাংসল নহে,
শরীরের বর্ণ দীর্ঘ রক্তিমাবিশিষ্ট, কিন্তু
উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে
পারা যায় না। এইগুলির সামর্থ্যও অনেক
কম এবং ইহারা তত অমসহিষ্ণুও নহে।

‘দোনসলা’—ইহাদের শরীরের গ-
ঠন পূর্বোক্ত দুইজাতীয় হস্তীগঠনের মি-

জাণে উৎপন্ন । ইহার 'মৃগা' জাতি হইতে অধিকতর বলশালী ও ভ্রমসহিষ্ণু । হস্তী পরিবার কালে 'কুমারিয়া' ও 'দোনম্লাই' অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম ও মনুষ্যালয়ে ইহারাই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে । ইদানীং মাল্ভতেরা হস্তীর কোন কোন লক্ষণকে নিত্যন্ত দূষিত বলিয়া মনে করে । এবং উহাদের মনের এই ধারণা যে এবং-বিধ লক্ষণাক্রান্ত হস্তী পোষণ করিলে পোষ্টার কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা আছে । এইগুলি কোন অংশেই যে পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হস্তী হইতে বলবিক্রমাদিতে হ্রাস, এমনত নহে । তবে কেন যে এই সংস্কার তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না । নিম্নে উক্ত লক্ষণগুলির নাম লিখিত হইল ।

১ মতরখাম, ২ বোলনখী, ৩ সেহাতালু, ৪ ঝাকদোম, ৫ বালখণ্ডী ।

১ । যে গুলির মেরুদণ্ডস্থি অস্বাভাবিক উচ্চ ও বক্র, সেইগুলিকে 'মতরখাম' কহে ।

২ । যে হস্তীর পায়ে ১৮টি নখ না থাকিয়া ১৬টি নখ থাকে, তাহাকে বোলনখী বলে ।

৩ । যে গুলির তালুতে কাল কাল দাগ কিংবা তালু একেবারে কাল সেই গুলিকে 'সেহাতালু' কহে ।

৪ । যে হস্তীর লাঙ্গুল চলিবার সময় মৃত্তিকা স্পর্শ করে, এবং বোধ হয় যেন এদিক ওদিক ভুলিয়া ঝাড়ু দিতেছে সেই গুলিকে 'ঝাকদোম' কহে ।

৫ । যে গুলির লাঙ্গুলের উত্তরপার্শ্বে লোম না থাকিয়া কেবলমাত্র একপার্শ্বেই লোম থাকে, সেইগুলিকে 'বালখণ্ডী' কহে ।

হস্তীর মূল্য অত্যন্ত অধিক । অত্যাৎকৃষ্ট একটি হস্তী পঁচিশ, তিশ হাজার টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে । আর পূর্বেকৃত লক্ষণাক্রান্ত হস্তী অতি সূত্রী হইলেও তাহাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম । হস্তীর দন্ত এবং অস্থিও বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, এবং উহা দ্বারা মনুষ্যের বহুবিধ কার্য্যোপযোগী বস্তু নির্মিত হইয়া থাকে । হস্তীদন্তে অত্যাৎকৃষ্ট সিংহাসন, পাচী, কোটা, হেণ্ডল, চিকণী, খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত হয় । পূর্ব্বকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাদি করা হইত, কিন্তু এখন ইহাদিগকে কেবল যুদ্ধসামগ্রী বহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে । কোন হিংস্র জন্তু হত্যা করিতে গাইতে হইলে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গাওয়াই কর্তব্য । হস্তী আরোহণ করিতে হইলে উহার পৃষ্ঠে গদি কিংবা চারজামা অথবা ছাওদা বাঁধিয়া লইতে হয় । ব্যাভ্রাদি শিকার করিবার সময় ছাওদাতেই কিছু কম বিপদের সম্ভাবনা । হস্তিজাতি অত্যন্ত ভীক, স্তরং কোন বন্য পশুর সম্মুখে পড়িলে ভয়ে এত জড়মড় হয় যে, কোন দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলেই নিত্যন্ত শ্লাঘা মনে করে । কিন্তু মাল্ভতের অল্পশ ভাড়নে তাহা করিতে পারে না, অবশেষে ফৌস ফৌস করিয়া শুণ-

দ্বারা ভূমিতে এমন জোরে আঘাত করিয়া থাকে যে সেখানকার মাটি একেবারে উঠিয়া যায়। কোন কোন হস্তী উপযুক্ত রূপ শিক্ষা পাইলে একেবারে নির্ভর হয়। যদি প্রথম প্রথম শিকারের সময় পলাইবার উপক্রম করিলে মাল্হ তেরা কোন রূপেই পলাইতে বাইতে না দিয়া দৃঢ়শাসনে শিকারের সম্মুখেই দাঁড় করাইয়া রাখে, তবে দুই চারি বার এইরূপ করিলেই পরে অন্য পশু দেখিয়া আর ভয় পায় না।

হস্তীর স্বর অত্যন্ত কর্কশ, কিন্তু সচরাচর উহার শব্দ করে না। কোন রূপ ভয় পাইলে অথবা তাহাদের দল হইতে বিচ্যুত হইলে, ভয়ানক এক প্রকার চীৎকার করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লয়। আবার অহ্লাদের সময়ও গুড় গুড় করিয়া এক অব্যক্ত শব্দ দ্বারা উদ্ভাদিগের আনন্দ প্রকাশ করে। আর মনুষ্যের নিজেদের কার্যসাধনের জন্য ডাকাইতে হইলে মাল্হ তেরা উদ্ভাদের কর্ণের মধ্যে একটু অল্প জোরে অঙ্গুল দ্বারা আঘাত করিলেই চীৎকার করিয়া উঠে। হস্তীর বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল; প্রতিপালককে (মাল্হ তকে) বিপদের সময় রক্ষা করিবার জন্য অনেক হস্তীকে অনেক প্রকার যত্ন করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা নিম্নে উহার একটি অত্যশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ববঙ্গে কোন এক সম্ভ্রান্ত ভূম্য-

ধিকারীর বাটিতে পবন নামক * একটি ব্রহ্মদাকারের হস্তিনী আছে, উহা এক সময়ে বন্য হস্তী ধরিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মাল্হ ত যেমনি শিকারের সময় ঐ হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া একটি বন্য হস্তীর পায়ে দড়ী বাঁধিতেছিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে আর একটি বন্য হস্তী আনিয়া উহাকে মারিবার উপক্রম করে, মাল্হ ত ইহা দেখিতে পাইয়া ছিলনা,—কিন্তু পালিতা হস্তিনী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মাল্হ তকে শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আপন পৃষ্ঠে আরোহন করাইয়া লইল। পালিতা হস্তিনীটি এইরূপ না করিলে মাল্হ তের আর বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিলনা।

হস্তী মনুষ্যালয়ে গর্ভবতী হইয়া সচরাচর সম্ভ্রান্ত প্রসব করে না। আমরা একটি মাত্র হস্তিনীর মনুষ্যালয়ে গর্ভবতী হইয়া সম্ভ্রান্ত প্রসবের বিষয় অবগত হইয়াছি। কিন্তু উদ্ভাদের ও বন্দী অবস্থায় সম্ভ্রান্ত হয় নাই। পালিতা হস্তিনীর স-

* এই স্থানে উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক যে বন্যহস্তী ধরিয়া মনুষ্যালয়ে আনিলে প্রত্যেকটির এক একটি নাম রাখা হয়। উদ্ভাদের নাম রাখিবার প্রকৃতি এইরূপ, কুনকীর নাম,—যথা মহেশ্বরী, দৌলতভরি, রতনহার, আনর মালা, মনমতী, নাচভরি, ইত্যাদি। শুণ্ডা হস্তীর নাম যথা—জজবাহাদুর, গোলকুমার, রূপসুন্দর, ইত্যাদি।

জ্ঞান হয় কিনা উহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি হস্তী ও একটি হস্তিনী দেশীয় সামান্য বনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং সেই অবস্থায় উহাদের গর্ভসঞ্চার হইলে, পরে মনুষ্যালয়ে আনিলে সন্তান প্রসব হয়। গর্ভবতী হস্তিনী বন হইতে ধরিয়া আনিলে উহাদের প্রসবক্রিয়া নির্বিশেষে মনুষ্যালয়ে সম্পাদিত হয়। প্রসবের সময় উহার দাড়াইয়া প্রসব করিয়া থাকে।

লোকালয়ে হস্তিনীর যে সন্তান হয়, তাহার কখনও বনা বুদ্ধি হয় না, শিশুকাল হইতেই নিঃশব্দ চিত্তে মনুষ্যের সঙ্গে খেলা করিয়া থাকে। শিশুকাল হইতে মনুষ্য দেখিতে দেখিতে কোন কোনটী এমনি বেআদব হয়, যে সময় সময় কাহারও কণা না শুনিয়া মনুষ্যের অনেক অনিষ্ট করে। রাস্তাদিয়া ঘাইবার সময় কদলী প্রভৃতি উহাদের কোন খাদ্য বস্তু পাাইলে অলক্ষিত ভাবে উহা চুরি করিয়া লইয়া আসিবে এবং মাতার বক্ষতলে আসিয়া অতি আঙ্খান্দে উহার একটী করিয়া থাকিবে; আবার মনে করুন, একটী

মনুষ্য যেন নিঃশব্দ চিত্তে ছাটিয়া ঘাইতেছে, এমন সময় হস্তিনাবকটী চুপে উহার পিছের দিকে ঘাইয়া মনুষ্য দ্বারা উহাকে এমন আঘাত করিবে, যে তৎক্ষণাৎ সে ভূতলশায়ী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহাতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হইয়া মাগের বক্ষতলে গিয়া লুকাইয়া রহিবে। করভেরা যে ক্রুদ্ধ কিংবা কুটিল হইয়া মনুষ্যের এইরূপ অনিষ্ট করে এমন নহে, উহার মনে করে মনুষ্যালয়েই উহাদের আলয় এবং শিশুরা যেরূপ স্বল্প আলয়ে আবদার করিয়া কখন কখন পরিবারস্থ সকলকেই বিরক্ত করিয়া তুলে, ইহারও সেইরূপ আপন গৃহ ভাবিয়া লোকের সঙ্গে খেলিতে ঘাইয়া অনিষ্ট করিয়া বসে। এইরূপ অনিষ্টকারীদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ছয় বৎসর পরেই ইহাদিগকে মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী কার্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ইহার অপেক্ষাকৃত সহজেই কার্যাদি শিখিতে পারে। (ক্রমশঃ)

প্রতি সমালোচনা ।

দুপ্রসিদ্ধ এডিসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, পাঠকদিগের হাতে কোন গ্রন্থ পড়িলেই লেখক কক্ষ কি শুভবর্ণ, শাস্ত কি উদ্ভট, অথচ কি বিবাহিত ইত্যাদি অনেক

বিষয় তাঁহার জানিতে ইচ্ছুক হন, এবং যে পর্যন্ত জানিতে না পান, সে পর্যন্ত ঐ গ্রন্থ পড়িতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। পাছে বা ভীয়ে আসিয়া ভয়ী হইয়া

যায়, এই ভয়ে গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। বা-
লালী অনুকরণপ্রিয়, আমি তাহার অনু-
করণ করিয়া পূর্বেই সাহিত্যসমাজে আ-
মার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ এডি-
গন তাঁহার প্রকৃত নামটি গোপন রাখি-
য়াছিলেন, অন্যবশ্যক বিবেচনায় আমি আ-
মার নামটি পর্য্যন্ত সাধারণে প্রচার করি-
য়াছি। যাহা হউক এই গুরুতর বিষয়টি
অন্যত্র বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইবে।
সম্প্রতি যে প্রবন্ধ লিখিতে প্ররত হইয়াছি,
তাঁহাতে কিছু আত্মপরিচয় দেওয়া কর্তব্য
হইতেছে। প্রবন্ধলেখক মহাশয়েরা মাপ
করিবেন, কিন্তু আপনাদের একটি গুরু-
তর অপরাধ, অথচ একটি সাধারণ রোগ
আছে। আপনারা পত্রিকা প্রভৃতিতে
যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও প্র-
বন্ধ লিখেন, তাহার অধিকাংশেরই নিম্নে
বিঃ ক্রিঃ, ছাঃ, ইঃ, মাঃ, টিঃ প্রভৃতি লি-
খিয়া আত্মনাম গোপন করিয়া রাখেন;
আমি যদি সাহিত্যডিপার্টমেন্টের পোলিষ
দারোগা হইতাম, তাহা হইলে আপনাদি-
গকে এই উদারতার উচিত শিক্ষা দিতে
পারিতাম; অর্থাৎ এই সমুদয় প্রবন্ধ নি-
জের নামে ছাপাইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে
পুস্তক বাহির করিতাম। যাহা হউক আ-
পনারা ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

আমি সাহিত্যসমাজে বিশেষ পরি-
চিত, অর্থাৎ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছি।
আমি প্রথম কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া স-

মালোচনার জন্য তদানীন্তন প্রায় প্রত্যেক
সম্পাদকের নিকট এক একখানা পাঠাই-
য়াছিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সমাদর ক-
রিল না। যাহা হউক তাঁহাতে আমার
বিশেষ আপত্তি নাই; বঙ্গভাষা আজিও পূ-
র্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং সমুদয় রস
আজিও ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পার
নাই এবং লোকের কচিও এক্ষণ পর্য্যন্ত
সম্যক্ পরিপক হইতে পারে নাই। দেশে-
রও দোষ বলি না; কারণ ইংলণ্ডেরও এক
সময় এইরূপ অবস্থা ছিল; কবিগুরু সেক্-
পিয়র যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন
তাঁহার মহীয়সী শক্তির কেহই অবধারণা
করিতে সক্ষম হইল না, এমন কি তাঁহাকে
কবি বলিয়াই কেহ গ্রাহ্য করিল না। আ-
মারও ভরসা ভবিষ্যৎ বংশীরের, অন্ততঃ
আমার উত্তরাধিকারীগণের হস্তে।

যাহা হউক, সম্পাদকদিগের এইরূপ
ঔদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত, বিরক্ত ও আত-
শিক জ্বল্জ্বল হইলাম, এবং তাঁহারা কোন
মতে নিরস্ত থাকিতে না পারেন, ইহা মনে
করিয়া পুনরায় গ্রন্থ লিখিতে বসিলাম।
এবার আমার উদ্দেশ্য সফল হইল, প্রায়
প্রত্যেক পত্রিকাতেই উহার সমালোচনা
বাহির হইল; সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি
একবাক্যে ইহার প্রশংসাধনি করিয়া-
ছিল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্ধ্যদর্শন,
ভারতী, বাঙ্গুর এবং ঐধরাণের কএক-
খানা মাসিক পত্রিকাতে উহার যেরূপ
নিরুত্থরূপে সমালোচনা হইয়াছিল, তা-

হার প্রতিসমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

বান্ধব সম্পাদক মহাশয়, উল্লিখিত পত্রিকাচতুর্দশের সর্বশেষে বান্ধব নাম উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না । ইহার কারণ আছে । প্রথমতঃ আপনার পত্রিকাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ছাপাইবার মনস্থ করিয়া উহাকেই সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না । দ্বিতীয়তঃ আপনি আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা করিয়াছেন, সূত্রাং আপনাকে সম্বন্ধিত করাও আমার ইচ্ছা নহে । তথাপি আপনার বান্ধব নামে আকৃষ্ট হইয়া এই সামান্য পত্রখানিকে প্রকাশ করিতে আপনাকে অনুরোধ করি ।

পূর্বে যে আত্মপরিচয়ের কথা বলিয়াছি, তৎসম্পর্কে এক সম্পাদক লিখিয়াছেন “ গ্রন্থকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেই ভাল হইত । ” নাম প্রকাশ করিবার ভয় লোকসমাজে তিরস্কৃত হওয়া । কিন্তু যখন লোকে অপদস্থ হইয়াও সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেছে, তখন নাম গোপন করিবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু খুলিয়া বলিতে গেলে আমার যশোলাভের আর এক সুপ্রশস্ত পথ আছে । আমি গ্রন্থ লিপিয়াছি বলিয়া জগতের শত্রু হই নাই, আমার অনেক মিত্র রহিয়াছে ; যাহারা আমার মিত্র, স্নেহবশতঃই ইউক, কি লজ্জায় পড়িয়াই ইউক, তাঁহারা আমাকে অবশ্য প্রশংসা করিবেন, আমি যদি শত্রু-

দিগের চকানিনাদ বজ্রগণের প্রশংসানিতে ডুবায়া দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল, তাহা হইলেই আমার নাম সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । আমাদের দেশে এ পদ্ধতি ত নতুন নহে, তবে আমার একার মিন্দা কেন ? আর এক কথা, মনে করুন দেশে যেন আমি এত করিয়াও সম্মান লাভ করিতে পারিলাম না । কিন্তু বিদেশীয়দিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ উদারপ্রকৃতি, এবং যাহারা স্বদেশে ভাষা-তত্ত্ববিৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছুক, সূত্রাং যাহারা বঙ্গভাষার কোন পুস্তক পাইলে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হন, অথচ বঙ্গভাষা বুঝেন না, এইরূপ ব্যক্তি আমার এই যথাশক্তিগ্রন্থতঃ গ্রন্থও মহাসমাদরে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই । যদি ছলে কৌশলে, ইহাদের নিকট কোন সম্মানিত উপাধিলাভ করিতে পারি, তবে জন্মকৃষ্য-ভাব এই বঙ্গবাসীকে কে ভয় করে ? আমার যখন এতগুলি আশা সম্মুখে বর্তমান, তখন আত্মপরিচয় দিতে ভয় করিব কেন ?

আর এক সম্পাদক লিখিয়াছেন ‘গ্রন্থখানি ইংরাজির অনুকরণ, এবং ইহার ভাষা অতি কদর্যা ।’ আমি এইরূপ সমালোচনা শুনিয়া অবাক হইয়াছি । বান্ধব সম্পাদক মহাশয় শেষোক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করিলে কতক খাটিত, কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই যে, উহা অপরের মুখে শুনিতে

হইল। যাহারা কর্তাকর্ম ঠিক করিয়া লিখিতে জানেন না, এবং বাঙ্গালাভাষার অঘরের সহিত ইংরাজির অঘর মিলাইয়া দিতে চান, তাহাদের ভাষাবিশয়ে কাহারও নিন্দা না করিয়া আপনাদিগের কলমের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকিলেই ভাল হয়। আর অনুকরণের কথা, যে দেশের লোকেরা ভাষা ছাড়িয়া কচি, কচি ছাড়িয়া প্রকৃতি, এবং প্রকৃতি ছাড়িয়া অঙ্গের গঠন পর্যন্ত বিলাতি ছাচে ঢালিয়া লইয়াছেন, সেদেশে একে আবার অন্যকে অনুকরণপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করে কেন? বঙ্গভাষার অক্ষরের সহিত সংস্কৃত অক্ষরের যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার ভাবের সহিত ইংরাজি ভাবের সেই সম্পর্ক। কিন্তু উল্লিখিত দোষারোপটি আপাতবিস্মাক্ত হইলেও পরিণামমধুর। ইংরাজির অনুকরণ করিয়াছি, এ কথাতে অবমাননা না বুঝাইয়া প্রশংসা বুঝায়, অর্থাৎ যাহারা কালিকার বঙ্গভাষার দুই তিন খানা বহি পড়িয়াই পুস্তক ও সংবাদপত্র ছাপাইতে বসেন, তাহাদের হইতে অন্ততঃ উচ্চতর আসন লাভ করা হইল।

কিন্তু আমি এক সমালোচকের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে জন্ম হইয়াছি। অর্থাৎ আমার স্বকপোল কল্পিত একটি মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিচে এক ইংরাজি গ্রন্থকারের নামে একটি টীকা লিখিয়া দিয়াছিলাম, মনে ভরসা ছিল যে, ইনি সাহিত্যসমাজে বড়

পরিচিত নহেন, এবং বিশ্বাস ছিল তারতবর্ষে বোধ হয় ইহার অন্যতর পুস্তক আর নাই, সুতরাং অল্প লোকেই উহা পড়িয়াছে, অতএব তাহার নামে কিছু একটা লিখিয়া দিলে লোকে না পড়িয়াই প্রত্যয় করিবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উল্লিখিত সমালোচক ঐ পুস্তক খানি সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমার চাতুরি ভাদ্রিয়া দিয়াছেন। আমি এবিষয়ে ইংরাজি পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া বঙ্গীয় নব্যলেখকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলাম।

এক সম্পাদক বলেন গ্রন্থকার অস্বাভাবিক। মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার বয়স এই বিংশতি বৎসর, আমি ইহার দুই বৎসর পূর্বে গ্রন্থ লিখিতে প্ররত্ত হই। জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গ কয়জন লেখক খুজিয়া পাওয়া যায় যাহারা ষোড়শবৎসর বয়সে বঙ্গীয় সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে নাই?

আর এক আপত্তি এই যে, বঙ্গ আজ কালি অনেকেই কেবল নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া বেড়ান। বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর বিষয়ে কেহই সাহস করিয়া হস্তক্ষেপ করেন না। ইহা হইতে অধিকতর প্রলোপোক্তি আর শুনি নাই। সাহসের কথা বুঝি না; কিন্তু বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক ভণ্ড পরিশ্রম। বোধ হয় যাহারা এবিষয়ে মনোযোগ করেন না, তাহারা ইহাকে বিফলপ্রয়াস এবং সময়ের অপব্যয় বলি-

রাই চেষ্টায় বিরত রহেন। উদ্ভানের একটি পুষ্প দেখিয়া উহাতে কয়টি পাপড় আছে, গণিয়া সকলেই বলিতে পারেন, কিন্তু কয়জন লোক যুবতী কামিনীর অবেশময়ী মোহন মুরতির সহিত জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনীর কুন্তুমুমদামের তুলনাকল্পনায় আনিতে পারিয়াছেন। আর পৃথিবীতে কাহার সমধিক আদর; কবির না বৈজ্ঞানিকের; কয়জনে কালিদাস ও সেক্ষপিয়র অধ্যয়ন করে, আর কত জনেই বা শঙ্করাচার্যের অধ্যাত্তত্ত্ব ও নিউটনের আবিস্কৃতি লইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্জিত করিতে কবি যত পটু, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অপহরণ করিতে বৈজ্ঞানিক তত নিপুণ। কবি যাহা গড়ে, বৈজ্ঞানিক তাহা ভাঙ্গে, কবি যাহার প্রশংসা করে বৈজ্ঞানিক তাহার নিন্দা করে, এবং কবি যাহা ভালবাসে, বৈজ্ঞানিক তাহা ঘৃণা করে। কবি স্তুতিবাদক বৈজ্ঞানিক নিন্দুক; কবি বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক মুক; কবি সহৃদয়, বৈজ্ঞানিক পামর।

আর আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন কি? বিজ্ঞানের যেটুকু আবশ্যিকতা, ইংরাজদ্বারা তাহা সম্পাদিত হ-

ইতেছে। সে সকল জ্ঞানের কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, 'স্বাস্থ্য-রক্ষণপ্রিয় ভ্রতলোকের তাহাতে যোগদান করা কোনরূপই সম্ভব নহে। এক-ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিবে সহস্রলোকে তাহার ফলভোগ করিবে, এক ব্যক্তি বস্ত্র-বয়ন করিবে, শতলোকে সেই বস্ত্র পরিধান করিবে, ইহাই সমাজের নিয়ম; সেই-রূপ, কতিপয় জাতি বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া জগতে তাহার উপকার বিকীর্ণ করুক, অবশিষ্ট জাতি সমূহ কাবানিকুলে প্রবেশ করিয়া মধুসংগ্রহ পূর্বক তাহাদিগের ক্লান্ত দেহের আশ্রি বিদূরিত করিতে থাকুক। ফলতঃ, বাহারা কাব্য ও কবিতা লিখাকে সময়ের অপব্যয় মনে করিয়া বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন, আমাদের বিবেচনার তাঁহারা দেশের সর্ব্বথা শুভ-বিদেষী, প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাপবাদী।

উপসংহারে বক্তব্য এই সম্পাদকগণ মনে রাখিবেন যে গ্রন্থ সমালোচনা করা যত সহজ, গ্রন্থ রচনা করা তত সহজ নহে, এবং মুখের বায়ু দ্বারা নিমেষে যাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়, হস্তের লেখনীদ্বারা তাহা শীঘ্র গঠিত করা যায় না।

শ্রীবজ্রচন্দ্র—

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ।

যাঁহারা ইতিহাসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ডাল বাসেন, মুসলমানদিগের ইতিহাস তাঁহাদের অতিশয় আদরের বস্তু। পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি মুসলমানদিগের ন্যায় এত অল্প সময়ে অধিকার, ধর্ম ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। মহম্মদের জন্ম হইতে আজি পর্য্যন্ত ১৩০৮ বৎসরের অধিক হয় নাই, কিন্তু এই কাল মধ্যে মুসলমানদিগের উন্নতি, অবনতি এবং পরিবর্তন কত একবার ভাবিয়া দেখ। বা-লুকামর প্রদেশের নদী অপেক্ষা অধিক পরিবর্তনশীল মুসলমান জাতির ইতিহাস এক্ষণে সভাসমাজের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ৬২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের তিরোভাব হইতে ৭১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মাত্র ৮৮ বৎসর সময়; একজন দীর্ঘজীবী মনুষ্যকেও এই সময় অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যেই মহম্মদের বংশধরগণ ইত্রো হইতে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন; পরাক্রান্ত খসকদিগের সুদৃঢ় সিংহাসন মুসলমানের পদাঘাতে রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল; আ-মির্রা ও আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল; ভূমধ্যসাগর মুসলমান-

দিগের সুসজ্জিত অর্ণবযানে শ্রুশোভিত হইয়াছিল; ফলতঃ ইশমেলেগনের বলবীর্য্যে সমস্ত মেদিনী প্রকম্পিত ছিল। যে সময় এইরূপ অতাবনীয়া পরাক্রম প্রদর্শিত হয়, তখন বিজ্ঞানের নিতান্ত শৈশব সময়। আরবীরগণ শারীরিক বল এবং মানসিক অদাবসায় ব্যতীত কোন বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে অথবা তদ্বারা পরিশ্রমের লাভ সম্পাদন করিতে পারে এরূপ তাহাদের কিছুই ছিল না। তখন কামানাদি আয়ুধের আবিষ্কার হয় নাই, ভগ্নতরবারী প্রভৃতিই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। তখন তাহারা একমাত্র ধর্মের নামে পতাকা উড্ডীন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিত। ধর্ম রক্ষায় যুদ্ধ, ধর্ম-বিস্তারে 'কাফের' বিনাশ ও ধর্মসাহায্যে পরকালে ঈশ্বরসমীপে সমাদর এবং কঙ্কলনয়ন। অপরীকরণের সহবাসলাভ মুশলমানগণের মোহমন্ত্র ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা প্রাণের জন্ত ম-মতা করিত না; তাহারা ধর্মের জন্ত উ-ম্মত ছিল, এবং ধর্মার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম-বেগে ধাবিত হইত। এই ধর্মপ্রাণ ভী-ষণজাতি কিরূপে অভ্যুদিত হইয়া আপ-নাদের শক্তি, সাহস ও প্রতাপবলে সমস্ত

পৃথিবীতে কিরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সম্প্রতি কএকটি প্রবন্ধে মহম্মদের পরবর্তী প্রধান পদস্থ কএক জনের জীবনরত্ন সম্বলন পূর্বক আমরা এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রথম অধ্যায়।

মহম্মদের তিরোভাব হইলে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রবর্তক এবং প্রজাগণের রাজা উভয়েরই অভাব হইল। মুশলমান-রাজ্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল, সুতরাং অচিরে বিনাশ প্রাপ্তির উপক্রম হইয়া উঠিল। আরবরাজ্যে শান্তি রহিল না। মহম্মদের প্রিয়নিকেতন মদিনা নগরীতে ভয়ঙ্কর গোলযোগ হইবার উপক্রম হইলে এসামাই-বিন্‌য়েইদ মহম্মদের গৃহসমক্ষে জাতীয় পতাকা স্থাপন করিলেন, এবং স্থানে স্থানে সৈন্যসংস্থাপনপূর্বক প্রজাগণের বিদ্রোহ ও কোলাহল নিরারণে রুতকার্য্য হইলেন। কে রাজা হইবে এই প্রথম প্রশ্ন। মহম্মদের স্বর্গগমনে চারি ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। আবুবেকার, ওমার, ওথমান্ এবং আলী এই চারিজনের স্বত্ব সর্বপ্রাধান্য বোধ হইল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আরেশার পিতা আবুবেকার, সুতরাং সেই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক সহায় হইল। হাক্সা নাম্নী মহম্মদের অন্য এক স্ত্রীর পিতা ওমারের হস্তে মহম্মদ পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ

বিস্বাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং অনেকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। ওথমান্ মহম্মদের দুইটি তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উভয় এবং তাঁহাদের সম্ভানগণ পরলোক গমন করাতে ওথমানের স্বত্ব অনেক লঘু হইলেও কেহ, কেহ তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুলতাত-পুত্র আলী মহম্মদের একমাত্র তনয়া কতেমাকে বিবাহ করেন; সম্পর্ক বিবেচনা করিলে আলীর স্বত্ব সর্বপ্রাধান্য হয় সংশয় নাই; সুতরাং দলসংখ্যক লোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে চারিজন সৈন্যপ্রধান চারি বিভিন্ন স্বত্ব মুসলমানদিগের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যশাসন করিতে লোলুপ হইলেন। একেত সম্পর্কে সর্বপ্রাধান্য নিকট, তাহাতে আবার ধর্মবুদ্ধি, ন্যায়পরতা এবং মনঃপ্রাণে মহম্মদের সাহায্য করা প্রভৃতি পর্যালোচনা করিলে আলীকেই মনোনীত করা কর্তব্য হয়। যখন মুশলমানধর্ম ধর্মপ্রচারকের উন্নতির প্রতীকসময়ে নিতান্ত অবজিত এবং অনাদৃত হইতেছিল, যখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের উপদ্রবে মহম্মদ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন আলী তাঁহার সহায় হন। মহম্মদ সমুদয় হইয়া তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি এবং ভ্রাতা বলিয়া ঘোষণা করেন। আলী কথায় এবং কার্য্যে যে পর্য্যন্ত মহম্মদ প্রদর্শন করিতেন, তরবারি হস্তে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার উপযুক্ত পরাক্রমই দেখাই-

তেন। তিনি অতিশয় ক্ষিপ্রভাষী, সদা-লাপী এবং সর্বসাধারণের উপকারী ছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী মহম্মদ-তনয়া ফতেমার সজ্জননয়ন নিরীক্ষণে অনেকের হৃদয় আলীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। মৃতরাং কিরূপে নির্বিবাদে আলী সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, তাহা অবধারণার্থ ফতেমার গৃহে আলীর হিতৈষী এবং বন্ধুবর্গ সমবেত হইলেন।

অন্যান্য পক্ষও নীরবে বসিয়াছিলেন না। আবুবেকার আয়েশার পিতা ছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণমধ্যে তিনি সর্বপ্রধান ও অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার ভক্তি ও বন্ধুতাতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, মৃত্যুকালীন তাঁহার ধর্মাবলম্বীদিগের জন্য ঐশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া যান। এক্ষণে আয়েশা আপন পিতার সাহায্যার্থ সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই অনুরোধের আরও অর্থ ছিল। যাহাতে আলী মহম্মদের উত্তরাধিকারী নাহন আয়েশার এই প্রধান কামনা ছিল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদনের আলীই প্রধান কারণ ছিলেন। রূপবতী আয়েশা মহম্মদের পবিত্র প্রণয়ের অবমাননা করিয়া অন্যের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ অপবাদ আলীই প্রথমতঃ মহম্মদের কর্ণগোচর করেন। তদবধি আলীর প্রতি আয়েশার নিদাক্ষণ বিদ্বেষ জন্মে। এক্ষণে সেই বিদ্বেষ-পরতা প্রযুক্ত

যাহাতে আলী সিংহাসন নাপান তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জনসাধারণ মধ্যে অনেকে ওমারের পক্ষপাতী ছিল তাঁহার গৌরবপূর্ণ মুখত্রী, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, অসাধারণ রণকৌশল, বালকের ন্যায় সারল্য এবং অপরিমিত সাহসাদি দৃষ্টে সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার কন্যা হাফসা ও তাঁহার হিত সাধনে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।

একদিকে ফতেমার গৃহে আলী ও তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া মজ্জনা-নিরত ছিলেন; অন্যদিকে প্রধানপদস্থ মুসলমানগণ আবুবেকার এবং ওমারের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহার প্রথমতঃ উত্তরাধিকারের নিয়মমত সিংহাসনে অধিকৃত না হইয়া জনসাধারণ কর্তৃক শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইবেন এইরূপ বিধান করিলেন। এতদ্বারা আলীর স্বত্ব একদা ধ্বংশ করা হইল। এক বংশ অন্য বংশ হইতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবে, এই ভয়ে অনেকে আলীর বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে আবার ধূর্ত-প্রকৃতি আয়েশার মজ্জনা ও চাতুর্য্য আলীর বিপক্ষে যুগপৎ কার্য্য করিতে লাগিল।

অনন্তর যাহারা মক্কা হইতে মহম্মদের সপক্ষ হইয়া পলায়ন করে এবং যাহারা মদীনায় তাঁহার সাহায্য করে এই দুই দলের মধ্যে কোন দল শাসন কর্ত্তা মনোনীত করিবে এবিষয়ে বিবমবিতর্ক উপস্থিত

হইল । প্রথমোক্তগণ বলিতে লাগিল মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান, মক্কাতে প্রথমতঃ তাঁহার মত প্রচার হয় ; বিশেষতঃ তাহার মহম্মদের স্বর্গণ, প্রতিবেশী এবং তাহার মহম্মদের নির্বাসন সময়ে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লেশ সূচ্য করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তাঁহাদেরই অধিকার । শেষোক্তগণ বলিতে লাগিল, মদীনা মহম্মদের আশ্রয়স্থান এবং মনোনীত বাসস্থান ; তাহার তাঁহার পলায়ন সময়ে সাহায্যদান করিয়াছে, প্রতিপক্ষগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া সেই সকল অত্যাচারী শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে সনাতন ধর্ম বিস্তার হইয়াছে । সুতরাং রাজানির্বাচনে তাহাদেরই অধিকার ।

এই বিবাদ ভীষণাকার ধারণ করিল । উভয়পক্ষ অসি নিক্ষেপ করিয়া স্বপক্ষের প্রতি পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল । মদীনাবাসীগণ বলিল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন শাসনকর্তা মনোনীত করা হইবে । ওমার এই প্রস্তাব হাস্য করিয়া উড়াইলেন, এবং বলিলেন “এক কোষে দুইখানা অসির স্থান হয় না ।” আবুবেকারও রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করার বিজ্ঞপ্তি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন “রাজ্যের এখন নিতান্ত শৈশব কাল, দুইভাগে বিভক্ত হইলে নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে ।” তিনি বলিলেন একজন শাসনকর্তা মনোনীত করা কর্তব্য,

ওমার এবং আবু অবিদা এই দুই জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করা হউক । প্রথমতঃ যে কয়জন মহম্মদের শিষ্য হয় আবু অবিদা তাহার মধ্যে একজন ছিলেন । মক্কা হইতে পলায়ন সময়ে তিনি মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন, এবং চিরদিন নিতান্ত অনুগত, ও বিশ্বস্তভাবে কার্য নির্বাহ করেন ।

জানবুদ্দ এবং বয়োবুদ্দ আবুবেকারের উপদেশে কিয়ৎকাল শাস্তিরক্ষা হইল । কিন্তু আরবজাতি স্থির থাকিতে পারে না, আরব সাগরের ন্যায় সর্বদা টলমল করে, পুনরায় দুইদল ক্ষেপিয়া উঠিল । তখন ওমার সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন ‘আবুবেকার সর্বাপেক্ষা বয়োবুদ্দ এবং জ্ঞানী ; মহম্মদের অনুচরগণ মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অনুগত ছিলেন, সুতরাং সর্বপ্রায়ে তাঁহাকেই মনোনীত করা কর্তব্য ।’ এই বলিয়া আবুবেকারের আনুগত্য স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ হস্ত চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্য বলিয়া আজ্ঞা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ।

ওমার আপন স্বার্থ প্রতিপক্ষের অনুকূলে উৎসর্গ করিলেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল, এবং প্রকৃত পক্ষে আবুবেকার সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা তাহার সম্প্রদে-
শিতে পাইল । আবুবেকার কিরূপ সর্বদা মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহার উপদেশে কিরূপে মুসলমানদিগের

শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়; তাঁহার স্বার্থোৎসর্গ, জ্ঞান, শুক্রকেশ সকল বিষয় একবার মনে হইল। সুতরাং তিনি যে শাসনভার গ্রহণে সন্মত হইলেন তাহা উপযুক্ত তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সকলে ওমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। আবুবেকার শাসনকর্তা হইলেন। তখন ওমার দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ‘অতঃপর যে ব্যক্তি সাধারণের সম্মতি ব্যতিরিক্ত রাজ্য হইতে লোলুপ হইবে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে, এবং যাহারা তাহাকে মনোনীত অথবা তাহাকে সাহায্য করিবে তাহাদিগের ও প্রাণদণ্ড হইবে।’ একথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিল; সুতরাং অন্যান্য রাজপদাধীশ্বরের পক্ষে কোন গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না।

‘উল্লিখিত কার্যপ্রণালী দৃষ্টে ওমারকে নিতান্ত নিঃস্বার্থ ও সদাশয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইবে’ এইরূপ কোন কোন মুসলমান-গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। উহাদের মত এই যে, আবুবেকার অত্যন্ত রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাঁহার বয়স মহম্মদের সমান ছিল। আবুবেকার অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যে তিনি স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন ওমারের এই আশা ছিল। তাঁহার শেষোক্ত কার্যে আলীর আশা

সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আলী ফতেমার গৃহে বন্ধুগণ সহ অবস্থান করিতে ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনাবলী ঘণাক্ষরে জানিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার আশা চিরদিনের জন্য উচ্ছিন্ন হইল। ইতিহাস-পাঠে যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাতে ঐ সকল গোষ্ঠ্যকারগণের লিখিত গ্রন্থে ও ওমারের চরিত্রে স্বার্থপরতার চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় না। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ সরল-প্রকৃতি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি মুসলমানধর্ম রক্ষা এবং বিস্তারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে ভ্রমেও কোনরূপ কৌটিল্যতা বা কপটতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার প্রকৃতি আরবীয় অনেকের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং তাঁহার উদার চরিত্রে দোষারোপ করা সহৃদয় লেখকের কর্তব্য হয় না।

আলী এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবুবেকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া কোন প্রকার গোলযোগ ঘটাইবেন, এই ভয়ে আবুবেকার অতিশয় ভীত ছিলেন। তিনি একদল সৈন্যসহ আলীর বাসস্থানে পৌঁছিয়া সমস্ত নিরাক্রম করিতে ওমারকে অনুরোধ করিলেন। ওমার তাঁহার দলবল সহ ফতেমার বাটী অবরোধ করিয়া আবুবেকারের অভ্যেষকরত্নান্ত আলীকে জ্ঞাপন করেন, আলী আপনার স্বয়ং প্রদর্শন পূর্ব্বক আপত্তি করিলে ওমার তাঁহাকে বলেন যে আপত্তি পরিত্যাগ নাকরিলে তাঁ-

হার প্রাণদণ্ড হইবে, তাঁহার অশুচর বর্ণের ও সেই দশা ঘটিবে, এবং জনসাধারণের ক্রোধবল্লিতে তাঁহাদের গৃহ ভস্মসাৎ হইবে। তখন ফতেমা নিতান্ত আত্মশরে মিশ্র ভৎসনার সহিত বলিলেন ‘আপনি কি এইরূপ কার্য্য করিবেন ? আমার বিশ্বাস হয় না।’ তখন ওমার বলিলেন যদি আপনারা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত না হন এবং তাঁহাদের মতের প্রতিপক্ষতা করেন, তবে আমি সত্য সত্যই এরূপ করিব সন্দেহ নাই।’ আলীর বন্ধুগণ অগত্যা নত হইল এবং আবুবেকরকে রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিল। আলী নিতান্ত মর্ষাহত হইয়া বিরলে ফতেমার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ফতেমার মৃত্যু হইল। অনন্তর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আবুবেকরের প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি আবুবেকরকে এই বধিয়া মিষ্টভৎসনা করিতেন যে তাঁহাকে না জানাইয়া নিতান্ত কপট এবং অসুরলভাবে রাজপদ গ্রহণ করা কদাচ কৰ্ত্তব্য ছিল না। এই ভৎসনা অমূলক নহে। আলীর সম্মতি লইয়া কার্য্য করিলে তিনি এত দুঃখিত হইতেন না। তাঁহার যেরূপ মহৎ অন্তঃকরণ ছিল তিনি স্বচ্ছন্দে সম্মতি দিতেন। আবুবেকর বলিলেন, তিনি কেবল জনসাধারণের গোলযোগ নিবারণার্থ সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন,

তাঁহার চক্রান্ত কিছুই নাই, কোন উপযুক্ত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জনসাধারণের বাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।

আলি এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, এইরূপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ ব্যাখ্যা হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং আপন পুত্র মহম্মদের দৌহিত্র-দ্বয় হাসেন ও হোসেনকে সঙ্গে লইয়া আরবদেশের মধ্যস্থলবর্তী কোন নিভৃত প্রদেশে গমন করিলেন। হাসেন এবং হোসেন হইতে অনেক বংশ উদ্ভব হইয়াছে তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত বর্তমান আছেন। বংশমর্যাদার চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা সবুজ বর্ণের শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া থাকেন।

আবুবেকর শাসনভার গ্রহণ করিলে সকলে তাঁহাকে রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল, তাহাতে তিনি অসম্মত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া আহ্বান করিত, কিন্তু তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিতেন তিনি ঈশ্বরের প্রতীক নহেন, মহম্মদের প্রতীক মাত্র। “আমি মহম্মদের উপদেশানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিব, তাহাতে সকল কুসংস্কার এবং পক্ষপাত হইতে বিরত থাকিব। যতদিন আমি ঈশ্বর ও তাঁহার মহম্মদের আজ্ঞা পালন করিব, ততদিন তোমরা আমাকে মান্য করিও, যখন তাহা না করি কেহ আমার

কথাটিও শুনিও না ! যদি আমি ত্রমে প-
তিত হই আমাকে সংশোধন করিও, তা-
হাতে সন্তুষ্ট হই অসন্তুষ্ট হইব না ।”

তিনি খলিফা উপাধি (উত্তরাধিকারী)
গ্রহণ করিলেন । তাঁহার পরবর্ত্তীগণ এই
উপাধির সহিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং
পৃথিবীতে তাঁহার ছায়াস্বরূপ ইত্যাদি গ-
র্বদ্যোতক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
মহম্মদ যেমন বিষয় এবং ধর্ম উভয়ের
রাজা ছিলেন, খলিফাগণও সেইরূপ রহি-
লেন ।

আবুবেকারের অনেক নাম ছিল ।
কেহ সত্যধর্মপ্রচারক, কেহ অন্যান্য অভি-
ধানও প্রদান করিত । আবুবেকার শব্দের
অর্থ কুমারীর জনক । মহম্মদের স্ত্রীগণমধ্যে
মাত্র আরেশাকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ
করেন, অন্যান্য সকল বিধবাবিবাহমাত্র ।
অন্যান্য হইতে প্রভেদ করার জন্য সকলে
আরেশার পিতাকে আবুবেকার বলিত,
এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন ।

আবুবেকারের বয়স সিংহাসন গ্রহণ-
সময়ে দ্বিষাট বৎসর ছিল । তিনি দীর্ঘ-
কায় এবং ক্ষীণাজ ছিলেন । তাঁহার মু-
খশ্রী উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল ছিল । পূর্বদেশীয়
অনেক মুসলমান যেমন শ্রুতরঞ্জিত করে,
তিনিও সেইরূপ করিতেন । তিনি অতি-
শয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন । প্রত্যেক
কার্য্য সম্পাদন সময়ে এতদূর সতর্ক হই-
তেন যে, মহলা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে
কেহ তাঁহাকে ধূর্ত মনে করিতে পারিত

না । কিন্তু তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ নিঃ-
স্বার্থ সাধুপ্রকৃতি শাসনকর্ত্তা মুসলমানদি-
গের মধ্যে অতি বিরল ছিল । নীচপ্রকৃতি
সংসারীর ন্যায় তাঁহার একটি কার্য্যও ছিল
না । তিনি ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক, বিলাস-
বাসনা প্রভৃতি কিছুই জন্য ব্যস্ত ছিলেন
না, কার্য্য করিয়া কোন অর্থও সাধারণের
ধনাগার হইতে গ্রহণ করিতেন না । তাঁ-
হার একটি ক্রীতদাস এবং একটি উষ্ট্রমাত্র
ছিল । তাহাতে যে কিঞ্চিৎ বায় লাগিত
এবং নিজের যৎসামান্যরূপ ভরণপোষণে
যাহা আবশ্যক হইত, মাত্র তাহাই রাজ-
কোষ হইতে গ্রহণ করিতেন । রাজকোষে
যে অর্থ সঞ্চিত হইত তাহা পণ্ডিত, গুণ-
বানব্যক্তি এবং দরিদ্রদিগকে প্রতি শুক্র-
বার বিতরণ করিতেন । তন্মিত্র স্বকীয়
পরিশ্রমে যে কিছু আয় হইত তাহা সর্বদা
দুঃখীগণকে দিতেন । যাহাতে দরিদ্রদি-
গকে যথানিয়মে দান করা হয়, অনর্থক
তাঁহার শাসন সময়ে কোন অর্থ ধনাগারে
বসিয়া না থাকে, তাহা অগহিত হইয়া
দেখিবার জন্য আপন দুহিতা আরেশাকে
উপদেশ করিলেন ।

উল্লিখিত গুণগ্রাম সত্ত্বেও আরবীয়দি-
গকে শাসনাধীন রাখা আবুবেকারের
পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল । যাহাদিগকে
তরবারির সাহায্যে মুসলমান করা হইয়া-
ছিল, জয়ীসেনাপতির শাসিত থকা এবং
ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের ধর্মোপদেশ ব্যতীত
তাহারা স্থির থাকিবে কেন ? মহম্মদের

তিরোভাবের পর তাঁহার স্থলবর্তীকে কে-
হই ধর্মরাজ বলিয়া মানিল না, চারিদিকে
বিরোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । অব-
শেষে মক্কা, মদিনা এবং তায়েফ্ ব্যতীত
অন্য সকল স্থান স্বাধীন হইল ।

মালেকইবিন্ নাওইরা নামক একব্যক্তি
আপন দলবলসহ মদীনা নগরীর নিকটে
ধাবমান হইলেন । তিনি যেমন উৎকৃষ্ট
অশ্বারোহী, সঙ্গশক্ত এবং বীরপুরুষ
ছিলেন, তেমনই শুরকি এবং শুরকি ব-
লিয়া আরববাসীগণ তাঁহাকে অতিশয়
ভাল বাসিত । তাঁহার স্ত্রী সমস্ত আরব-
ললনা অপেক্ষা রূপবতী ছিলেন ।

আবুবেকার এই বিষয় অবগত হইয়া
দুর্শ্লল, রুদ্ধ এবং রমণীগণকে দুঃখক্রম
পার্বত্য প্রদেশে প্রেরণ করিলেন, এবং ন-
গরী দুর্গপরিবেষ্টিত করিতে লাগিলেন ।
মহম্মদ বর্তমান ছিলেন না সত্য, কিন্তু মু-
সলমানতরবারি তাঁহার সহিত অন্তর্মিত
হইয়াছিল না । ওয়ালেদ নামক বীরপু-
রুষ পূর্বপরাক্রমের পুনরভিনয় করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তিনসার্কি চারিসহস্র
সৈন্যসহ বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে
লাগিলেন । রাজাও নিশ্চেষ্ট রহিলেন
না । তিনি কৌশলপূর্বক বিপক্ষকে হস্ত-
গত করিয়া জয়লাভ করিবেন সঙ্কল্প ক-
রিলেন । খালেদইবিন্ ওয়ালেদকে বলি-
য়াছিলেন, মালেককে কোন প্রকারে হ-
স্তগত করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যেন
যথাসম্ভব সদ্যবহার করা হয় ; কিন্তু খা-

লেদ সে প্রকৃতির ছিলেন না । তিনি বি-
পক্ষকে পরাজয় করিয়া তাহাদেয় দেশ
লুণ্ঠনার্থ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন ।
মালেক এবং তাঁহার সুলক্ষণী পত্নী অন্যান্য
অনেকের সঙ্গে বন্দী হইলেন ।

খালেদ ইবিন্ ওয়ালেদ মালেক পত্নীর
সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন, কোন
প্রকার মালেককে বিনাশ করা তাঁহার স-
ঙ্কল্প হইল । মালেক অতিশয় তেজস্বী ছি-
লেন, কথাবার্তায় রাজার ক্ষমতা স্বীকার
করিলেন না, খালেদের আদেশে তাঁহার
প্রাণদণ্ড হইল ।

আবুবেকার এই কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত
হইলেন । তিনি বলিলেন, ওয়াকন নামক
ইথিওপীয়া বাসী এক ব্যক্তি মহম্মদের
পিতৃত্বকে ইত্যা করে কিন্তু মহম্মদ তা-
হাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে ক্ষমা
করিয়াছিলেন । কোরাণের উপদেশানু-
সারে এক্ষণে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ব্য-
ভিচার জন্য অথবা একজন মুসলমানের
জীবন হনন জন্য অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা
কর্তব্য । কিন্তু এব্যক্তি ভ্রমাক্রান্ত প্রযুক্ত
এই পাপ কার্য্য করিয়াছে । অতএব ঈ-
শ্বরের কার্য্যে যে তরবারি নিক্ষেপিত
হইয়াছে তাহা বন্ধ করা কর্তব্য হয় না ।

মহম্মদ যখন পৌড়িত ছিলেন তখন
মোসিলমা নামক এক ব্যক্তি আপনাকে
ধর্মপ্রচারক বলিয়া ঘোষণা করে । অনেক
শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লোহিত সাগর হ-
ইতে পারস্য সাগর পর্য্যন্ত সকল ভূভাগ

অধিকার করিয়া লয়। এক্ষণে এই ব্যক্তির দমনার্থ তরবারির প্রয়োজন হইল।

কথিত আছে যে মোসিলমার শিষ্য-গণ মধ্যে আবুকাদলার রূপবতী ও গুণবতী পত্নী সেজ্জা প্রধানা ছিলেন। তিনি কবিত্ব সম্পন্না এবং তামিমজাতীর লোক মধ্যে অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। হিক্রদিগের রাজ্য মালমনের তাঁহার জ্ঞান গৌরবে বিমুগ্ধা হইয়া শিবির রাজী তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন গমন করিয়াছিলেন, সেজ্জাও মোসিলমাকে সেইরূপ দেখিতে গেলেন। ধর্ম্মের পবিত্র আকর্ষণে না হইলেও রূপজ্ঞানস্নেহে উভয়ের নয়ন ও মন উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরস্পর পরস্পরের সহবাস ভাল বোধ করিল; অধিকাংশ সময় একত্র অতিবাহিত হয়। সেজ্জা তাঁহার নবীন প্রণয়ীর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা লাভ করেন, মোসিলমা ও প্রণয়িনী হইতে কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্মের পবিত্র আবরণে আবৃত থাকিয়া প্রণয়ি যুগল যখন কবিতা ও ভবিষ্যদ্বাণীর সুখময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন খালেদ ও তাঁহার অগণ্য সৈন্য সেই সুখের অবিরাম স্রোতে প্রতিরোধ জন্মাইল। মোসিলমা ততোধিক সৈন্যসহ প্রত্যাগমন করিলেন। যামামার রাজধানীর সমীপে আক্রেদায় একটি ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রথমতঃ বিজ্রোহীর পক্ষেই বিজয়-চিহ্ন লক্ষিত হইল, বার শত মুসলমান ভূতলে শয়ন করিল। কিন্তু খালেদ তাঁহার সৈন্যগণকে পুনরায়

শ্রেণীবদ্ধ করিলেন, বিপক্ষগণ সম্পূর্ণ পরাভূত হইল, তাহাদের দশ সহস্র সৈন্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মোসিলমা প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। কথিত আছে ইখিপিওপিয়াবাসী ওয়াক্সা মহম্মদের পিতৃত্বকে ওহদের যুদ্ধে যে অস্ত্রে নিপাত করে, ঠিক সেই অস্ত্রদ্বারা মোসিলমাকে হত্যা করিল। মহম্মদের পিতৃত্ব হামজাকে বধ করা সত্ত্বেও মহম্মদ ওয়াক্সাকে ক্ষমা করেন, ওয়াক্সা তদবধি গোঁড়া মুসলমান হয়।

মোসিলমার অবশিষ্ট সৈন্যগণ ও শিষ্য সমুদয় আগ্রাহের সহিত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। খালেদের নির্ভুর প্রকৃতিতে ও অসত্যভাবে মালেককে হত্যা করাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের যে ঘৃণারভাব হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সেকথা সকলে ভুলিয়া গেল। তিনি আরও অনেক জয়লাভ করিলেন। যখন যেখানে যাহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ স্বরূপ প্রেরণ করা হইত, খালেদ হয় তাহার সহিত মিলিত হইতেন না হয় সৈন্য দ্বারা বা অন্য প্রকার সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক জয়লাভ করিতেন। এইরূপে খলিকাদিগের রাজ্য স্থাপনাবধি এক বৎসর কাল মধ্যে যেখানে যে উচ্ছৃঙ্খলভাব ছিল সে সমস্ত প্রশমিত হইয়া সমস্ত আরবদেশে খলিফাক্ষমতা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

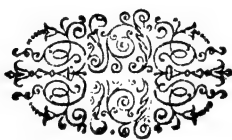
মোসিলমাকে পরাজয় করার অব্য-

বহিত পারেই আবুবেকার বাচনিক, লিখিত উপদেশ এবং দৈববাণী প্রভৃতি হইতে কোরাণের মূলতত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তৎপূর্ব্বে কোরাণের কতকাংশ খণ্ড খণ্ড কাগজে লিখিত এবং অপরাংশ মহম্মদের শিষ্য ও সঙ্গীগণের স্মৃতিফলকে অঙ্কিত ছিল। পরমধ্যমিক ওমার এই কার্য সাধনে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। আফ্রেরার যুদ্ধে মহম্মদের প্রাচীন সঙ্গীগণ মধ্যে অনেকে হত হয় দেখিয়া ওমার নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হন। অন্তর তিনি বলেন “এক্ষণে যঁাহারা জীবিত আছেন, যঁাহাদের স্মৃতিক্ষেত্রে মহম্মদের দৈবাদেশ, কার্যকলাপ এবং উপদেশ সকল লিখিত রহিয়াছে, সেই সকল

সনাতন ধর্ম্মের সারতত্ত্বের সাক্ষীগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে এবং তৎসঙ্গে ইস্লাম ধর্ম্মের মূলপ্রশ্ন বিলোপ হইতে পারে।” সুতরাং ওমার নির্বন্ধাভিশয় সহকারে আবুবেকারকে অনুরোধ করেন, যে সকল জ্ঞাতসার ব্যক্তি জীবিত আছেন তাহাদিগহইতে এবং যে সকল অংশ লিখিত আছে তাহা হইতে কোরাণ সংগ্রহ হউক। তদনুসারে কোরাণ সংগ্রহ আরম্ভ হয়। রুদ্ধ আবুবেকার এই কার্য সমাপন করিতে পারেন না। তাঁহার উত্তরাধিকারী খলিফা এই আরম্ভ সাধু কার্য সমাধা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ ।)

শ্রীত্র—



শিশুশিক্ষা। *

বাস্তবায়নের প্রধান দোষ এই যে তাহারা শিখিতে জানেন না এবং শিখাইতে জানেন না। কিন্তু শিখিলে সংসারে লব্ধ প্রতিষ্ঠা হওয়া যায়, এবং সুখে দিন নিব্বাহ করিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা তাহাদিগের বুদ্ধির অগম্য। এক অনুকরণে তাহাদিগের সর্বনাশ হইল। মহাপুরুষেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের ও সেই পন্থানুবর্তী হওয়া বিধেয়, এই মূলমন্ত্র তাহাদিগের হৃদয়ের চালক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং ইহারই বশবর্তী হইয়া তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে “যাহা হইয়াছে তাহা হইবেই, কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা ভবিষ্যৎও নহে।”

মহাপুরুষদিগের অনুবর্তী হওয়াকে আমরা নিন্দা করিতেছি না। বরং অনেক সময়ে ইহাই একমাত্র স্লাঘণীয় কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়েই তাহাদিগের উচ্ছ্রষ্ট উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করা কোন প্রকারে যুক্তি সংগত নয়। দেশকাল, পাত্রভেদে নিয়মের এবং কার্যের প্রভেদ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে

কন্যাধরগই বিবাহের উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থল ছিল। কিন্তু সেই কন্যাধরগ এক্ষণে দণ্ডবিধি অনুসারে গৃহীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহারা ভারতচন্দ্রের অপূর্ব কবিতালহরী পাঠ করিয়া নাসিকায় বস্ত্রদিয়া ‘অল্লীল’ ‘অল্লীল’ বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাহারা বুঝেন না যে, ভারতচন্দ্রের সময় আমাদের সময় নহে। এবং এই কথা নাবুঝিয়া অল্লীলতানিবারিণী সভায় কবিরের অতুল্য যশস্বন্তরূপ বিদ্যাসুন্দর দগ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। ধনা কুশাগ্র বুদ্ধি। যাহারা আবার ভাবেন, যে মৎস্যমাংস ভোগ করিয়া প্রাচীন যোগীশ্বরিদিগের অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য। প্রাণিহিংসা পরম অধর্ম এই মহামন্ত্রের বশবর্তী হইয়া যে সকল মহাপুরুষেরা পরকালের জন্ত ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন তাহাদিগের কার্যের উপর বাক্য ব্যয় করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্টকার্য। যাহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাহারা স্বদেশের আধুনিক অবস্থা এক বার ভাবিয়া দেখেন না। বাঙ্গালী দুর্বল, বাঙ্গালী ক্ষীণ, বাঙ্গালী ভয়শীল সুতরাং এ অবস্থায় বঙ্গ মাংস

* এই প্রবন্ধের সারাংশ, দৃষ্টান্ত সমেত, হার্টফেল্ডের প্রণীত ‘Education’

নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল।

বাবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, সকল কার্যে মহাপুরুষদিগের অনুকরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এই অনুকরণের বশবর্তী হইয়া বাঙ্গালী আপন অবস্থাকে উন্নত করিতে শিখে নাই। আদালত উকীলে পরিপূর্ণ, তথাপি বাঙ্গালী উকীল হইবে; কেননা তাহাদিগের পিতা মহাশয়েরা ওকালতী করিয়া দিন কাটাইয়াছেন। বিলাতে থাকিলেই যেন সিভিলিয়ান ও বারিস্টার হওয়া বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আজি কালি ইংরাজপ্রিয় বাবুরা এরূপ ব্যবসায়ের যেরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালী অধঃপাতে গেল বলিয়া সংবাদ পত্রে ঘোর গর্জন করিতে থাকেন, আমরা ইহাতে সে পরিমাণে দোষ দেখি না। বাঙ্গালীর আধুনিক অবস্থা অনেকটা রাজ-প্রসাদাৎ। কার্য্যকরী বিদ্যা রাজ্যার দৃষ্টি নাই। যিনি সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া শিল্পি বা কৃষি শিখিলেন, তিনি হয়ত পরে মানসস্ত্রম রাখিয়া দিনপাত করিতে অক্ষম হইবেন, এবং কাজেই এখন ভাবেন যে তিনি আপনার পূর্ব্বকৃত পাণের প্রাণ-শ্চিত্ত করিতেছেন। যেখানে এত বিপদ এবং সংস্কে সঙ্গে মুখের করতালি, সেখানে কে অগ্রসর হইবে? * কিন্তু কথাটা

* এস্থলে বক্তব্য যে কৃষি বিদ্যা পারদর্শী বাবু জ্ঞানাত্মক (যিনি তিন বৎসর কষিয়াতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। তৎকর্তৃক সম্পাদিত একখানি ক্ষুদ্র মাসিক

এই যে এমনি পোড়া দেশ যে বাঙ্গালী ক্রোড়পতিরা অর্থের সমাগ্র এখনও শিখিল না?

মুতরাং বাঙ্গালী যে শিখিতে জানে না তাহা একপ্রকার ত্রি। যাহারা শিখিতে জানে না তাহারা অন্যকে কিরূপে শিখাইবে? বাঙ্গালী নিজের যেরূপ শিখে পুত্র পৌত্রকেও সেইরূপ শিখাইতে যত্ন করে। মুতরাং পিপীলিকাজাতীর মত তাহারা সংসারে লীলা খেলা করিয়া চলিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক য় যুদ্ধ হইতে বাঙ্গালার যে কোম উপকার হইবে না তাহা একপ্রকার আমাদিগের বিশ্বাস। যদি বাঙ্গালার কিছুমাত্র উন্নতি হয় তবে সে ভবিষ্যৎ বংশ হইতে। আমরা ত নিজ দেশের কিছুই করিলাম না, যদি পুত্র পৌত্রাদি হইতে কিছু হয় তবে তজ্জন্য কেন চেষ্টা না করিব? কিন্তু এউন্নতি শিক্ষা সাপেক্ষ। প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্তব্য যে তাহার শিশুদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দেয়। এই শিশুশিক্ষা সম্বন্ধেই আমাদিগের দুই চারিটা বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ কিরূপ শিক্ষা বঙ্গ আবশ্যক? সর্ব্বাণ্ডে বঙ্গ শিশুদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এইটি বাপ্তের ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিতে হয়। কি আশ্চর্য্য বাঙ্গালী ভাবায় এত উন্নতি হইতেছে তথাপি প্রয়োজনীয় একখানি সাময়িক পত্রের গ্রাহক জুটে না।

জানার কোথাও দৃষ্ট হয় না। শিশু চারি পাঁচবৎসর বয়সের হইলেই তাহাকে অমনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালাে বা স্কুল পণ্ডিতের অধীনে সমর্পণ করা হয়। গুরুমহাশয়ের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, স্মরণশক্তি স্তান হয় এবং এই কোমল বয়সে গুরুতর মানসিকপরিভ্রমে শরীর দুর্বল হয় এবং আনুষঙ্গিক যত অকল্যান আসিয়া জুটে। সেই অপবয়সে তাহাদিগের শিক্ষিত বিষয়ে রসবোধ হয় না। শিথিলে আনন্দ বোধ হয় না। সুতরাং তাহারা পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ফাঁকি দিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয় জানিতে পারিলে আর রক্ষা রাখেন না। বেত্রধারীরূপী হইয়া সেই কোমল পুষ্ঠে নির্দয় রূপে প্রহার আরম্ভ করেন। শিশুদিগের কাজেই বিদ্যাগ অগ্রজ্ঞা জন্মে, শিক্ষকের প্রতি অভক্তি জন্মে। এবং যে পিতা মাতারা সন্তানের এইরূপ কষ্টের কারণ হন, তাহাদের উপরেই বা অভক্তি না জন্মিবে কেন? এই সকল শিশুরা বয়প্রাপ্ত হইলে মূর্খ, ধূর্ত, এবং অকর্মণ্য হইয়া বংশে কালি দিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের পিতা মাতারা বুঝেনা যে, তাহাদিগের দোষেই সন্তান ধনুর্ধর হইয়া দাড়াইয়াছে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, সাত আট বৎসরের পূর্বে সন্তানকে কখন স্কুলে পাঠান উচিত নয়, কারণ ইহার পূর্বে

মানসিক পরিভ্রম করিলে সন্তান ক্রীণ, দুর্বল এবং অপঞ্জীবী হয়।

কেবল তাহাই নয়। বঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষতঃ শিশুদিগের কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। শৈশবে স্বাস্থ্য রক্ষার যেরূপ প্রয়োজন এরূপ আর কখন নহে। মৃত্যু সংখ্যার তালিকা লইলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের অধিকাংশই শৈশবে এবং বার্কিক্যে ঘটিয়াছে। পিতা মাতারা শিশুদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন না, ইহা সামান্য দুঃখের বিবরণ নয়। শিশু প্রাতঃকালেই শয্যা হইতে উঠিলে হিম লাগিবে বলিয়া তাহাদিগের পিতা মাতা পুনরায় শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। এবং সেকথা প্রতিপালিত না হইলে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং শিশু আর প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে না। শিশু পরিভ্রমজনক ক্রীড়া করিতেছে দেখিলে হয়ত বজ্রীয় পিতা বলিবেন “বসিয়া খেলা নাই কেবল উৎপাত”, এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দুই চারি চপটাখাত পড়িল, অমনি শিশু পরিভ্রম হইতে ক্ষান্ত হইল। এইরূপে তাহাদিগের মনের সুখ এবং শরীরের সুখ একবারে নষ্ট করা হয়। যদি তাহারা জীবিত থাকে তাহা হইলে অভ্যস্ত দুর্বল হওয়ারই সম্ভাবনা। নহিলে পিতা মাতাকে কঁদাইবার হইলে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

কেবল তাহাই নয়। খাদ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শিশুরা প্রায় অ-

পরিমিত ভোজন করে না, কিন্তু তাহাদিগকে নিয়মিত ভোজনে বাধ্য দিলেই তাহারা সুবিধা পাইলে অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকে। এইজন্য শিশুদিগের খাদ্য সম্বন্ধে কোন বাধ্য দেওয়া উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে মাংস ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে বলিবেন বঙ্গদেশে উত্তাপ প্রাধান্য; এখানে মাংস ব্যবহারে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। যাহারা এরূপ ভাবিবেন, তাহারা ডাক্তারদিগের পরামর্শ লইলেই তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তবে সকল প্রকার মাংস এখনে উপকারী না হইতে পারে। কিন্তু দাগ প্রভৃতি লঘুমাংস বঙ্গের যে উপযোগী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মাংস যে সর্বাণেক্ষা পুষ্টিকারক তাহা বুদ্ধিমানকে বুঝান নিম্নপ্রয়োজনীয় ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, জগতে জিত জাতিরা প্রায় সকলেই মাংসভোজী। ইংলণ্ডীয় কসিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত স্থল। মাংসে যে কেবল শারিরীক বল বৃদ্ধি করে তাহাই নহে, ইহাতে শরীরের আয়তন বৃদ্ধিকরে এবং সঙ্গতঃ অস্থি ও ধমনীগণকে পরিপুষ্ট করে। ডার্বিন একজাতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাদিগের আয়তনও শরীরের উচ্চতা সাধারণ মানুষের অর্ধেক। তাহারা নিরামিষাণী। অনেকে দেখিবেন যে, ইংরাজ এবং কাবেলীর তুলনায় বাঙ্গালীর

শরীরে আয়তন অনেক কম। দেশভেদে এবং ঋতুভেদে শরীরের অনেক পার্থক্য জন্মে, স্বীকার করি। কিন্তু খাদ্যানুসারেও যে পার্থক্য জন্মে তাহাও নিশ্চয়। এতদ্ব্যতীত মাংস ভোজনে সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বী হয়। অক্ষয়কুমার বাবুলিখিয়াছেন যে * কোন ব্যক্তিকে শিশুকালেই আনিয়া তৃণভোজন করিতে শিখান গিয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে, সে বড় হইলে আর কাহাকেও দংশন করিতনা এবং তাহার সাহস একেবারে নষ্ট হইয়া গৃহপালিত পশুর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাংসে যে বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয় তাহা মাংস ভোজীমাত্রকেই পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। একবার বিলাতে কোন ব্যক্তিকে ছয়মাস কাল ফল মূল তণুল খাইয়া রাখা গিয়াছিল। তাহাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ, ও স্মরণ শক্তি হ্রাস হয়। পরে আবার মাংস ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস মধ্যেই আপনার সেইপূর্ব শক্তিগুলিকে পূর্বাবস্থায় পাইল। স্মরণীয় ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গ মাংস ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু শৈশবে সেই মাংস ব্যবহার করিলে যে পরিমাণে উপকার হইবার সম্ভাবনা, এমত আর কোন সময়ে নহে! কারণ শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বল, মানসিক বুদ্ধি, চিত্তের কথা বদ, প্রথম হইতে যত্ন করিলে

* বাণ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

যে রূপ উৎকর্ষ লাভ করিবার সম্ভাবনা
এমত আর কোন রূপে নহে। অনেকে জা-
নেন, যে সম্ভান শিশুকালে দুর্বল থাকে,
সে আর কখন বলবান হইতে পারে না।
কিন্তু যে শৈশবে বলবান থাকে সে মাঝে
দুর্বল হইতলও যত্ন করিলে পুনরায় আপ-
নার আত্মবিক বললাভ করিতে পারে।
ইহাও অনেকে জানেন যে, একবার রোগ
হইলে শরীর কখন ঠিক পূর্বের মত
হয় না। এইজন্য শৈশবাবস্থা হইতেই স-
স্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এই সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আ-
বশ্যক। এই কথা শিশুদিগের সম্বন্ধে এবং
লঙ্কায়ঃ হুবক সম্বন্ধেও প্রযোয্য। অতি
রিক্ত মানসিকপরিশ্রমে আধুনিক ছাত্রেরা
শরীরকে দুর্বল করিয়া ফেলে। পরীক্ষা
উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা শরীরকে
একরূপ কষ্ট দিয়া থাকে যে, হয় পরীক্ষার
সময়েই নরপরীক্ষার পরেই তাহাদিগকে
গুৰুতর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।
'মস্ত্রং বা সাধয়েম শরীরং বা পাত্যয়েম' এই
ভ্রমের বশবর্তী হইয়া তাহারা সমাজের
কি পরিমাণ অনিষ্ট করে তাহা একবার
চাছিয়াও দেখে না। শিশুদিগের সম্বন্ধে
এতদ্বিধনে পিতা মাতার দৃষ্টি থাকি-
কর্তব্য। (*)

* এই দোষের কিয়দংশ শিক্ষাবিভা-
গের কর্তৃপক্ষীদের উপর অর্শে না কি ?
তাহারা একটু অনুগ্রহ করিলেই ত ছা-
ত্রেরা এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বিভীষতঃ বঙ্গে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা
হওয়া আবশ্যক। বিলাতেও এই বিষয়ে
তর্ক হইতেছে। তাহারা বলিতেছে যে
বিলাতে এক্ষণে কাব্যের কিছু উন্নতি আ-
বশ্যক। আমরা বলিতেছি কাব্যে আমা-
দিগের ছাড় জ্বালাতন হইয়াছে, আমরা
কাব্য আর চাহি না। মূল কথায় সংকল-
বই সীমা আছে। কাব্যের যতদূর সীমা,
বিলাতে ততদূর যায় নাই। আমাদিগের
কাব্য সীমা ছাড়াইয়া এতদূর চলিয়া গি-
য়াছে যে কাব্যের জ্বালায় আমরা অস্থির।
সেই যে জয়দেব 'ললিত লবঙ্গলতা' বলিয়া
প্রেমের বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন অমনি
রসিক বাঙ্গালী কবি 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম'
করিয়া পাগল। বিরহ বর্ণনা বসন্ত বর্ণনা
বাঙ্গালীর লেখনীর অগ্রে বর্তমান (*)
কিছু দিনের জন্য আমাদিগের উচিত গ-
ভীর বিষয় আলোচনা করা। বঙ্গে বিজ্ঞা-
নের উন্নতি চাই। সেই তপস্যায় এক্ষণে
নিমগ্ন হওয়া কর্তব্য। কেবল যে আমরা
কবিদিগের জ্বালায় জ্বালাতন তাহা নহে,
কাব্যপাঠকদিগের জ্বালায়ও কিয়ৎ পরি-
মাণে অস্থির। চতুর্দশবর্ষীয় রসিক নাটক
হাতে করিয়া ভাবকল্প করতঃ 'হা প্রেয়সী'
'হা প্রেয়সী' বলিয়া ভবিষ্যৎ প্রণয়-
নের সহিত আলাপ করে এবং তাহার বি-
রহে কান্দিতে থাকে, ইহা কি কম হাস্য-

* শ্রবণের ক্ষমতা করিবেন। তাহা-
দের কথা আমরা বলিতেছি না। তাহারা
বঙ্গের জুলতিলক।

জনক এবং শোচনীয় ব্যাপার? সুতরাং
 বাহ্যতে শিশুরা কাব্য পড়িয়া এইরূপ
 'কবি' না পান তব্বিয়ে পিতা মাতার
 দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শৈশব হইতেই তাহা-
 দিগকে বিজ্ঞানে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া
 কর্তব্য। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে মাতা
 আট বৎসরের পূর্বে সন্তানকে বিদ্যালয়ে
 পাঠান কর্তব্য নয়। ইহাতে অনেকে ব-
 লিবেন, যে 'ক' 'খ' শিখিবার উপ-
 যুক্ত নয় সে বিজ্ঞান শিখিবে কিরূপে?
 আমরা তাহাদিগকে উপায় বলিয়া দি-
 তেছি। বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পূর্বে যে
 শিশুর কোনরূপ শিক্ষা হইবে না তাহা
 নহে। মুখে মুখে সন্তানকে যত শিখান
 যায় ততই ভাল। মুখে মুখে শিখিতে ম-
 ন্ত্রিকের পরিশ্রম হয় না এবং শিখিতেও
 আমোদ হয়। সুতরাং সে সময়ে যাহা
 শিখে তাহা আর জন্মে ভুলেনা। শিশু
 ঠাকুরমার নিকট কত আগ্রহের সহিত
 রাজা ও রাণীর গম্প শুনেন। যাহারা শি-
 খাইতে জানেন, তাহাদিগের শিশুরাও
 তাহাদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত আগ্র-
 হের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করে। আমরা
 উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তোমার
 শিশুকে তুমি বাগানে লইয়া গিয়াছ।
 একটি বৃক্ষের পত্র ছিড়িয়া তাহার হাতে
 দিয়া বলিবে এইরূপ পাতা বাগানে যদি
 আর থাকে লইয়া আইস। শিশু অত্যন্ত
 আনন্দের সহিত একাধা করিবে, ঘু-
 রিয়া ঘুরিয়া সেই পাতার সহিত অন্য

পাতার সাদৃশ্য পাইলেই তুলিয়া আনিবে।
 অতি সামান্য মাত্র বিভিন্নতা থাকিলে সে
 বুঝিতে পারিবে না। তখন দুইটি পাতার
 মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা
 করিবে। প্রথমে হয়ত সে বলিবে কিছুই
 নাই। পুনরায় তুমি ভাল করিয়া দেখিতে
 অনুরোধ করিবে, তখন সে বহুক্ষণে একটি
 বিভিন্নতা দেখাইতে সমর্থ হইবে। তখন
 তুমি বলিবে আর কিছু আছে কি না?
 এইরূপে শিশু যতক্ষণ আপনি বসিতে
 পারে ততক্ষণ বলাইবে, পরে বলিয়া
 দিবে। এইরূপে শিশুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা
 জন্মিবে। একপ্রকার পাতার বিষয় শি-
 খাইলে অন্যরূপ পত্রের বিষয় শিখাইবে।
 এইরূপে সে শীঘ্রই উদ্ভিজ্জ বিদ্যার মূলমন্ত্র
 হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া ফেলিতে পারিবে।
 এইরূপে তাহাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা,
 সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি সকলেরই কিছু কিছু
 শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ নীতিশিক্ষা। এসবক্ষেও শি-
 শুদিগের উপর পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা
 কর্তব্য। সন্তান বড় হইলে বাহ্যতে গুরু-
 জনের অবাধ্য না হয়, সেইজন্য শৈশব হ-
 ইতেই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।
 কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ? স্পেন্সর বলেন
 স্বভাবের শিক্ষা। অনেক পিতা মনে করেন
 যে, প্রহারে সকল শাসন হয়। যে সন্তান
 পিতার অবাধ্য তাহাকে প্রহার কর, ইহাই
 তাহাদিগের উপদেশ। এটি যে ষোরতর
 ভ্রম তাহা বলা বাহুল্য। সন্তানকে কখন

প্রহার করিবে না। স্বভাবের শিক্ষায় শিশুকোশাসন করিবে। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি। মনেকর তোমার শিশু-সন্তান প্রদীপের নিকটগিয়া কাগজ পুড়িতেছে। যদি সে সময়ে তুমি তাকে প্রহার কর, তাহা হইলে সে ভাবিবে যে আমি কোন দোষ করিনাই তথাপি মার খাইলাম। কাজেই পিতার উপর তাহার অভক্তি জন্মিবে। এরূপ আর দুই চারিটি ঘটনা হইলেই পিতার উপর ক্রমেই অশ্রদ্ধা দৃঢ় হইয়া যাইবে। এবং তখন পিতার একান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিবে। এবং সেই অবাধ্যতা শাসন করা পিতার সাধ্যাতীত। সুতরাং সন্তান যখন এইরূপ প্রদীপ লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিলে, তখন পিতার উচিত যে তাকে মুখে বারণ করিয়া দেয়। পিতা বলিবে, 'দেখ এরূপ করিও না হাত পুড়িয়া যাইবে' শিশু হয়ত শুনিবে না। কিছু পরেই হাত পুড়িবে, এবং তখন পিতা যে ঠিক কথাটি বলিয়াছিল, এই জন্য পিতার প্রতি ভক্তি হইবে। এবং পিতার কেম অবাধ্য হইয়াছিল তজ্জন্য দুঃখ করিবে। এবং সেই স্বভাবের শিক্ষা পাইয়া সে আর কখন অগ্নির নিকট যাইবে না। এইরূপে তিন চারি বার পিতার কথার বাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া, এবং যখনই পিতার কথা অমান্য করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটয়াছে, এটি দেখিয়া পিতার প্রতি তাহার অচলা ভক্তি জন্মিবে।

মানসিক শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা পর-

স্পার দুইটি ভাগিনী। যেখানে মানসিক শিক্ষা সেইখানেই নীতি শিক্ষার আবির্ভাব, এবং যেখানে নীতি শিক্ষা সেইখানেই মানসিক শিক্ষার উন্নতি। জ্ঞানী হইলেই সং হয় এবং সং হইলেই জ্ঞানী হয়। সুতরাং পিতা মাতাদিগের কর্তব্য যে, যাহাতে তাহাদিগের সন্তান দিগের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তি সকল যুগপৎ উন্নতিলাভ করে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া। নৈতিক বৃত্তি ব্যতিত মানসিক বৃত্তির স্ফূরণ হয় না। মানসিক বৃত্তি ব্যতিত নৈতিক বৃত্তির স্ফূরণ হয় না।

কিরূপে শিশুদিগকে শিক্ষাদান করিতে হয় আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। যাহারা ইংরেজী জানেন না তাহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। যাহারা ইংরেজী জানেন, তাহাদিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ যেন তাঁহারা একবার স্পেন্সর রচিত মূলপুস্তক পাঠ করেন।

উপসংহার কালে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে এতদূর আসিয়া চিত্রটি উপন্যাসিক হইয়াছে বলিয়া অমেকে আক্ষেপ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, শিশুকে এইরূপ সর্বদিক্‌সুদিক শিক্ষা দেওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। ইহাতে যে যে উপকরণ আবশ্যক করে তাহার সকলগুলি একজনের ভাগ্যে ঘটা অসম্ভব। যে পিতার অর্থ আছে, তাহার হয়ত নিজের ভাল শিক্ষা দাই সে সন্তানকে কিরূপে

শিখাইবে ? যাঁহার শিক্ষা আছে তাঁ-
হার সময় নাই ইত্যাদি শত শত বিষয় যে
ঘটে তাঁহা আমরা স্বীকার করি । কিন্তু
যতদূর সম্ভব ততদূর শিক্ষা কেন না দেই ?
যাঁহাদের উপর বঙ্গের সমস্ত আশা ভরসা

নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদিগের উন্নতির
জন্য যে যত্ন না করিল সে কি মানুষ ? শি-
শুশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা ব-
লিবার রহিল ।

জীব, ৮—

জয়পুর ।

৪র্থ খণ্ডের ৭ম সংখ্যার ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর ।

কুন্তলদেবের পরলোক গমনের পর
তদীয় পুত্র পূজন সিংহাসনে অধিরোহণ
করিলেন । রাজপুত-কবিকুল-চূড়ামণি চাঁদ
পূজন-চরিত্র যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন,
তাঁহাতে পূজনকে বীরকুলপূজনীয় বলিয়া
সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই ।
পূজনের সমগ্র বীরকীর্তির অণ্ডারণা ক-
রিতে হইলে সাময়িক পত্রের পত্র পৃষ্ঠার
অবলম্বন পরিভ্যাগ পূর্বক এক খানি স্বতন্ত্র
গ্রন্থের প্রচার আবশ্যক হইয়া উঠে । সু-
তরাং তাঁহাতে আমাদের নিরন্তর হইতে হ-
ইয়াছে, অতএব পূজনের পরিচয় সংক্ষেপে
বর্ণন করিতে হইল বলিয়া আমরা নিতান্ত
দুঃখিত হইলাম ।

চোলরায় হইতে পূজন বর্ষ পুরুষ ।
এই অসাধারণ বীরপুরুষের বীরকীর্তির প্র-
তিভা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে রাজ-
কুলমাননীয় দিল্লীখর চোহান বংশীয় বি-
খ্যাতনামা পৃথীরায় পূজনের সহিত স্বীয়
সহোদরার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং স-

তাহা একশত আটজন প্রধান কুলীন সেনা-
নাগকের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান পদ প্রদান
করিয়াছিলেন । পূজন এবস্ত্রকার গৌ-
রবাস্পদ পদের বথার্থ যোগ্য পাত্র ছি-
লেন । তিনি দুইবার মুসলমানদিগকে প-
রাস্ত করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষের উত্তর-
পশ্চিম-সীমা-সংলগ্ন পার্শ্বতা প্রদেশের
খাইবার নামক বিখ্যাত গিরি-সঙ্কটে পূজন
এক ঘোরতর যুদ্ধে যখন সেনাপতি প্রসিদ্ধ
সাহাবুদ্দিনকে পরাভূত করিয়া গিজনী ন-
গর পর্যন্ত তাঁহার শস্তাং২ ধাবিত হইয়া-
ছিলেন । তাঁহারই অস্ত্রশিক্ষা প্রভাবে
চণ্ডালাধিকৃত মাহোবা দেশ পৃথী রায়ের
করতলস্থ হয় । পৃথীরায় যে কান্যকূজা-
ধিপতি জয়চন্দ্রের পরম রূপ লাভব্যবতী হু-
হিতাকে হরণ করেন, তদন্তিনয়ে পূজন
শৌর্যবীর্যের পরাকর্ষ্য দেখাইয়াছিলেন ।
জয়চন্দ্র পৃথীরায়ের এই অবস্থা ব্যবহারে
কোপান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত পাঁচদিন
ঘোরতর যুদ্ধ করেন । এই যুদ্ধব্যাপারে

চেতুমতি বীরপুরুষ স্বগণসমভিব্যাহারে পৃথ্বীরায়ের সহকারিতার জন্ত নিযুক্ত থাকেন। পূজন এই যুদ্ধেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রাজকবি চাঁদ এই যুদ্ধের যে রূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করা গেল ;

“ মিরার বংশীয় গোবিন্দ গেহলোট পূজনসহ সমবেত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। গোবিন্দের পতনে শত্রুদল আনন্দে হতা করিতেছে দেখিয়া বীরাগ্রাণ্য পূজন কুলিশপাতের আয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উভয় করে ভীষণ খড়্গা ধারণ করিয়া অবিরত শত্রুমুণ্ড নিপাত করিতে লাগিলেন। চারি শত যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহার সাহায্যার্থে কেবলমাত্র কেহরি, পীপা, বোহো, নরসিংহ এবং কচরা এই ভ্রাতৃপণ্ড গণজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নিরন্তর বল্লম ও খড়্গা চালিত হইতে লাগিল, অনবরত নরমুণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল এবং নরশোণিতে রণভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। এমন সময়ে পূজন জয়চন্দ্রের যবন সেনাপতি ইতিমাদকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার মস্তক ভূমিতে পতিত হইতে না হইতেই তাহারই পরিত্যক্ত কালরূপী বল্লম পূজনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। কুর্ম * বীরশয্যা শয়ন

* পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কচ্ছপ হইতে কচবহ বংশের নাম হওয়ায় পূজনকে কুর্ম বলা হইয়াছে।

করিলেন। অপ্সরাগণ তাঁহার দেহ লইয়া বিবাদ করিতে লাগিল। রণভূমি মৃতদেহে আচ্ছাদিত হইল, মহাদেবের মালায় অনেক নরমুণ্ড সংযোজিত হইল। পূজন ও গোবিন্দের পতন সময়ে দিবা এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ভ্রাতৃশবের উদ্ধার সাধনার্থ পলহন কুপিত কেশরীর আয় শক্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কনোজশ্রেণী স্তম্ভিত হইল, জয়চন্দ্রের ঘোরঘনঘটা সদৃশ নিবিড় সৈন্য পশ্চাদভিমুখ হইল। পূজনের ভ্রাতা ও পুত্র বীরকুলগৌরব কর্ণের নায় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উভয়েই রণশয্যা শয়ন করিলেন। সূর্য্যদেব আপনার রথ প্রেরণ পূর্বক তাঁহাদিগকে স্বলোকে লইয়া গেলেন।

“ এই মহাযুদ্ধের ভীমগর্জনে গঙ্গা ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন, চন্দ্রদেব কম্পিত হইলেন, দিকপালগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, কনোজ সম্প্রদায় প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং এই অবকাশে পূজনাজ্ঞ পিতার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। পূজন পৃথ্বীরায়ের বর্ম্মস্বরূপ ছিলেন। কান্যকুব্জের বীরগণকে তিনি অতি ভীততর অস্ত্রসকল দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরকীর্তি বর্ণন করা কবিরও সাধ্য নহে। তিনি শেষ নাগোপরি পদস্থাপন করিয়া নরবন নিমূল করিয়াছিলেন। বীরগন্তান কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে নাই। পূজন রণশয্যা শয়ন করিয়া কহিয়াছিলেন,—‘ মনুষ্যের একশত বৎসর মাত্র

পরমায়ু, তাহার অর্দ্ধেক রজনীর অন্ধকারে বিনষ্ট, তাহারও অর্দ্ধেক বাল্যকৌড়ায় রুখা অতিবাহিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে খজা ধরিতে ক্ষমবান করিয়াছিলেন ।’ তিনি এই কথা বলিতে বলিতে যখন কৃতান্তের করকবলিত হন, সেই সময়ে স্বীয় পুত্রের হস্ত শত্রুমধ্যে বিকসিত দেখিতে পান । তাহাতে তাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত হয় । মালসী মাতবার অত্নাহত হন, তাঁহার ঘোটক অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হয় । পুজনপুত্র অত্যাভূত বীৰ্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । ”

পুত্রনের কনিষ্ঠ পুত্র মালসী অম্বরাজ্যে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজকবি চাঁদ “ পৃথুরায় রাসু ” নামক তদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মালসীর ভূয়োমী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন । মালসী কত্রাহি নামক স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধে মাণ্ডুরাজকে পরাভূত করেন । মালসী হইতে দশম পুরুষ পর্যন্ত রাজগণ কেহই কোন বিশেষ কার্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই । যথাক্রমে তাঁহাদের নাম নির্দেশ করা যাইতেছে ।—বিজল, রাজদেব, কীলন, কুস্তল, জুসী, উদয়কর্ণ, নরসিংহ, বনবীর, উদ্ধারগ, ও চন্দ্রসেন । এতদ্ব্যতীত উদয়কর্ণের এক পুত্র বালোজী কোন কারণ বশতঃ পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক অমর্ত্যশীর নগর অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন । তাঁহার পৌত্র শিখরী ঐ ক্ষুদ্র রাজ্য ক্রমে বিস্তার করিয়া

স্বীয় নামানুসারে উহার শিখাবতী নাম প্রদান করেন ।

চন্দ্রসেনের পুত্র পৃথুরাজ । পৃথুর সপ্তদশ পুত্র, তদ্ব্যতীত দ্বাদশজন মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হন । তিনি জীবদ্দশাতেই ঐ দ্বাদশ পুত্রকে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান । তাঁহাদিগের দ্বারা ই কচবহ বংশের দ্বাদশ শাখা সংস্থাপিত হয় । ঐ দ্বাদশ শাখার নাম কচবহ বংশের “ দ্বাদশ কোটরী ” বলিয়া বিখ্যাত আছে । পৃথুরাজ পুত্রগণের মঙ্গল সাধনে বিশিষ্টরূপে যত্নবান ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এক কালরূপী পুত্র ভীমসিংহ তাঁহার বধ সাধন করিয়া সিংহাসন অপহরণ করে । কার্যের কি বিচিত্র গতি ! দুর্ভাগ্য পিতৃহন্তা ভীমসিংহ এই দুষ্কৃতিলব্ধ রাজ্য অধিক কাল ভোগ করিতে পারে নাই । হাতে হাতেই ইহার ফলভোগ করিয়াছিল । তদীয় দুর্ভাগ্য পুত্র ঐশকর্ণ স্বগণগণের পরামর্শানুসারে পিতৃহন্তা পিতার বধ সাধন করে । * এই দুর্ভাগ্য পিতৃবধের

* বোধ হয় ঐশকর্ণের এই দুর্ভাগ্য-রিত্য সম্বন্ধে তৎকালীন সম্রাট বাবর সাহেব কিছু পরামর্শ ছিল, কারণ, রাজপুত ইতিহাস বেত্তারা কহেন, ঐশকর্ণ তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাট সন্নিধানে উপস্থিত হইলে বাবরসাহ তাঁহাকে ‘ নরবারের রাজ্য ’ এই উপাধি প্রদান করিলেন । এই নরবার রাজ্যের বংশ কচবহ বংশের শাখাস্বরূপ গণনীয় হয় ।

পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিল। অমর রাজের কোন কোন রাজাবলীর মধ্যে এই দুই দুর্ভাগ্যের নামো-
ল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ-
হয় যুগপাত্র বলিয়াই পরিভাষিত হইয়াছে।

ঐশ্বৰ্য্যের পুত্র বাহার মন্ত্র সূর্য প্র-
থমেই মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার
করেন। তিনি বাবর সাহেব অনেক স-
হায়তা করেন এবং জমায়ুন বাদশাহ ক-
র্তৃক “পঞ্চ হাজারী মন সর্ব” অর্থাৎ
কখন রাজার অপুত্রতা নিবন্ধন কচুবহ
সিংহাসন শূন্য হইলে এই বংশ হইতে উ-
ত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। যখন অম-
রের শেষ রাজা জগৎসিংহ গতানু হন,
তখন তাঁহার অপুত্রতা নিবন্ধন নববার বংশ
হইতে এক পুত্র আসিয়া উত্তরাধিকারী
হয়।

পাঁচ হাজার অশ্ব সৈন্যের অধিনায়ক এই
উপাধি প্রাপ্ত হন। বাহার মন্ত্রের পুত্র
ভগবান দাস মোগল সম্রাটদিগের সহিত
অত্যন্ত সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন ক-
রিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত কৌশলী
ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তিগণের স-
হিত সম্প্রীতি করিতে তাঁহার কোন চে-
ষ্টারই ক্রটি হইত না। জানি না, তিনি
ভগবান দাসকে কি কুহকে ভুলাইয়া ছি-
লেন। কচুবহু রাজা মোগল রাজবংশের
একপ অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, আকবর
পুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত আপন দুহিতার
বিবাহ দিয়া স্বর্গাকুল কলঙ্কিত করিয়াছি-
লেন। এই পরিণয়ের ফল স্বরূপ রত্নব-
শীল কুলকামিনীর গর্ভে খস্ক নামা দ্ব-
র্ভাগা রাজকুমারের জন্ম হয়।

(ক্রমশঃ।)

শুকর।

বিগত বারের বাক্সে আসিয়া এবং
আফ্রিকা এই উভয় ভূখণ্ডের হস্তীর বিষয়
উল্লেখ করিয়া কেবল আসিয়ার হস্তীরই
বিবরণ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আফ্রিকার
হস্তীর জীবনরত্ন উপযুক্তরূপে সংগ্রহ
করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলাম,
এই বারের বাক্সে তাহা প্রকাশ করিব।
কিন্তু এবারও আফ্রিকার হস্তীর বিবরণ
উপযুক্তরূপে সংগৃহীত হয় নাই, সুতরাং

স্কুলচর্চাজাতীয় আর একটি পশুর জীবন-
রত্ন লিখিয়া পাঠকের সমীপে উপস্থিত
করিলাম, ইহার শীর্ষক দেখিলেই পাঠক
ইহাকে চিনিতে পারিবেন; এই জ-
ন্তকে বিশেষরূপে চিনিবার কারণ এই,
আমাদিগের দেশে মনুষ্যানিবাসের নি-
কটে এই জাতীয় ভিন্ন অন্য কোন স্কুল-
চর্চাজাতীয় জন্তু বাস করিতে দেখা যায়
না। ইহারা যেমন বলশালী তেমনি ভ-

স্বাভাবিক। শরীর যেমন বলিষ্ঠ, স্বভাবও তেমনি কর্কশ এবং আকৃতিও তদনুরূপই হইয়া থাকে। অন্যান্য জন্তুর যেমন দূর হইতেই শরীর ও মস্তক পৃথকরূপে দেখা গিয়া থাকে, শূকরের সেরূপ নহে। ইহাদিগের মস্তক ও শরীরের সংলগ্ন স্থান অতি ঋক্ষ ও স্থূল। শরীরের অন্যান্য স্থান কর্ণন এবং মাংসল। শূকরের সর্ব্বাঙ্গ মোটা মোটা রোমাবলী দ্বারা আবৃত, কিন্তু উহা ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। ঘাড়ের রোমগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, মোটা ও দৃঢ়। সাধারণ ভাষায় এই রোমগুলিকে ‘কুঁচি’ বলে, আমরাও এখানে উহাকে শূকরের রোম না বলিয়া কুঁচি বলিব। এই কুঁচিগুলি মনুষ্যের অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, এদেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগকে ইহা দ্বারা শাঁখা ও গহনা পরিস্কার করিতে দেখিয়াছি।

যখন শূকরের ক্রোধ হয়, তখন ঘাড়ের কুঁচিগুলি খাড়া হয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানের রোম ঐরূপ খাড়া হইতে পারে না। ইহাদের চক্ষু নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নিস্তেজ। মাথা হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১৬।১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ। শরীর এবং মাথার সংলগ্ন স্থান অর্থাৎ গলা প্রায় মুখের সমানই পরিসর; এই স্থান হইতে মুখের অগ্রভাগ এমন সরু হইয়া আসিয়াছে যে, উহা দুই ইঞ্চির অধিক হইবে না। উপরের ওষ্ঠের মধ্য দিয়াই ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বি-

স্তৃত। এই ওষ্ঠের অগ্রভাগটি চেপ্টা, দৃঢ় এবং কার্য্যোপযোগী। শূকরের মাথা হইতে লাজুল পর্য্যন্ত এমন সমভাবে মাংসপেশীসকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, এক দিক হইতে অন্যদিকে ছাত বুলাইয়া নিলে অস্থির অনুসন্ধান পাওয়া ভার।

উহাদের চারি পায়ে প্রত্যেকটিতে চিখণ্ডিত ক্ষুর। এবং ক্ষুরের বিপরীতদিগের উপরিভাগে প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া উপক্ষুর আছে। এই উভয় প্রকার ক্ষুরই একই উপকরণে নির্মিত, এবং বেশ একটুকু ধারাল। উহাদের শরীরের সহিত তুলনা করিলে ক্ষুরগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। তথাপি চলিবার কিংবা দৌড়িবার সময় কোনরূপ অসুবিধা হয় বলিয়া অনুমিত হয় না।

শূকরের দৈর্ঘ্য নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাজুলের শেষ পর্য্যন্ত ৪ হাতের বড় বেশী হইতে দেখা যায় না। উচ্চতাও ২।২৥ ফিটের অধিক নহে। সচরাচর ইহাদিগের দৈর্ঘ্যতা ও উচ্চতা ইহা অপেক্ষা কিছু কম, আজি তিন বৎসর হইল, আমরা যে একটি শূকর শিকার করিয়াছিলাম, উহা হইতে বহুৎ শূকর অনেকেই দেখে নাই বলিয়াছিল। উহারই শরীরের মাপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে।

ইহাদের লাজুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। লাজুলের অগ্রভাগটি অল্প কএক গাছি কুঁচি সন্নিবিষ্ট। উহারা সর্ব্বদাই ঐ ক্ষুদ্র লাজুলটি এদিক ওদিক ঘুরায়, কিন্তু আমরা

বুঝিতে পারি না যে উহাঘারা শূকরের কি উপকার হয়। এদেশীয় পূর্ণায়তন বনা শূকরের বর্ণ গাঢ় ধূসর। কিন্তু শিশুগুলির বর্ণ রক্ত গুলির বর্ণের সহিত যার পর নাই অনৈক্য। শিশু গুলির লোম কোমল ও ঘন সন্নিবিষ্ট। এবং লোমের বর্ণ পিঙ্গল ও তাহার উপরে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ পরিসর ব্যাপিয়া হরিত্র। রক্তের ডোরা দৈর্ঘ্য ভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গেই বিস্তৃত থাকে। উহারা যতই বড় হইতে থাকে, ততই শরীরের বর্ণ ধূসরে পরিণত হইয়া যায়। জন্মবার ২।৩ মাস পরে উহাদের গর্ভ পশমগুলি পড়িয়া গিয়া ধূসর কুঁচি ঘারা আবৃত হয়।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত শূকর অনেক গুলি একত্র থাকিতে পারে না; যদিও কখন কখন একদলে ২০।২৫টা শূকর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা একটিরই সম্ভান সম্ভতি। শূকরী ৬ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে কতকগুলি সম্ভান প্রসব করে। এমন কি আমি নিত্যন্ত বিশ্বস্ত হুত্রে অবগত হইয়াছি, একটি মৃত্যু শূকরীর গর্ভ হইতে ২০টি সম্ভান বাহির করা হইয়াছিল। কোন কোন শূকরীর প্রসব কালের কিছুদিন পূর্বে উদর এবং শুন এমন ঝুলিয়া পড়ে যে, উহা ২।৩ ইঞ্চির জন্য মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। রক্ত শূকরী গুলিরই এইরূপ উদর ঝুলিয়া পড়ে। গিলবার্ট হোয়াইট নামক জনৈক ব্যক্তি একটি শূকরের বিষয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন

যে, ঐ শূকরীটি মৃত্যু হইবার পূর্বে অত্যান ৩০০শত সম্ভানের গর্ভধারিণী হইয়াছিল। শূকরী প্রসব কালের অত্যাধিক পূর্বে শুক পত্র, ঘাস ও অন্যান্য ডাল পালা দিয়া একটি কুটির নির্মাণ করিয়া লয়, এবং উহা এইরূপ আশ্চর্য্য কোণে প্রস্তুত যে রক্তের জল কিম্বা রৌদ্রের ভেজ উহাতে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারি না। এতদ্দেশীয় ছোট লোকেরা এই প্রকার কুটিরকে 'শূকরের ডেরা' কহে। এই কুটির দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্য কতগুলি ঘাস পাতা একত্র রাখিয়াছে, প্রকৃত কুটিরের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। এদেশীয় শূকরেরা প্রায়ই বর্ষাকালে হৈমন্তিক দান্য ক্ষেত্রের পার্শ্ব জঙ্গলে এবং শীত ঋতুতে কাঁটা ঝোপার নীচে এইরূপ ডেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রসব কালে উহারা দাড়াইয়া ঐ কুটিরের নিকটে প্রসব করে, প্রসব বেদনার সময় কোন ভয় পাইয়া যদি শূকরীকে স্থানান্তর যাইতে হয়, তবে তাহাতেও শূকরীর প্রসব কার্যের কোন প্রতিবন্ধক জন্মায় না। উহারা যেমনি অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্ভান গুলি ভূমিতে নিপতিত হয়। আবার সম্ভান গুলি এমনি সবল যে, মাটিতে পড়িয়া দুই মিনিট কাল নড়িয়া চড়িয়াই তাহাদের প্রসূতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে। এই রূপ আশ্চর্য্য কথা শুনিলে, সহসা যে পাঠক ইহাকে প্রকৃতিবিক্রম বলিয়া হাসিয়া উড়া-

ইবেন, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত কার্যকলাপ যতই পর্যালোচনা করিতে থাকিবে, ততই ইহা হইতে অনেক নূতন ও আশ্চর্য্য বিষয়ের আবিষ্কার হইতে থাকিবে । সুতরাং সামান্য বিষয়ের একটি আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা শুনিয়া কেহই ইহাকে প্রকৃতি বিকল্প বলিয়া উপহাস করিবে না । শূকরীর বুক হইতে পোট পর্য্যন্ত ২ পংক্তিতে ৬টি করিয়া ১২টি স্তন । পশ্চাৎ দিকস্থ শেষ দুইটি স্তনে একেবারেই দুগ্ধ হয় না । অন্য গুলিতে সমভাবেই দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে ।

শূকর শাবকৈরা ৩ । ৪মাসের অধিক মাতৃস্বাস্থ্য পান করে না । কিন্তু বহু সন্তানবতী বলিয়া শূকরী এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন ক্রিষ্ট হইয়া পড়ে ।

শূকরীর সন্তানের জন্য অত্যন্ত মমতা । যদি অন্য কোন রহস্তর জন্ত শূকরীর শাবক দিগকে আক্রমণ করিতে যায়, তখন সে অবশ্যই তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিবে । শূকরীর সামান্য দন্ত ভিন্ন যদিও আর কোনরূপ প্রতিযোগিতা করিবার অস্ত্র নাই, কিন্তু তথাপি সেই অস্ত্রই উহারা এমন দ্রুতগতিতে চালাইতে পারে যে, মুহূর্তের মধ্যে একজনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় ।

যে পর্য্যন্ত শূকরীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ছাগুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে । এই ছাগুলি বড় হইলে একদলে অনেকটি শূকর বলিয়া বোধ হয় ।

কিন্তু ইহাদের মাতা পুনরায় প্রসব করিলে ইহাদের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখে না । তখন উহারা আপনাই সন্তানের মা বাপ হইতে আরম্ভ করে ।

মৃত্তিকা খনন করিবার জন্য শূকরজাতি নিতান্তই উৎসুক । ইহাদের আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে অনেক সময় মৃত্তিকা খননের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ইহারা অনর্থকও ঐরূপ মৃত্তিকা খনন করিয়া রাখে । ইহাদের মৃত্তিকা খননের অস্ত্র উপরের ওষ্ঠ বা নাসিকার অগ্রভাগ । তেমন কঠিন মৃত্তিকার মধ্যেও উহা প্রবেশ করা ইয়া বল প্রয়োগ করিলে উহা উঠিয়া আইসে । নাসার ফুৎকারও এমনি প্রবল যে, খোদিত মৃত্তিকা একবার ফুৎকার করিলেই উহা দূরে সরিয়া যায় । শূকরের নিম্ন ওষ্ঠ অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং উপরি ওষ্ঠের মধ্যেই উহা রক্ষিত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা খনন করিবার সময় উহাতে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় না ।

পূর্বে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে পুংশূকরের কোনরূপ কথারই উল্লেখ করি নাই, নিম্নে উহাদের স্বভাবে এবং আকৃতিতে শূকরী হইতে যাহা কিছু বৈকল্য আছে, তাহা লিখিত হইল ।

পুংশূকরের উপরের এবং নীচের মাটির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রত্যেক দিকে দুইটি অতি রূহৎ দন্ত নির্গত হইয়া উপরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে । ঐ দন্তগুলি সম্পূর্ণ গোলা মত, ত্রিকোণ এবং উহার

এতোকটি কোণ অত্যন্ত ধারাল। দন্তের যে ভাগ বাহিরে থাকে, উহা নিরেট এবং যাহা মাংস ও মাটাদ্বির মধ্যে থাকে, তাহা শূন্যগর্ত। হস্তিদন্তের ন্যায় এগুলিও উৎকৃষ্ট রস *। উহাদের আত্মরক্ষার জন্য এই দন্ত চারিটি প্রধানতম অস্ত্র। এই চারিটির মধ্যে নীচের দুইটি অধিক কার্যকারী। যে কোন পশুই কেন হটুক না, যদি একবার উহার শরীরে দন্তবিদ্ধ করিতে পারে, তবে উহার শরীর ৮। ১০ অঙ্গুলি পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিতে পারে। পরে উহার যে দুই একটি দৃষ্টান্ত লিখিত হইবে, পাঠক তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইবেন। এদেশীয় ছোট লোকেরা এইরূপ দন্তবিশিষ্ট বড় বড় শূকরগুলিকে “বয়রা” কহে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এই নয় শূকর গুলির প্রবণ শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু ইহা নিতান্তই একটি ভ্রম মূলক সংস্কার। এইরূপ সংস্কার হইবার একটি কারণ আছে, তাহা এই,—আমি দেখিয়াছি অত্যন্ত বলবান শূকর গুলি কোন প্রকার শব্দ পাইলেও

* ইংরাজিতে আইভরি শব্দে যে প্রকার অস্তিকে বুঝা যায়, বাজলাতে সেইরূপ অস্তিবোধক কোন শব্দ নাই; আমি বঙ্গসাহিত্যজগতের একটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করাত্তে, তিনি আমাকে আইভরি শব্দের অর্থ রস লিখিতে বলিলেন। আমি ভরসা করি, তাহার এই উপদেশ বাজলাতে উপেক্ষিত হইবে না।

বড় কিছু একটা মনে করে না। যখন উহার ক্ষেত্র চাষ করিতে আসে, তখন কোন রূপ সামান্য শব্দে উহার ভয় পায় না, বরং অহঙ্কার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এজন্য কৃষকেরা মনে করে ইহার কানে শোনে না।

শূকরের যুদ্ধ বড় ভয়ানক। ইহাদিগের দুইটি পুং শূকরের অন্য কোন সময়ে যুদ্ধ হটুক আর না হটুক, যখন একটি শূকরীর গর্ত সঞ্চারের সময় উপস্থিত হয়, তখন দুইটি সমবলশালী শূকর একত্রে উপস্থিত হইলে আর রক্ষা থাকে না। যুদ্ধের অপরিহার্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া উহার একটি না একটি হত হয় বটে, কিন্তু অক্ষত শরীরে বিজয়ী হইবার সাধ্য নাই। এতদ্ব্যতীত যখনই ইহার কাহারও উপরে জুদ্ধ হয়, তখনই ইহার ভয়ানক রূপ ধারণ করে। নিজ হইতে দশগুণ বড় জন্তু হইলেও আক্রমণ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্তস্বরে শুনিয়াছি যে, একটি চিতা ব্যাঘ্র আহাঁরের জন্য একটি শূকরকে ধরিয়াছিল, এবং শূকর ও ব্যাঘ্রকে ফিরিয়া এমন ভয়ানক আঘাত করে যে উভয়েরই এক স্থানে মৃত্যু হয়।

শূকরেরা সময় সময় এমনি কুৎসিত শব্দ করে, যে তাহা শুনিলে কণ্ঠ কপাটি ধরিয়া যায়। ঘটনাক্রমে যদি কোন শূকরের সম্মুখে ছোট ছোট বাঘ উপস্থিত হয়, তবে শূকরের চীৎকারে দৌড়িয়া পলায়, অথবা নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করে।

পুংশুকরের শরীরের গঠনে অধিক কিছু প্রভেদ নাই বটে, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিতে, পুরুষ এবং স্ত্রীর গঠনে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা ইহাদিগের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পুংশুকরের বক্ষ অধিকতর প্রশস্ত এবং কটিদেশ একটুকু সরু। ইহাদের মুষ্ণু অতি বিচিত্রভাবে গুহাধারের নিম্নে মাংসের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে, স্বক্ষদৃষ্টিতে না দেখিলে ইহাও ঐ স্থানের অত্যাশ্রিত উচ্চতা অনুভব করা যায় না। শূকরের মুষ্ণু, শুনিয়াছি দুর্দল গোকর অতি বলকারক ঔষধ। আমি উহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, যাহারা পরীক্ষা করিয়াছে, তাহাদের নিকটে শুনিয়াছি।

শূকরের শরীরে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ অধিক বসা আছে। তাত্র ও আশ্বিন মাসে যখন শস্য পরিপক হয় এবং উহার উপযুক্তরূপে আহার পায়, তখন ইহাদিগের বসা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাংসও নাকি অপেক্ষাকৃত তখন স্নান হয়। এদেশীয় চণ্ডাল এবং কিরিজিরা আমাকে এবিষয় অবগত করাইয়াছে। উহারাই ইহাও বলে যে, যখন পোয়ারা পাকিয়া উঠিলে শূকর উহা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন উহাদের বসা কমিয়া যায়, মাংসও স্নান হইয়া রহে না।

এদেশীয় শস্যের পক্ষে বন্যশূকর এক ভয়ানক শত্রু। ইহারাই বহুসংখ্যক এক সময়ে একত্র হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এবং যত না আহার করে, তাহার দশগুণ

অনিষ্ট করিয়া যায়। শূকরেরা সচরাচর রাত্রিতেই আহাৰাদি করে, দিবসে কাঁটাঝোপার নীচে শুইয়া থাকে।

শস্য রোপণের পূর্বে শূকরগুলি কোন কোন ক্ষেত্র এমনভাবে খুঁড়িয়া রাখে যে প্রথম দৃষ্টিতে উহা কর্ষিত ভূমি বলিয়া বোধ হয়। এদেশীয় কৃষকেরা শূকরের দোঁড়িয়া হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য স্তম্ভের একটি উপায় অবলম্বন করে। ক্ষেত্রের কোন এক স্থানে উচ্চ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটার বাঁধিয়া লয়। কৃষকেরা উহাকে “টং” বলে। সমস্ত রাত্রি ‘টং’ এ বসিয়া বন্দুক কি অন্য কিছুদ্বারা ভয় দেখাইয়া শূকরদিগকে ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না। যদি একটি রাত্রি কৃষকেরা এইরূপ সতর্কতার সহিত না থাকে, তবে পরদিন সমস্ত জমিদারের নিকটে বৎসরের খাজানা মাপ পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে করজোড় করিয়া কাঁদিতে হয়। কোন কোন দাঁতাল শূকর এমন ভয়ানক ক্রোধী যে, যে দিক হইতে উহাদিগের প্রতি বন্দুক ছোড়া যায়, ধূয়া দেখিয়া সেই দিকেই আক্রমণ করিতে দোড়িয়া আইসে। শিকারীরা যদি শূকরের এই প্রকার স্বভাব অবগত না থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। পদব্রজে শিকার করিতে হইলে, শূকরের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র সামান্য উপায় আছে;—শূকর যখন সোজাভাবে শিকারীকে আক্রমণ করিতে

দৌড়িয়া। জ্বাইসে, তখন যদি শিকারীও কেবল সোজাভাবে না দৌড়াইয়া একবার এদিক ওদিক বক্রগমনে দৌড়িতে থাকে, তবে অনেকটা রক্ষা পাইবার আশা থাকে। শূকর সোজা দৌড়িয়া মনুষ্যকে ধরিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্য বক্রগমনে একদিকে সরিয়া গেলে, শূকর জুঁহার প্রকাণ্ড শরীরের সম্মুখগতি রোধ করিয়া হঠাৎ মনুষ্যের দিকে ফিরিতে পারে না। সুতরাং এই নিয়ম জানা থাকিলে সময় সময় অনেকটা উপকারের সম্ভাব। প্রকৃত পক্ষে মাটিতে দাঁড়াইয়া শূকর শিকার করা নিতান্তই অন্যায়। হস্তীর উপরে থাকিলে শূকর শিকারে একেবারেই জ্ঞানশূন্য নাই। শূকরীরা মনুষ্যদিগকে এরূপ ভয়ানকভাবে আক্রমণ করে না; কোন রূপ শব্দ শুনিলেই দৌড়িয়া পলায়।

ইদানিং সাহেবেরা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া বন্যমদ্বারা শূকর হত্যা করিয়া থাকে, (শূকর শিকারের বন্যমগুলি মুন্সের প্রদেশে প্রস্তুত হয়, উহার ফলকের সহিত ৪।৫ ফিট একটি বংশদণ্ড লাগান থাকে ও ঐ দণ্ডের অপর প্রান্তে কতকগুলি মীমক গালাইয়া ভাঙ্গি করিয়া দেয়।) হস্তী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বন হইতে শূকর গুলিকে তাড়াইলে যেমন উহার মাঠে বাহির হয়, অমনি উহার পিছে পিছে অশ্ব চালাইয়া পৃষ্ঠে বন্য বসাইয়া দেয় এবং সময় সময় এইরূপ শিকারীরা এমন বিপদে পড়ে যে, তাহার গল্প শুনিলে

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

এদেশের একজন মৃগয়াপ্রিয় এমিঙ্গ ভূস্বামীর বন্যমশিকার করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি এক দিবস এইরূপে একটি শূকরকে আহত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শূকরও মরিল না, হুর্ষিপাক বশতঃ হাত হইতে বন্যমও পড়িয়া গেল। এমন সময় শূকর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করাতে তিনি ঘোড়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, শূকরও তাঁহার পিছে পিছে ছুটিল। তিনি যাইতে যাইতে একটি কর্দমময় স্থানে ঘোড়া সহিত একেবারে গাড়িয়া পড়িলেন, শূকরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কর্দমাক্ত স্থানে গাড়িয়া পড়িল। সুতরাং শূকর আর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না, ইত্যবসরে সঙ্গীয় একটি লোক গিয়া শূকরকে সংহার করিল।

১৮৭৬ সনে শিকার সময়ে একটি আহত শূকরে ক্রমান্বয়ে ৭।৮টি হস্তীকে পরাস্ত করে। শূকরটি আহত হইয়া একটি জঙ্গলে ছিল, উহাকে বাহির করিবার জন্য যেমন একটি হস্তী ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করে, অমনি উহার পায়ে দাঁত বিদাঁইয়া উহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর সকল গুলি হস্তী একেবারে জঙ্গলে প্রবেশ করাইয়া উহাকে বাহির করিয়া হত্যা করা হয়।

শূকরের প্রধান আহাৰ্য্য কচু, ধান,

কেশুর ইত্যাদি। কখন কখন বা মৃতদেহ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে আহার করিতে দেখা গিয়াছে। পালিত শূকরেরা এতদ্ভিন্ন এত অপরিষ্কার বস্তু আহার করে যে, তাহা মনে হইলেও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

শূকরের প্রাণ অত্যন্ত কঠিন। ফুস ফুস ভিন্ন শরীরের অন্য স্থানে ৭। ৮ টি গুলি লাগিলেও শীঘ্র প্রাণে বিনষ্ট হয় না। আমি একটি শূকরকে বারটি গুলি মারিয়া ছিলাম। শূকরের শিশুগুলিও অত্যন্ত কঠিনপ্রাণ। একটি অস্পবয়স্ক শূকর-শিশুকে গুলি মারিলে উহার সমস্ত নীচের ওষ্ঠ ও গলার কতক অংশ ছিঁড়িয়া গেল; তবুও প্রাণে মরিল না। আমার সঙ্গে বেড্-ফোর্ড নামে বলশালী জর্নেক ইংরেজ ছিল, তিনি বলিলেন, “যখন শূকরটি বাঁচিবে না, তখন শীঘ্র মারিয়া ফেলাই ভাল।” এই বলিয়া তিনি একটি লাঠী দ্বারা উহার মস্তকে সজোরে ১০। ১২ টি আঘাত করিলেন, তথাপি উহার প্রাণ বিরোধী হইল না।

শূকরকে শিশুকাল হইতে যত্ন করিয়া পুষিলে বেশ পোষ্য মানে। এদেশে মাঝে মাঝে অনেককেই শূকর পুষিতে দেখা যায় এবং উহাদের মধ্যে শূকরের বর্ণেরও নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ শূকরের রঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ইহাদের শব্দর জাতিও বিভিন্ন প্রকার বর্ণ হইয়া যায়। এই শব্দর শাবক গুলির বর্ণ পূর্বোক্ত শূকর শাবকের বর্ণের ন্যায়

নহে। উহাদিগের শরীরের যে বর্ণ (মাদা কালা প্রভৃতি) জন্মবার সময়ই তাহা পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উহার বড় হইলেও বর্ণের আর পরিবর্তন হয় না। এতদ্দেশে এই জাতীয় শূকর গুলিই অনেকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। একদলে ৫০০ শূকরের অধিক প্রতিপালিত হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এইরূপ রূহৎ পালের মধ্যে যে শূকরী গুলির শাবক নিতান্ত শিশু, তাহার রাত্রিতে শয়নের সময় পাল হইতে ১০। ১২ ছাত দূরে গিয়া সমস্ত গুলিকে শুন্য পান করায়। রক্তগুলি ঘৃণা ইয়া রহে, ও ছা গুলি তাহার হৃদয় খায়। সময় সময় শাবকগুলি উহাদের মাতাকে ভুলিয়া অন্য শূকরীরও শুন্য পান করে, কিন্তু ইহাতে সেই শূকরী শাবককে কিছু বলে না।

বন্য শূকরের ন্যায় ইহারা এসবের জন্য ডেরা প্রস্তুত করে না। রাখালেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময়, যেখানে এসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই এসব করে।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, শূকরের বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে; কেবল ইহাদের বিজ্ঞী আকৃতি দেখিয়া, এবং আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদের নিতান্ত জঘন্য প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া, মানুষেরা ইহাদের মানসিক বৃত্তির পরিমার্জনপূর্বক ইহাকে নানারূপ কার্যশিক্ষা দিতে আলাসা করে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহাদের দ্বারা অনেক প্রকার কার্য সংসাদিত করা যাইতে

পারে। কখন কখন ইহাদের পৃষ্ঠে জিন্ কসিয়া উপরে আরোহণ করা যায়, কখন কখন বা শকটাদিতে ২টী বা ৪টী যোজনা করিয়া শকট চালান যায়।

একটি কৃষক, তাহার শকটে ৪ টী শূকর গুড়িয়া, সেটে এলুভিন্‌সের বাজারে যাইত, এবং ২।৩ বার সেই বাজারে পরিভ্রমণ করিয়া, শূকরদিগকে কিছুকাল বিশ্রাম করাইত। এবং পুনরায় সমস্ত দিনিস পত্র পূর্ণ শকটে উছাদিগকে যোজনা করিয়া, অবলীলাক্রমে ২।৩ মাইলের পথ উহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত।

• নরফোক দেশীয় আর একটি কৃষক, ৪ চারিক্রোশ দূরবর্তী উইচ্‌বেইচ স্থানে এক ঘণ্টার উপস্থিত হইবে এই বাজি রাখিয়া, তাহার শূকরে আরোহণ করিত, কিন্তু তাহার শূকর নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে তাহাকে তথায় পৌছাইয়া বাজি জিতাইয়া দিত। শিক্ষা দিলে শূকরেরা অশ্বের ন্যায় ৪ চারি ফিট উচ্চ দেয়াল লাফাইয়া পার হইতে পারে।

শূকরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন শূকরকে শিক্ষা দিলে কুকুরের ন্যায় বন হইতে বিবিধ শিকার বাহির করিতে পারে। এক ব্যক্তির সুট্‌ নামে একটি শূকরী ছিল, সে শিকারে নিত্যন্ত পারদর্শিতা দেখাইত। ৪০ গজ দূরে কোন রূপ শিকার থাকিলে তাহা যাইয়া বাহির করিয়া দিত, কিন্তু উহার এরূপ আশ্চর্য্য অস্তাব ছিল যে, সম্মুখে কোন শ-

ক থাকিলে তাহার সে তল্লাসও নিতনা।

শূকরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু গীজদি ও মুসলমানেরা ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া স্পর্শও করে না। এতদ্দেশীয় আদিম অ-মভ্য জাতিদিগের ইহা একটি প্রধান জীবিকা। সুসভ্য ইংরেজেরাও শূকরের মাংস নিত্যন্ত সুখাদ্য বলিয়া মনে করেন। ইহারা বন্যশূকর কিংবা সাধারণ পালিত শূকর ভক্ষণ করেন না। তাহাদের জন্য যে শূকরের মাংস মনোনীত করা হয়, সেই গুলিকে শিশুকাল হইতে ছোট কামরাতে বদ্ধ রাখিয়া অন্য কোনরূপে অপরিষ্কার বস্তু খাইতে দেওয়া হয় না। সিদ্ধ আলু ও সিদ্ধ যব খাওয়াইতে খাওয়াইতে উছাদিগের শরীরে যখন ২৫৫ পরিমাণ বসী সঞ্চয় হইয়া থাকে, এবং আপন শরীরের ভারে যখন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তখন উছাদিগকে হত্যা করিয়া সেই মাংস সাং-হেবদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

শূকরেরা সমুদ্রগে বিলক্ষণ পটু। সমুদ্রবর্তী শূকরী সাঁতার দিলে ছা গুলিও পিছে পিছে সাঁতারিয়া যায় এবং ক্রান্ত হইলে সম্মুখের পা দিয়া উছাদের মায়ের পৃষ্ঠে ভর দিয়া রহে।

শূকরের তৈল অনেক প্রকারে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কুঁচিতে স্কন্দর স্কন্দর বিলাতী ব্রাস প্রস্তুত হয় এবং চর্মে অস্বারোহণের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট জিন্ নির্মাণ করা যাইতে পারে। সাধারণ জিন্ হইতে এই জিনের মূল্য ও স্থায়িত্ব উভয়ই অধিক।

শুকর সম্বন্ধে আমরা আজি পর্য্যন্ত যে সমস্ত র্ত্তাস্ত অবগত হইয়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, আমার শূকরে যদি তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য একটু

স্বাধী করিতে পারি, তবে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা একটি ভাল পশু আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিব ।

ক্রি:—

স্প্যানিস সভ্যতা ।

আজি কালি ইউরোপের সকল জাতিই ক্রীমান্ । ফ্রান্স বর্ষগোমুখ মেঘরাশির ন্যায় নিকৃষ্টভাবে নিজ সময় প্রতীক্ষা করিতেছে । ইংলণ্ড ও কসিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী দেশ সকল স্বায়ত্ত করিতেছে । জার্মাণের প্রভুত্বল যথেষ্টাচার রাজগণের নিকট হইতে আপনাদের স্বয়ং সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু স্পেন, হতবল, নিকৃষ্ট, নিছল ; স্পেন, ধীরে ধীরে ইতিহাস ও মনুষ্য হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে ।

কিন্তু স্পেন কি চিরকাল এইরূপ ছিল ? না এমন একসময় ছিল, যখন স্পেনের জয়পাতাকা দেশে বিদেশে উড্ডীন হইত, যখন হলণ্ড, আমেরিকা, জার্মাণ প্রভৃতি দেশ হইতে স্পেনের দনাগার পরিপূরিত হইত, যখন স্পেনের নামে মহারাজী এলিজাবেথও কম্পিতা হইতেন ? কি কারণে স্পেনের আধুনিক উজ্জ্বলদশা উপস্থিত হইল সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে স্পেনের সহিত ভারতবর্ষের অনেক গৌসাদৃশ্য আছে । ইহার উত্তরে হিমালয়ের ন্যায় পিরিনিস “স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মেরুদণ্ডঃ” রূপে অবস্থিত । দেশের মধ্যভাগ বিস্তৃত প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পার্বত্যমালায় বিভক্ত । ভারতবর্ষে যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দীর্ঘব্যাপিনী নদী, স্পেনেও সেইরূপ ইব্রো, টেগস প্রভৃতি বিশাল স্রোতঃ স্বতী । স্পেনের তিন দিক্ ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত । প্রাকৃতিক দৃশ্য মহান্ ও বিস্ময়কর হইলে মনুষ্যের মনে যে সকল ভাব সঞ্চারিত হয়, স্পেনীয়দের মনেও সেই সকল ভাব আধিপত্য লাভ করিয়াছিল । যে দেশের লোকেরা নিত্য নিত্য অভ্রভেদী পার্বত্য ও বিশাল সমুদ্র দেখিতে পায়, তাহাদের মনে স্বভাবতঃই পার্বত্য ও সমুদ্রের সৃষ্টি কর্তার সত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় । তাহারা এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আপনাদের অসামান্য ও ক্ষুদ্র বৃ-

স্থিতে পাইরে এবং একান্ত মনে অবসন্ন চিত্তে সেই রহৎ হইতেও রহৎ দেবদেব পুরমেশ্বরের নিকট আশ্রয় লয়। ঈশ্বর-ভক্তি ও নিঃস্বের প্রতি অনাদর তাহাদের হৃদয়ের প্রধান প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। প্রথম হইতেই ভারতবর্ষীয় ও স্পেনীয়দের মনে এই দুইটি প্রবৃত্তির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুষ্য আপনার প্রতি হতাদর হইলে, অন্য একজন প্রভুর আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়। সূত্রান্তে প্রভুভক্তি ঐরূপ মনুষ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; এবং নিঃস্ব প্রভু ক্ষমতাশালী হইলেও তিনি অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে, স্পেনীয়দের মনে তিনটি প্রবৃত্তি সংরোপিত হয়—ঈশ্বর ভক্তি, নিঃস্বের প্রতি অনাদর, এবং প্রভু ভক্তি। তাহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন, যে প্রাচীন কালে ভারতবাসীদের মনেও এই তিনটি প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি, ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য এবং দুর্বল ভারতবাসীদের ভূত্যোচিত মন্তব্য এই কয়টি প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

নানা কারণে স্পেনীয়দের মনে এই কয়টি প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। স্পেনীয়েরা প্রথমতঃ রোম কর্তৃক বিজিত হয়। বহুকাল পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা ও ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়া-

ছিল। যুদ্ধের পূর্বে তাহারা প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করিয়া যা-ইত। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিত, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইলে হত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত। যুদ্ধ কালে, তাহারা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত, কারণ প্রভুর শাসনাধীন হওয়াই যুদ্ধে জয়লাভ করার প্রধান উপায়। এই রূপে স্পেনীয়দের মনে প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি অধিকতর রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

রোমের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ ভ্রাস হইলে ভিসিগথেরা স্পেন অধিকার করে। স্পেনীয়দিগকে পুনরায় দেশ রক্ষার জন্য বন্ধপরিকর হইতে হয়। সূত্রান্তে তাহাদের মনে, পূর্বের ন্যায়, ঈশ্বর ভক্তি ও প্রভুভক্তি আরও অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া গেল।

ভিসিগথেরা (Visigoth) দেশে লঙ্কাধিকার না হইতে হইতেই আরবীয় মুসলমানেরা স্পেন অধিকার করিল। সূত্রান্তে স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষা করিবার জন্য স্পেনীয়দিগকে পুনরায় বন্ধপরিকর হইতে হইল। রোমীয় ও ভিসিগথদিগের সহিত যুদ্ধে স্পেনীয়দের প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি পূর্বেরই অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এক্ষণে বিদগ্ধী, ভিন্ন বর্ণধারী, অসভ্য আসিয়াবাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে ঐ দুই প্রবৃত্তি আরও অধিকতর রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ কালে অন্য অন্য অনেকগুলি ক্ষ-
দয় বৃত্তি পরিপোষিত হয়, তন্মধ্যে সাহস
ও কর্তব্যমততা সর্বপ্রধান। প্রভু ভক্তির
সহিত এই শেষোক্ত দুইটি গুণ যোগ দে-
ওয়াতে স্পেনীয়েরা তাত্‌কালিক জাতিদের
মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ হইয়া
উঠিল। এক দেশের পর অন্য দেশ তাহা-
দের করকবলিত হইতে লাগিল। ইউ-
রোপীয় সমস্ত জাতিগণের মধ্যে স্পেন
সর্ব প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

কিন্তু একদোষে স্পেনের এই সম্পাদ-
চিরস্থায়ী হইল না। স্পেনীয়েরা অস্ত্র অন্য
অনেক গুণে বিভূষিত হইল বটে, কিন্তু
পূর্বের তাহারা যেমন অন্যের দুখাপেক্ষী
ছিল এখন ও সেইরূপ রহিল। সাম-
রিক উন্নতি সত্ত্বে স্পেনীয়েরা রাজার
মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিত। রাজা তা-
হাদিগকে যে পথে চালাইতেন, তাহারা
সেই পথে অকুতোভয়ে অমিত সাহসের
সহিত চলিত, কখন বিকল্পিত করিত না।
আবার পারমৌলিক উন্নতি সত্ত্বে স্পে-
নীয়েরা স্বদেশস্থ ধর্ম যাজকের সম্পূর্ণ
অনুবর্তী হইয়া চলিত। ধর্ম যাজক যে
কিছু উপদেশ দিতেন, স্পেনীয়েরা অকুণ্ঠ
চিত্তে তত্ত্বি ও শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল
প্রতিপালন করিত। এই রূপে, স্পেনী-
য়েরা কখন বা রাজার কখন বা ধর্মযাজ-
কের অনুবর্তী হইয়া নানা রূপ সংকর্ষ ক-
রিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা স্বাধীন চিন্তা
বা স্বানুবর্তিতা একেবারে পরিত্যাগ করিল।

যতদিন স্পেনের রাজা ও ধর্মযাজক নিজ-
কর্তব্য কার্যে অবহিত ছিলেন, ততদিন
স্পেনের উন্নতিও অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু
যখন রাশি রাশি অর্থদ্বারা স্পেনের ধনা-
গার ক্ষীণ হইতে লাগিল, যখন ইতঃস্ত
রাজ্যবিস্তার দ্বারা স্পেনের ক্ষমতা চতু-
র্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন রাজা
ও ধর্মযাজক উভয়েই গর্হিত, স্বার্থপর ও
সুখবিলাসী হইয়া উঠিলেন। সেই দিন
হইতে স্পেনের অধঃপতন আরম্ভ হইল।
যতক্ষণ সেনাপতি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ
তাহার অধীনস্থ সৈন্যেরা বলবিক্রম প্র-
কাশ করিয়া বিপক্ষ দলের ভীতি বিধান
করিতোঁত। কিন্তু যে দণ্ডে সেনাপতি
হত হইলেন, অমনি সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হ-
ইয়া, যে যেদিকে পারিল সে সেদিকে
শলাঘন করিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে
লাগিল।

এহুলে ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের তুল-
না করিলে, স্পেনের অবস্থা আরও প-
রিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডে যখন
কোন গর্হিত অত্যাচারী, বা স্বার্থপর
রাজা সিংহাসনারোহণ করিতেন, তখন
ইংলণ্ডের প্রজারা স্পেনীয়দের ন্যায় সমস্ত
আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া, নিষ্কণ্ঠম নি-
জীব ভাবে আপনাদের অধঃপাতের
পথে অগ্রসর হইত না। তাহারা দলবদ্ধ
হইয়া যাহাতে সেই রাজা সিংহাসন হ-
ইতে দূরীকৃত হন সেই চেষ্টা করিত। প্র-
য়োজন পড়িলে তাহারা ঐরূপ রাজার

প্রাণবিনাশে পর্যন্ত মনুচিত হইত না। প্রথম চ'ল'স্, এইরূপে প্রজাদের কর্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বিতীয় জেম্‌স্ যদি সময়ে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনিও প্রথম চ'ল'সের "রক্তশ্রোত * রক্তি করাইতেন।", ইংলণ্ডীয়েরা শুদ্ধ এইরূপ রাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করাইয়া মনুষ্ট হইতেন না। যাহাতে ঐ সকল অত্যাচারী রাজার পরিবর্তে দেশহিতৈষী, প্রজাবৎসল, সত্যপ্রিয় রাজা সিংহাসনাক্রুত হইয়া তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে ইংলণ্ড ও স্পেনের অবস্থাগত বৈষম্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ড স্বাভাবিকী স্বতরাং ইংলণ্ডের রাজার অধঃপতন হইলে ইংলণ্ডের সর্বসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিছুকাল বিদ্রোহ বিপ্লব সহ্য করিয়া ইংলণ্ড শান্তির পথে, উন্নতির পথে পুনরায় ধাবমান হইত। স্পেন পরানুবর্তী স্বতরাং রাজার অধঃপতন হইলে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত।

এইরূপে স্পেনীয়দের অধঃপতন আরম্ভ হইলে, তাঁহারা সহজেই অন্য জাতি কর্তৃক বিজিত হইতে লাগিল। সন্নিহিত ফ্রান্সরাজ সহজেই স্পেন অধিকার করিলেন। যত দিন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি স্পেনের সহিত যোগ দিত ততদিন

* জগৎসিংহ ওসমানকে বলিয়াছিলেন, "না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তশ্রোত রক্তি করাইব।"

স্পেন অমিত মাহসের সহিত ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিত। কিন্তু কোন কারণবশতঃ সেই জাতি স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেই স্পেন পূর্বের জায় শত্রুর পদ দলিত হইত। কিছু কাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে ফ্রান্সরাজ দৃঢ়রূপে স্বকীয় ক্ষমতা স্পেনে সংস্থাপিত, করিলেন।

তখন বিজিত জাতিদের যে সকল দোষ ঘটে, এক একটি করিয়া সেই সকল গুলি স্পেনীয়দের মনে অধিকার লাভ করিতে লাগিল। সে দিকে ফেঞ্চরাও যাহাতে স্পেনীয়দের সকল দিকে উন্নতি হয় সর্বাস্থঃকরণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অবস্থা স্পেনের অবস্থাও তৎকালে অবিকল সেইরূপ হইয়া উঠিল। জেতারী উভয়েই ভিন্ন দেশী। উভয় স্থলেই জেতারী বিজিতদের মঙ্গল প্রার্থী। উভয় স্থলেই জেতারী স্বদেশস্থ মঙ্গলকর নিয়মাবলী বিজিতদের মধ্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য সচেষ্ট। উভয়েরই একদল লোক জেতাদের পক্ষপাতী; তাঁহাদের পক্ষে জেতাদের সমস্তই (ভাষা, পরিচ্ছদ, প্রভৃতি) সর্বোৎকৃষ্ট। উভয় এই অন্য একদল লোক স্বদেশ প্রচলিত পূর্ব প্রথা ও পূর্ব নিয়মের পক্ষপাতী; তাঁহাদের চক্ষে দেশে পূর্ব যাহা কিছু ছিল তৎ সমস্তই সর্বোৎকৃষ্ট। উভয় এই জেতাদের পক্ষই, সকল প্রকার বিয় বিপত্তি সত্ত্বেও বহুসংখ্য ও ক্রমশঃ লব্ধপ্রায়।

তখন স্পেনে ফ্রান্সের কাপড় না হইলে বস্ত্র পরিধান করা হইত না, ফ্রান্সের রাজমন্ত্রী না হইলে গৃহ প্রস্তুত হইত না। ফ্রান্সের রীতিতে না হইলে গৃহ মজ্জাগ মনস্তত্ত্ব হইত না। অস্পৃশ্য এখন যেমন ইংরাজ ভারতবাসীদের প্রদান অবলম্বন, ফ্রেঞ্চরাও স্পেনীয়দের পক্ষে প্রায় সেইরূপ ছিল।

যতদিন ফ্রান্স ক্ষমতামালা রহিল, ততদিন স্পেনের অবস্থা একরূপ চলিল। কিন্তু যখন ফ্রান্স নিজের হতবল হইল, যখন ওয়েলিংটন স্পেনে তাহাদের ক্ষমতা খর্বীকৃত করিলেন তখন স্পেনে আবায় এক ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। যে সকল ফ্রেঞ্চ প্রথা স্পেনে রোপিত হইয়াছিল, স্পেনীয়েরা একেই সেই ঠুলিকে সমূলে উন্মূলিত করিতে লাগিল, এবং তৎপরিবর্তে ও তৎস্থলে স্বদেশের প্রাচীন প্রথা সমস্ত প্রচলিত করিতে লাগিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন, গৃহ কর্ম প্রভৃতি যেখানে যে টুক ফ্রেঞ্চদের অনুযায়ী ছিল, স্পেনীয়েরা সেইখানে সেই টুক পরিবর্তিত করিয়া দিয়া ত্বরিপরিতে স্বদেশ প্রথা প্রবর্তিত করিয়া দিলেন। আজ ও স্পেন এইরূপ পরিবর্তন ও প্রবর্তন চলিতেছে। ফ্রেঞ্চরা যে গৃহটি অতি যত্নে, অতি পরি-

শ্রমে পরিপাকী রূপে নির্মান করিয়াছিল, স্পেনীয়েরা আজ তাহার ছাদটি, কালি তাহার কড়িটি পরিদর্শন তাহার দরজাটি একেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। স্মরণ্য পুরাতন বাড়ির সংস্কার কালে যেরূপ দৃশ্য হয়, আজ কালি স্পেনের দৃশ্যও অবিকল সেইরূপ। এখানে কতক ঠুলি লোক ঘরকি প্রস্তুত করিতেছে। এখানে কতক গুলি লোক ইটের বোঝা লইয়া গোলমাল করিতে উপরে উঠিতেছে। এখানে ভয় ইটক পতনের শব্দ, এখানে ভূতাদের কলরব, এখানে মিস্ত্রীদের কলরব, এখানে ইঞ্জিনিয়ারের ডাউন প্রভৃতি নানা বিরক্তি কর দৃশ্য দেশ পরিপূর্ণিত হইতেছে। স্পেন আপন লইয়া বাস্তব, স্মরণ্য পৃথিবীর কোণায় কি হইতেছে, তাহা তাহার দেখিবার অবকাশ নাই।

শুদ্ধ ইতিহাসে বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইল না। স্পেনের এই অবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অন্যায্যবী কি না, এবং ইংরেজেরা এদেশ হইতে বিদায় লইলে ভারতীয়েরা স্পেনবাসীদের ন্যায় আকুল হইবে কিনা এই তত্ত্বটি প্রশ্নাকারে পাঠকের নিকট উপস্থিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

লুক্ৰিসিয়া ।

“অইত দিবসনাথ, উঠিল পূরবে;
 ছড়াইয়া কণকের তরল কিরণ,—
 “এনিওর” শ্যাম জলে; নেহারি উষায়
 অইত মধুরে মরি! কুস্মনিল বনে
 বিহঙ্গম বিহঙ্গীর চুম্বিয়া অধর;
 অইত ফুটিল ফুল, ফুটিল সরোজি
 সরোবরে হস্তামনে জলজ স্নন্দরী;
 অইত প্রকৃতি দেবী ধরিল মোহাগে
 বিশ্ববিনোদিনী বেশ নয়নরঞ্জিনী;
 কেন আজি কোন দুঃখে কেমনে বলিব,
 প্রভাতের চাকবেশ সন্দেশ নয়নে,
 তরুণ অকণ অই তরল অশ্রু,
 এনিও-লহরী লীলা, অনিল চঞ্চল,
 বিহঙ্গের কলকণ্ঠ, কুসুম কানন;
 কিম্বা অই স্নহাসিনি সরোজীর পাশে,
 সমীরের ভ্রমরের প্রণয় মিনতি,
 হলাহলে মাখা যেন, নয়নে আমার,
 ইচ্ছাকরে এইক্ষণে, কি বলিব আর
 অনন্ত তিমিরজালে লুকাই বদন।
 এখনো এল না কেন প্রাণেশ আমার!
 রাখিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ,
 তাজিব কি কলঙ্কিত জীবন একণে?
 তাজিব না তাজিব না আশুক প্রাণেশ
 চরণকমলে তাঁর করি নিবেদন।
 অকলঙ্ক মরমের অসহ্য বেদনা।

তার পারে জন্মশোধ, দেখি একবার,
 মিটায় মনের সাধ, ভরিয়া নয়ন
 প্রাণেশের প্রেমময় বদন মণ্ডল! !
 অবশেষে, অরপিয়া নাথের চরণে,
 কলুষিত কলেবর, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
 ছিড়িব প্রাণের লতা, জীবন কাননে!
 আর কেন প্রাণনাথ, এস একবার!
 ককণ বিকল কণ্ঠে ডাকে অভাগিনী;
 কত দিন, যদি নাথ ডাকিত কিস্করী,
 শিবিরে, প্রান্তরে, কিম্বা আহব অঙ্গনে,
 যথায় থাকিতে তুমি, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
 কি বলিব, প্রণয়ের বিজলী সঞ্চারে,
 অমনি হৃদয়-তার, বাজিত তোমার,
 অমনি প্রাণেশ তুমি, আগিতে সরে,
 তুষিতে, বদন মম করিয়া চুম্বন!
 আজি কেন, ডাকি নাথ, ডাকি শতবার,
 নাহি পাই দরশন, অভাগীর প্রতি
 কেন এত অকলঙ্ক, জীবন জীবন!
 এস নাথ ত্বর করি, আর কতক্ষণ,
 বহিবেন বসুমতী, পাপিনীর ভার!
 যত উঠিছেন রবি, তরঙ্গি অশ্রু,
 ততই বাড়িছে মম হৃদয়বেদনা;
 ও কি ও তুরঙ্গ অই হ্রৈসিল দুয়ারে,
 অই বুঝি আসিলেন হৃদয়রঞ্জন!
 এই যে প্রাণেশ মম, নয়ন উপরে,

নিরখি নাথের মুখ, শোক-পারাবার
উচ্ছ্বাসিত হল প্রাণে, জ্বলিল অনল,
রাখিতে পারি না আর নয়নের নীর !
নয়নের বারি আজি, অনন্ত যতনে,
অভাগিনী সঞ্চার করিতে অক্ষম !
ঝরক ঝরক তবে, নয়নধারায়
প্রফালিব প্রাণেশের যুগল চরণ !
এস নাথ দুঃখিনীর নয়নের তারা !
দূরে থাক, স্পর্শিও না মিনতি আমার !
স্পর্শিও না কলঙ্কিত কলেবর মম !
এস তুমি স্নেহময়, জনক আমার !
আজি তাত ! অভাগিনী নন্দিনী তোমার,
অনন্ত বিদায় চায় চরণকমলে ;
দাঁড়াও দাঁড়াও তাত ! নয়ন উপরে,
বিদীর্ণ হৃদয়ে আজি, সকল শ্বরে,
নিবেদিয়ে অভাগিনী, হৃদয়বেদনা,
শুন নাথ দয়া করি, অনন্যশ্রবণে !
কালি সেই আহায়াস্তে, কক্ষে আপনার,
সঙ্গিনী সমাজে বসি, নীরব বদনে,
তুলিতেছিলাম হায় ! চাক 'কার্পেট'
চম্পকের কলি, যথা মন্দ সমীরণে,
নিরবে নাচিতে ছিল, অঙ্গুলি নিচয় ;
ভাবিতেছিলাম কভু, প্রাণেশমুরতি,
সাজিয়া গেলেন যবে, আর্টিয়া সমরে,
সজ্জিত সমরসাজে, কক্ষে অভাগীর !
হেনকালে দেখিলাম, জীবন জীবনে,
দেখিলাম হায় ! সেই নির্দয় বর্ষরে,
দেখিলাম আর কত, সঙ্গী প্রাণেশের !
পূজিলাম প্রেম ভরে, নাথের চরণ,
পূজিলাম সঙ্গীগণে, কতই যতনে,

কতকণ পারে নাথ ! সহ সঙ্গীগণ,
গেলা চলি পুনরায়, 'আর্টিয়া' মগরে !
সজল নয়নে আমি, উদ্ভাদিনী প্রায়,
দাঁড়াইনু একাকিনী অলিন্দ উপরে,
চাহিলাম একমনে, রাজপথপানে,
দেখিলাম আশুগতি তুরঙ্গমগণ
মিলাইল ক্রমে ক্রমে, মুহূর্ত ভিতরে,
অভাগি নয়ন পথ অতিক্রম করি
অমনি নিষাদবিদ্ধ কপোতিনী প্রায়,
ফিরি নু মনের হুঃখে, আপন মন্দিরে !
সঙ্গিনী কুলের সেই আমোদ সাগরে,
ঢালিয়া দিলাম প্রাণ, জুড়াতে হৃদয়,
অলিন্দ উপরে বসি নিরানন্দ মনে !
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে, দিবস রতন,
নীরবে পড়িল ধসি, পশ্চিম গগণে,
দেখিলাম দিনমণি, ক্রমে পুনরায়,
লুকাইল সমুদ্রিয়া, সহজ কিরণ !
দেখি নু হাসিল সঙ্ক্কা, কুসুমবদনে,
তুলিয়া বিনোদহাসি, চিরসৌরভিনী,
শুনি নু গাহিল দূর নিকুঞ্জ কাননে,
বিহঙ্গিনী-মালা মিলি সঙ্ক্কার সংগীত ।
দেখিলাম স্থির নেত্রে, ক্রমে পুনরায়,
আলোকমালিনি মহী, তিমির বসনে,
আবিরল শ্যাম তনু, সঙ্ক্কার মিলনে ;
তারাময়ী সুহাসিনী যামিনী সুরমী !
ক্রমে ক্রমে দেখা দিল, কুসুম সান্দনে,
নবমীর চাক্ষুশী, হাসিল অশ্বরে,
চঞ্চলিল চাক্ষুশী, 'এনিওর' জলে ।
তাজিয়া অলিন্দ পুনঃ, কক্ষে বসিলাম !
শুইলাম সুরঞ্জিত কোমল শযায়,

যাইলাম মূহুরে, ব্যথিত হৃদয়ে,
 খুলিয়া কুসুম কণ্ঠ, সজ্জিত লইয়া !
 দেখিনু মর্ম্মর মঞ্চে, বিনোদ মন্দিরে,
 জ্বলিছে মৃদলে দীপ, স্ফটিক আদারে,
 প্রদীপ হইতে ঝরি, আলোক তরল,
 দেখিলাম থরে থরে নাচিছে চঞ্চলে !
 শুনিলাম সমীরণ, মধুর নিঃশ্বাস,
 বিকচিত মধুময়, কোমল কপোলে,
 নাচাইছে দীপে, নব অলকার দাম ।
 শুনিলাম দূরে কল সজ্জিত কোমল,
 কামিনীর কলকণ্ঠে ঝরছে মধুরে,
 কোমল শয্যা শূন্য, দেখিনু উল্লাসে,
 কাদম্বিনী মাঝে শশী, সুদূরগগনে ।
 দেখিনু কার্পট পরে কক্ষের দুয়ারে,
 অচঞ্চল চন্দ্রমার, কোমল মালতী,
 মিলিয়া পলকহীন ; অচল নয়ন,
 দেখিতেছি সেই জ্যোতি, কতই ভাবনা,
 ভাবিতেছি একমনে ; হেনকালে হয় !
 সহসা চরণধনি, শুনিনু সোপানে ।
 শুনিলে চরণধনি, ফুটিল অমনি,
 শত সাধে অভাগীর হৃদয় কমল ;
 উজ্জ্বল হইল পদ্য, নয়নের তারা !
 চঞ্চলে বাঁহল রক্ত, ধমনী ভিতরে,
 তাজিয়ে শয়ন আমি, উঠিনু সহরে,
 চমকিয়া চলিলাম চঞ্চল চরণে,
 ভাবিয়া অন্তরে বুঝি, প্রাণেশ আমার,
 আসিলেন তুষিবারে এই অভাগীরে !
 কিন্তু কি বলিব হায় ! মুহূর্ত্ত ভিতরে,
 শুকাইল আশালতা হৃদয় কাননে,
 দেখিলাম ক্ষীণালোকে, সোপান উপরে,

সজ্জিত সমর সাজে প্রাণেশ বাক্সবে !
 তখন জানিনি মনে, অমৃত জলদ
 বরশিবে হলাহল ; কোমল মুরতি,
 কে জানে কটকময় ; জানে কি কখনো,
 কুরঙ্গিনী, মরীচিকা, তরঙ্গিনীরূপে
 শোভে যবে মক্‌ভূমে, জানিনা অন্তরে !
 দেববেশে এল সেই, কৃতান্ত আমার ।
 প্রবেশিয়া নিজ কক্ষে হায় ! তার মনে,
 বসাইল সমাদরে কাঠাসনপরে,
 আপনি বসিনু পাশে, পবিত্র অন্তরে !
 শনিবারে প্রাণেশের ! মঙ্গল বারতা,
 শনিবারে সমরের অপূর্ব্ব কাহিনী,
 কটকিত কলেবরে শুনিনু শিহরী,
 মনোহরা শোভাময়ী আর্ডিয়া নগরী
 বেকিয়াছে চারিদিকে, রোম অনীকিনী ।
 কাহলা বর্ষের পুনঃ, কতক্ষণ পরে,
 “সমরের পরিশ্রমে ক্লান্ত কলেবর,
 তোমার মন্দিরে আমি, অতিথি সুরঙ্গি,
 বঞ্চিত যামিনী দেবি, মন্দিরে তোমার !
 অনুমতি দাও তুমি, ভুবনমোহিনী ।”
 কি বলিব পতিপ্রাণা, সতী সাদ্বী প্রায়,
 তখনি সম্মতি দিনু, কহিনু আবার
 ভাগ্যবতী আজি আমি, ধরণী মণ্ডলে !
 রাখিলাম অতিথিরে, অমৃত প্রদানে
 পোষিলাম আশীর্বাদে ; কিছুক্ষণ পরে,
 অই কক্ষে নিদাক্ষণ করিল শয়ন ।
 বসিলাম গিয়ে আমি, অলিন্দ উপরে,
 দেখিলাম স্নেহময়ী নিজ প্রাণেশনে,
 অচল জীবনজ্যোত, ক্ষণেকের তরে
 ঘুমায়েছে জীবকুল, কেবল কাননে

নিঃশ্বনিছে সমীরণ, আর নীলাশ্বরে
 ছুটিতেছে কাদম্বিনী, আবরি সলাজে,
 সলজ্জ চন্দ্রমা ছবি, নয়ন নন্দন !
 দেখিছু অলিন্দে বসি, নয়ন অদূরে,
 ভুবন সুন্দরী রোম নিদ্রায় বিহ্বলা ।
 ক্রমে নবমীর শশী চলিল পাশ্চিমে,
 সম্বর মধুরময় কোঁমুদো কোমল ।
 বসিয়াছি, হেনকালে কতক্ষণ পরে,
 ডাকিল 'জুলিয়া' আসি, ভাঙিল চेतন,
 চলিলাম ক্রত পদে শয়ন মন্দিরে,
 পশিয়া শয়ন কক্ষে, 'জুলিয়ার' সনে,
 খুলিলাম চাকবেশ, রাজেন্দ্রমোহিনী,
 পরিব্রু শয়ন বাস, পর্য্যঙ্ক উপরে,
 রাখিলাম কলেবর, কোমল শয্যা
 তুষার শীতল জল, স্ফটিক আধারে,
 রাখিয়া নিশীথ-মঞ্চে, 'জুলিয়া' সুন্দরী
 আবরিল চাক দীপ, নীল বসনের
 সুকোমল আবরণে, বাঁধিল আবর,
 প্রফুল্ল কুসুম দাম, মুক্ত বাতাসনে ;
 বিদায়িনী 'জুলিয়ার' কতক্ষণ পরে ।
 তার পরে আসিলেন, বিশ্ববিনোদিনী
 চিরসুখময়ী নিদ্রা নিকটে আমার,
 পরশিলা কলেবর, চিরমোহময়ী,
 মুদিয়া নয়ন দুটি হুঁ অচেতন
 সময়ের চল চক্রে মধুরা যামিনী
 নীরবে গন্তীয়া ; ক্রমে কোমল শয্যা,
 নিদ্রায় বিহ্বলা প্রাণ, হেনকালে হয় !
 বোধ হল কলেবরে কর-পরশন ;
 অমনি ভাঙিল নিদ্রা উঠিছু শিহরী
 ছদয়ের প্রতিঘাত, হইল চঞ্চল,

সভয় হইল হিরা, সৌদামিনী স্রম ।
 উঠিয়া বসিছু সেই পর্য্যঙ্ক উপরে,
 দেখিছু শয়ন কক্ষ পূর্ণিত আলোকে !
 ঘুরিয়াছে প্রদীপের, নীল আবরণ,
 চঞ্চল প্রদীপালোকে, দেখিছু আবর,
 পর্য্যঙ্কের পাশে সেই দ্রাঘা বর্ষরে !
 নিষ্কোষিত অসি করে, মূর্ত্তকে তরে,
 ঘুরিলা, নয়ন মম, চমকিল প্রাণ !
 সঞ্চারিল সৌদামিনী ধমনী ভিতরে,
 তরল অনল স্রোত, বাহিল শরীরে,
 * * * * *
 মূর্ত্ত ভিতরে পুনঃ, পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া,
 ব্যাধ শরে বিদ্ধ মত্তা সিংহিনী যেমতি
 পড়িলাম হর্যাতলে, আকুল অন্তরে ;
 ভিজানু নয়নাসারে, চরণ তাহার,
 করিছু বিকল কণ্ঠে, সতত মিনতি,
 ভাগ্যদোষে, কি বলিব, নয়নের জলে,
 জীবীভূত হইল না, নির্যম পাশাণ !
 কি বলিব প্রাণনাথ ! সেই দণ্ডে হয় !
 আলিঙ্গন করিতাম উলঙ্গ রূপাণে,
 ত্যজিতাম এই প্রাণ, অন্নান বদনে !
 কিন্তু মধু ভাবিলাম, কলঙ্ক বেদনা,
 ব্যথিবে প্রাণেশ প্রাণ, ভাবিতে ভাবিতে
 অবশ হইল প্রাণ, ঘুরিল আবর,
 নয়ন মন্তক মম, চेतনা প্রবাহ,
 অচল হইল ক্রমে ধীরে ধীরে হয় !
 খগিল ভূতলে নব বসন্ত বল্লরী
 অচেতন হর্যাতলে রহিছু পড়িয়া ।
 * * * * *
 বল তুবে প্রাণনাথ ! ধরিবে কেমনে,

কলঙ্কিত তনু পুনঃ হৃদয়ে তোমার !
 সজীব বিহনে নাথ ! যুবতী জীবন,
 রাখিয়া কি ফল আর সমক্ষে সবার !
 এখনি তাজিব প্রাণ, অন্মন বদনে ;
 প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ ! জনক আমার,
 অনন্ত বিদায় দাও, চিরঅভাগীরে,
 ধরিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ ।
 আর কি বলিব নাথ ! শিরায় তোমার,
 প্রবাহিত হয় যদি, রক্তের লহরী,
 প্রতিফল পায় যেন, পাবণ্ড বর্ষর,
 বিদায়ের কালে এই, মিনতি আমার !
 এই দেখ, করে নাথ ! রূপাণ উজ্জ্বল,
 পবিত্র অন্তর মম, পবিত্র হৃদয়,
 কলঙ্কিত কলেবর, ঘুঘু অভাগীর .
 বর্ষরের পরশনে, সেই কলেবর .
 প্রক্ষালিত করি এই, পবিত্র শোণিতে !
 বিদায় মা বসুমতী ! দাও অভাগীরে,

বহিতে হবে না আর পাপিনীর ভার ।
 যাই তবে প্রাণনাথ ; --ওকি ? প্রাণেশ্বর !
 স্পর্শিওনা কলঙ্কিত কলেবর মম !
 বিদায় বিদায় তাতঃ ! প্রাণেশ বিদায়,
 এই বিদারিনু বক্ষ ! এই দেখ নাথ !
 উছলিল বক্ষঃস্থলে, লোহ-নির্ঝরিণী,
 সম্বরিতা মর লীলা, নারীকুলেশ্বরী,
 পশিলা পবিত্রপুরে, নবীন যৌবনে,
 রূপের আকাশে মরি, বাসন্তি পূর্ণিমা,
 আবরিল অন্ধকারে, অনন্ত জলদে,
 শুকাল বসন্ত ফুল, প্রফুল্ল কাননে,
 মিলাইল ক্ষণপ্রভা, অনন্ত অশ্বরে,
 সম্বরিতা চলজ্যোতি, চির অন্ধকারে ;
 উষার চুশনে চাক, নব প্রমোদিনী,
 মৌরভিনী কমলিনী জলজ সুন্দরী
 ডুবিল অতল জলে, ফুটিবে না আর ।

স্ত্রীঃ—

স্ত্রীকবি ও তদনুযায়ী উপদেশ ।

পীঠিকা ।

সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ অবস্থা তা-
 হাতে যাহা পুরুষের শিক্ষণীয়, স্ত্রীলো-
 কেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা করিতেছেন ।
 স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উভয়জাতীয় শিক্ষা
 না হইলে সংসারের কখনই উন্নতি হইবে
 না । গৃহস্থালি, গার্হস্থ্যশিল্প, পাকবিদ্যা,
 এই সকলই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ও অ-

বশ্য শিক্ষিতব্য । বর্তমান স্ত্রীশিক্ষাতে
 এ সকলের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হই-
 তেছে ।

পূর্বকালের স্ত্রীলোকেরা পুস্তক
 পড়িতে পারিতেন না, অক্ষর আঁকিতেও
 জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা গৃহস্থালি,
 গার্হস্থ্যধর্মোপযোগী শিল্প, বিনয়, সদা-
 চার, ধর্মপ্রবলতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয়

শিক্ষিত্য বিষয়ে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। তাঁহার বালিকাদিগকে যে সকল খেলা রচনা করিয়া নিশ্চয় রাখিতেন, তদ্বারা বালিকাদিগের বালিকা অস্থানেই গৃহস্থালি শিক্ষায় অনুরাগ সঞ্চার হইত। রামাবাতি খেলায় রঞ্জন বিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিত, পুতুল খেলায় পুত্র কন্যার লালন ও তাহাদের বিবাহ, আত্মীয় কুটুম্বের আদর আহ্বান, দাম্পত্য ধর্মের মর্যাদা, নৈতিকতা রক্ষা, প্রতিবেশী প্রেম, গৃহস্থ ও কন্যাদিগকে শিক্ষা প্রদান, তাহাদের কলহ ভঞ্জন ইত্যাদি সমস্ত গৃহস্থালীর ব্যাপার অভ্যাস পাইত। এই সকল ক্রীড়াতে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ও অমৃৎস্বরূপ লজ্জা, ভয়, বিনয়, কোমলতা শব্দভি জন্মিত। এক্ষণ ক্রমে যে সকল আবির্ভূত হইতেছে, কেবল অক্ষর শিক্ষাই নরকোমলতা দাঁড়াইয়াছে।

প্রাকপ্রাচীনকালের গ্রহণীরা কি প্রকারে শিক্ষা দিতেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিত হইল। প্রাচীন জীর্ণের যে সকল সারগর্ভ উপদেশাত্মক বাক্য আছে, তাহাকে আমরা স্ত্রী কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পুরুষেরা ভাষায় পণ্ডিত, তাহাদের ভাষা সুস্বাদু, স্ত্রীদিগের ভাষায় তত অধিকার ছিল না, এজন্য তাহাদের কবিতা তত সুস্বাদু নহে; স্ত্রীভাষা স্বতন্ত্র। স্ত্রীভাষায় অধিকতর খণ্ডখণ্ড কবিতার মত বাক্যকে আমরা স্ত্রীকবি বলিলাম। ইহার ভাষা

এখন শ্রবণ-সুখকর না হইলেও সারগর্ভ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার আবশ্যিকতা ও সময়।

বিদ্যা স্ত্রী পুরুষ স্বজন করিয়া আপন স্বস্তির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সংসারে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া চলিবে এবং পরস্পরকে সুখী করিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। স্ত্রী পুরুষ যদি যথাযোগ্যরূপে সুশিক্ষিত হইয়া একযোগে সংসারস্থ্রে আবদ্ধ থাকিয়া সামঞ্জস্যে জীবনানতিপাত করেন, তাহা হইলে এই মানবধাম স্বর্গতুল্য সুখধাম হয়।

প্রধানতঃ পুরুষেরা গৃহস্থ জাতি, নারীগণ গ্রহণীজাতি। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাবিভাগ এই যে, পুরুষেরা অর্জন শিক্ষা করিবেন এবং গ্রহণীরা গৃহস্থালী শিক্ষা করিবেন; ধর্ম, জ্ঞান, নীতি সাধারণে থাকিবেন। উহা পুরুষেরাও শিক্ষা করিবেন, স্ত্রীরাও করিবেন। যেমন এক যোগে গৃহস্থালি করিলে তাহা সুচাঞ্চ ও সুখের হয়, তদ্রূপ ধর্ম ও একযোগে করিলে ভাল হয়। নারীজাতি ধর্মানুষ্ঠান, বাহ্যবিদ্যা, শিক্ষা প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া কখন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সকলের অনুষ্ঠান একযোগে হওয়া উচিত, একযোগে হইলে বিনাক্ষেপে ও সুচাঞ্চরূপে সম্পাদিত হয়।

কি প্রকারে গৃহস্থালি করিতে হয়, কি উপায়ে ধর্মোপার্জন হয়, নারী এসকল শিক্ষা করিবেন এবং সুশিক্ষিতা হইয়া ধর্ম ও ন্যায় পথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নিরীক্ষা করিবেন । পুরুষদিগের প্রতি এইরূপ নিয়ম যে, গৃহস্থালি ও ধর্মোপার্জন এই দুইটি সংসার রক্ষের শাখা ; ধর্মমূল্য সম্ভোগ তাহার ফল । জ্ঞানতির গৃহস্থালি না জানা বিড়ম্বনার বিষয়, পুরুষেরও ধনোপার্জনের অক্ষমতা অসীম দুঃখের কারণ । ধর্মমতির অভাব উভয়েরই অনিষ্টকর । যিনি যাহাই শিক্ষা করেন, তদানুযায়িক ধর্ম ও নীতিশিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় । অনুষ্ঠানকালেও ধর্ম ও নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যকর কর্তব্য ; যিনি তাহা না করিয়া বদচক্রাক্রমে কার্য্য করেন, তিনিই বিপদপ্রাপ্ত হইবেন ।

বিনা শিক্ষায় কিছুই হয় না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত । অতএব কি গৃহস্থালি, কি ধনোপার্জন সমস্তই শিক্ষা করিতে হয় । যাহা শিক্ষিতব্য, তাহা শৈশবাবস্থায়ই শিক্ষা করা কর্তব্য । কেমন বালাকালে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাতেই উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে । বয়োবৃদ্ধিসহকারে নানা বিষয়ে বুদ্ধি বিকশিত হওয়ায় অঙ্গশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং কোন বিষয়ই ভাল শিক্ষা হয় না । তখন ভোগের সময়, পুথিভোগে মন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সুতরাং কষ্টসাধ্য শিক্ষাসকল ঘটিয়া উঠে না । তখন বুদ্ধি প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু সংসারের চি-

ন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় ও ঈদৃশ কষ্ট সহ্য হয় না । এই সকল কারণে শিশুকালেই শিক্ষা আরম্ভ করা কর্তব্য । এবিষয়ে প্রাচীন জ্ঞানীলোকেরা বলিয়া থাকেন—

“কচিতে না নোরা’লে বাঁশ ।

পাকলে করে ট্যাশ ট্যাশ ॥” (শ্রীকবি পূর্বে বাঁশের ছড় ব্যবহৃত হইত, “চৌপালী” নামক এক প্রকার ডুল ছিল ; তাহার ডাণ্ডি বাঁশের দ্বারা নির্মিত হইত, এই বাঁশ কচি অবস্থায় চৌপালীর উপযুক্ত করিবার জন্য বাঁকাইয়া দিতে হইত । কেন না পাকা বাঁশ নোরাইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায় । উপরোক্ত শ্লোকটি তদ্রূপে কোন গৃহিণী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । পদ্মি-বাসিনী বৃদ্ধা গৃহিণীরা কোন বুদ্ধিমতী বালিকা দেখিলে আজ্ঞাদিতচিহ্নে—
মাতাকে উপদেশ দিতেন ‘তোকে’
মেয়েটিকে এই বেলা গৃহস্থালি শিক্ষা
চেৎ ইহার পর আর শিখিতে পারিবেনা
এবং আপনার কথা সমগ্র জন উপ-
রোক্ত পুরাতন স্ত্রী-কবিত্ত শ্লোকটির আ-
রতি করিতেন । অতএব যাহা শিক্ষিতব্য
তাহা সংসারজীবনের ক্ষেত্রে না পড়িতে প-
ড়িতে বালাকালেই শিখিতে হইবে । যা-
হার প্রথমকালে শিক্ষা না করেন, বয়ঃ-
প্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইলে তাহাদিগের
দুর্গতির ভীষণ থাকে না ।

অশিক্ষিতা নারী কোন ক্রমেই গৃহ-
স্থালির সুব্যবস্থা করিতে পারেন না ।
সোণার সংসারও অশিক্ষিতার হস্তে প-

কিছু কিছু করার হয়। কি করিলে সকল
কিছু রক্ষা পাইবে, কিরূপ করিলে সংসা-
রকে ত্যাগ সহজ সাধ্য হইবে, কি কার্য
করিলে পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে,
কি করিলে অবলম্বন করিলে সংসারের
অনিষ্ট বা অপ্রতুল দুর্চিবে এবং শ্রীযুক্ত
কর্তব্য, শিক্ষিতা রমণীরা এসকল বুঝিয়া
করিতে পারেন না। অজ্ঞতা ও অনভ্যাস
কর্তব্যের দ্বারা সংসারকে ভার জ্ঞান
কর্তব্যের কার্য কালে তাহাদের ক্লেশ
বৃদ্ধি করে। ইহা অলম্য প্রশ্রয় পাওয়াতে
সংসারী হইতে থাকে; সুতরাং
সংসারী জীবনের সারদর্শ ও শ্রুত সন্তোষ
বৃদ্ধি করে। দুঃখ ও ক্লেশময়িত্ব
বৃদ্ধি করে তাহাদের কটি কলুষিত হয়।
অন্য পক্ষ করে, সুতরাং তাহাদিগের পা-
দেবতা পথেও জলাঞ্জলি দিতে হয়।
সংসারীদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ জা-
নিত্য কথেরাও যদি প্রথম বয়সে উ-
দ্ভব হয়, নীতি ও ধর্মানুষ্ঠান শিক্ষা না ক-
রে, তাহাও সংসার-দশায় অশেষবিধ
ক্লেশ পাইবে, সংসার তাঁহাদিগের ভার
বৃদ্ধি করে এবং তাঁহাদের সংসার চালাইতে
কঠিন হয়। অবশেষে হয় ত অর্থ ও
অন্য উপায়ে ধনার্জন করিতে প্রবৃত্ত হ-
য়। তাহাও উভয় কালই নষ্ট করেন।

বাহির হইতে আনয়ন করা বা উপা-
সনা করা আর গৃহস্থালি কার্য করা এই
কর্তব্য যদি এক ব্যক্তির স্বন্ধে পতিত
হয় তাহা হইলে তাহাকে তাহার যৎপ-

রোনিাস্ত কষ্ট হয় এবং কায্যও সূচাঙ্কুরে
নির্মাণ হয় না। একজন গৃহস্থ ও গৃহিণীর
উছা অংশ করিয়া লওয়া কর্তব্য। গৃহস্থ
বাহির হইতে ধনাতি আহরণ করিবেন
এবং গৃহিণীরা তাহা সামঞ্জস্য করিয়া ব্যয়
ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাহা হইলে
উভয়েরই ভারের লাঘব হয় এবং উভয়েই
শুখী হইতে পারেন। যদি গৃহিণীর আ-
হরণের চিন্তা না থাকিল এবং যদি রক্ষ-
ণাবেক্ষণের চিন্তাও গৃহস্থের না থাকে,
তাহা হইলে উভয়েই আপনাপন কর্তব্যের
উন্নতি করিতে পারেন ও শ্রুত কালযাপন
করিতে সমর্থ হয়েন। ঐরূপ হইলে অতি
শ্রমরূপে সংসার নির্বাহ হয়। নচেৎ
একজন দাগ হইয়া সমস্ত করিবেন, আর
একজন যোগীর ন্যায়, উদাসীনের ন্যায়,
পরের ন্যায়, নিঃসম্পর্কিত থাকিবেন ইহা
অতীব অনায়াস। ইহাতে উভয়েরই অত্যন্ত
কষ্টের বিষয় তাহা প্রাচীন কালের শ্রী
কবির ঐরূপে বাক্য করিয়াছেন।

‘গাছে পাড়া তলার কুড়ান এ
সামান্য নয়।
নাকের জলে চোকের জলে একাকার
হয় ॥’ (শ্রীকবি)

কোন বৃহৎ বৃক্ষের ফল পাড়িতে হ-
ইলে দুই জনের আবশ্যক হয়। একজন
পাড়িবে ও একজন কুড়াইবে। ঐরূপ
না হইলে কষ্ট এবং ক্ষতি স্বীকার করিতে
হয়। আত্ম পাড়িয়া তলার ফেলিলে
যদি বৃক্ষ না থাকে, তাহা হইলে অনা-

রাসে তাহাঁ দুটলোক কর্তৃক অণুপস্থিত অথবা বন্যপশু দ্বারা ভক্ষিত হইতে পারে। অতএব পাড়িতে গেলে কুড়ান এবং কুড়াইতে গেলে পাড়া হয় না। এই দুটালু শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে সংসারকে ভারজ্ঞান হয় না এবং অনাগাসে সংসার-কার্য-নিচয় সূচাকরূপে নির্বাহ করা যায়। সু-টেরা শিক্ষা কৌশল ও অভ্যাস বনৈ লোকের কত বহুভার ত্রাবা বহন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সংসারের অঙ্গ ও তাহার প্রণালী ।

সংসারে সকলেই অজ্ঞানাবস্থায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা প্রকার শিক্ষালাভ হয়। কিছু না কিছু শিক্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক। জ্ঞানসঞ্চার আরম্ভ হইলে কিছু না কিছু শিক্ষা হইবেই হইবে। যখন কোন প্রকার ঘটনা আপনা হইতেই হইবে, তখন ভাল বিষয় শিক্ষা করাই কর্তব্য। যে শিক্ষা দ্বারা ইহকালে সুখদাচ্ছন্দ্য ও পরকালে শুভ হয়, তাহা শিক্ষা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। সে বিষয়ে আলস্য করিলে মন্দ শিক্ষার ফল—কষ্টভোগ করিতে হয়। মনুষ্য যদি ধর্ম, নীতি, সংসার-নির্ব্বাহন-প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা না করে, এবং কেবল আহার ভয় ও ইন্দ্রিয়বলি লইয়া থাকে তাহা হইলে সে পশু হইতেও অপকৃষ্ট হয়। পশুরা কোন ভাল বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম, নীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি শিখে

না। মনুষ্যেরা ইহা শিখে বলিয়া পশু অপেক্ষা সুখী ও শ্রেষ্ঠ। যে মনুষ্য এই-কম শিক্ষা না করে সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ পশুদের কোন বিশেষ প্রকার পাপ শিক্ষা ঘটেনা। মনুষ্য অশিক্ষিত হইলে সে দুর্জীবর ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া কেবল পাপ শিক্ষা করে, সুতরাং অধঃপাতে যায়। এবিষয়ে পুরাতন একটি স্ত্রীগাথা এই—

“ বসে বসে খুটি খুটি ।

আভাগী যেন পাপের কুটি ॥ ”

যে নারী কোন আত্মহিতকর কার্য করিতে ভাল বাসেন না, তাঁহাকে ‘খুটি খুটি’ অর্থাৎ রূপা বা নিষ্ফল কার্য করিতে হয়; যেহেতু কাহারও চুপ করিয়া থাকিবার যো নাই। একজন বহুদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘মনুষ্য কার্যের অভাবে অকার্য্য করে’ অর্থাৎ কোন ভাল কার্য্য নিযুক্ত না থাকিলে মন্দ কার্য্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। রূপা কার্য্যে আশক্ত হইলে তাহাকে ক্রমে পাপ জাগ্র করে, সুতরাং অভাগ্যবতী হইতে হয়।

অনেকে বলেন, পুস্তক পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষা সমাধা হইল। এটি বড় ভ্রম। পুস্তক পড়িতে শিক্ষা আর ষাট কত অক্ষর পড়িতে শিক্ষা একই কথা। কএকটা অক্ষর জানা কোন ক্রমেই জীবনের প্রধান শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেক বালক বালিকা কেবল অক্ষর পড়িয়া বাবু অর্থাৎ অক-

